১৯ উনিশ কুড়ি ২০

পুজো

১৪২২

পুজো ১৪২২

সূচিপত্র

উপন্যাস

৫০

অমৃত আশাবরী

মল্লিকা ধর

এ হল আগামী যুগের কাহিনি। প্রবল বন্যায় ভেসে গেল উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু। জেগে থাকল শুধু উঁচু জমি। বেঁচে গেল সেখানকার সরল মানুষজনেরা। বড়-বড় দেশ, শহর সব চলে গেল জলের তলায়। এই পরিবেশে বড় হয়েছে ওরিয়ানা এবং আরেনুশ। কীভাবে এগিয়ে চলল তাদের জীবন?

আলোছায়ার কথাকলি

সুমন মহান্তি

এই উপন্যাসে সমান্তরাল ভাবে বয়ে গিয়েছে সায়ম, অদিতি, রমিত, সুলগ্নার জীবন। মফস্‌সল শহরের বাসিন্দা সায়ম ব্যাঙ্কের কর্মী। কিন্তু তার মনের গভীরে, ঘুমের অচেতনে ঘাই মারে গীতিকার হওয়ার স্বপ্ন। স্ত্রী অদিতি, ছেলে রোহন আর ব্যক্তিত্ববান বাবা প্রিয়নাথকে ঘিরে আবর্তিত হয় তার জীবন। তবু সর্বদাই কীসের যেন হাহাকার ঘিরে থাকে তার মানসভূমি। সায়মের বন্ধু রমিতের চোখেও রয়েছে অন্য এক স্বপ্নের অঞ্জন। সুলগ্নার সঙ্গে কি একছন্দে বাঁধা পড়বে তাঁর জীবন? ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তাদের সমবেত জীবন নতুন বাঁক নেবে কি?

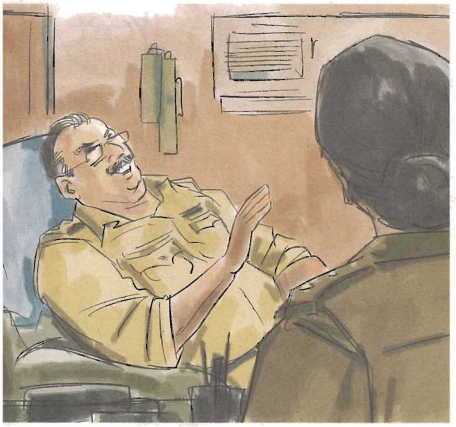

২৫২

কাউন্টডাউন

তুষার কান্তি ভট্টাচার্য

কুখ্যাত মাফিয়া টারজেন সিংহের হাতে খুন হন বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন জৈন। দক্ষ পুলিশ অফিসার কস্তুরী মুখোপাধ্যায়ের নৈপুণ্যে ধরা পড়ে টারজেন। কিন্তু জেলে বসেই টারজেন প্ল্যান করে জজ সমরজিৎ লাহিড়ির মেয়েকে অপহরণ করার। সেই প্ল্যান আবার ধরে ফেলে কস্তুরীর সহকারী অফিসার। তারপর সমরজিতের মেয়েকে কি উদ্ধার করতে পারে কস্তুরী? নাকি সমরজিতের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিচারব্যবস্থাকে ফাঁকি দেয় টারজেন? এদিকে কস্তুরীর অনমনীয় মনোভাব চটিয়ে দেয় উপরমহলকে। তাহলে কি টারজেন ধরা পড়ার আগেই কস্তুরীকে সরিয়ে দেওয়া হবে কোনও এক গুরুত্বহীন দফতরে?

AMARBOI.COM

ফি চা র

৩৭

দুর্গাপুজোর সবুজ উপচার

সু বর্ণ ব সু

প্রকৃতিরূপিণী দেবীর আরাধনায় কেন অপরিহার্য বিল্ববৃক্ষ, নবপত্রিকা, অপরাজিতা লতাসহ বিভিন্ন গাছগাছালি?

বইপত্তর...বিক্রিবাটা

৪০

পা য়ে ল সে ন গু প্ত

প্রযুক্তি ও বই পড়ার দ্বন্দ্ব নিয়ে বহু আড্ডা তোলপাড় হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কমে যাচ্ছে বইয়ের বিক্রি বা বাংলাভাষার প্রতি টান?

AMARBOI.COM

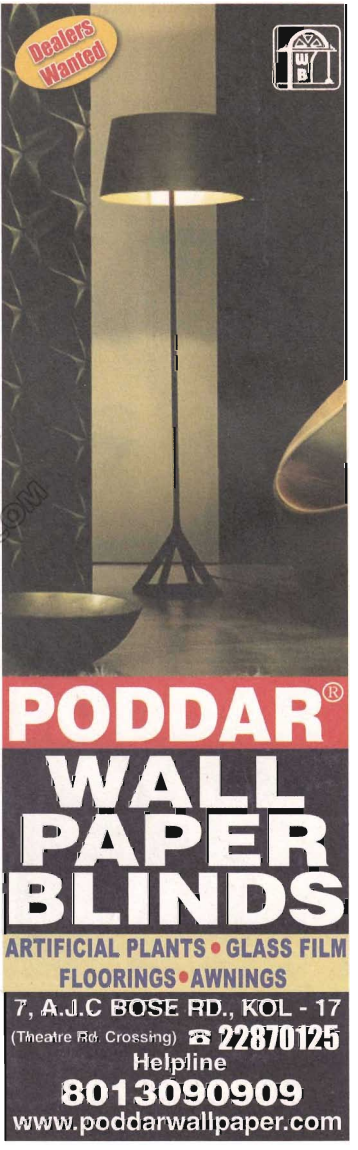

৪৪

Metallic মোহজাল

পা র মি তা সা হা

মেকআপে মেটালিক শেড এবার পুজোয় হট অ্যান্ড হিট। কখনও ব্লাশারে, কখনও আইশ্যাডোতে আবার কখনও লিপস্টিকে মেটালিক শেড... তোমার আবেদন নিঃসন্দেহে বাড়াবে। গ্লসি কপার, প্ল্যাটিনাম শেড, মিক্সড মেটাল... পুজোর পাঁচদিন ট্রাই করার জন্য হরেক রকম মেটালিক ম্যাজিক মেকআপের ফরমুলা শিখিয়ে দেওয়া হল তোমাদের।

১৪০

চেনা-অচেনা গেম অফ থ্রোন্‌স

অ চ্যু ত দা স

সারা দুনিয়ার যুবসমাজ এই শোয়ের নামে জ্ঞান হারাচ্ছে উঠতে-বসতে! যারা এই শো-এর নিয়মিত দর্শক আর যারা এখনও দেখা শুরু করলে না, দু'দলের জন্যই রইল এই শোয়ের নেপথ্যের একগুচ্ছ দারুণ গল্পোগুজব!

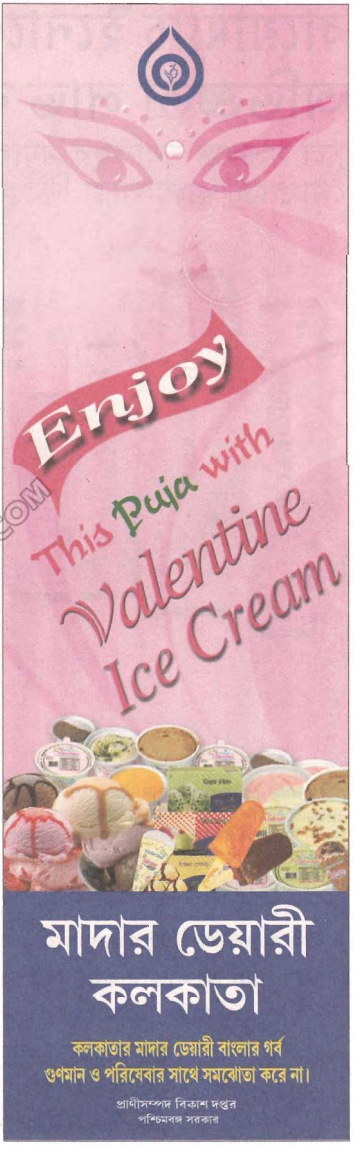

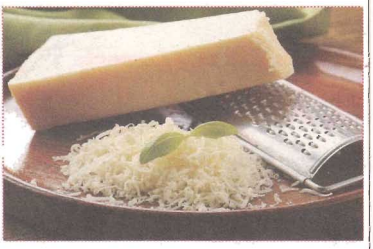

Cheese সাগরে দিয়েছি ডুব

১৩৬

পা র মি তা সা হা

আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চিজ়ের ব্যবহার পৃথক আইটেম হিসেবে যত না, তার চেয়ে অনেক বেশি অনুষঙ্গ হিসেবে। খাবারের স্বাদ কোশেন্ট বাড়াতে, চিজ়ের জায়গা একদম ফার্স্ট বেঞ্চে। চিজ়ের বিস্তৃত বিবরণের পাশাপাশি তোমাদের জন্য রয়েছে কয়েকটি ইয়াম্মি রেসিপিও।

২১০

Smoke ইন চোখ

ন ব নী তা দ ত্ত

চোখে একটু কাজলের ছোঁয়ায় কীভাবে মোহময়ী হয়ে ওঠা যায়, সেটা কি জানো? কালো, খয়েরি, নীল, সবুজ ইত্যাদি রংবেরংয়ের কাজল দিয়ে চোখে বিভিন্নরকম স্মোকি লুক ট্রাই করতে পার। নিউট্রাল, বোল্ড, ক্যাট্‌স আই, মেটালিক, রঙিন, ড্রামাটিক ইত্যাদি বিভিন্নরকমের স্মোকি আইজ় ট্রাই করব কীভাবে? থাকছে তার টোটাল টিপ্‌স।

AMARBOI.COM

২২০

ত্বক ও চুলের Diet

মৌমিতা সরকার

পুজো স্পেশ্যাল লুকে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত হতে হবে ফিটফাট, টিপটপ। শরীর ফিট রাখার মতো, ঝলমলে ত্বক ও চুলের জন্যও জরুরি সঠিক ডায়েট। তাই পুজোয় ঝকঝকে, চকচকে লুক পেতে বিভিন্ন রকমের ফল ও সবজি দিয়ে বানিয়ে নাও তোমার এক্সক্লুসিভ বিউটি ডায়েট।

২১৪

মিষ্টিতে Fusion

নবনীতা দত্ত

গ্রিন ম্যাঙ্গো সন্দেশ, বাটারস্কচ সন্দেশ, চকোকদম, আমের ছানার পায়েস, বেক্‌ড রসগোল্লা... আহা! কতরকম মিষ্টি। কলকাতার বিভিন্ন দোকানে সনাতনী মিষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিক্রি হচ্ছে এরকম রংবেরংয়ের লোভনীয় ফিউশন মিষ্টি। '১৯ ২০' বন্ধুদের জন্য রইল কলকাতার বিভিন্ন দোকানের ফিউশন মিষ্টির খোঁজ।

AMARBOI.COM

লং রেসে শর্ট ড্রেস

নি জ স্ব প্র তি নি ধি

সারাবছর সকাল হোক বা রাত, নাইট পার্টি হোক বা বার্থডে পার্টি, শর্ট ড্রেস অলওয়েজ হিট। তাই নিজের ওয়ার্ডরোবে অবশ্যই গুছিয়ে রাখো কিছু শর্ট ড্রেসের কালেকশন। কাট ও প্রিন্টেও কিন্তু অনেক রকমফের এসেছে শর্টড্রেসে। একদিকে এ-লাইন কাট, স্ট্রেটকাট, অন্যদিকে ফ্লোরাল, জিওমেট্রিক প্রিন্ট বা সলিড কালার। এবার তোমাদের পুজোর ফ্যাশনে থাকছে এক আলমারি শর্টড্রেস কালেকশনের শর্টকাট।

A TATA Enterprise

CMC Ltd is a subsidiary of TCS Ltd.

চাকুরী ভিত্তিক সেরা

IT Diploma Course

CMC ACADEMY তে

DIPLOMA COURSES

Software, Hardware, Multimedia, FA-Tally, Networking, Android, Banking & Finance, Software Testing.

CERTIFICATE COURSES

Basic Course, DTP, MS Office, C, C++, Java, J2EE, .Net, PHP MySQL, RDBMS, Adv. PHP, AutoCAD.

Personality Development & Interview Grooming Programme

Attention!

Diploma / Degree Engineers!!

Latest Industrial training & Project @ CMC ACADEMY with Guaranteed Interview

CMC ACADEMY

CMC COMPUTER EDUCATION

CMC Limited Your IT Partner

- KONNAGAR: 2674 - 7614 / 9007403663
- BEHALA: 2446 - 0725 / 9330148679
- HOWRAH: 2637 - 1117 / 9007403663
- HAZRA: (033) 4073 - 1111 / 9339408422
- CHANDANNAGAR: 26856405/9007403663
- BUDGE BUDGE: 2470 - 1025 / 9339488632
- DANKUNI: 2659 - 0234 / 9007403663

AMARBOI.COM

২৩০

পশ্চিমি বেশ, পুজোয় বেশ

পা র মি তা সা হা

পুজোর পোশাক মানেই শাড়ি, চুড়িদার নয়। ওই স্পেশ্যাল চারটে দিন না হয় আপন করে নাও ওয়েস্টার্ন আউটফিট। শিয়ার, রাফেল্‌স, পেপলাম, গ্যাদারড... এবার তোমার পোশাকে থাকুক পশ্চিমি স্টাইল।

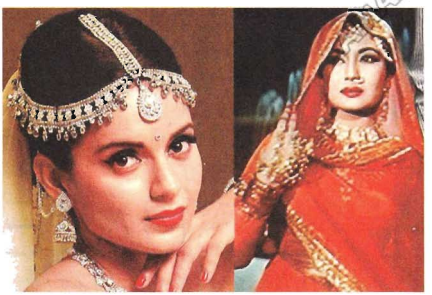

ব-এ বায়োপিক আসছে তেড়ে

২৩৪

অ চ্যু ত দা স

বায়োপিক বা আত্মজীবনীমূলক ছবি নিয়ে গত কয়েকবছরে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে বলিউডে। হলিউডেও এমন ছবি নিয়ে মাতামাতি চিরকাল তুঙ্গে। কোনগুলো সেরার সেরা? আগামী ক'মাসেই বা মুক্তি পাচ্ছে কোন-কোন মাস্ট-ওয়াচ?

২৪২

দশে দশ পরিচালক!

ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়

অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম সবাই জপে। কিন্তু ছবির স্রষ্টা, সেই পরিচালকের কথা ক'জন মনে রাখে? বর্তমানের সেরা দশ হলিউড পরিচালক কারা? সমালোচকদের হিসেবে নয়, বরং বক্স অফিস আর আর্টের মধ্যে একটা ব্যালান্স করে, এই হিসেব আমরাই করলাম...

২৪৮

Ice-Ice কফি!

পারমিতা মুখোপাধ্যায়

কোনও উৎসব হোক বা স্রেফ নির্ভেজাল আড্ডা সেশন, সঙ্গে থাকলে কোল্ড কফি, জমে যায় ১৯ ২০-দের সেলিব্রেশন! কী-কী ধরনের কোল্ড কফি পাওয়া যায় কলকাতায়? থাকছে তার হদিশ। সঙ্গে থাকছে coolest কফি জয়েন্টগুলোর ঠিকানা এবং বাড়িতে বসে কোল্ড কফি বানানোর কিছু দুর্দান্ত রেসিপি...

'১৯ ২০' পত্রিকার পাঠকদের জন্য পুজোয় বিশেষ উপহার

৩০০

কলকাতা ও তার আশপাশের কয়েকটি বিশেষ জনপ্রিয় পুজো

নতুন জামাকাপড়, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, ছুটির আমেজ, রুটিন-ভাঙা সেলিব্রেশন — এসব তো আছেই, তবে সবকিছুর সঙ্গে যা জুড়ে আছে, তা হলো চারবেলা চুটিয়ে ঠাকুর দেখা। তাই এবার পুজোয় ঠাকুর দেখার আনন্দকে দ্বিগুণ করতে কলকাতা ও তার আশপাশের জেলা মিলিয়ে ৫২টি সেরা পুজোর খোঁজ নিল ১৯ ২০। সেই সঙ্গে থাকছে সেইসব বিখ্যাত পুজোগুলো সম্পর্কে এক্সক্লুসিভ ইনফো। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম... কুপন হাতে থাকলে বাদ যাবে না কোনও পুজোই। আর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে এই ৫২টি পুজোয় প্রবেশ কুপন। তা হলে আর দেরি কীসের! ঝটপট একঝলক দেখে নিই চলো...

AMARBOI.COM

TOP HOTEL MANAGEMENT INSTITUTE *CSR
INDIA'S LARGEST HOTEL SCHOOL
INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
IIHM
KOLKATA • DELHI • BANGALORE • PUNE
JAIPUR • AHMEDABAD • HYDERABAD
BANGKOK
5-STAR HOSPITALITY EDUCATION
WORTH IT'S WEIGHT IN GOLD
INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
INTERNATIONAL TOWER,
X-1, 8/3, BLOCK - EP,
SALT LAKE, ELECTRONICS COMPLEX,
SECTOR - V, KOLKATA - 700 091.
PHONE : 2357 7663 / 64
Mob : 9831259414/16/18
facebook/iihmhotelschool
www.iihm.ac.in

৩৫৪

‘ইন্ডিগো’র ইশারায়

ঈপ্সিতা বসু

এবার পুজোয় লাইমলাইট থাকবে ‘ইন্ডিগো’ রং-টির উপর। তাই পুজোয় ফ্যাশনেব্‌ল থাকতে এই রংয়ের পোশাক ওয়ার্ডরোবে রাখতেই হবে! চুড়িদার থেকে ড্রেস, শার্ট থেকে ওয়েস্টকোট সব জায়গায় চাই এই রংয়ের ছোঁয়া... জেনে নাও পোশাকের পাশাপাশি অ্যাকসেসরিজেও কী করে রাখবে এই রংয়ের প্রাচুর্য...

৩৫৮

নতুন তাঁরা, তাতেই ‘তারা’

অংশুমিত্রা দত্ত

হলিউডের দিকপাল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পরের প্রজন্ম তৈরি... তারা নিঃশ্বাস ফেলছে প্রবীণদের ঘাড়ের কাছে। এমা ওয়াটসন, ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট, রবার্ট প্যাটিনসনরাই এখন নিউ এজ সুপারস্টার। আর কারা টেক্কা দিচ্ছে জর্জ ক্লুনি, টম ক্রুজদের? কারাই বা রূপে-গুণে অ্যাঞ্জেলিনা বা কেট উইন্সলেটের যোগ্য উত্তরসূরি?

AMARBOI.COM

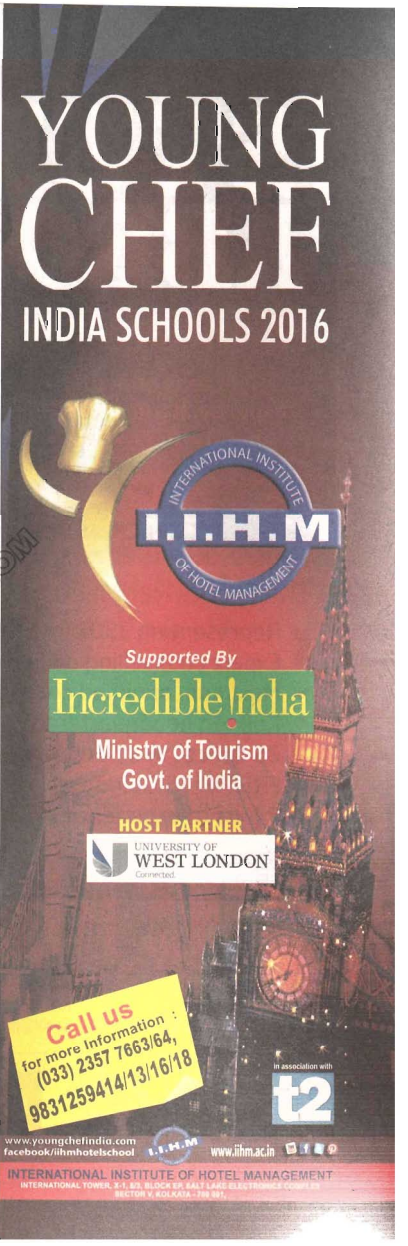

৩৬২

স্মার্ট Shorts

মৌমিতা সরকার

জিন্স, ট্রাউজার্সের সঙ্গে এবার পুজোয় ছেলেদের ওয়ার্ডরোবে রাখতে পার শর্টসের দারুণ কালেকশন। শর্টসের সঙ্গে টি-শার্ট বা শার্টের কম্বো দিয়ে তৈরি করো স্টাইল স্টেটমেন্ট।

৩৬৬

খোলা চুল পুজোয় Coo!...

পারমিতা মুখোপাধ্যায়

ফ্রেঞ্চ ব্রেড বা হাই পনি, অনেক হেয়ারস্টাইলই তো ট্রাই করলে হানি... এই পুজোয় না হয়, খোলা চুলেই হয়ে ওঠো বিউটিফুল! কী করে পাবে একঢাল কালো ঘন চুল? ফ্রিজের মতো হাজার সমস্যা তাড়িয়ে, শাইন-ভলিউম বাড়িয়ে খোলা চুলে ফ্যাশন স্টেটমেন্ট মেনটেন করার সিক্রেটগুলো পাতাবন্দি করা হল, সঙ্গে পুজো স্পেশ্যাল হেয়ারস্টাইলিং টিপ্‌স।

INTERNATIONAL INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
I.I.H.M

IIHM
YOUNG
CHEF
OLYMPIAD

2nd INTERNATIONAL
YOUNG
CHEF
OLYMPIAD
KOLKATA 2016
Supported By
Incredible India
Ministry of Tourism, Government of India
www.iihm.ac.in
www.ycolympiad.com

পুরাণ Revision

৩৭২

সুবর্ণ বসু

উলট-পুরাণ না হলেও, এখন চলছে পুরনো পুরাণকেই অন্য ছাঁচে ফেলে নতুন মোড়কে পরিবেশন করার ট্রেন্ড। কতরকম এক্সপেরিমেন্ট হল পুরাণকে নিয়ে? একইভাবে কি নতুন হয়ে উঠল রামায়ণ, মহাভারতও?

৩৭৬

বিত্তশালী খেলুড়ে

স্বর্ণাভ দেব

ফ্লয়েড মেওয়েদার জুনিয়র, লিওনেল মেসি থেকে রজার ফেডেরারের মতো একঝাঁক কিংবদন্তি খেলোয়াড়দের চলতি বছরের আয়ের পরিমাণ, সম্পদের খতিয়ান তুলে ধরা হল। সঙ্গে রইল ধোনি, সচিনের মতো ভারতীয় স্পোর্টস তারকাদের সম্পত্তির নজরকাড়া তথ্য। কে কত বিত্তশালী দেখে নেওয়া যাক...

AMARBOI.COM

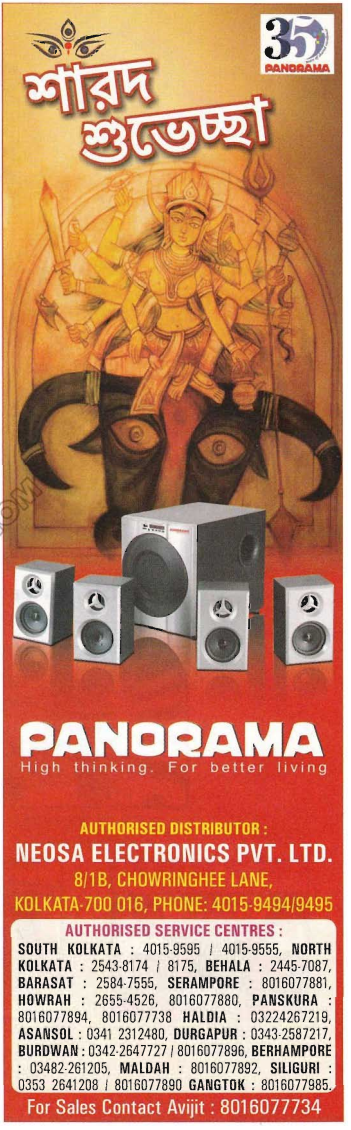

৩৮১

ছোটপরদার তারাবাজি

ঈ ন্দি তা ব সু

ছোটপরদার তারকাদের সঙ্গেই তো রোজ সন্ধেবেলা টিভি-র সামনে জমে ওঠে আসর! তবে সে তো অন্য চরিত্রের আড়ালে। এবার ব্যক্তিজীবনে কে কেমন জেনে নিই চলো...

প্রচ্ছদের মডেল: আলিয়া ভট্ট

ফোটো: প্রসাদ নাইক

মেকআপ ও হেয়ার: বিয়াঙ্কা হার্টকফ

স্টাইলিং: তানিয়া ঘভড়ি

স ম্পা দ ক

পৌলোমী সেনগুপ্ত

৮০ টাকা

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও লাভ পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা ৭০০০৬০ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল (আন্দামান ও মণিপুর): ৩৫ টাকা

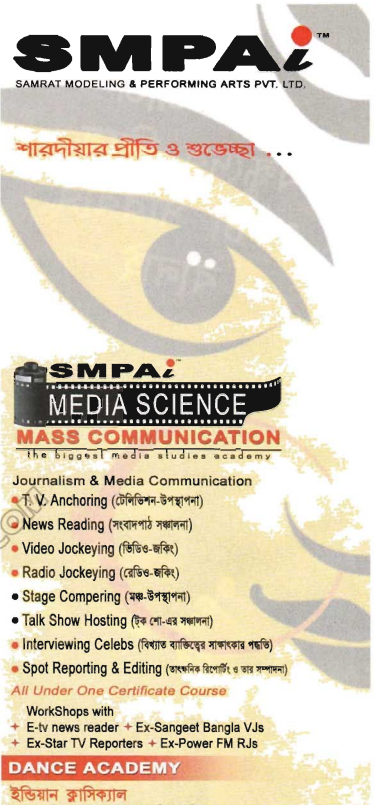

দুর্গাপুজোর সবুজ উপচার

প্রকৃতিরূপিণী দেবী দুর্গার পুজোয় ব্যবহৃত গাছগাছালির তাৎপর্য খুঁজলেন **সুবর্ণ বসু**

ষষ্ঠীর সন্ধে...

"এখনই বোধন শুরু হবে... ওই দ্যাখ, রমেনকাকা বেলগাছ স্থাপন করছে... চল বাইরে গিয়ে বসি!" ফিসফিস করে বলল রশ্মিদি। অমনি লুই, রানা, বিন্তি, হুতোম, বুলি সবাই বলল, "বোধন কী গো রশ্মিদি? রমেনকাকা বেলগাছ পুঁতছে কেন?"

যেখান থেকে শুরু হয়েছিল...

এবার সদ্য কলেজে উঠেছে পাড়ার লুই আর বিন্তি। হঠাৎ কী মাথায় ঢুকেছে, দু'জনেরই মনে হয়েছে এবার পুজোয় ঠাকুর দেখতে না বেরিয়ে ননস্টপ আড্ডা দিলে কেমন হয়! ব্যস... অমনই রাজি করিয়েছে পাড়ার নন্তু, রানা, মিন্টু, রশ্মিদি-সহ ওদের কাছাকাছি বয়সের বাকিদেরও। সকলে মিলে ঠিক করেছে, ননস্টপ না হলেও ষষ্ঠীর সন্ধে, সপ্তমীর সকালটুকু তো আড্ডা দেবেই। তারপর ঠাকুর না দেখলেও কি চলে! কোনওদিন বাড়ির লোক, কোনওদিন স্কুলের বন্ধুরা, কোনওদিন কলেজের বন্ধুরা, কোনওদিন পাড়ার সকলে মিলে... কাজেই লুই আর বিন্তিও না বেরিয়ে পারবে না। তা সেই রুটিন অনুযায়ীই ষষ্ঠীর সন্ধেয় আড্ডা শুরু হয়েছিল। খানিকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পরই রশ্মিদি সবাইকে ওই কথা বলে উঠল। রশ্মিদি সকলের চেয়ে বড়, ভাল ছাত্রী, বটানি নিয়ে পিএইচডি করছে। ওকে সবাই খুব মানে। ওর কথা শুনে সবাই উঠে চলে এল মণ্ডপের বাইরে।

তখনই বিন্তি জিজ্ঞেস করল "বললে না তো, বোধনটা কী? বেলগাছটাই বা কেন?"
রশ্মিদি হেসে বলল, "আসলে আমাদের পুজোয় জল আর ফলকে তো খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেকারণেই বেলগাছ..."
"জল আর ফল? কীভাবে?" বলে লুই।
"মানে ধর, আদিম মানুষ নদীর জল খেত, নদীর মাছ খেত, নদীর ধারে গাছ থেকে ফল খেয়ে প্রাণধারণ করত, পরে সেটাই চলে এল তার পুজোর অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে," বলল রশ্মিদি।
"গাছ, ফল, জল...কীভাবে?" জানতে চাইল হুতোম আর রানা।
"কেন? ঘটের মধ্যে জল, তার উপর ডাব, তার উপর পঞ্চপল্লব! একেই তো মূল দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়, মাটির উপর সযত্নে স্থাপন করা হয়, আচ্ছাদন দেওয়া হয়, এটা তো সেই আদিম জলপান এবং ফলাহারের মাধ্যমে জীবনধারণেরই প্রতীকপুজো। সম্ভবত সভ্যতার সবচেয়ে পুরনো সিম্বলিক ইনস্টলেশন," বলে রশ্মিদি।
"বাঃ দারুণ ব্যাপার তো!" বলে বিন্তি।
"হুম্... খুব ইউনিক কনসেপ্ট, জানতাম না তো! কিন্তু বেলগাছ?" হুতোম বেলগাছ থেকে সরছে না।

বিল্ববৃক্ষে বোধন

"দ্যাখ, বোধন মানে জাগানো, আর অকালবোধনের গল্প তো জানিসই! বসন্তকালের পুজোর সময় দেবতারা জেগেই থাকেন। কিন্তু শরৎকালের পুজোয় তো আগে ঘুমন্ত দেবীকে জাগিয়ে নিতে হয়। পুজোর আগে দেবীকে জাগানোর প্রার্থনাই হল বোধন। আর বেলগাছ কেন? তার অনেক কারণ আছে। আমার মাস্টার্স-এর সময় 'স্পিরিচুয়াল ইমপ্যাক্টস অফ প্ল্যান্ট' নিয়ে একটা প্রজেক্ট করেছিলাম। সেসময় দেখেছিলাম, হিন্দুশাস্ত্রে কয়েকটি দিব্যবৃক্ষের উল্লেখ আছে, যেগুলোকে পুরুষের ক্ষেত্রে বলা হয় ব্রহ্মবৃক্ষ এবং শক্তির ক্ষেত্রে বলে কুলবৃক্ষ। বিল্ববৃক্ষ কুলবৃক্ষ, আবার ব্রহ্মবৃক্ষও বটে। কারণ বিল্ববৃক্ষের চূড়া হল দেবীর মুখ, বিল্বফল হল দেবীর স্তনদ্বয় এবং তিনটি ফলকযুক্ত বেলপাতা যোনির প্রতীক। বেলপাতায় তিনটি ফলককে আবার ত্রিশূলের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। আবার বৃক্ষের ত্বকে রয়েছে কাঁটার উপস্থিতি, যা বোঝায় দেবী স্পর্শের অযোগ্যা কুমারী, এটিই দেবীর ব্রহ্মভাব।
তাই বিল্ববৃক্ষ বা বেলগাছ এমনই গাছ, যেখানে দেবীর ব্রহ্ম এবং শক্তি এই দু'টি রূপেরই সমন্বয় ঘটেছে। সেই কারণেই বিল্ববৃক্ষের মূলাধারে মায়ের বোধন হয়।"
গোটা ব্যাপারটা শুনে তো সকলে অবাক। এত তাৎপর্য। মিন্টু তো বলেই ফেলল, "রশ্মিদি, তুমি এতসব জানলে কী করে?"
একটু হেসে রশ্মিদি বলল, "এম এসসির প্রজেক্টটা করতে গিয়ে কিছুটা জেনেছিলাম, তারপর বাবা বলেছে।"
ও হো! তাই তো! রশ্মিদির বাবাই তো পাড়ার পুজোটা করেন! উনি তো একটা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন। পণ্ডিত মানুষ। রশ্মিদির বাবা তো জানবেনই।

ষষ্ঠীর সন্ধেয় বিল্ববৃক্ষের নীচে বোধন

অষ্টনায়িকার নাম হল ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা।

সপ্তমীর সকাল

ষষ্ঠীর সেই সন্ধেয় ওরা একটু রাত করে আশপাশের পাড়ায় ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিল। সপ্তমীর দিন সকাল হতেই ফের জড়ো হয়েছে সবাই মণ্ডপে। রমেনকাকা, বিশুদা, অশোকজেঠু সবাই বেরিয়ে গিয়েছেন কলাবউ স্নান করাতে। আমরা বসে আছি। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল গুপ্তি। সে এবার ইলেভেনে উঠেছে। সে বলল, "গণেশের এখন মনখারাপ, গণেশদাদার বউ কলাবউ-বউদি নেই তো পাশে তাই! একটা মজার ছড়া আছে জানিস, *গণেশদাদা পেটটি নাদা, গায়ে মেখেছ সিঁদুর / কলাগাছকে বিয়ে করেছ, বাহন তোমার ইঁদুর!*"
আমরা সকলে হেসে ফেললাম। রশ্মিদি বলল, "যাঃ। কলাবউ মোটেও গণেশের বউ নয়। কলাবউই আসলে দুর্গা।"
"সে কী! ছোটবেলা থেকেই তো জানি, কলাবউ গণেশের বউ! তা না হলে গণেশের পাশেই থাকে কেন?" গুপ্তিও নাছোড়।
"গণেশের পাশে থাকবে না কেন! ওই তো মায়ের সবচেয়ে ফেভারিট ছেলে, জানিস না! আর কলাবউ বলা হয় বটে, আসলে তো নবপত্রিকা! নবদুর্গার প্রতীক," বলে রশ্মিদি।
আমরা ঘিরে বসি রশ্মিদিকে।

নবপত্রিকায় নবদুর্গার রূপকল্পনা

"এই গল্পটা একটু খুলে বলো না রশ্মিদি..." আবদার করে লুই ও বিন্তি।
"নবপত্রিকা মানে হল কলাগাছ, ডালিম গাছের ডাল, হলুদ গাছ, জয়ন্তী গাছের শাখা, বেল গাছের ডাল, কচুগাছ, অশোক গাছের ডাল, মানকচু ও ধানের শিষ, এই ন'টি পত্রিকাকে অপরাজিতা লতা ও নয়টি পাটের সুতো দিয়ে বেঁধে, শাড়ি পরিয়ে কলাবউ সাজানো হয়, এটি হল দেবী দুর্গারই প্রতিনিধি। মা দুর্গা যখন শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন, তখন তিনি অষ্টশক্তি বা অষ্টনায়িকার সৃষ্টি করেছিলেন। এই অষ্টনায়িকা এবং মা দুর্গা স্বয়ং মিলে তৈরি হয়েছে নবদুর্গা। তবে অষ্টনায়িকা আর

নবদুর্গায় পার্থক্য আছে।"
"বাবা! এ তো খুব জটিল ব্যাপার..." মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে মিন্টুর।
"খুব জটিল নয়," হেসে বলে রশ্মিদি, "অষ্টনায়িকার নাম হল ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা। কিন্তু নবদুর্গার মধ্যে বাকিরা থাকলেও অনুপস্থিত হচ্ছেন ঐন্দ্রী, বারাহী এবং নারসিংহী, তার বদলে আছেন নতুন তিনজন। তাঁদের নাম কালিকা, রক্তদন্তিকা এবং শোকরহিতা।"
"তা হলে এই ন'টি পত্রিকা কি নবদুর্গার ন'জনের প্রতীক? কোন দেবীর জন্য কোন গাছ, এরকম কি নির্দিষ্ট করা আছে?" ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে বুলি।
"নিশ্চয়ই! কলাগাছ হচ্ছেন ব্রহ্মাণী, কচুগাছকে কালিকা, হলুদগাছকে দুর্গা, জয়ন্তীগাছকে কার্তিকী (কৌমারী), বেলগাছকে শিবা (মাহেশ্বরী), ডালিমগাছকে রক্তদন্তিকা, অশোকগাছকে শোকরহিতা, মানগাছকে চামুণ্ডা, ও ধানগাছকে লক্ষ্মী (বৈষ্ণবী) হিসেবে কল্পনা করা হয়।"
"পুজোর সঙ্গে এভাবে গাছগাছড়া জড়িয়ে আছে, ভাবতেই পারিনি!" বলে লুই।
"তা তো হবেই... আদিম যুগে মানুষ প্রচুর এবং সুস্বাদু ফল ও ফসল পাওয়ার জন্য বৃক্ষের পুজো করত, নবপত্রিকা তো সেই বৃক্ষপুজোরই স্মৃতি। আমাদের প্রফেসর দেখিয়েছিলেন, অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'পূজার পাঁচালি' নিবন্ধে বলেছেন, আমাদের বাংলাদেশ বা তার পাশের রাজ্যগুলি চিরকালই ধান্যনির্ভর। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আমাদের সভ্যতায় যিনি ফসলের দেবী ছিলেন, তাঁকে বলা হত শারদা। তাঁর পুজো হত শরৎকালেই। সেই ধান্যমাতাই বৈদিকযুগে হয়ে ওঠেন ঊষাদেবী। পরে তিনিই মার্কণ্ডেয়পুরাণের মহাদেবী বা মহিষমর্দিনীর সঙ্গে মিলে-মিশে যান। শস্যের অধিষ্ঠাত্রী বলেই তাঁর নাম শাকম্ভরী এবং অন্নপূর্ণা।"
"কী আশ্চর্য! কত পুরনো আমল থেকে কীভাবে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বদলে গিয়েছে পুজো... ভাবলেও অবাক লাগে!"
অবাকভাব যেন কাটতেই চায় না বিন্তির।

দশমীর সকাল

তারপর আবার ওরা জমায়েত হল দশমীর সকালে। ঠাকুরমশাই যখন সবাইকে প্রণাম করতে বলেন, আর তারপর ঘটের সুতো কেটে ঘট নাড়িয়ে বিসর্জন করেন, তখন মন ভারী হয়ে ওঠে। হলুদজলে দেবীর প্রতিচ্ছবি দেখতে-দেখতে চোখ ছলছল করে ওঠে। তারপর অপরাজিতা পুজো।

আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আমাদের সভ্যতায় যিনি ফসলের দেবী ছিলেন, তাঁকে বলা হত শারদা। তাঁর পুজো হত শরৎকালেই।

অপরাজিতা লতার বেষ্টনী

অপরাজিতা পুজোটা কী ব্যাপার? ফের সবাই ঘিরে ধরে তাদের রশ্মিদিকে। রশ্মিদি বলে, "অপরাজিতার লতা দিয়ে নবপত্রিকাকে বন্ধন করে রাখা হয়, সে তো আগেই বলেছিলাম। আর খুব সম্ভবত মহিষাসুরকে পরাজিত করেও দেবী যে অপরাজিতা রইলেন, তা বোঝানোর জন্যই অপরাজিতা লতা দ্বারা পুজো করা হয়। স্কন্দপুরাণে দেবী দুর্গাকে অপরাজিতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।"
"তা হলে কি এই লতার বাঁধনে আমরা দেবীকে বেঁধে রাখতে চাই?" বলে মিন্টু।
"কিছুটা তাই, আবার বলা হয় যে, আশ্বিনের শুক্লা দশমীতে ঈশান কোণে দেবীকে স্থাপন করে অপরাজিতা ফুল দিয়ে দেবীর আরাধনা করলে মনস্কামনা পূরণ হয়। তাই অপরাজিতা লতায় দেবীর আরাধনা করা হয়। তারপর অনেকে হাতে লাল সুতোর তাগা বেঁধে নেয়, যাতে দেবীর আশীর্বাদে তারা জীবনে অপরাজেয় হতে পারে। অনেকে বলেন, দেবী দুর্গার সহচরী চৌষট্টি যোগিনীর মধ্য অন্যতমা হলেন অপরাজিতা, তাঁকেই অপরাজিতা লতার প্রতীক হিসেবে পুজো করা হয়।"
বিন্তি বলল, "সত্যি রশ্মিদি, পুজোয় যত গাছগাছড়া ব্যবহৃত হয়, তার পিছনেও এতরকম তাৎপর্য। ভাবতেই পারিনি!"

অপরাজিতা পুজোর পালা শেষ হয়, শেষ অবধি কোনও বাঁধনেই বেঁধে রাখা যায় না তাঁকে। নীলকণ্ঠ পাখি বার্তা বয়ে নিয়ে যায় কৈলাসে। সপরিবারে গঙ্গাজলে বিলীন হন দেবী, ভাসিয়ে দেওয়া হয় নবপত্রিকা... মহামায়া ফের ফিরে যান শিবের কাছে। আমরা অপেক্ষা করে থাকি পরের শরতের নীল আকাশে ভেসে আসা সেই সাদা মেঘখণ্ড, শিউলির গন্ধ আর কাশের ঝোপের সাদা হয়ে ওঠার জন্য।

ছবি: প্রত্যয়ভাস্বর জানা

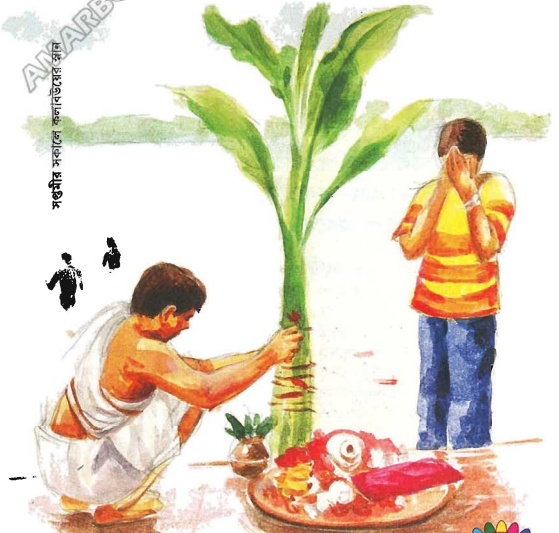

সপ্তমীর সকালে কলাবউয়ের স্নান

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

বইপত্তর...বিক্রিবাটা

বাঙালি ছেলেপিলেরাই বাংলা বইকে দূর ছাই করছে? বাস্তব বলছে অন্যকথা। সরেজমিনে তদন্ত করলেন **পায়েল সেনগুপ্ত**

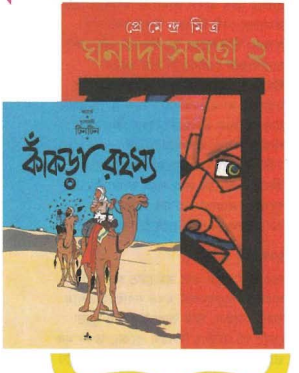

সুনামির স্রোতের মতো প্রযুক্তি আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমাদের ডিকশনারি থেকে 'অবসর' শব্দটা হারিয়ে যাচ্ছে কি না, তাই নিয়ে রীতিমত সন্দিহান হয়ে যেতে হয়। অথচ অন্তত দশবছর আগে হলেও এই ধরনের কোনও সময়ের জন্য মন মুখিয়ে থাকত! বই পড়ার সময়। কে কোন বয়সে কোন বইটা পড়ে দারুণ আনন্দ পেয়েছে অথবা কোন বই কারও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে বদলে দিয়েছে...এসব কথা এখনও আমাদের আগের জেনারেশনের কাছে যে কোনও আড্ডার বাতাবরণ সরগরম করে তোলার মতো বিষয়। বই পড়ে অবসর যাপনের বিলাসিতা আমাদের প্রজন্মের কাছে কি এখন অদ্ভুত-আশ্চর্য বলে মনে হয়? কী জানি, বেস্টসেলারের তালিকা কিন্তু অন্য কথা বলছে!

যখন ছোট ছিলাম

'বই' ব্যাপারটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হওয়ার সময়টি আসলে সুদূর শৈশব। সেই সময় পছন্দ-অপছন্দের বোধ ততটা শক্ত হয় না। বড়রা যেসব

বই জোর করে পড়ায় কিংবা হাতের কাছে থাকা যেসব বই নিজের উৎসাহে পড়ে ফেলি, সেগুলো মনের মধ্যে গেঁথে যায়। বড় হয়েও সেই বইগুলোর মায়া কাটানো যায় না। সেই কারণেই বোধ হয় সবসময় বেস্ট সেলার বইয়ের উপরের তালিকাতেই থাকবে শিশুসাহিত্য। অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' যতই রূপকথার গল্প হোক না কেন, তার মায়াজাল কেটে পরিণত বয়সেও বেরিয়ে আসতে পেরেছে ক'জন! শুধু তাই নয়, নাম করতে হবে 'রাজকাহিনি' বইটিরও। স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বই পড়ার কত আগে থেকেই কিশোর মন উৎসাহী হয়ে পড়ে, মুঘল-রাজপুত দ্বৈরথ নিয়ে। ছাপ ফেলে যায় রাজপুতদের জয়গাথা, দেশপ্রেমের কাহিনি। বিক্রির নিরিখে এর তুলনা মেলা ভার। যে বইটি ছাড়া যে কোনও বাঙালির শৈশব অসম্পূর্ণ, সেই 'আবোলতাবোল'-এর নাম বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ অক্ষর পরিচিতিরও আগে এই বইয়ের পংক্তিগুলি দাগ কেটে যায় আমাদের মনে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং সুকুমার রায়, পিতাপুত্র তাঁদের রচনা সংগ্রহ নিয়ে শিশু সাহিত্যের বাজার অর্ধেক দখল করে রেখেছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাসও অত্যন্ত আকর্ষক বিক্রি। আর-একটি অবিস্মরণীয় এবং চিরন্তন বইয়ের নাম 'ঠাকুরমার ঝুলি'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টেনিদা সমগ্র' বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা সমগ্র'-র নির্ভেজাল মজাও রয়েছে বাঙালিদের মন জুড়ে। বাদ দেওয়া যাবে না, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়', 'পথের পাঁচালি' বা আম আঁটির ভেঁপুর। শিশুসাহিত্যের বিক্রিতে ভাঁটা পড়ে না কখনওই কারণ কোনও এক মনখারাপের মুহূর্তে একচিলতে শৈশব যদি হাতে এসে পড়ে, তার মূল্য কি এত সহজে অস্বীকার করা যায়? সম্ভবত সেই কারণেই বাংলা কিশোর সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এই বইগুলি বহুবছর ধরেই বেস্ট-সেলার।

মস্তিষ্ক ও মগজাস্ত্র

নিজেকে প্রখর বুদ্ধিধর ভাবার এক অদ্ভুত ফ্যান্টাসিতে ভুগি আমরা। আর এই ফ্যান্টাসির গোড়ায় যাঁরা নিয়মিত ধোঁয়া দিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের নাম প্রদোষচন্দ্র মিত্র এবং ব্যোমকেশ বকসি। বাঙালিকে গোয়েন্দা ভাবানোর অনুপ্রেরণা জোগানো বা ভুল করা, দুইই এঁরা শিখিয়েছেন। ফেলুদা আজীবন কৌমার্য বজায় রেখে বেশ একটা 'ছোটদের' তকমার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকলেও তাঁকে নিয়ে বয়স্ক লোকদের মাতামাতিও অশেষ। ফলে বইয়ের বিক্রিও দিন-দিন বেড়ে চলেছে তরতর করে। ব্যোমকেশ আবার 'অ্যাডাল্ট'। তাঁর ইমেজে এবং কাহিনি বুননে কিছুটা 'নিষিদ্ধ' সমীকরণ থাকায় তাঁর অ্যাপিল বয়ঃসন্ধি পেরনো যৌবনের দ্বারস্থ জনতা থেকে শুরু করে রসিক বিদ্বদজ্জনের কাছেও একইরকমভাবে পৌঁছয়। গোয়েন্দাগিরিতে সঙ্গতকারী ব্যোমকেশের অজিত ও সত্যবতী বা ফেলুদার তোপসে ও লালমোহনবাবুও কিছু কম ফ্যান ফলোয়িং তৈরি করেননি। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে এঁদের বড়-বড় সব গ্রুপ এবং তাতে জ্ঞানগর্ভ সব আলোচনা। কে কার সম্পর্কে কত বেশি জানে, কুইজ, প্রতিযোগিতা, এমনকিছুই এঁদের বিক্রি দিন-দিন বাড়িয়ে চলেছে। ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আমাদের সাংবাদিক বন্ধু টিনটিন ও তার খুদে পোষ্য ও শিষ্য কুট্টুস, প্রোফেসর ক্যালকুলাস, ক্যাপ্টেন হ্যাডককে। টিনটিনের একের পর-এক অ্যাডভেঞ্চার সরস অনুবাদের গুণে বাঙালির কাছে এখনও সমান জনপ্রিয়। গোয়েন্দা গল্পের এমনই এক ঘনীভূত টান যে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের কলমের খরস্রোতে বড় হয়েছেন অজস্র 'সত্যান্বেষী'। কাকাবাবু, অর্জুন, মিতিনমাসি, এঁদের সিঙ্গল বই হোক বা সমগ্র, বিক্রিতে কিছুই বাধার সৃষ্টি করে না।

প্রেম কিংবা প্রেম নয়

সম্পর্কের জটিলতা যে কোনওকালে যে কোনও দেশের সাহিত্যকে জনপ্রিয় করেছে। বলা যায়, পৃথিবীর বেশিরভাগ বিখ্যাত বই-ই সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং দর্শন নিয়ে। রোমান্টিকতা ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখকের কলমে ভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে, দেখা

দেয় এবং দেখা দেবে বলেই বোধ হয় এই ধরনের সাহিত্যের জনপ্রিয়তায় কোনও ঘাটতি পড়ে না। প্লটের সঙ্গে পটভূমিও যদি জোরালো হয়, তবে সেই বইকে আটকানো কঠিন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসটির প্রতি এখনও বজায় রয়েছে বাঙালি পাঠকের আকর্ষণ। সাতের দশকের নকশাল আন্দোলন যদি এর একটি কারণ হয়, তবে অবশ্যই অন্য কারণ অতীন-অলি-শর্মিলার প্যাশনেট প্রেমের সমীকরণ। রাজনীতিক বাবা কৃষ্ণকান্ত এবং রাজনীতি উদাসীন ছেলে ধ্রুবর অদ্ভুত সম্পর্ক তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দূরবীন' উপন্যাসটিকে। জটিলতা অনেক, তবু ধ্রুবর সঙ্গে স্নিগ্ধ আলোর মতো জুড়ে থাকে তার স্ত্রী রেমি। এই উপন্যাস তার আত্মপ্রকাশের লগ্ন থেকে শুরু করে নিশ্চয়ই এখনও কোনও নতুনত্বের স্বাদ দিচ্ছে পাঠককে, তাই বেস্টসেলারের তালিকা থেকে একে বাদ দেওয়া যায় না। 'মানবজমিন' এবং 'পার্থিব'-র কথাও উল্লেখ করতে হয়। সম্পর্কের বিভিন্ন দিক, পারিবারিক দৃষ্টিকোণ এবং বিশেষ করে কোনও মেয়ের চোখ দিয়ে সমাজ ও পৃথিবীর বীক্ষণ, এই বিষয়ে আশাপূর্ণা দেবী প্রায় পথ-প্রদর্শক। তাঁর 'সত্যবতী ট্রিলজি' অর্থাৎ 'সত্যবতী', 'সুবর্ণলতা' এবং 'বকুলকথা' এবং সেই সঙ্গে আরও অনেক উপন্যাস এখনও সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির কাছে বড় আকর্ষণ। উপন্যাসের ধারাকেই আরও আধুনিক, বৈচিত্রময় এবং বহুমুখী করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বাণী বসু এবং সুচিত্রা ভট্টাচার্য। একদল কলেজের ছেলেমেয়ে এবং একই উপন্যাসে তারা প্রত্যেকেই প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ...বাণী বসুর 'একুশে পা' সেই অর্থে একঝলক সতেজ হাওয়ার মতো তুলে এনেছিল সদ্য যৌবনে পা দেওয়ার একটি বয়সকে।

আবার এর বেশ কিছু বছর পরে 'কাছের মানুষ' উপন্যাসটিতে উঠে এল শহুরে গৃহবধূ ইন্দ্রাণীর সংসার, তার প্রেম ছেলে-মেয়ে এবং অদ্ভুত দিশাহীন এক জীবন। অদ্ভুত সাড়াজাগানো এই উপন্যাসটিতে সুচিত্রা ভট্টাচার্য যেন গল্প বলার এক নতুন ট্রেন্ড সৃষ্টি করলেন। এই উপন্যাসটি তো বটেই, তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলিও সেই কবে থেকেই বজায় রেখেছে এক স্থিতিশীল জনপ্রিয়তা। সমরেশ মজুমদারের 'সাতকাহন' এবং 'উত্তরাধিকার-কালবেলা-কালপুরুষ' ট্রিলজির যে জনপ্রিয়তাও অক্ষুণ্ণ, সেটা বোঝা যায় বহুবছর পরে প্রকাশিত 'মৌষলকাল' উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা দেখে। বিংশ শতকের কলকাতা, তার নাগরিক ও মধ্যরাতের জীবন এখনও কৌতূহলের বিষয়! তাই হয়তো অনেকদিন কেটে গেলেও মরচে পড়েনি শংকরের 'চৌরঙ্গী'র আকর্ষণে। কালকূটের 'কোথায় পাব তারে' একেবারে অন্যরকম বই হওয়া সত্ত্বেও খুবই জনপ্রিয়। অধুনা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর 'উনিশ কুড়ির গল্প' এবং 'পালটা হাওয়া' দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। ইদানীং একটু কম জনপ্রিয় হলেও সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্খিনী' এবং নবকুমার বসুর 'চিরসখা' উপন্যাসগুলি বেরনোর পর বেস্টসেলার ছিল অনেকদিন। নাম করতে হবে প্রচেত গুপ্তের 'এক যে ছিল সাগর' এবং 'পঞ্চাশটি গল্প' বইটির।

ইতিহাস এবং ...

কথাসাহিত্যে নতুনত্ব বা অন্য স্বাদের মাত্রা আনতে বহুবারই তুলে আনা হয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। কখনও যুক্ত হয়েছে আধিভৌতিক পরিবেশ বা পুরাণ, বাদ যায়নি কল্পবিজ্ঞানও। সরস লেখনী ও প্লটের বৈচিত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালির মনের কোণে নিজস্ব জায়গায় অধিষ্ঠিত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গল্পসমগ্র ও উপন্যাস সমগ্রের চাহিদা অটুট। ইতিহাস ও কল্পনার মিশেলে বাণী বসুর 'মৈত্রেয় জাতক'-এর জনপ্রিয়তাও কিন্তু নেহাত কম নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাস-সময়াশ্রিত দুই কালজয়ী উপন্যাসের নাম করতেই হয় 'সেইসময়' এবং 'প্রথম আলো'। 'বিতর্ক' ব্যাপারটাকে পজিটিভ ক্যাটালিস্ট বলে মনে করেন অনেকেই। এর

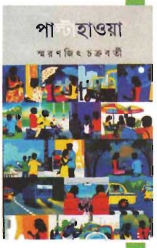

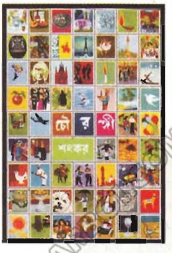

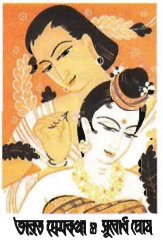

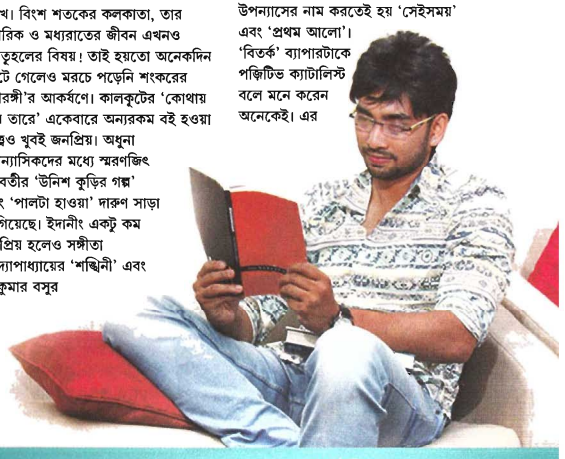

ছোঁয়া একবার পেলে ফিল্ম থেকে বই, সব কিছুরই নাকি বাজারে একটা চাহিদা তৈরি হয়। এটাই কারণ কি না জানি না, তবে সমরেশ বসুর 'বিবর' এবং 'প্রজাপতি', এককালে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত এই দুটি বইয়ের বিক্রি রীতিমতো ভাল। তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' এবং 'নির্বাচিত কলাম' সম্পর্কেও খাটে। ভারতীয় পুরাণের গল্প ভিত্তি করে লেখা সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা' অলটাইম বেস্টসেলার। বিক্রির তালিকায় উপরের দিকে থাকবে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মহাভারত বা রামায়ণের উপর লেখা বা মহাভারতের প্রেক্ষাপটে লেখা কালকূটের 'শাম্ব' এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'পাঞ্চজন্য'। একটু অন্যরকম ঔপন্যাসিক নারায়ণ সান্যাল বিজ্ঞান, ইতিহাস, কল্পবিজ্ঞান কিছুই প্রায় প্লটের তালিকা থেকে বাদ দেননি। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসই বহুদিন ধরে জনপ্রিয়, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা 'বিশ্বাসঘাতক'। বেস্টসেলারের তালিকায় 'কবিতা' থাকবে না, তা কি হয়? জয় গোস্বামীর 'কবিতা সংগ্রহ' এবং শ্রীজাতর 'কবিতা সমগ্র' তালিকার শীর্ষে থাকবে। 'অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা' বইটি নতুন আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর বিক্রয় তালিকার শীর্ষে চলে এসেছে। বাঙালিদের কাছে অনুবাদ সাহিত্য কখনওসখনও একটু ব্রাত্য হয়ে পড়লেও ঝুম্পা লাহিড়ী (নাবাল জমি, গল্প সপ্তদশ, সমনামী), অমর্ত্য সেন (তর্কপ্রিয় ভারতীয়, নাতি ও নায্যতা), জে ডি বার্নাল (ইতিহাসে বিজ্ঞান) এবং এ পি জে আবদুল কালামের (অগ্নিপক্ষ) বইয়ের বিক্রি খুবই ভাল।

যখন যেমন

"প্রতিবছর পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত বা 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাসগুলি যখন বই আকারে বের হয়, তার সবসময়ই একটু আলাদা চাহিদা তৈরি হয়। ঠিক একই কথা বলা যায় কোনও বই বিশেষ পুরস্কার পেলে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যপ্রেমী মানুষের নতুন বইগুলোর প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। কিন্তু কিছু অন্যরকম বইয়ের বিক্রি বরাবরই ভাল এবং স্থিতিশীল, যেমন চিত্রা দেবের 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' কিংবা সুকুমার সেনের 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।" জানালেন আনন্দ পাবলিশার্সের কর্ণধার শ্রী সুবীর মিত্র। সদ্য আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত বই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ'ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে উপরের সারিতে। সুবীর মিত্রের মতে, "এত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসন্দেহে বলতে পারি, বইয়ের বিক্রি কিন্তু আগের চেয়ে বেশি।

> লেখা পুরনো হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের আবেদন চিরকালীন। বেস্ট সেলিংয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে টেক্কা দেওয়া এখনও মুশকিল!

AMARBOI.COM

কারণ বইকে পৌঁছে দিতে হবে পাঠকের কাছে। না হলে বই পড়ার সুযোগ তাঁরা পাবেন কী করে?" আনন্দ পাবলিশার্স এখনও বাংলায় সবচেয়ে বড় চেন। পিছিয়ে নেই অন্য প্রকাশকরাও। "বাংলা ভাষায় এখন বিষয়ভিত্তিক বইয়ের বৈচিত্র বেড়ে গিয়েছে, তৈরি হয়েছে আলাদা-আলাদা বিষয়ে আগ্রহী পাঠকবর্গও, ফলে শক্ত হয়েছে বাংলা বইয়ের বাজার" মত দেন্ধ

পাবলিশিংয়ের শুভঙ্কর দে-র। সম্ভবত সেই কারণেই অজয় হোমের 'বাংলার পাখি' কিংবা জলজ উদ্ভিদ বা সাপ নিয়ে বইয়ের বিক্রি বেড়েছে। "সাহিত্যনির্ভর কোনও ফিল্ম বা সিরিয়াল হলেও মানুষের মনে আসল বইটি পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়। সেইসব বইয়ের বিক্রিও বেড়ে যায়," বললেন মিত্র ও ঘোষ-এর আধিকারিক ইন্দ্রাণী রায়। যেমনটি ঘটেছে 'সুবর্ণলতা' বা প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো'র ক্ষেত্রে। তা ছাড়া বিশ্বভারতীর কপিরাইট উঠে যাওয়ার পর থেকে 'গীতবিতান', 'সঞ্চয়িতা' বা 'গল্পগুচ্ছের'ও বিক্রি বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ। বিক্রির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাহিদা চিরকালীন। বইপাড়া, বইমেলা বা সাহিত্য সম্মেলনে ঘুরঘুর করলে অনেকখানি বেনোজলের সঙ্গে কিছুটা পরিশুদ্ধতাও চোখে পড়ে। বাংলা ভাষার প্রতি এখনও মায়া ও ভালবাসা অবশিষ্ট আছে বলেই প্রকাশকরা এখনও গর্ব করে প্রকাশ করেন বেস্ট সেলারের তালিকা। যা কিছু আমরা ভাবি, ফুরিয়ে গিয়েছে, তা আসলে ফুরোয় না...'ফুরায় যাহা ফুরায় শুধু চোখে!'

বেস্টসেলারে ইংরেজি

গো সেট আ ওয়াচম্যান : *হারপার লি*
ফিফ্‌টি শেড্‌স অফ গ্রে : *ই এল জেম্‌স*
আই অ্যাম মালালা : *মালালা ইউসাফজাই ও ক্রিস্টিনা ল্যাম্ব*
স্টিভ জোব্‌স : *ওয়ালটার আইজ্যাকসন*
দ্য ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি : *জে কে রাউলিং*
ইনফার্নো : *ড্যান ব্রাউন*
দ্য চাইল্ডহুড অফ জেসাস : *জে এম কোটজি*
দ্য ডিসক্রিট হিরো : *মারিও ভার্গাস ইয়োসা*
দ্য লোল্যান্ড : *ঝুম্পা লাহিড়ি*
দ্য ফেস্টিভ্যাল অফ ইনসিগনিফিক্যান্স : *মিলন কুন্দেরা*

মডেল: অন্বেষা, অরিজিৎ, **মেকআপ:** অভিজিৎ পাল, **ফোটো:** অমিত দাস
পোশাক সৌজন্য: কটন ওয়র্ল্ড, ফোরাম মল
শুটিংস্পট: নোভোটেল, রাজারহাট

অমৃত আশাবরী

মল্লিকা ধর

বাইরে মিহিন বৃষ্টি নেমেছে, হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে ভিজে যেতে থাকে বাগানের গাছপালা, লতাপাতা, পুষ্পমঞ্জরী, ঘাস, নুড়িপাথর, মাটি। দূরের বাড়িঘর ঝাপসা দেখায়। আমার ছবিতেও বৃষ্টি নামে, গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে ডুবে যেতে থাকে বাড়িঘর, মাঠ, পাহাড়, নদী তীরের পাথর, বালি, দেবদারু গাছের সারি। আমি তুলি ঝেড়ে জল ফেলি আরও-আরও। ফোঁটা-ফোঁটা জল। এ ধরনের ছবির বেশ ভাল চাহিদা আজকাল।

ছবি আঁকতে গেলে আমি নিজেই ছবির মধ্যে মিশে যাই, রেখা টানার আগে সামনে যেন দেখতে পাই ছবিটা, একদম জ্যান্ত। ছবির এই বৃষ্টি, গাছপালা, নদী, নৌকা, যা সব ফুটে ওঠে কাগজে, রেখা আর রঙে, তা যেন ওই আসল ছবিটার ছায়ামাত্র। আসলের যে অবর্ণনীয় রং, গতি, আলোর আঁকিবাঁকি, তার সামান্য ভগ্নাংশই যেন শুধু ধরা দেয় এই থেমে থাকা কাগজে, বোবা রঙে।

আমার হাতের তুলির এই সব টানে-টানে ফুটে ওঠা ছবিটা যেন বড়-বড় বিষণ্ণ চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকে। ফিসফিস করে বলে, "তুমি সত্যিকারের আমাকে দেখতে চাও? চাও?"
রং করতে-করতে তুলি থেমে যায় আমার, কোথা থেকে উদাসী হাওয়া এসে ভিতর-বাহির কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।

"ওরিয়ানা-আ-আ-আ-আ..."
শুনতে পাই কে যেন ডাকছে আমাকে। পাহাড়ের গায়ের সরু সর্পিল পথটা দিয়ে উঠে আসছে ডাকটা। এই বৃষ্টির মধ্যে কে আসছে? যদিও খুবই মিহিন বৃষ্টি, এই বৃষ্টিতে শুধু শরীর জুড়িয়ে যায়।
আরও কাছে এলে গলাটা চিনতে পারি। নিজনির গলা। এবারে অনেকদিন পরে ফিরল। মাঝে-মাঝেই কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে যায় নিজনি, আবার কয়েক মাস পরে ফিরে আসে। গাঁয়ের লোকেরা ওকে বলে আধপাগলি।
আমি রংওয়ালা তুলি সাবধানে নামিয়ে রাখি কাঠের পাতে। তারপরে দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। নিজনি আসছে দ্রুত পদক্ষেপে, ওর সমস্ত শরীরে যেন ঝলমল করছে আনন্দ, ওর চকমকে ফিনফিনে বাদামি চুল উড়ছে হাওয়ায়, ওর কানে লাল পাথরের দুল। ওর হাতে একগোছা নানা রঙের ফুল। মুখটি বৃষ্টিকণায় সাজানো সদ্যফোটা ফুলের মতো।
বারান্দায় আমায় দেখে ও ছুটতে শুরু করল, আমি বারান্দা থেকে নেমে সামনের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম।
নিজনি এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, "ওরিয়ানা, কতদিন পরে আবার তোকে দেখছি। কেমন ছিলি তুই? তোরা সবাই?"
আমি হেসে ফেলি, বলি, "আমরা তো সবাই ভালই ছিলাম, তুই কেমন ছিলি রে? কতদিন ধরে নিরুদ্দেশ তুই! কোথায় গিয়েছিলি এবারে?"
নিজনি হাসতে-হাসতে বলে, "এবারে গিয়েছিলাম অনে-এ-এ-ক দূরে, সমুদ্দুরের মধ্যে এক ছোট্ট দ্বীপ, আমার ডিঙা ভাসিয়ে-ভাসিয়ে সেইখানে গিয়ে পড়লাম এক ঝড়ের রাত্রে। কালিগোলা

অন্ধকারে কিছু ঠাহর হয় না, ঝড়ে উথালপাথাল করতে-করতে আমার ডিঙা আছড়ে পড়ল তীরের বালিতে। আমি জ্ঞান হারালাম। সকালে উঠে দেখি হাজার-হাজার সবুজ পায়রা উড়ছে আকাশে, সমস্ত দ্বীপ পাখিদের রাজ্য। কী সবুজ, কী সবুজ সেই দ্বীপ, গাছে-গাছে কত ফল! আর দ্বীপের মাঝখানে এক ছোট্ট নীল পাহাড়, সেইখানে এক ঝরনা, সেই ঝরনার জল কী মিঠা, কী মিঠা!"

আমি হাসতে থাকি, প্রতিবার নিরুদ্দেশ থেকে ফিরে নিজনি এমন সব রূপকথার মতো গল্প বলে। সত্যি বলে বিশ্বাস হয় না, তবু মনে হয় আহা যদি সত্যি হত!

আমি ওকে নিয়ে আমার আঁকার ঘরের দাওয়ায় উঠি, আসন পেতে বসতে দিই। ওর হাতের ফুলগুলোকে নিয়ে ছোট্ট পাথরের ফুলদানিতে রাখি। এ ফুলদানি আমার বন্ধু আরেনুশ বানিয়েছে একখণ্ড চকচকে কালো পাথর থেকে। আমাকে দিয়েছে আমার গত জন্মদিনে।

নিজনি ফুলদানিটায় হাত বোলায় পরম যত্নে, বলে, "কী সুন্দর! কোথা থেকে পেলি এটা?"

আমি আস্তে করে বলি, "একজন উপহার দিয়েছে আমায়, সে নিজের হাতে বানিয়েছে।"

নিজনি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসে, ওর অতল চোখে ভালবাসা টলটল করে, ফিসফিস করে ও বলে, "ওরিয়ানা, আহ! তোর মুখে কেমন রং ফুটে উঠেছে! এ রং আসে অন্য আকাশ থেকে, গহিনের আকাশ সেটা। সেই আকাশের চাবি সবার কাছে থাকে না। আমাকে বলতে হবে না সে কে, কেবল তোর হয়েই থাক। খুব ভাল লাগছে রে।"

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বলি, "যাহ কী সব বলছিস। সে আমার বন্ধু শুধু, খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু তুই যে সেই সবুজ পায়রাদের দ্বীপের কথা বলছিলি আর বলবি না?"

নিজনি আমার ছোটবেলার বন্ধু, ছোটবেলা থেকেই একটু অন্য রকম ছিল ও। অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলত, একা-একা বসে-বসে ভাবত। এক বুড়ি ঠাকুরমা ছিল ওর। ছোট্ট একটা কুটিরে ওরা থাকত, কুটিরের চারধার ঘিরে ছিল নানা রকম শাকসবজি আর ফলফলারির বাগান। ঠাকুরমা আর নাতনি মিলে সেই বাগানের দেখাশোনা করত। সেই শাকসবজি ঘাটের কাছের বাজারে বেচেই ওদের দিন চলত কোনওক্রমে। কিন্তু ওর ঠাকুরমা তারই মধ্যে নাতনির পড়াশোনার ব্যবস্থাও করেছিলেন কোনওভাবে, নিজনি স্কুলে পড়াশোনাও করেছে কয়েক বছর, লিখতে-পড়তে আর হিসেব করতে শিখছে।

নিজনির বাবা আর মা দু'জনেই বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা একসঙ্গে থাকতেন না। বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল দু'জনের। ওঁদের যখন বিবাহবিচ্ছেদ হয়, তখন নিজনির বয়স বছরপাঁচেক, ওর একটা ভাইও ছিল, সেই ভাই তখন বছরদেড়েকের। ওর মা ওর সেই ভাইকে নিয়ে চলে গেলেন দূরের এক দ্বীপে কী একটা কাজ নিয়ে। ও রয়ে গেল বাবা আর ঠাকুরমার কাছে। ওর বাবাও আর কয়েক বছর পরেই নতুন এক বিয়ে করে উঠে গেলেন অন্য জায়গায়। শুধু নিজনি আর ওর ঠাকুরমা সেই থেকে রয়ে গেল কুটিরে। প্রথম-প্রথম ওর বাবা মাঝে-মাঝে দেখতে আসতেন, তারপরে তিনিও আর আসতেন না তেমন। নিজনির মা আর কোনওদিনই আসেননি মেয়েকে দেখতে।

বাবা-মা সম্পর্কে নিজনি উদাসীনতা দেখাত, বলত, "জানিস ওরিয়ানা, মাকে মনেও পড়ে না আমার। কেমন ছিল তাঁকে দেখতে একদম ভুলে গিয়েছি। কোনও ছবিও নেই ওঁর। আমার সেই পাঁচ বছর বয়সে শেষ দেখেছি ওকে, ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি, মা ছেলেকোলে ফেরিতে উঠে আমাকে হাত নাড়ছে বিদায় জানাতে। এইটাই শেষ স্মৃতি, ঘটনাটা মনে আছে, ওদের মুখ একদম ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। এখন, এই এত বছর পরে, হয়তো পাশ দিয়ে চলে গেলেও বুঝতে পারব না ওরা আমার মা, আমার ভাই। ভাই তখন ছিল একদম শিশু, আজকে সে কিশোর। কী করে চিনতে পারব? যাক গিয়ে, ওদের চিনে কী কাজ আমার? আমার ঠাকুরমাই আমার সব, আমার মা, আমার বাবা, সবই এই ঠাকুরমা।"

কথাগুলির মধ্যে নিরাসক্তির একটা ভঙ্গি থাকত, কিন্তু তার ভিতরে ছলছল করে বয়ে যাওয়া একটা অভিমানের ফল্গুধারা অনুভব করতে পারতাম। কেমন একটা মায়ায় ভরে যেত মন, এই মায়া আমার নিজের লোকেদের কারওর জন্য নেই বলে নিজের উপরে কেমন একটা রাগ হত।

মনে হত, আমার নিজের বাবা-মা, পরিবার-পরিজন কত অন্য রকম, বিশাল পরিবারে কত মানুষ, কত ব্যস্ত সবাই, তাদের কারওর সঙ্গে মানসিক নৈকট্য গড়ে ওঠেনি আমার। কোনও মান-অভিমানের তাই প্রশ্নই ওঠে না। জ্ঞান হওয়া থেকে দেখছি মা উদয়াস্ত খেটে চলেছেন, তাঁর নিজের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, আর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর আশ্রিত ছেলেমেয়ে সব নিয়ে তাঁর রীতিমতো হট্টমেলার সংসার, আমি সেখানে আলাদা করে চোখেই হয়তো পড়ি না তাঁর। বাবাও প্রায় সব সময়েই নানা কাজে কাকা-জেঠাদের সঙ্গে বাইরে, তাঁর বাড়ি ফেরা শুধু আহার ও রাতের বিশ্রামের জন্য। তিনি আরও অনেক দূরের মানুষ।

আমার বাবা-মায়ের আমি তৃতীয় সন্তান, আমার আগে এক দিদি আর এক দাদা, মিরি আর মির্তাক। আমার পরে যমজ ভাইবোন, মেহুথ আর মিত্তা। তা ছাড়া বাড়িতে জেঠতুতো দিদিরা-দাদারা আর খুড়তুতো বোনেরা-ভাইয়েরা সবাই মিলে সে এক রীতিমতো হট্টমেলা। শুধু ছোটরাই এতজন, তার সঙ্গে জেঠুরা, কাকুরা, জেঠিমা, কাকিমারাও ছিলেন। মাঝে-মাঝে আসতেন পিসিমারা ও তাদের ছেলেমেয়েরা। তখন হট্টমেলা আরও বড় হয়ে উঠত আর মা-জেঠিমাদের খাটাখাটুনি আরও বেড়ে উঠত।

এই হট্টমেলার থেকে এক পাশে সরে আমি থাকতাম আমার নিজের মনে। পরিজনেরা যেন ছিল ছায়ার মতো, তাঁরাও আমার কাছে ছায়া, আমিও তাঁদের কাছে ছায়া। আমার ভাবনাচিন্তা মন্দলাগা পছন্দ অপছন্দ কোনও বিষয়েই ওদের কারওর, এমনকী আমার মায়েরও, কোনও ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। মায়ের কাছাকাছি আসার তেমন খুব একটা সুযোগ পেতাম না আমরা ভাইবোনেরা কেউই। মা নিজে সংসার নিয়ে এত ব্যস্ত যে, আমাদের দিকে আলাদা করে মনোযোগ দেওয়ার সময়, সুযোগ তাঁরও খুব কম ছিল।

নিজনের ছোটবেলার কথা যত দূর মনে করতে পারি, মা আমাকে কোলে নিয়ে আদর করছেন, নাওয়াচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, এরকম কিছু একদমই মনে পড়ে না। হয়তো একদম ছোটবেলায় করেছেন, কিন্তু সেই স্মৃতি কিছু নেই আমার।

তার চেয়ে অনেক বেশি স্মৃতি আছে নিজনি আর ওর ঠাকুরমার সঙ্গে। নিজনির বয়স আর আমার বয়স প্রায় এক, একই বছরে জন্ম আমাদের দু'জনের, নিজনি মাসতিনেকের বড়। খুব ছোটবেলা থেকেই নিজনির সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার, প্রায় রোজ বিকেলেই ওর সঙ্গে খেলতে যেতাম সেই পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকেই।

নিজনির ঠাকুরমাকে মনে পড়ে, সেই ছোট্টবেলা থেকেই তাকে প্রায় একই রকম দেখছি। বেশ বৃদ্ধা কিন্তু শক্ত, মজবুত চেহারা। একটুও ঝুঁকে পড়েননি, সোজা হয়ে হাঁটতেন। বাগানের কাজ ঘরের কাজ এমনকী সবজি-টবজি নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যাওয়া, সব অনায়াসে করতেন, কোনওদিন অসুখ হতে দেখিনি ওঁর। মুখের

চামড়া কুঁচকে গিয়েছিল, চুলও সব পেকে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বার্ধক্য তাঁকে এক অন্য রকম সৌন্দর্য এনে দিয়েছিল। ওই অদ্ভুত দুটো গর্তে ঢুকে যাওয়া চোখের মধ্যে আমি এক রহস্যজগতের আভাস পেতাম।

মাঝে-মাঝে নিজনিকে ঈর্ষা হত অমন এক ঠাকুরমা ওর আছে বলে। নিজের ঠাকুরমাকে কোনওদিন দেখিনি আমি, আমার জন্মের অনেক আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে মনে হত, তিনি থাকলে কি তিনি নিজনির ঠাকুরমার মতো হতেন? অমন সহজ-সরল, অমন কর্মঠ আবার অমন আশ্চর্য সব গল্পবলিয়ে? নিজনির ঠাকুরমা আমাদের অনেক-অনেক গল্প বলতেন, আশ্চর্য সব উপকথা। আমরা যখন খুব ছোট্ট, ওঁর দু' পাশে বসে শুনতাম। টুকরো-টুকরো ছবি ভেসে আসে সেইসব দিনের, নিজনি বলছে, "ঠাকুরমা, গল্প বলো।"

"আরে পাগলির কথা শোনো, কাজ করছি দেখছিস না?" বাগানের জমিতে নিঁখুতভাবে খুরপি চালাতে-চালাতে তিনি বলতেন।

নিজনি ঠোঁট উলটিয়ে বলত, "পরে কোরো। খুরপি তো পরেও দিতে পার, কালকে দিও। আজ গল্প বলো।"

ঠাকুমা হাসতেন, বলতেন, "আজ রাত্রে বৃষ্টি হবে, তার আগেই খুরপি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে। বৃষ্টির পরে কালকে সকালে নতুন বীজ ফেলব তো।"

অবাক হয়ে নিজনি বলত, "বৃষ্টি হবে? কী করে জানলে তুমি?"

ওইসব ফুল দিয়ে আমরা ছুটির দিনে দুপুরবেলা রান্নাবাটি খেলতাম গাছের ছায়ায়। খেলতে-খেলতে কত বেলা বেড়ে যেত

ঠাকুমা রহস্যময় হাসি হেসে বলতেন, "জানি আমি। বাতাস বলছে তো! আমি যে বাতাসের কথা বুঝতে পারি।"

আমাদের চোখ বিস্ময়ে এত্তখানি হয়ে যেত, দু'জনেই দাওয়া থেকে দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। নিজনি বলত, "বাতাস কথা বলে?"

ওর ঠাকুরমা হেসে বলতেন, "বলে তো!"

আমি বলতাম, "কই, আমি তো খালি শুনি শোঁ শোঁ করে ঝড়ের সময়। আবার এমনিতে যখন গরমকালের সন্ধেবেলা দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া আসে, তখন গাছের পাতায়-পাতায় মর্মর শব্দ করে, কিন্তু কথা তো বলে না!"

ঠাকুরমা আমার দিকে চেয়ে হাসতেন, বলতেন, "বাতাসের ভাষা অন্য রকম, ওই ভাষা জানলে তবে বোঝা যায় ও কী বলে।"

নিজনিকে দেখে কত সব স্মৃতি ফুরফুরে নানারঙা পালকের মতো উড়ে-উড়ে আসে। বুকের মধ্যে ছোটবেলা ফুটে ওঠে লাল-হলুদ-নীল-সাদা ঘাসফুলদের মতো। বসন্তে, গ্রীষ্মে, শরতে ওইসব ফুল দিয়ে আমরা ছুটির দিনে দুপুরবেলা রান্নাবাটি খেলতাম গাছের ছায়ায়। খেলতে-খেলতে কত বেলা বেড়ে যেত, কিছুতেই আর স্নান করতে যেতে ইচ্ছে হত না।

নিজনিকে বারেবারে ডাকতেন ওর ঠাকুরমা, ও বারেবারে মিনতি করত, "আর একটু, আর একটু খেলি ঠাকুরমা।"

তার পরে সূর্য যখন মাঝ আকাশ পেরিয়ে যেত, তখন আমার দিদি মিরি আমায় ডাকতে আসত রাগ-রাগ মুখ করে, এসে আমার ঝুঁটি ধরে বলত, "শিগগির চল বাড়িতে, নাওয়া নেই খাওয়া নেই, এত বেলা হয়ে গেল! মা রেগে আগুন হয়ে আছে। আজ তোর পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙবে।"

আমি অনিচ্ছুক মুখ করে উঠতাম, ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে মিরিকে বলতাম, "চলো যাচ্ছি। চুল ছেড়ে দাও। আমি পালাব না।"

মিরি আমার চোখের দিকে চেয়ে কেমন যেন মিইয়ে যেত, বলত,"চল। আজ মজা বুঝবি মায়ের কাছে।"

আমি নিজনির দিকে চেয়ে আলতো করে বলতাম, "আসি রে নিজনি। কালকেও তো ছুটি, কালকে আবার খেলা হবে। তা ছাড়া বিকেলেও আসব।"

নিজনি হেসে হাত নাড়ত, তারপরে হেসে-হেসেই মিরিকে বলত, "দিদি, ওকে মেরো না কিন্তু তোমরা। মাসিমাকে বোলো নিজনি ওকে নানা কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে আটকে রেখেছিল।"

মিরির সঙ্গে চলতে-চলতে আমার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হত, আমাকে তা হলে মনে পড়েছে মায়ের? লক্ষ করেছে তা হলে বাচ্চাদের দলের মধ্যে নেই একজন?

উঠোনে মা দাঁড়িয়ে থাকত, কিন্তু আমাকে মারত না, এমনকী বকুনিও সেভাবে দিত না, খালি বলত, "এত দেরি করতে হয়? সে-এ-এ-ই কোন সকালে দু'টি খেয়েছিস। যা তাড়াতাড়ি নেয়ে আয়, আমি খাবার বাড়ছি সবাইয়ের জন্য।"

আমি শুকনো কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে নাইতে যেতে-যেতে শুনতাম মিরি মাকে বলছে, "মা, তুমি ওরিয়ানাকে প্রশ্রয় দাও কেন এত? আমাদের বেলাতে তো একটু এদিক সেদিক হলেই আর দেখতে হত না।"

মা কী উত্তর দিত আর শোনা হত না আমার, ততক্ষণে স্নানের ঘাটের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যেতাম কিনা! যেতে-যেতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হত আমার। সেই ছোটবেলায় অনুভূতিটাকে চিনতে পারিনি, আজও পারি না। কী সেটা? অভিমান? একাকিত্বের অহঙ্কার? নাকি বেদনা? আত্মীয়স্বজনের ওই বিরাট দল আমার অস্তিত্বের চারপাশ ঘিরে থাকত, কিন্তু তার মধ্যেও কেন আমি অমন একাকী? নিজের মন ওদের কারও সঙ্গে মেলাতে পারিনি, ওরাও কেউ আমার মন বুঝত না।

শুধু একবার, মা তাঁর শেষ শয্যায় তখন, একবার মা আমাকে কাছে ডেকে...থাক, সেকথা পরে কখনও হবে।

স্মৃতির জলছবিগুলো মন থেকে পাশে সরিয়ে রেখে সামনে তাকাই, হাসিমুখ নিজনির দিকে। তারপরে বলি, "একটু বোস তুই, নিমকি নিয়ে আসি। খেতে-খেতে তোর গল্প শুনব।"

নিজনি হাসে, মাথা কাত করে বলে, "নিয়ে আয়। তোদের বাড়ির নিমকি খুব চমৎকার।"

আমি ঘরে ঢুকে তাক থেকে নিমকির কৌটো নামাই, তারপর কৌটো থেকে ডালায় ঢালি বেশ অনেকটা। ডালা নিয়ে নিজনির সামনে রেখে নিজেও একটা আসন পেতে ওর কাছে বসি।

তারপরে খেতে-খেতে আমাদের গল্প শুরু হয়ে যায়।

নিজনি বলে, "তারপরে শোন, সেই দ্বীপ ভরতি সবুজ গাছপালা, গাছে-গাছে সুগন্ধী ফুল আর মিষ্টি সুস্বাদু ফল। দ্বীপের মাঝখানে নীল পাহাড়ের গায়ে মিষ্টি জলের ঝরনা। তো, আমি সেই ফল খাই, জলপান করি ঝরনা থেকে আর তারপরে সমুদ্রতীরের বালিতে নারকেল গাছের ছায়ায় বসে বসে ভাবি কেমন করে ফিরব নিজের জায়গায়। ডিঙিটা একেবারে শতখণ্ডে ভেঙেচুরে পড়ে আছে

সাগরতীরে, মেরামতের অযোগ্য অবস্থা।"
এই পর্যন্ত বলে নিমকি মুখে দেয় নিজনি, খেতে থাকে।
আমিও নিমকি খেতে-খেতে বলি, "তারপরে কী হল?"
নিজনি বলে, "তারপরে তো নারকেল গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে বসে ভাবছি আর ভাবছি আর চেয়ে আছি নীল সাগরের দিকে, কূলকিনারাহারা নীল সমুদ্র আমার সামনে। তার উপরে নত হয়ে পড়েছে অসীম নীল আকাশ। চেয়ে থাকতে-থাকতে কেমন যেন নেশা-নেশা লাগে, ঘুমে ঢলে পড়ি।
"কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, অদ্ভুত একটা ঠান্ডা হাওয়ায় কেঁপে উঠে জেগে গেলাম। দেখলাম, সমুদ্রে সূর্যাস্ত হচ্ছে, পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্র আবিরগোলার মতো লাল। আর কোথা থেকে যেন ঠান্ডা হাওয়া আসছে।
"এত ঠান্ডা পড়ে নাকি রাত্রে? এদিকে আমার তো কাপড়জামা সব হালকা-হালকা, শীত মানবে তো? গলার উত্তরীয় খুলে গায়ে জড়িয়ে নিলাম, তরপরে পাহাড়ের দিকে চললাম, যদি আড়াল খুঁজে আগুন-টাগুন জ্বালানো যায়, যেতে-যেতে গলার হারের চকমকি পাথর দুটো অনুভব করে নিলাম, আগুন জ্বালাতে ও দুটো চাই। আর চাই শুকনো কাঠকুটো ঘাসলতা, সেসব দিন থাকতে-থাকতে সংগ্রহ করে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু কী করে জানব রাতে এত ঠান্ডা পড়ে? দিনে তো দিব্যি ফুরফুরে বসন্তকালের মতো ছিল আবহাওয়া।
"পাহাড়ে পৌঁছে ঝরনা থেকে আর-একটু জল খেলাম তারপরে পাহাড়ে চড়তে শুরু করলাম, উপরে কোনও গুহা-টুহা পেলে সেখানে রাত কাটানো যাবে আগুন ছাড়াই, ঠান্ডা হাওয়া না ঢুকলে অসুবিধা কী?
"আর-একটু উঠে দেখি পাহাড়ের পাথুরে গায়ে একটা যেন ছোট্ট চাতাল আর সেই চাতাল যেখানে শেষ সেখানে একটা গুহা মতো কিন্তু গুহার মুখ মস্ত একটা পাথর দিয়ে বন্ধ করা।
"আমি এগিয়ে গিয়ে পাথরটা সরানোর কোনও উপায় আছে কিনা, কোনও কোনাকাঙ্কিতে ফাঁকফোকর কিছু আছে কিনা দেখছি নিবিষ্ট হয়ে, এমন সময় পিছন থেকে জলদগম্ভীর একটা গলা শুনে চমকে ফিরে তাকালাম।
"দেখি এক প্রকাণ্ড মানুষ, শক্তসমর্থ চেহারা, বয়স বোঝা যায় না, যুবকও হতে পারে, প্রৌঢ়ও হতে পারে। মুখে এত দাড়িগোঁফ যে মুখ দেখাই যায় না প্রায়। মাথার চুলও জটাপড়া বিশাল। তার পরনে এক বিরাট আলখাল্লা ধরনের পোশাক, একেবারে গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সেই পোশাকে ঢাকা। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে তার ওই দাঁড়িগোফে আচ্ছন্ন মুখে চোখ দু'টি যেন তারার মতো জ্বলছে।
"দেখে তো আমার ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে চলৎশক্তি আর বাকশক্তি লোপ পেল সাময়িকভাবে। আমার দিকে আর-এক পা-ও না এগিয়ে এসে সেই লোক অদ্ভুত অজানা ভাষায় কী যেন আমায় জিজ্ঞাসা করল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম কেবল।"
এই অবধি বলে নিজনি থেমে যায়, আর-এক মুঠো নিমকি নিয়ে মুখে দেয়।
এদিকে আমার তো উত্তেজনায় দমবন্ধ, ওকে নাড়া দিয়ে বলি, "এইখানে কেউ থামে? তারপরে কী হল?"
নিজনি দুষ্টুমির হাসি হাসে, নিমকি চিবোতে থাকে আমার দিকে ঝিকমিকে চোখে চেয়ে। তারপরে বলে, "তুই সেই ছোটবেলার মতো রয়ে গেলি। তখনও ঠাকুরমার রূপকথার গল্পের মাঝখানে যখনই ঠাকুরমা থামত, তুই হামলে পড়ে বলতিস, এইখানে কেউ থামে?"
অমনই আমার মনে পড়ে যায় নিজনির ঠাকুরমার সেইসব গল্পগুলো, সেইসব গল্পবলার ভঙ্গি, সেইসব চলে যাওয়া দিনগুলো। কত ঘটনা, কত ভাবনা, কত পরিবর্তন।
মুহূর্তের জন্য ফিরে গিয়েছিলাম অতীতে, বর্তমানে ফিরে আসি। হঠাৎ মনে পড়ে কত কাছের মানুষ আর কাছে নেই আজ। মেঘলা হয়ে যেতে থাকা মনে আবার মেঘছেঁড়া রোদ্দুরের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে নতুন কথাও, কত অজানা মানুষও তো আজ কাছে আছে, সেদিন যাদের কোনও খবরই জানা ছিল না।
আমিও এবারে হেসে বলি, "নিজনি তুই আগে এত দুষ্টু ছিলি না রে! এখন শিখেছিস কী করে আনবান কথা বলে লোককে আনমনা করতে হয়। আরে বল না কী হল তারপরে। লক্ষ্মীটি বল।"
নিজনি বলে, "তারপরে সেই অদ্ভুত মানুষটার মুখে শুনলাম আমার চেনা ভাষা। সে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ এখানে?'
"আমার গলা কেমন শুকিয়ে গিয়েছিল যেন, কথা বলতে পারব সেই আত্মবিশ্বাসও ছিল না। তবু অনেক চেষ্টায় বললাম, 'আমি নিজনি। আমি আনুমা জনপদ থেকে আসছি।'
"সেই লোক আমাকে কথা বলতে দেখে মনে হল সন্তুষ্ট হয়েছে, বলল, 'নিজনি। বাহ্ সুন্দর নাম। আমার নাম ভোলতিক। নিজনি, এই দ্বীপে তো আমি ছাড়া কোনও মানুষ নেই, তুমি কেমন করে এখানে এলে?'
"ততক্ষণে আমার ভয় অনেক কমে গিয়েছে। আমি উত্তর দিলাম, 'কাল রাত্রের ঝড়ে আমার ডিঙিটা এই দ্বীপের সমুদ্রসৈকতে আছড়ে পড়ে। আমি নিজে আগেই জলে পড়ে গিয়েছিলাম। ঢেউ আমাকে বালিতে এনে ফেলেছিল, ডিঙিটা ভেঙে গিয়েছে। ওটা না সারানো গেলে আমি ফিরতে পারব না আমার বাড়িতে।'
"ভোলতিক এসব শুনে মনে হয় খানিকটা করুণা অনুভব করছিল আমার জন্য। নরম গলায় বলল, 'তুমি যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছ তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ডিঙিতে আর কেউ ছিল তোমার সঙ্গে?'
"আমি ডাইনে বামে মাথা নাড়িয়ে জানাই, না, আর কেউ ছিল না।
"ভোলতিক অবাক হয়, বলে, 'তুমি একা-একা সমুদ্রে ডিঙি চালিয়ে ঘুরছিলে?'
"আমি বলি, 'হ্যাঁ, প্রায়ই তো আমি এরকম বেরিয়ে পড়ি। নিজের জায়গায় আটকে থাকতে-থাকতে আমার প্রাণ কেমন যেন হাঁসফাঁস করতে থাকে, তখন এমনই করে আমি বেরিয়ে পড়ি সমুদ্রে। সমুদ্র বিশাল, আকাশ আরও বড়। আমার প্রাণ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এই বিরাটের বুকের মধ্যে এসে।'
"ভোলতিক আরও অবাক হয়, বলে, 'তোমার আপন লোকেরা উতলা হবে না?'
"আমি বলি, 'নাহ। আপন বলতে এক বুড়ি ঠাকুরমা, সে আমার জন্য উতলা হয় না। সে জানে আমি এভাবে অজানায় ঘুরতে ভালবাসি।'
"ভোলতিক আশ্চর্য হয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'নিজনি, তুমি তো আমায় অবাক করলে হে! একলা-একলা একটা এইটুকু মেয়ে সমুদ্রে-সমুদ্রে ঘুরে বেড়াও আর আপনজনেরাও কেউ উতলা হয় না!'
"আমি হেসে বলি, 'আমাদের ওখানে পাড়া, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বলে পাগলি। বলুক গিয়ে, আমার কী? আর আমি মোটেই তেমন এইটুকু না, সেই কবেই স্কুল পাশ করেছি।'
"ভোলতিক হাসে, বলে, 'তবে তো মস্ত বড় হয়ে গিয়েছ। কিন্তু সত্যিই অবাক করলে তুমি। একা-একা এইভাবে ঘুরে বেড়াতে ভয় করে না তোমার?'
"'করে তো! এই যে একটু আগেই তুমি যখন হঠাৎ করে এসে খুব চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আমায় কী জানি জিজ্ঞেস করলে অজানা ভাষায়, তখন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম কে এই

লোক? কী বলছে? কী করবে এইবার? ও কি খুব রাগী?''
"ভোলতিক হো হো করে হেসে ওঠে শুনে, তারপরে বলে, 'বাহ, তুমি বেশ মজার। আর, ওই অজানা ভাষার ব্যাপারে মাফ করো। আসলে হঠাৎ তোমাকে দেখে এমন চমকে গিয়েছিলাম যে, এখানকার স্থানীয় ভাষা ব্যবহার না করে নিজের মাতৃভাষায় প্রশ্ন করে ফেলেছিলাম। হা হা হা।'
"আমি বললাম, 'ভোলতিক, এত যে আমার একা-একা ঘোরার বিষয়ে অবাক হচ্ছ, এদিকে তুমি বললে এই গোটা দ্বীপে তুমি একা-একা থাকো। তোমার ভয় লাগে না?'
"ভোলতিক বলে, 'আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। আমার অনেক কাজই তো একা-একা করতে হয়। আর এই দ্বীপে নিরীহ প্রাণীরা থাকে, ভয়ের তেমন কারণ নেই। আচ্ছা নিজনি, কথা বলতে-বলতে সন্ধে গড়িয়ে যাচ্ছে। তোমার তো একটা থাকার জায়গা চাই রাত্রে। আমার তো এখানে আলাদা বাড়ি নেই, এই গুহার মধ্যে থাকি, আজ রাত্তিরে সেইখানে থাকতে আপত্তি আছে তোমার?'
"আমি মাথা নেড়ে জানাই কোনও আপত্তি নেই।
"ভোলতিক হেসে বলে, 'আমাকে বিশ্বাস করছ এতখানি? যদি তোমার কোনও ক্ষতি করি?'
"আমিও হেসে বলি, 'ক্ষতি যদি করতে চাও সে তো যখন খুশি যেখানে খুশি করতে পার। কেউ তো নেই এই দ্বীপে। আর, আমি তোমার শক্তির কাছে তো একেবারেই ছোট্ট একটা ফড়িংয়ের মতো। পাখা ছিঁড়ে দিতে চাইলে যে-কোনও মুহূর্তে দিতে পার।'
"এই শুনে ভোলতিক স্থির চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে, ওর জ্বলজ্বলে চোখে কেমন বিষাদ ঘনিয়ে এল। তারপরে সে কেমন গভীর স্বরে বলল, 'আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না কখনও, বরং তুমি যদি কখনও বিপদে পড়ো আমার সাধ্যমত তোমায় রক্ষা করার চেষ্টা করব।'
"আমি ওকে বলি, 'ধন্যবাদ ভোলতিক। আমি জানি তুমি খুব ভাল লোক।'
"গুহার মুখের মস্ত পাথরটার কাছে গিয়ে কী যেন একটা মন্ত্র বলে ভোলতিক, অমনই গুম গুম গুম করে পাথর সরে যায় এক পাশে, যেন সেটা ঠেলা দরজার পাল্লা। ভিতরে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের মতো, সুড়ঙ্গমুখে দাঁড়িয়ে ভোলতিক নিজের ডানহাতের অনামিকায় বসানো একটা আংটিতে একটু চাপ দিতেই উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল আংটির রত্নপাথরে, পরে জেনেছিলাম ওটা আসলে রত্নপাথর না, এক রকম আলো, সুইচ টিপে জ্বালাতে হয়। ওর জন্য শক্তি সঞ্চিত থাকে সৌরকোষে।
"ভোলতিক আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে। ডানহাত উঁচু করে রেখেছে যাতে ঠিকভাবে আলো পড়ে আমাদের পথে। সরু পাথুরে পথ দিয়ে এগিয়ে চলি ওকে অনুসরণ করে, ভয়ে আর কৌতূহলে বুক ঢিপ ঢিপ করে। কোথায় যাচ্ছি আমি?
"আমার সামনে থেকে ভোলতিক অভয় দেয় আমায়, বলে, 'ভয় নেই, প্রায় এসে গিয়েছি।'
"দেখতে-দেখতে সরু সুড়ঙ্গ শেষ আর তারপরেই বিরাট এক প্রশস্ত জায়গা, যেন সভাঘর। তবে এত ছাদ এত উঁচু যে মাথা ঘুরে যায়। ঘরের দেওয়াল থেকে নরম আলো বেরিয়ে আসছে, বিশাল সেই বিচিত্র ঘর মৃদু আলোয় আলোকিত। ঘরটা কেমন গোল মতো, সব দিকের দেওয়ালেই নানা রকম ছোট-বড় খাঁজ, তাক, নকশা ইত্যাদি। কত রকমের বিচিত্র জিনিস যে সেই ঘরে আমি তার প্রায় কিছুই চিনি না।
"বিস্ময়ে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, পায়ে চলার যেন আর শক্তি নেই।
"ভোলতিক আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসায় এক পাথরের চেয়ারে, বলে, 'বসে একটু বিশ্রাম করো। আমি খাবার আর জল আনছি।'
"আমি ভোলতিকের হাত ধরে আটকাই, নিশ্বাস আটকে আসার মতো গলায় বলি, 'ভোলতিক, এসব তোমার? তুমি কে? তুমি কি জাদুকর?'
"হা হা হা করে হেসে ওঠে ভোলতিক, বলে, 'হ্যাঁ, জাদুকরই তো। মানুষদের ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসে ওদের স্ফটিকের পুতুল বানিয়ে রেখে দিই। ওই যে দেখছ না কত স্ফটিকের পুতুল?' এই বলে সে হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের আর-এক সুইচ টিপে দেয়, ঘরের এক পাশে কতগুলো উজ্জ্বল সাদা আলো জ্বলে ওঠে, সেখানে নানা সাইজের স্ফটিকের পুতুল দাঁড়িয়ে আছে, কেউ সবুজ, কেউ নীল, কেউ কমলা, কেউ বা সোনার মতো ঝকমকে। কেউ মাত্র হাতখানেক উঁচু, কেউ মানুষপ্রমাণ, কেউ বা দেড়মানুষ।
"বিস্ময়ে আমার ভয় ডুবে যায়।
"ভোলতিক স্ফটিকপুতুলগুলোর কাছে গিয়ে একটা মানুষপ্রমাণ রুপো চকচকে পুতুলের গায়ে কী যেন কারিকুরি করতেই সেই পুতুল সচল হয়ে ওঠে, হাঁটতে-হাঁটতে আমার কাছে এসে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখায়, তারপরে যান্ত্রিক গলায় বলে, 'আমাদের যন্ত্রঘরে স্বাগত।'
"ততক্ষণে আমার কথা বলার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, আমি কাঠ হয়ে বসে থাকি। এসব কী? এ কি সত্যিই জাদু নাকি ওই যে ইস্কুলে নানা যান্ত্রিক ব্যাপারের কথা আমরা পড়তাম এসব তারই উন্নত রূপ? যন্ত্রঘর বলল যে পুতুলটা? জাদুর ঘর তো বলল না!
"ভোলতিক পুতুলটাকে আবার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে অচল করে রেখে আস্তে-আস্তে আমার কাছে এল। তারপরে বলল, 'এই নিজনি, তুমি তো বুদ্ধিমতী মেয়ে, ভয় পেয়ে গেলে নাকি? জাদু না, জাদু না, এ নিতান্তই যন্ত্রের ব্যাপার। তুমি যদি চাও ধীরে-ধীরে সবই দেখিয়ে দেব তোমায়। এখন আগে তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি। দেখো তো অতিথি মানুষ তুমি, আর আমি কিনা...' কথা না শেষ করেই সে সেই বিরাট ঘরের আর-একপাশে চলে যায়, সেখানে এক বিচিত্র চুল্লি বসানো।
"চুল্লিতে জল গরম করতে বসিয়ে বিচিত্র নকশা করা পাথরের প্লেটে আমার জন্য ভাজা চিংড়ি আর নারকেল-কুচি এনে দিল ভোলতিক। এক গ্লাস জলও দিল। খুব আপ্যায়ন করে বলল, 'খাও, খাও, নিশ্চয়ই বেশ খিদে পেয়েছে তোমার। জল গরম হলে চা বানিয়ে দেব।'
"খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল, চিংড়িতে কামড় দিয়ে খুব ভাল লাগল, কী চমৎকার স্বাদ! তারপরে ওকে বললাম, 'আমায় একা-একা খেতে দিচ্ছ? তুমি খাবে না?'
"সে বলল, 'চা হয়ে গেলেই আমিও খেতে বসব। ততক্ষণ তুমি মুখরোচক হিসেবে এগুলো খেতে থাকো। আসল খাবার রুটি, সবজি, মাছ, কাঁকড়া এসব তো এখনও আসেইনি।' কথা শেষ করে হাসে সে।
"তারপরেই চুল্লিতে বসানো পাত্রে শোঁ শোঁ করে আওয়াজ হচ্ছে দেখেই দৌড়ে যায় সেদিকে, জল ফুটে গিয়েছে কিনা দেখতে। ফুটন্ত জলে চা পাতা ভিজিয়ে সে চা বানায়, ভারি সুন্দর একটা গন্ধ তার। ছোট্ট-ছোট্ট দু'টি স্ফটিকের মতো জিনিসের তৈরি হাতলওয়ালা বাটির মতো পাত্রে সেই চা ঢালে। তারপরে আমাকে একটা পাত্র এগিয়ে দেয়, আর-একটা পাত্র থেকে নিজে খায়। ভারী একটা আরামের ভাব দেখি ওর মুখে। নিশ্চয়ই এই পানীয় ওর খুবই প্রিয়।"
এই পর্যন্ত বলে আবার থেমে গিয়ে নিজনি নিমকি তুলে মন দিয়ে খেতে থাকে। আমি এইবারে ওর কৌশলে আর পা দিই না, বরং

ওর কৌশল ওর উপরেই প্রয়োগ করি।
নিমকি খেতে-খেতে ভালমানুষের মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করি, "হ্যাঁরে নিজনি, ওই ভোলতিক চা পাতা পেল কোথায়? ওই দ্বীপে কি চা গাছও হয়?"
নিজনি চোখ ঝিকঝিকিয়ে হাসে, বলে "আরে সে তো আমিই জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে। চা পেলে কোথায়? চিনি পেলে কোথায়? গুঁড়োদুধ পেলে কোথায়? সে বলল, ওর বন্ধুরা তিনমাস পরপর জাহাজে করে আসে, তখন ওকে আবশ্যক জিনিসপত্র সব দিয়ে যায়। শুধু তো খাবার জিনিসপত্রই না, ওর পোশাক যন্ত্রপাতির অংশ বইপত্র কাগজ-কলম ইত্যাদি আরও সব জিনিস, সবই নাকি দিয়ে যায়। বেশ মজা।"
আর-এক মুঠো নিমকি তুলে নিয়ে বলি, "তারপরে কী হল? তোফা খাওয়াদাওয়া হল? ভোলতিক কি তোর ভাঙা নৌকো মেরামত করে দিল পরে?"
নিজনি এইবারে নিজেই ফাঁদে পা দেয়, বলে, "আরে গল্পের মাঝখানে খেই হারিয়ে দিচ্ছিস কেন? কী বলছিলাম যেন? হ্যাঁ, ওই রাত্রে ভাল করে খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে ভোলতিক ওই স্ফটিকপুতুলগুলো যে চৌকোনা জায়গাটায় ছিল, তার পাশে আমায় তোফা বিছানা করে দিল। বিছানার পাশে একটা জগে জল আর গেলাস রাখল, আর রাখল একটা ছোট্ট আলো, দেখিয়ে দিল সুইচ টিপলে কী করে জ্বলে ওটা। বলল সে তার নিজের শোওয়ার

অদ্ভুত সেই গুহার দেওয়াল, দেওয়াল থেকে আসা লুকনো আলো, সারি-সারি স্ফটিকপুতুল, যারা নাকি আবার সক্রিয়

জায়গায় চলে যাচ্ছে, সেটা এর পাশের গুহা। কিন্তু আমার যদি ভয়-টয় লাগে বা কোনও অসুবিধে হয় তবে যেন ওকে ডাকি। এই বলে আর-একটা ছোট চৌকো বাক্সের মতো জিনিস রাখল, সেটার গায়ে লাল-নীল আলো ঝকঝক করছে, উপরের নীল বোতাম টিপলেই ওর গলার লকেটে ঝোলানো ওইরকম ছোট বাক্সে সঙ্কেত পৌঁছে যাবে, ও বুঝতে পারবে ওকে ডাকা হচ্ছে।
"আমি তো অবাক হয়ে দেখছিলাম কাণ্ডকারখানা। ঠিক মনে হচ্ছিল কোনও রূপকথার মধ্যে ঢুকে পড়েছি।"
আমি হেসে খুব আস্তে করে বলি, "তোর জীবনটাই তো রূপকথার মতো।"
নিজনি বলে চলে, "রাত্রে খুব ঘুমোলাম আর ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত-অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম স্ফটিকগুলো সব সক্রিয় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ রান্না করছে, কেউ গান করছে, কেউ বাজনা বাজাচ্ছে। ভোলতিক একটা বিরাট উঁচু অদ্ভুত পাথরের চেয়ারে বসে কীসব অদ্ভুত মন্ত্র বলে যাচ্ছে। আর আমি নিজেও একটা স্ফটিকপুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি একটা ছয়কোনা পাথরের উপরে, নড়তে পারছি না, গলা দিয়েও কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কেবল দেখতে পাচ্ছি আর শুনতে পাচ্ছি।
"স্বপ্ন দেখে ঘামে ভিজে জেগে উঠলাম। উঠে বসে বিছানার পাশ থেকে একটা কাগজ তুলে হাওয়া করতে লাগলাম নিজেকে। বিছানার পাশে একস্তূপ ছবি আঁকা কাগজ ছিল, ভোলতিক দেখতে দিয়েছিল ওর আঁকা ছবি। আমি ঘুমের আগে দেখছিলাম, ছবিগুলো বুঝিনি ভাল, মানুষ বা গাছপালা পশুপাখির ছবি না, নানা যন্ত্রপাতির রেখাচিত্র। আমিই কৌতূহলী হয়েছিলাম, কিন্তু দেখতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম খুবই ঘোরালো ব্যাপার। পরে ভোলতিককে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে বলব ভাবছিলাম ছবিগুলো দেখতে-দেখতে। তো, সেইগুলোই রয়ে গিয়েছিল ওখানে। তারই একটা তুলে হাওয়া খেতে লাগলাম। ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল না, একদিকের দেওয়াল থেকে খুব মৃদু নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কে জানে ওই আলোর উৎস কোথায় ছিল!"
নিজনি থামল একটু, নিমকি খেতে না, সে চুপ করে যেন সেই রাত্রিটা মনের মধ্যে আবার দেখছিল, ওর চোখ বড়-বড় হয়ে যাচ্ছিল। দূরের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছিল কিন্তু দেখছিল না কিছু, ওর চোখ স্মৃতিস্বপ্নে আচ্ছন্ন। অদ্ভুত সেই গুহার দেওয়াল, দেওয়াল থেকে আসা লুকনো আলো, সারি-সারি স্ফটিকপুতুল, যারা নাকি আবার সক্রিয় হয়ে হাঁটতে, চলতে পারে, আমিও সেই দৃশ্য মনের চোখে ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম।
এক সময় নিজনি বর্তমানে ফিরল, আমার দিকে চেয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, "ওরিয়ানা, আজকে যাই? আর-একদিন এসে বাকি গল্প বলব। আজকে আর বলতে পারব না, মনটা কেমন করছে। এখন ঠাকুরমার কাছে যাব। যাই, ওরিয়ানা?"
ওর গলার স্বরে একটা অদ্ভুত মিনতির মতো কিছু ছিল, সত্যি-সত্যিই ও আর বলতে পারবে না আজ। নিজনির প্রকৃতি আমি খুব ভাল করে জানি। যখন কোনও কিছু করবে বলে তখন কিছুই ওকে থামাতে পারে না। আবার যখন কোনও কিছু করবে না বলে তখন কিছুতেই সেই কাজ ওকে দিয়ে করানো যায় না। অথচ যে রাগারাগি করে বা নিষ্ঠুরতা করে তাও নয়, ও অদ্ভুত রকমের কোমল অথচ দৃঢ়।
আমি নরম গলায় বলি, "যাবি আজ? গল্পের এমন জায়গায় তুই থামলি, উফ্‌ফ। কৌতূহলে মরে যাচ্ছি। রাত্রে ঘুম হলে হয়। কিন্তু বলতে যখন আর পারবি না আজ, কী আর করা? আর-একদিন আসিস তবে। সাবধানে যাস।"
ও উঠে দাঁড়ায়, আমিও। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। ছিন্ন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল রোদ্দুর।
আমি নিজনিকে ওর বাড়ির পথে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আবার নিজের আঁকার জায়গায় ফিরে এলাম।

{২}

আমার ছবিটা হয়ে গিয়েছিল আঁকা। স্ট্যান্ড থেকে সাবধানে খুলে নিয়ে টেবিলের উপরে পেতে রেখে চার কোণে চারটে পাথর চাপা দিই। ছবি শুকোতে দিয়ে জানালার কাছে যাই, পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাই, শীত কমে গেছে কবেই, এখন স্বল্পায়ু বসন্তও শেষ হয়ে এল। ঘরের দেওয়ালে ক্যালেন্ডার ওড়ে বাইরে থেকে আসা হাওয়ায়, ক্যালেন্ডারে দোলনচাঁপা আর রক্তকরবীর ছবি, সমুদ্র থেকে লোনা হাওয়া এত দূরে আসে না, আমাদের জনপদটি বন্ধুর পার্বত্যভূমিতে ঈগলপাখির বাসার মতো।
বসন্তের পাখিরা ডাকতে-ডাকতে এতদিনে ডাক খানিক কমিয়ে ফেলেছে, ইদানীং তারা ব্যস্ত বাসা তৈরিতে। আমার জানালার বাইরে ক্ষুদ্র বাগান, বাগানটুকু পেরিয়েই এলোমেলো পাথর সাজানো সীমানারেখা, তারপরেই পথ আর শস্যক্ষেত্র।
শস্যক্ষেত্র শুরু হওয়ার আগেই বিরাট-বিরাট কতগুলো গাছ,

টকটকে লাল ফুলে ভরে গেছে এখন সেগুলো। এগুলো তুলো গাছ, কিছুদিন পরেই এই ফুল থেকে ফল হবে উপগোলক আকারের, পাকলে ফল ফেটে যায়, ভিতর থেকে তুলো বেরিয়ে আসে উজ্জ্বল শরৎ মেঘের মতো সাদা, রেশমের মতো কোমল। আগে এ গাছ এখানে ছিল না, কীভাবে জানি পাখির আনা বীজের থেকে এই সতেজ প্রাণময় গাছগুলো জন্মে তরতর করে বেড়ে উঠে যৌবনে উপনীত হয়েছে! তাই ঠিক জায়গা মতো না হলেও ওদের কেটে ফেলার কথা কেউ বলেনি।

আমাদের জনপদে গাছপালা লাগানো হয়েছে ঋতুচক্রের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে, এক অংশে গ্রীষ্মের, এক অংশে বর্ষার, এক অংশে শরতের, এইরকম করে। যদিও এখন ঋতুবৈচিত্র অনেক কম, তেমন করে শীত পড়েই না, ক্রান্তীয় আর নিরক্ষীয় আবহাওয়ার মতো হয়ে গিয়েছে সব। তবুও যেটুকু পাওয়া যায় তাকেই যথাসম্ভব দর্শনযোগ্য করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন যেখানে বসন্ত আর গ্রীষ্মের বর্ডার, সেখানে লাল আর বাসন্তী ফুল ফুটেছে, উড়ে যাচ্ছে রেণু, ভোমরা-মৌমাছিরা ব্যস্ত হয়ে উড়ছে, জনপদের বর্ষা অংশ এখন চুপ। সেখানের সবুজ গাছেদের পাতায়-পাতায় শান্ত অপেক্ষা। আর কিছুদিন পরেই ওদের দিন আসবে, সমুদ্র থেকে আসা নবধারাজল, ওরা স্নান করবে সর্বাঙ্গ মেলে দিয়ে, আআআআহ!

আমাদের এই জনপদটি গড়ে উঠেছে বিশ্বপ্লাবনের পরে-পরেই। শিল্পায়িত দুনিয়া ক্রমে বৃক্ষহীন হতে-হতে একসময় তেড়ে উঠে রুখে দাঁড়াল, মহাবন্যায় সব ভেসে গেল উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু। কয়েকটা জেগে থাকা উচ্চভূমিখণ্ডে টিকে রইল সরল পাহাড়ি মানুষেরা, উপকূলের ক্ষুরধারবুদ্ধি বোধিনগরগুলো জলের তলায় চলে গিয়ে করতে থাকল তখনও না-মেটা হিসেবনিকেশ।

ডুবোজাহাজে চড়ে চড়ে দুনিয়া ঘোরে যেসব গূঢ়পুরুষ ও গূঢ়নারীরা, তারা নাকি এখনও ওসব জলমগ্ন শহরে শুনতে পায় নানা রকম কনফারেন্স হচ্ছে, নানা ক্লাস হচ্ছে, নানা রকম তর্ক চলছে আবদ্ধ আলোচনাকক্ষে-কক্ষে। ওরা ভয় পায়, পালিয়ে আসে, ওদের জন্য যেসব মনোবিদ ছিলেন, তাঁরা নিজেরাই পাগল হয়ে গেছেন অনেক আগেই। তাঁরা হো হো হো হো করে অকারণে হাসেন, গ্লাসে-গ্লাসে ঠোকা মেরে চলকে ফেলেন মদ, কখনও ভেঙে ফেলেন গ্লাস, চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে গান করে ওঠেন, "সব লাল হো জায়েগা, এভরিথিং উইল বি রেড, রেড, রেড..."

বাড়াবাড়ি হলে ওদের ধরে বেঁধে নৌকায় তুলে পাহাড়ি ডাঙায় পাঠিয়ে দেয় অন্যেরা, সেখানে কিছু-কিছু অ্যাসাইলাম করা হয়েছে আজকাল, কারা যে চিকিৎসা করে কে জানে। নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা আছে ঠিকই, বাকিরা এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু ওই মানুষদের কেউই আর কাজে ফিরে আসেন না। শুধু একবার একজন...থাক সে কথা। পরে কখনও বলা যাবে।

একটি দেশের আজকাল খুব নাম...সম্ভালা। আগে নাকি ছিল তিব্বত। সেখানে এখন সভ্যতা স্ফুরিত হয়েছে। নতুন সব ধারণা নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ-তরুণীরা জাহাজে করে দলে-দলে সম্ভালায় যায় যোগতত্ত্ব শিখতে। তবে সবাই যেতে পারে না, সেখানে যাওয়ার অনুমতি পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, নানা রকম পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে চাল পেতে হয়, সেসব যোগ ও তন্ত্রের পরীক্ষা, খুব বাছা-বাছা পরিবারের ছেলেমেয়েরাই সেসব শেখার সুযোগ পায়। সম্ভালার ভাষাও আলাদা, তবে সেই ভাষাতে লেখাপড়া শেখার কিছু-কিছু স্কুল আছে, অবস্থাপন্ন বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের সেইসব স্কুলেই পড়ান যাতে ওদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়।

মহাসাগরের মাঝের এক দীর্ঘ দ্বীপের মধ্যিখানের গিরিশিরার এক প্রান্তে ছোট্ট এই আনুমা জনপদে জন্মেছি সেই পৃথিবীপ্লাবনের অনেক পরে, আগে এই দ্বীপ ছিল এক বিশাল মহাদেশ। সেই সব শুনেছি গল্পে, পড়েছি ইস্কুলের বইয়ে, কিছু দেখেছি স্ক্রিনে। আমাদের এই জনপদটির এক অদ্ভুত কাহিনি আছে, শুনেছি মহাপ্লাবনের আগে এই জনপদটি ছিল একটি পরিত্যক্ত জনপদ, পাহাড়ের মালার মাঝে উচ্চ মালভূমিতে একলা-একলা লুকিয়ে ছিল মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে।

মাঝে-মাঝে ভবঘুরে কিছু পশুচারক এই জায়গার অদ্ভুত সব বাড়িঘর আর পাথরের মূর্তির খবর নিয়ে যেত। লোকে অবাক হয়ে শুনত আর পরে যখন এসব নিয়ে বলত তখন নিজেদের কল্পনা মিশিয়ে আরও পুষ্পিত-পল্লবিত করে নাকি বলত এসবের কথা। তাই জনগোষ্ঠীর চেতনায় এই লুক্কায়িত জনপদ ছিল কল্পিত স্বর্গের মতো সুন্দর অথচ অপ্রাপ্য।

মহাপ্লাবনের সময় কাছাকাছি অঞ্চলের লোকে এই দিকে চলে আসে, ক্রমে জল যখন বাড়তে থাকল, তখন দুর্গমতার বাধা না মেনে অল্পসংখ্যক দুঃসাহসী গিরিপথের গোলকধাঁধায় ঘুরতে-ঘুরতে একসময় এখানে এসে পৌঁছায়। এখানকার জঙ্গলে চাপাপড়া পাথরের বাড়িঘর, আশ্চর্য মূর্তি, পাথরে বাঁধানো পথ, জলের কুণ্ড সব ধীরে-ধীরে তারা আবিষ্কার করে একটু-একটু করে, অনেক বছর ধরে।

বর্তমান জনগোষ্ঠী সেই সাহসী শরণার্থীদেরই উত্তরপ্রজন্ম। প্রথম আসা লোকেদের নিয়ে ইতিমধ্যেই এখানকার লোককথায় জন্ম নিয়েছে নানা বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য মিথ। কোথাও-কোথাও তাঁরা প্রায় দেবমর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন, মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়া তো সোজা ব্যাপার না! ঈশ্বরের খুব অনুগৃহীতরাই কেবল পেতে পারে সেই অভাবিত সৌভাগ্য।

তারা সঙ্গে করে অনেক কিছু এনেছিল, অদ্ভুত-অদ্ভুত সব চাকতি, অদ্ভুত-অদ্ভুত সব ছোট্ট-ছোট্ট সিলিন্ডারের মতো দেখতে জিনিস, চৌকো-চৌকো কিছু বাক্সের মতো যন্ত্র। সব সযত্নে রাখা আছে আমাদের এখানকার মিউজিয়ামে, কী যে ওসবের ব্যবহার ছিল বা এখনও সেসব ব্যবহারযোগ্য আছে কিনা, জানা যায়নি, হয়তো কোনওদিন জানা যাবে না আর।

ওরা যেসব বইপত্র এনেছিল তার কিন্তু পাঠোদ্ধার হয়েছে, সেইসব বইয়ের কাহিনি প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু খুব থ্রিলিং, মানুষে চাঁদে নেমেছিল সেই বর্ণনা। মানুষ মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিল, সেই কথা। মহাকাশে মানুষ বহু-বহু কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছিল পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তনের খবর দেওয়ার জন্য, যোগাযোগের জন্য, এক দেশ অন্য দেশের উপরে নজর রাখার জন্য...

কখনও-কখনও পূর্ণিমার গোল চাঁদ বা শুক্লপক্ষের ফালি চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবি, গল্প হোক বা সত্যি হোক, যদি ওখানে যাওয়া যেত! বইয়ে বলেছে যারা ওখানে নেমেছিল তারা দেখেছিল শুধু শুকনো পাথর, জল নেই, বাতাস নেই, কোনও শব্দ নেই, আকাশে অজস্র তারা ধূলিহীন তীব্রতায় ঝকঝক করছে! সত্যি ওখানে যদি যাওয়া যেত!

আমরা এখানে আমাদের খাদ্য উৎপাদন করি প্রধানত কৃষিকাজ, পশুপালন আর সমুদ্রে মৎস্যশিকার করে। জীবন আমাদের বেশ সাদাসিধে এমনিতে, তবু ওই যে! দূর সম্ভালার অসহ্য ঐশ্বর্যের খবর এসে পৌঁছে আমাদের তরুণ ডানাকে চঞ্চল করে তোল! উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা প্রায় সকলেই সম্ভালায় যেতে চায়। আহা, কী না জানি আছে সেই অবাকভূমিতে! পৃথিবীর দেশ হয়েও সে যেন কল্পস্বর্গের মতো।

আমি নিজে অথবা আমার খুব কাছের বন্ধু যারা, তারা নিজেরা কোনওদিন সম্ভালা যাওয়ার আশা করি না। নিতান্ত সাধারণ

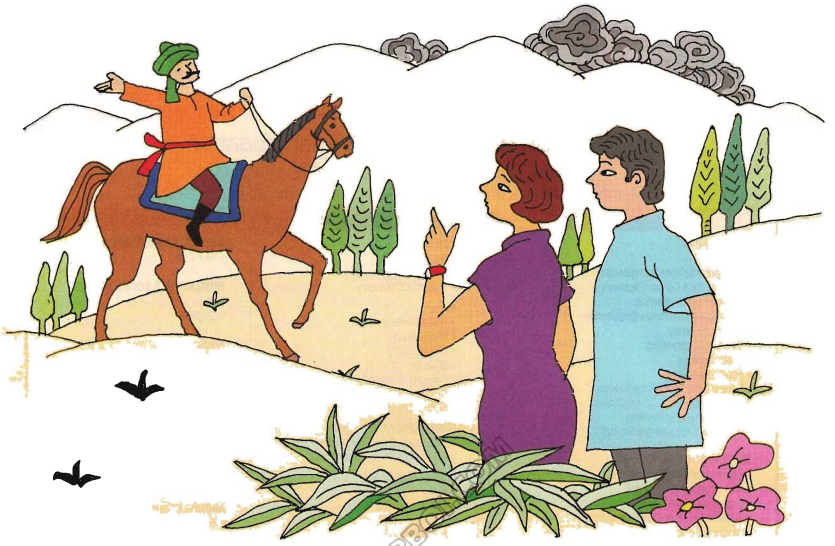

পরিবার আমাদের। খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের ব্যবস্থাটুকু করতেই আমাদের প্রায় সমস্ত সময় পার হয়ে যায়। পরিবারের পুরুষ-মহিলা সবাই কাজ করেন, জমিতে চাষবাস আর সমুদ্রে মাছধরা, সেই সবের বিকিকিনির বন্দোবস্ত করা সবই তারা করেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। ছোটরা কিছুদিন ইস্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায়, এই অক্ষর পরিচয়, সংখ্যা চেনা, লিখতে-পড়তে শেখা আর হিসাবপত্র শেখা। ওই হয়ে গেলেই তারাও কাজে লেগে পড়ে। কেউ-কেউ, যাদের কিনা সত্যি-সত্যি আগ্রহ আছে, তারা সৌভাগ্য থাকলে আরও কিছুদিন লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়। তখন তারা সম্ভালার ভাষাও কিছু-কিছু শেখে।

পড়াশোনায় খুব বেশি সুযোগ যে পাব সে আমিও ভাবিনি, আমার অভিভাবকেরাও কেউ না। বছরচোদ্দো-পনেরো বয়স হয়ে গেলেই কাজেকর্মে লেগে পড়তে হবে আমাকে, সে এক রকম ঠিকই হয়ে ছিল। তবু তার মধ্যেও কেমন করে যেন আমার ছবি আঁকা শুরু হয়ে গেল!

যত দূর মনে পড়ে কেউ আমাকে সেভাবে শেখায়নি নিয়ম করে, কিন্তু পাথরের পাশে নরম ঘাসের গোছা রোদ্দুরে কাঁপত, ছোট্ট-ছোট্ট চকচকে লাল পোকা টুপটুপ করে গুটি-গুটি চলত পাতার উপর দিয়ে, হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে উড়ে বের হয়ে আসত মস্ত নীল প্রজাপতি, এসব দেখে আমার মন কেমন করত, মনে হত আহা ওদের যদি ধরে রাখা যেত কোনওভাবে! বালির উপরে কাঠি দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটতাম, ভাবতাম আহা যদি রং পেতাম, যদি ভাল আঁকার জায়গা পেতাম!

আমাদের স্কুলে একজন শিক্ষিকা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল ঐশা। অন্যদের চেয়ে কোথায় যেন আলাদা ছিলেন তিনি। অল্প বয়স ছিল তখন তাঁর, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, খোলা পরিষ্কার চোখে হাসি ঝকমক করত। তখনও তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। কাছের একটা দ্বীপ থেকে নিজের ছোট্ট ডিঙি নিজেই চালিয়ে আসতেন। ঘাটে ডিঙি জমা রেখে তারপরে ডাঙাপথটুকু বাইসাইকেলে করে আসতেন, ঘাট থেকেই বাইসাইকেল ভাড়া নেওয়ার মাসকাবারি বন্দোবস্ত ছিল তাঁর।

উনি আমাদের স্কুলে অঙ্ক করাতেন, মাঝে-মাঝে বিজ্ঞানের ক্লাসও করাতেন। অঙ্কের মতো কঠিন গুরুগম্ভীর বিষয়ও ওঁর পড়ানোর দৌলতে আনন্দের আর উৎসাহের হয়ে উঠত। আর বিজ্ঞানের ক্লাসে অনেক সময়ই উনি গোটা ক্লাসের সবাইকে নিয়ে ক্লাস ঘর ছেড়ে সামনের মাঠে বের হয়ে আসতেন, হাতে কলমে শেখাতেন প্রকৃতির নিয়মগুলো কীভাবে কাজ করে।

একদিনের কথা মনে পড়ছে খুব। স্কুলছুটির পরে আমি স্কুল থেকে বাড়ি না গিয়ে স্কুলের খেলার মাঠের ধারে বসেছিলাম একটা গাছের ছায়ায়। গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ বেলা, তখন যদিও বিকেল, কিন্তু তেজালো রোদ্দুর চারপাশে। গাছের ছায়ায় ভারী স্নিগ্ধ একটা আরামে বসে ছিলাম ঘাসের উপরে আর দেখছিলাম গাছের চিকন-চিকন পাতাগুলোয় উজ্জ্বল রোদ্দুর কেমন খেলা করছে।

ঐশা দিদিমণি সাইকেল চালিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন সমুদ্রের ঘাটের দিকে। ওইখান থেকেই ফেরি ধরে নিজের দ্বীপে যান তিনি। আমাকে দেখে ঐশাদি থেমে গেলেন, নেমে পড়লেন সাইকেল থেকে। সাইকেল হাঁটিয়ে-হাঁটিয়ে গাছের কাছে এসে সাইকেল দাঁড় করালেন স্ট্যান্ডের উপরে, আমার কাছে এসে বললেন, "ওরিয়ানা

না? এখানে কী করছ? স্কুল তো অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গিয়েছে! বাড়ি যাবে না?"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে বলেছিলাম, "এই একটু বসেছিলাম দিদিমণি, এই তো একটু পরেই বাড়ি যাব। কত বেলা আছে এখনও!"

ভারী স্নিগ্ধ একটা হাসি হেসে দিদিমণি আমার হাত ধরে বললেন, "এসো দু'জনেই একটু বসি। কী চমৎকার ছায়া এখানে। রোজই পাশ দিয়ে যাই, কিন্তু ছায়ায় বসা হয় না। আজ সুযোগ পেয়েছি।"

দিদিমণি হাসতে লাগলেন।

আমি একটু বিচলিত হয়ে বললাম, "আপনার দেরি হয়ে যাবে না? ফেরি ছেড়ে যাবে না?"

ঐশাদি হেসে বললেন, "অনেক ফেরি যাবে এর পরেও, তার কোনওটায় যাব। অনেক বেলা আছে তো! গ্রীষ্মে এই একটা বিরাট সুবিধে অন্ধকার হয় দেরিতে। শীতকাল হলে আর দেখতে হত না, ঝপ করে রাত হয়ে যেত।"

আমরা বসলাম পাশাপাশি, প্রথমে খানিকক্ষণ চুপচাপ। কে কথা শুরু করবে সেটাই ভাবছিলাম। দিদিমণিই শুরু করলেন, বললেন, "তুমি ছবি আঁকতে খুব ভালবাসো, তাই না ওরিয়ানা?"

আমি একটু অবাক, আমি ছবি আঁকি এই খবর কয়েকজন কাছের বন্ধু ছাড়া বিশেষ কেউ জানে না। আর ঐশাদি তো অঙ্ক আর বিজ্ঞান পড়ান, অবশ্য অঙ্ক আর বিজ্ঞানেও ছবি লাগে, জ্যামিতি করতে, ডায়াগ্রাম আঁকতে। তবুও সেসব তো নিতান্ত কেজো আঁকা। আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললাম, "না-না, সেরকম কিছু না। অতি সাধারণ হিজিবিজি ধরনের আঁকা।"

আমার সঙ্কোচ দেখে ঐশাদি হেসে ফেললেন, বললেন, "আরে এত লজ্জা পেতে হবে না। ওহ, ওরিয়ানা তোমার কান দুটো এমন লাল হয়ে গেছে যেন চুরি করে ধরা পড়েছ। কই দেখাও না একটু কী এঁকেছ। আরে বাপু এখন তো আর আমি তোমার দিদিমণি না, এখন তো ক্লাসে নেই আমরা। এখন আমি তোমার দিদি।"

তারপরে আর-একটু কাছ ঘেঁষে এসে ফিসফিস করে বললেন ষড়যন্ত্রীর মতো, "জানো, আমিও অনেকদিন আগে ছবি আঁকতাম, গাছ, ফুল, পাখি, সমুদ্র, নৌকো এইসব।"

আমি কেমন এক অদ্ভুত আগ্রহে ঝুঁকে পড়ি ঐশাদির দিকে, বলি, "তারপরে, দিদি? এখন আর আঁকেন না?"

ঐশাদির মুখ কেমন ম্লান হয়ে যায় হঠাৎ, আমার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে দূরের দিকে তাকান, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "নাহ, এখন আর আঁকি না।"

"কেন?" আমি এতটাই জড়িয়ে পড়েছিলাম কথার মধ্যে যে মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্নটা বেরিয়ে এসেছে। ঐশাদি দূরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকান, কোমল গলায় বলেন, "সে অনেক কথা। পরে কোনওদিন বলব তোমাকে ওরিয়ানা। এখন তুমি বলো দেখি তুমি কীরকম ছবি আঁকো। তোমার কাছে তোমার আঁকা কোনও ছবি আছে? আমাকে দেখাবে?"

সঙ্কোচে আমার হাতের আঙুলগুলো অল্প-অল্প কাঁপছিল, তবু আমি স্কুলের ব্যাগ থেকে আমার আঁকার খাতা বের করে দিলাম। ঐশাদি আস্তে-আস্তে আমার আঁকার খাতার পাতাগুলো উলটে-উলটে ছবি দেখতে থাকেন আর তাঁর চোখে খেলা করতে থাকে অদ্ভুত আলোর ঝিলিক। মাঝে-মাঝে মুখ তুলে আমাকে দেখতে থাকেন আর সঙ্কোচে আমার কান, গাল সব গরম হয়ে যায়।

প্রথমদিকের ছবিগুলো শুধু পেনসিলে আঁকা, গাছপালা, সমুদ্রতীর, নৌকো, মেঘ, বাড়িঘর, মাঠ, রাস্তা এইসব। একদম কাঁচা হাতের ওগুলো। পরের দিকে কিছু-কিছু আছে জলরঙে আঁকা, তাও সামান্য কিছু রং-আবিরগোলার লাল, গাছের পাতার থেকে পাওয়া সবুজ, নীল পাথর গুঁড়ো থেকে পাওয়া নীল, চালের মিহি গুঁড়ো জলে গুলে পাওয়া সাদা, হলুদগুঁড়ো জলে গুলে পাওয়া হলুদ আর হলদে লাল মিশিয়ে পাওয়া কমলা।

খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকেন দিদিমণি আর আমি আরও গুটিয়ে যাই ভিতরে-ভিতরে। ভাবতে থাকি আহ, নানা ভুজুংভাজুং দিয়ে এড়িয়ে গেলেই হত, কী বা দরকার ছিল দিদিমণিকে এইসব দেখানোর?

ঐশা দিদিমণি আমার আঁকার খাতা থেকে মুখ তুলে হঠাৎ বললেন, "ওরিয়ানা, তোমায় কি কেউ শিখিয়েছেন আঁকতে? নাকি এসব তুমি নিজে-নিজেই সব এঁকেছ?"

আমি আস্তে-আস্তে বলি, "কেউ আমায় শেখাননি দিদিমণি, আমি নিজেই আঁকিবুকি করতাম প্রথমে কাঠি দিয়ে মাটির উপরে, তারপরে একসময় পেনসিল দিয়ে কাগজের উপরে। আমার আঁকাগুলো তো তাই তেমন ভাল না, আনাড়ির মতো, তাই নয়?"

স্নেহকোমল গলায় দিদিমণি বলেন, "ওরিয়ানা, তোমার আঁকাগুলো সুন্দর, কারণ সেগুলোর মধ্যে মৌলিকত্ব আছে। কিন্তু প্রথাগত আঁকায় নানা টেকনিক্যাল ব্যাপার থাকে, সেগুলো শিখতে হয় কারও কাছে। আমি যদি শেখাতে চাই, তুমি শিখবে?"

বিস্ময়ে আমার চোখ এতখানি হয়ে যায় নিশ্চয়ই, খানিকক্ষণ কথাই বলতে পারি না। দিদিমণি নিজেই আমায় আঁকা শেখাতে চান? যেখানে আমার নিজের বাড়ির কোনও লোক পর্যন্ত জানে না যে আমি আঁকাআঁকি করি?

ঐশাদিদিমণি হাসেন, বলেন, "আরে তুমি যে দেখি বাক্যহারা হয়ে গেলে? এত অবাক হওয়ার কী আছে? আমি নিজেও তেমন বেশি কিছু জানি না, তবে একসময় আমাকে একজন শিখিয়েছিলেন বলে সেইটুকু জানি, সেটুকুই তোমাকে শেখাতে চাই। তোমার যা হাত দেখলাম, তারপরে তুমি নিজেই তরতর করে এগিয়ে যাবে।"

আমি মাথা কাত করে আস্তে-আস্তে বলি, "আপনি আমায় শেখালে আমি... আমি ধন্য হব। কিন্তু আপনার হয়তো কষ্ট হবে। আর, আপনার সময় হবে কি? আর-আর...আমার বাড়ির লোকেরা এর জন্য কোনও খরচ করতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না, আমি এইসব আঁকার কথা বাড়িতে বলিও না। আপনার পারিশ্রমিক আমি কোথা থেকে দেব? থাক দিদিমণি, আপনি বললেন এতেই আমি ধন্য হলাম।"

দিদিমণি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে হাতের উপরে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন, "বোকা মেয়ে তুমি ওরিয়ানা, কেন কষ্ট হবে আমার? স্কুলের পরে এইখানে এসে তোমাকে শেখাব, বেশিক্ষণ তো না, এই ঘণ্টাখানেক। আর, পারিশ্রমিকের কথা তুমি বলতে পারলে? আমি যদি তোমার নিজের দিদি হতাম, তবে? তোমার কাছে পারিশ্রমিক চাইতাম? আমি নিজের ইচ্ছায় তোমাকে শেখাতে চাই ওরিয়ানা, তুমি একদম কোনও সঙ্কোচ কোরো না।"

দিদিমণির চোখে টলটল করছিল কী যেন, স্নেহ, ভালবাসা, করুণা নাকি অন্য কিছু? কে জানে!

পরদিন থেকেই আমাকে আঁকা শেখাতে শুরু করে দিয়েছিলেন ঐশাদিদিমণি। স্কুল ছুটির পরে আমি এসে বসে থাকতাম ওই গাছের ছায়ায়, দিদিমণি একটু পরে আসতেন। তারপরে আমাদের আঁকা পর্ব শুরু হত। চলত প্রায় ঘণ্টাখানেক বা কোনও-কোনওদিন ঘণ্টাদেড়েক কী তারও বেশি। সন্ধে নামলে দিদিমণি ঘাটের দিকে রওনা দিতেন সাইকেল চালিয়ে আর আমি বাড়ির দিকে রওনা দিতাম হেঁটে।

একটা দুটো তারা ফুটতে দেখতাম সন্ধ্যার আকাশে, তারপরে যতই অন্ধকার বেড়ে উঠত ততই আরও আরও বেশি তারা। ওই ঝকমকে তারাগুলোর দিকে তাকালে মন কী এক আশ্চর্য সুরে পরিপূর্ণ হয়ে যেত, মনে হত ওদের কাছে যাওয়ার কথা সত্যিই কি ভেবেছিল একদিন মানুষ? সেই পথে এগিয়েও গিয়েছিল খানিকটা! তারপরে সব ওলটপালট হয়ে গেল।

সেই তারারা আজও অপলক চোখ মেলে চেয়ে আছে, ওদের বুক থেকে অশ্রুত সুর ছড়িয়ে পড়ছে ডাইন বামে সামনে পিছনে উপরে নীচে, আলোর সুরে ওরা ডাকছে আমাদের, সেই পুরাকাল থেকে যেমন ডাকছে, আমরাই শুধু সব ভুলে গিয়েছি। হয়তো সবাই ভোলেনি, কেউ-কেউ বুকের ভিতরে হয়তো এখনও লালন করছে নক্ষত্রজয়ের স্বপ্ন। কিন্তু ওরা কোথায়? কিন্তু ওরা ক'জন?

{৩}

আরেনুশ! আমার বন্ধু। আরেনুশ আর আমি একসঙ্গে কাজ করি। সুবর্ণদ্বীপের মুইনুখ শহরের বাজারে আমরা নিজেদের আঁকা ছবি আর নিজেদের তৈরি মূর্তি বিক্রি করি।

ওর বাড়ি আমাদের জনপদের দক্ষিণসীমায়। ওদিকটা বাড়িঘর অল্প, পাহাড় বেশি রুক্ষ বলে চাষবাসও ওদিকে বেশি চলে না, ওদিকটা জনপদের হেমন্ত অংশ।

আরেনুশও ছবি আঁকে, তবে বেশি না, ওর আঁকা ছবি কেমন অদ্ভুত! আমার কাছে হিজিবিজি বলে মনে হয়। ও আমায় বুঝিয়েছে আগে ওসবকে বলত নাকি বিমূর্ত শিল্প। যাতে মানুষ, গাছ, বাড়ি, পশু, পাখি, ফুল, মেঘ, নদী কিছুই থাকবে না, অথচ সবই থাকবে বিমূর্ত হয়ে। দর্শককে কল্পনা করে নিতে হবে ওইসব এলোমেলো দাগ আর হিজিবিজির মধ্য থেকে। যাই বলুক, ওসব বিমূর্ত ছবি আমায় টানে না, আমি বুঝতেই পারি না।

তবে ওর আগ্রহ মূর্তি বানানোর। অসাধারণ সুন্দর সব ছোট-ছোট মাটির আর পাথরের মূর্তি বানায় ও! ক্ষুদ্র মূর্তিতে এত সূক্ষ্ম কারুকাজ কী করে করে, সে এক দারুণ ব্যাপার! মূর্তি-টুর্তি তো আর বিমূর্ত হতে পারে না, নাকি তাও পারে? আমি একদিন আরেনুশকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ও বলেছিল তাও পারে।

ওর ঘরের কোনায় এক জায়গায় কাপড়ের ঢাকা সরিয়ে দেখিয়েছিল অদ্ভুত এক পাথরখণ্ডের মধ্যে এলোমেলো গর্ত খাঁজ এসব করা, ওটা নাকি বিমূর্ত ভাস্কর্য! আমার কাছে তেমন ভাল মনে হয়নি, অথচ ফের ঢেকে দেওয়ার আগে যেন মনে হল এক মুহূর্তের জন্য আলোছায়ার খেলার মধ্যে দেখলাম পাথর থেকে দুই কিশোর-কিশোরী হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!

আরেনুশ একদিন আমায় এক পাহাড়ের গুহায় নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে গুহার দেওয়ালে অদ্ভুত সব চিত্রমালা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। ও বলেছিল এসব বহু-বহু হাজার বছর আগের ছবি, এই নতুন জনপদ হওয়ার বহু আগে এখানে মানুষেরা ছিল অন্য রকম অতিকথায় যারা আশ্চর্য সব রূপ নিয়েছে।

অদ্ভুত সেই গুহা। বিশেষ কেউ জানে না ওই গুহার কথা। আরেনুশ পথ চেনে বলে আমায় সঙ্গে নিয়ে একদিন সেখানে গিয়েছিল। ওর ঠাকুরদা নাকি ওকে ছোটবেলায় ওখানে নিয়ে যেতেন। তিনিই সব চিনিয়েছিলেন ওকে। এখন সেই ঠাকুরদা প্রয়াত।

সেই গুহায় গিয়ে আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। আরেনুশ একটা অদ্ভুত আলো নিয়েছিল সঙ্গে, সেই আলোয় আগুন লাগে না, একটা ছোট্ট বোতাম টিপলে ঝকমক করে আলো বেরিয়ে আসে কাচের ঢাকনা ঢাকা মুখটা থেকে। আরেনুশ বলেছিল ওটা নাকি সৌরশক্তি-চালিত। ওটাও ওর ঠাকুরদা ওকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

গুহাটা আশ্চর্য সব স্ফটিকের স্তূপে ভর্তি। গুহার ছাদ থেকেও ঝুলছে বিচিত্র নকশাকরা স্ফটিকের ঝালর। সবই প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া শিল্প যেন। আরেনুশের হাতের আলো পড়ে ঝকমক করে উঠছিল সবকিছু।

আমাদের আজকে মুইনুখে যাওয়া, আমি নতুন আঁকা ছবিগুলো গুছিয়ে নিয়েছি। হাঁটাপথে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগে সমুদ্রতীরে পৌঁছতে, গিরিপথের বন্ধুর যাত্রা। আমরা দু'জন বাইসাইকেল চড়ে যাই, পিছনের ক্যারিয়ারে প্যাক করা ছবি আর মূর্তির বোঝা, হাঁটার চেয়ে বাইসাইকেল একটু তাড়াতাড়িও হয়। সমুদ্রতীরে ঘাট, সাইকেল রাখার জায়গা আছে, আমাদের মাসকাবারি ব্যবস্থা করা আছে, প্রায়ই যেতে হয় কিনা ছবি আর মূর্তি নিয়ে, তাই। ঘাট থেকে ফেরিযান ছাড়ে প্রত্যেক ঘণ্টায়।

ফেরিযানগুলো কাছাকাছি দ্বীপগুলোয় যায়, সব দ্বীপই আসলে ডুবে যাওয়া মহাদেশের উচ্চতম অংশগুলো। আমাদের সব মহাসড়ক এখন মহাসমুদ্রে। যেহেতু আমরা এই অবস্থা ঘটার অনেক পরে জন্মেছি, আমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হয় না, শুধু একজন-দু'জন খুব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এখনও তাদের দাদু-ঠাকুরমাদের কাছে শোনা গল্পের কথা বলেন, কী বিরাট মহাদেশ ছিল, মাইলের পর-মাইল গাড়ি চালাতে-চালাতে, দিনের পর-দিন গাড়ি চালাতে-চালাতেও যার কিনা কূলকিনারা মিলত না!

কী জানি কেমন ছিল! কী হবে সেসব ভেবে? মানুষ বর্তমানে বাঁচে, অন্তত তাই আমি জানতাম, কিন্তু একদিন আরেনুশের সঙ্গে ওই একটেরে গুহায় গিয়ে দীর্ঘ আধো-আলো আধো-অন্ধকার সুড়ঙ্গের দুই দেওয়ালে আঁকা অসংখ্য ছবি আর খোদাই দেখে আমার ধারণাটা কেমন টাল খেয়ে গেছে।

কারা ওরা, কত হাজার বছর আগে ওখানে এঁকেছে ওইসব চিত্রমালা? কেমন ছিল ওদের মুখচোখ চেহারা? কেমন ছিল ওদের কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা, ভালবাসা, ঘৃণা, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গ?

কোনও-কোনও ছবিমালা যেন গল্পের মতো লেগেছিল, অথচ ঠিকমতো তাও নয় যেন! কিছু-কিছু অদ্ভুত-অদ্ভুত চিহ্নও ছিল কোথাও-কোথাও, ওগুলো কি ওদের অক্ষর? ওদের শব্দ? কিছুতেই কি বোঝা যাবে না কোনওদিন?

আমি আরেনুশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওই গুহা আর ছবির কথা আর কেউ জানে কিনা। ও বলেছিল হয়তো কেউ-কেউ জানে, কিন্তু গুরুত্ব দেয় না, কী হবে গুরুত্ব দিয়ে? এখনকার জীবনযাত্রায় ওসব মূল্যহীন, কার এত সময় আছে পাহাড়ের গুহায় পাওয়া কতগুলো অদ্ভুত ছবির পুরাতত্ত্ব নিয়ে ভাববে? এগুলোকে টুরিস্টদের আকর্ষণও করা সম্ভব নয়। এখন সম্ভালার সংস্কৃতি দুনিয়াকে আচ্ছন্ন করেছে, সেই কালচারে সব কিছুই অন্য রকম।

কথা বলতে-বলতে এগোতে-এগোতে বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ পেতে থাকি, কাছিয়ে আসছি। আর-একটা বাঁক ঘুরলেই, আহ! এতকাল ধরে এ পথে আসতে-যেতে আসতে-যেতে সব চেনা হয়ে গেছে। তবু এই বাঁকটার ম্যাজিক কোনওদিন আমি ঠিক করে বুঝতে পারি না, এখানে এসে সমুদ্র দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই এক নামহীন আনন্দে ভিতর-বাহির পরিপ্লুত হয়ে যায়! আরেনুশকে জিজ্ঞেস করতে হবে একদিন, ওরও এমনই হয়, নাকি এ আমারই শুধু হয়।

নেমে পড়ে সাইকেল রাখার জায়গার দিকে চলতে থাকি, আজকে খুব পরিষ্কার দিন, জ্বলজ্বল করছে জল, টলটল করছে নীল আকাশ, সূর্য আকাশ থেকে তীব্রোজ্জ্বল চোখ মেলে দেখছে পৃথিবীকে। বাইসাইকেল জমা দেওয়ার পরে ছবি আর মূর্তির বোঝা ভাগাভাগি করে নিয়ে ফেরিঘাটের দিকে এগোই, টিকিট কেটে চড়ে বসি ফেরিতে। বেশিক্ষণ লাগে না এখান থেকে মুইনুখ, আধাঘণ্টা মতো।

আরেনুশের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় অনেক বছর আগে, তখন আমি স্কুলে পড়ি। ঐশাদিদিমণির কাছে আঁকা শিখতে শুরু করার মাসছয়েক পরের কথা। তখন আমার এমন বেশ কিছু ছবি আঁকা হয়েছে যা দিদিমণির খুব পছন্দ। বেশির ভাগই প্রাকৃতিক দৃশ্য; সমুদ্রতীর, সবুজ গাছপালা, ঝরনা, সরোবর, সূর্যাস্তের আকাশ-এইসব। একটা ছিল বেশ অন্য রকম, একটা রঙিন পাখি আর তার ছোট্ট ছানা। মা পাখিটা ছানা-পাখিকে খাওয়াচ্ছে। এটা দিদিমণির এত পছন্দ হল যে দিদিমণি নিজের কাছে রেখে দিলেন। সেই সময়েই একদিন উনি খবর নিয়ে এলেন সুবর্ণদ্বীপের মুইনুখ শহরে একটা ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হতে চলেছে, স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাদের বয়স বারো থেকে আঠারোর মধ্যে, তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে।

সেই প্রথম আমার সুবর্ণদ্বীপে আসা। সঙ্গে ছিলেন ঐশাদিদিমণি আর স্কুলের আরও কয়েকজন বন্ধু। ওরাও ওই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিল।

সুবর্ণদ্বীপের মুইনুখ শহরের ফেরিঘাটে নেমে প্রথমেই চমকে গিয়েছিলাম মানুষের ভিড় আর ব্যস্ততা দেখে। কত রকমের লোক, কত রকমের চেহারা আর পোশাক-আশাক তাদের, কী বিচিত্র ধরনের কেশসজ্জা আর অলংকার! আর কত বিচিত্র আওয়াজ চারিপাশে। মানুষের গলার আওয়াজ, যন্ত্রপাতির ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ, গাড়ির হর্নের আওয়াজ, সমস্ত শব্দরাশি মিলেমিশে যেন এক অবিচ্ছিন্ন শব্দজাল তৈরি করে রেখেছিল।

নিরিবিলি পাহাড়ি জনপদ আনুমা থেকে এসে প্রথম ওই নাগরিক কলরোল আর বৈচিত্র ও ব্যস্ততা দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম সেদিন। আমাদের ভয়-ভয় মুখগুলো দেখে ঐশাদিদিমণি হেসে বলেছিলেন, "আরে তোরা দেখি একেবারে ভয়ে মুখ শুকিয়ে ফেললি! ভয়ের কী আছে? দেখবি খুব মজার জায়গা এটা। এখন তো যাব আঁকার কম্পিটিশনের ওখানে, প্রতিযোগিতা হয়ে যাওয়ার পরে বেশ কিছুক্ষণ ব্রেক থাকবে, বিকেলে প্রতিযোগিতার ফলাফল দেখাবে। ওই ব্রেক টাইমে আমরা শহরে বেড়াব, মুইনুখের বড় ময়দানের এক জায়গায় সারা বছর মেলা চলে, সেই মেলা দেখব সবাই। চল, চল চল, এখন শিগগির চল।"

দিদিমণি আনন্দে ঝলমল করছিলেন।

আমরা যখন আঁকা প্রতিযোগিতার বড় সভাভবনে গিয়ে হাজির হলাম তখন সকালবেলা, এই সাড়ে নয় কী দশটা বাজে। ভারি সুন্দর সাদা রঙের দোতলা বাড়ি, চারপাশ ঘিরে সবুজ বাগান। এখনও মনে আছে সেদিন আবহাওয়া ছিল ভারী চমৎকার, একেবারে ঝকঝকে নীল আকাশ, সোনালি রোদ্দুর, মৃদু স্নিগ্ধ হাওয়া বইছিল। প্রতিযোগিতা শুরু হতে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরি ছিল, আমরা বাগানের গাছের ছায়ায় পাথরের বেদিতে বসেছিলাম। বাগানে সেই অপেক্ষা করার সময়েই প্রথম দেখি আরেনুশকে। ওদের স্কুলের দলটাও আগে-আগে পৌঁছে গিয়েছিল, তাই ওরাও বাগানে গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করছিল।

ওদের দলে বেশ কয়েকজন ছাত্র ছিল, আর ছিলেন কয়েকজন প্রৌঢ় শিক্ষক যাঁরা ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন দায়িত্ব নিয়ে। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাছের নীচে পাতার ছায়াজাল আঁকা রোদ্দুরে বসে কথাবার্তা বলাবলি করছিল।

তাদের মধ্যে থেকে আরেনুশকে আলাদা করে চোখ টানল আমার, ওকে খুব মিতভাষী আর স্বপ্নমগ্ন মনে হচ্ছিল। ওর সঙ্গীসাথিরা কলকল করে নিজেদের মধ্যে কত কথা বলছিল, আরেনুশ এক পাশে বসে চুপ করে দূর আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। ওর চোখেমুখে গাছের পাতার ছায়া আর সূর্যের আলো খেলছিল। অমন এক অমল কিশোরমুখ আমি আগেও কখনও দেখিনি, পরেও না। পরে আরেনুশ আমাকে বলেছে সেও আমাকে তখনই প্রথম দেখেছিল, আমার দলের মধ্য থেকে আমাকে আলাদা করে লক্ষ করেছিল।

তখনও কেউ কারও নাম জানি না, পরিচয় জানি না, কিছুই জানি না, অথচ কী এক রহস্যময় বন্ধনে যেন যুক্ত হয়ে গিয়েছিল আমাদের ভিতরমন। লোকজন কাজকর্ম ঘটনা অঘটন সমৃদ্ধ আমাদের চারপাশ থেকে যেন কে আমাদের তুলে নিয়েছিল অন্য এক সমতলে, যেখানে আর কেউ ছিল না আমরা দু'জন ছাড়া।

বাগানে বেশিক্ষণ থাকতে হয়নি আমাদের, কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্যোক্তাদের একজন এসে ঘোষণা করলেন আঁকা প্রতিযোগিতা শুরু হবে কয়েক মিনিট পরেই, প্রতিযোগীরা যেন নিজের-নিজের প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র নিয়ে কাউন্টারে গিয়ে ব্যাজ সংগ্রহ করে। তারপরে সবাইকে ঠিকঠাক মতো ভিতরে নিয়ে গিয়ে উদ্যোক্তারাই বসাবেন ও রং-তুলি-কাগজ ইত্যাদি সরঞ্জাম সরবরাহ করবেন। আঁকার বিষয়বস্তু বলে দেওয়া হবে আঁকার প্রতিযোগিতা শুরুর মুহূর্তে। একঘণ্টা সময় থাকবে।

দুরুদুরু বুকে পরিচয়পত্র নিয়ে এগোতে থাকি। ফিরে একবার দেখি ঐশাদিদিমণিকে, দিদিমণি হেসে হাত উঁচু করলেন, একটা ভারী উৎসাহময় অভয়দাত্রী ভঙ্গি ছিল সেই হাতের মুদ্রায়। সেই দেখে কেন জানি হঠাৎ বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল আমার, সে কী সুখে না বিষাদে? প্রকাশ না করতে পারা একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি আমার চোখে জল এনে দিল, সন্তর্পণে মুছে ফেললাম চোখ। কেন কাছের মানুষ এত দূরে থাকে, এত পর হয়? আপনজনেরা কেন কাছের হয় না? এইসব নানা জটিল প্রশ্ন মাথায় আসে কুয়াশার মতো, মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়িয়ে দিতে থাকি ওদের। এখন এসবের সময় নয়, এখন সামনে সিরিয়াস ব্যাপার।

ভাবতে-ভাবতেই দেখি কাউন্টারে চলে এসেছি, সেখানে হাসিমুখ এক প্রৌঢ় বসে আছেন। আমার পরিচয়পত্রটি এগিয়ে দিই, উনি মিলিয়ে দেখে ওটা ফেরত দেন আর সঙ্গে দেন একটা গোল সাদা ব্যাজ, তার উপরে ৩৭ সংখ্যাটা লেখা ঘন নীল রং দিয়ে। ব্যাজ নিয়ে কোথায় যাব এদিক-ওদিক দেখছি, ঝলমলে সবুজ পোশাক পরা একজন তরুণী মহিলা এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন একটা বিশাল ঘরে। সেখানে ঘরের মেঝেজুড়ে শতরঞ্চি পাতা, সারে-সারে ছেলেমেয়েরা বসে আছে, সবার সামনে কাঠের বোর্ড, তার উপরে আঁকার কাগজ, একপাশে রং-তুলি-প্যালেট ইত্যাদি। এলাহি কারবার। আমি তো একেবারে হতবাক।

উনি আমাকে ৩৭ নম্বর জায়গায় বসিয়ে বললেন, "এখন চুপ করে বসে থাকো, ওই সামনের মঞ্চে উঠে প্রতিযোগিতার পরিচালক ও বিচারক প্রথমে একটা ছোট্ট বক্তৃতা দেবেন। তারপরে উনি বলবেন আঁকার বিষয়। মানে কী বিষয়ে আঁকতে হবে, সেটা বলে দেবেন। তারপরে ঘণ্টা বাজলে সবাই আঁকতে শুরু করবে। ঠিক আছে?"

আমি মাথা হেলিয়ে জানালাম ঠিক আছে। উনি মৃদু হেসে চলে গেলেন পরের জনকে পথ দেখিয়ে আনতে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব প্রতিযোগী জায়গামতো বসে পড়ার পরে পরিচালক মহাশয় সামনের মঞ্চে উঠলেন, দীর্ঘদেহী, ছিপছিপে নরম মুখচোখের যুবক একজন, আলগা লম্বা সাদা পোশাক, কাঁধে একটা সবুজ উত্তরীয়। মাথাভর্তি কালো চুল, চুলগুলো এলোমেলো। দেখেই মনটা ভাল হয়ে গেল, কেন জানি পরিচালক বলতেই মনে করেছিলাম রাগী চেহারার প্রৌঢ় কেউ হবেন। তার জায়গায় এই যুবককে দেখে মনটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

উনি ছোট্ট একটা বক্তব্য রাখলেন, বেশ মজার-মজার কথা ছিল,

AMARBOI.COM

হেসে ফেললাম আমরা প্রায় সবাই। তারপর উনি বললেন, "একটুও টেনশন না করে আঁকো তোমরা, যার যা খুশি আঁকো, কোনও বিষয়বস্তুতে তোমাদের বেঁধে দিতে চাই না। পাহাড়, সমুদ্র, গাছপালা, ফুল, লতাপাতা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, মানুষজন, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট যা তোমাদের ইচ্ছে আঁকো। মনটাকে ছেড়ে দাও, কল্পনায় যা দেখতে পাও তাই আঁকো। একঘণ্টা সময়। ঠিক আছে? আমিও ততক্ষণ ওই কোণে বসে আমার স্কেচখাতায় কিছু স্কেচ করে ফেলি। তোমরা শুরু করে দাও। কোনও অসুবিধা হলেই উঠে দাঁড়িয়ে জানাবে।"

এই বলে মৃদু হেসে সবাইকে অভয় দিয়ে উনি চলে গেলেন মঞ্চের একপাশে যে চেয়ারগুলো ছিল সেইদিকে, একটা চেয়ারে বসে নিজের স্কেচখাতা আর পেনসিল বের করলেন।

আমি ততক্ষণে আমার সামনে রাখা আঁকার কাগজটার দিকে দৃষ্টি দিয়েছি। হাতে নিয়েছি পেনসিল। আকাশপাতাল ভাবতে লেগেছি কী আঁকা যায়? বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমছে কপালে, গলা শুকিয়ে আসছে ভয়ে, মনে হচ্ছে কিছুই পারব না আঁকতে, সাদা কাগজ সাদাই রয়ে যাবে।

চোখ বুজে ফেললাম, ভাবতে চেষ্টা করলাম নিজের আঁকার খাতাটার কথা। সেখানে কোনটা সবচেয়ে ভাল হয়েছিল? সেই ছবিটা এঁকে দেব? কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না, সব জট পাকিয়ে গিয়েছে। কুলকুল করে ঘামছি। ওহ, এ কী হল শেষে আমার? হঠাৎ কোথা থেকে এক আশ্চর্য হাওয়া এসে আমাকে ছুঁয়ে গেল, অদ্ভুত সুখের শিহরনে কাঁপিয়ে দিল আমার ভিতর ও বাহির। মনে পড়ল গাছের পাতার ছায়াজাল আঁকা সকালের সোনালি রোদ্দুর আর সেই আলোছায়ায় এক স্বপ্নময় চোখের কিশোর দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ তুলে, যাকে এইমাত্র কিছুক্ষণ আগে প্রথম দেখেছি কিন্তু তাকে যেন বহু-বহু হাজার বছর ধরে চিনি।

চোখ খুললাম আর সেই স্বপ্ন দেখা চোখ দু'টি দেখতে পেলাম আমার আঁকার পাতাটার উপরে। ব্যস, সব ভয়, সব টেনশন কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেল। আমার পেনসিল দাগ দিয়ে-দিয়ে যেতে লাগল আর ছবিটা কাগজে ফুটে উঠতে শুরু করল। গোটা ছবিটাই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম মনের চোখে, শুধু চর্মচক্ষে তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য পেনসিলের দাগ, তারপর তুলি দিয়ে রং। এক ঘণ্টা শেষ হওয়ার বেশ কিছু আগেই আমার ছবি সমাপ্ত হয়ে গেল। ছবির কোনায় দেখলাম আমার নথিভুক্তি নম্বরটি আগে থেকেই প্রিন্ট করা। নিজের নাম, পরিচয় ইত্যাদি কিছু লিখতে বারণ করা ছিল, কারণ ছবিগুলো বিচার হবে শিল্পীর নাম ছাড়া। ছবি জমা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। বিকেলে ফলাফল জানা যাবে। আমার স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েরাও একে-একে বেরিয়ে এল। ঐশাদিদিমণি খুব খুশি আমরা ঠিকমতো আঁকা শেষ করে জমা দিতে পেরেছি বলে। বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে। ঐশাদিদিমণি আমাদের নিয়ে গেলেন মেলার মাঠে। বিশাল মাঠে কত রকম কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। বিশাল এক নাগরদোলা ঘুরছে এক জায়গায়, এক জায়গায় লক্ষ্যভেদের খেলা হচ্ছে, এক জায়গায় গোলকধাঁধার খেলা, এক জায়গায় ম্যাজিক দেখাচ্ছেন এক জাদুকর। আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের অভিজ্ঞতায় ওইসব জিনিসই তখন নতুন।

মেলার মাঠে অজস্র মুখরোচক খাবারের দোকান, নানা রকম মিষ্টি আর ঝাল খাবার। ঠান্ডা, মিষ্টি পানীয়ও আছে। কাছেই সাজের জিনিসের দোকানও অনেক, রঙিন পুঁতির মালা, চুড়ি, ব্রেসলেট, কানের দুল, টিপ, ক্লিপ, কী নেই? আমাদের মনে হল যেন রূপকথার সেই রাজবাড়িতে এসে পড়েছি যেখানে গয়নাপাতি আর খাবার-দাবার এত যে মেপে কূল পাওয়া যায় না।

দিদিমণি আমাদের নিয়ে নাগরদোলা চড়লেন, মিষ্টি আর ঝাল ঝাল টক টক মুখরোচক খাবার খাওয়ালেন, নিজেও খেলেন। খুবই আনন্দ করলাম আমরা সবাই। এমন দিন আমাদের জীবনে ক'টাই বা এসেছে তার আগে?

মেলার মাঠে ঘোরার সময় আবার আরেনুশদের দলটার সঙ্গে দেখা, ওরাও ঘুরতে এসেছে মেলায়। ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখাচোখি হল, অল্প হাসলাম আমরা, পরিচিতের হাসি। তারপরেই ও দৌড়ে চলে গেল নাগরদোলার দিকে, ওর সঙ্গীসাথিরা যে সেদিকে গিয়েছে! সেইসময় দেখলাম ওর স্বপ্নমগ্ন চোখ দুটো তখন ঝিকমিক করছে আনন্দে।

বিকেলে ফিরে এলাম সবাই সেই সভাভবনে যেখানে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়েছিল। দুরুদুরু বুকে মাঝের ঘরে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সেই বিচারক মহাশয় প্রথমে উঠে বললেন অনেক ছবি তিনি বেছেছেন, ছবিগুলো খুবই ভাল লেগেছে তার, নির্বাচিত বেশ কিছু ছবি দিয়ে একটি সংগ্রহ বানানো হবে। আর প্রতিযোগিতায় যুগ্মবিজয়ী যে দু'টি ছবি, সে দু'টি দিয়ে সংগ্রহের প্রচ্ছদ ও শেষের পাতাটি করা হবে। শুনে তো আমরা অবাক, খুশি! এরকম হবে যে সেই বিষয়ে কোনও ধারণাই ছিল না আমাদের। আজকে এতদিন পরেও মুইনুখে এসে যখনই সেই সভাভবনের পাশ দিয়ে যাই আমাদের দোকানের দিকে, তখনই সেই প্রথমদিনের কথা মনে পড়ে। এখন সেখান দিয়েই যাচ্ছি আমরা। আরেনুশ আমাকে আপনমনে হাসতে দেখে জানতে চায়, "কী হল, হাসছ

কেন ওরিয়ানা?"
আমি হাসিমুখ ওর দিকে ফিরিয়ে বলি, "মনে আছে এই মুইনুখের ওই সভাভবনের বাগানে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল? কত বছর আগের কথা। অথচ আমার মনে হয় এই যেন সেদিন।"
আরেনুশ মৃদু হাসল, মাথা হেলিয়ে জানাল মনে আছে। ভেবেছিলাম কিছুই বুঝি বলবে না, ও কথা এত কম বলে! কিন্তু একটু পরেই আবারও হেসে ফেলে বলল, "ওরিয়ানা, সেই আঁকা প্রতিযোগিতা, যেখানে আমাদের প্রথম দেখা, সেইটাতে তোমার আর আমার আঁকা ছবি যুগ্মবিজয়ী হয়েছিল, মনে আছে? উফফ, তোমাদের শিক্ষিকা যিনি তোমাদের সঙ্গে ছিলেন, কী খুশিতে উনি লাফাচ্ছিলেন তোমাদের সঙ্গে, তোমরাও লাফাচ্ছিলে।"
আমি হেসে উঠে, বলি, "তোমাদের মাস্টারমশাই সমেত সবক'টা ছেলে তো পাগলের মতো নাচছিলে ফলাফল ঘোষণার পর। আর আনন্দের কী প্রচণ্ড চিৎকার, বাপরে!"
আরেনুশ কেমন একটা অদ্ভুত গলায় বলল, "সত্যি, কী ছেলেমানুষ ছিলাম তখন। আমার ঠাকুরদা আর ঠাকুরমা দু'জনেই তখনও বেঁচে। পুরস্কারের মেডেলটা আর সার্টিফিকেটটা যখন তাঁদের কাছে নিয়ে দিলাম.." এই বলেই থেমে যায় আরেনুশ, মুখ অন্য দিকে ঘোরায়। ও খুব চাপা, কারও সামনে আবেগ প্রকাশ করতে চায় না, এমনকী আমার সামনেও আবেগ লুকোতে চেষ্টা করে। এখনও ওর চোখের জল আমায় দেখতে দিল না।
ততক্ষণে আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছি। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বিচিত্র জিনিসপত্রের দোকান, সেই দোকানেরই সামনের দিকে একপাশে একটু জায়গায় আমাদের ছবি আর মূর্তি সাজিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছেন সপ্তাহে দুইদিন। ভদ্রলোক আরেনুশের ঠাকুরদার পরিচিত ছিলেন, সেই সুবাদেই এই অনুমতি। আমরা সামান্য ভাড়া দিই ওঁকে, যদিও উনি নিতে চান না, আমরাই একটু জোরজার করি। বিনা দামে কারও কাছ থেকে কোনও সুবিধা নিতে আমাদের ভারী সংকোচ লাগে, হাজার হোক আমরা প্রাপ্তবয়স্ক, স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে স্বাধীন জীবিকা হিসাবে ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়া বেছে নিয়েছি।
ভদ্রলোকের আসল নাম আমরা জানি না, আরেনুশ অগিনদাদু বলে ডাকে, আমিও দেখাদেখি সেই নামেই ডাকি। উনিও এই নামেই খুশি হন। দোকানে অগিনদাদু নিজেই ছিলেন, আমাদের দেখেই সানন্দে অভ্যর্থনা করলেন যেমন প্রত্যেকবারই করেন, "আরে-আরে দাদুভাই আর দিদিভাই যে, আয়-আয়।"
তারপরে একটু হেসে বললেন, "তোরা পসরা না সাজালে আমার দোকানের রূপই খোলে না। তা আজ বেশ সকাল-সকাল এসেছিস তোরা দু'টিতে। হ্যাঁরে, না খেয়েদেয়ে দৌড়ে এসেছিস নাকি? দাঁড়া, কিছু মিষ্টি আর চা আনাই।"
আমরা না-না করে উঠি, বলি খেয়ে এসেছি, কিন্তু উনি শোনেন না। দোকানের ছোকরা কর্মচারীকে তাড়াতাড়ি চা আর খাবার আনতে পাঠান। দোকানে আমাদের পসরা সাজাতে-সাজাতেই জলখাবার আর গরম পানীয় এসে যায়।
এই পানীয় আমার খুব প্রিয়, সামান্য টক টক, সামান্য ঝাল ঝাল, একটু ঝাঁঝ ঝাঁঝ, সব মিলিয়ে দারুণ সুন্দর স্বাদ। মুইনুখের বাজারেই এই জিনিস মেলে। আমাদের পাহাড়ি জনপদ আনুমায় এই জিনিস পাওয়া যায় না। অগিনদাদু জানেন, উনি আগে আনুমাতেই থাকতেন কিনা! সেইজন্যেই মনে হয় উনি প্রায়ই আমাদের এই পানীয় খাওয়ান জলখাবারের সঙ্গে?
সত্যিই সকালে উঠে দ্রুত তৈরি হয়ে বেরতে গিয়ে প্রাতরাশ হয়নি আমাদের, তাই খিদের মুখে ওই খাবার আর পানীয় অমৃতের মতো লাগে। কিন্তু এইভাবে খেতে আমাদের দু'জনেরই বেশ লজ্জা করে। কিন্তু দাম দিতে যাওয়া আরও লজ্জার, অগিনদাদু মনে খুব ব্যথা পান। একবার দাম দিতে যাওয়া নিয়ে খুবই মান অভিমান হয়ে যাওয়ার পরে ওই ভুল আর করি না আমরা।

অগিনদাদুকে দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। একমাথা দীর্ঘ সাদা চুল আর বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়া লম্বা সাদা দাড়ির সদা হাস্যময় মানুষটি যেন রূপকথা থেকে নেমেছেন। বাজার থেকে একটু দূরেই অগিনদাদুর ছোট্ট বাড়ি, সেখানে উনি আর ওঁর স্ত্রী থাকেন। ওঁদের ছেলেমেয়ে পাঁচজন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেই সকলে ছড়িয়ে পড়েছে কাছে-দূরের নানা দ্বীপে-দ্বীপে, নিজের-নিজের কাজে। সকলেই এখন বিয়েথা করে সংসারী, মাঝে-মাঝে মা-বাবাকে দেখতে আসে। অগিনদাদুর বা তাঁর স্ত্রীর এই নিয়ে কোনও দুঃখ নেই, দাদু তাঁর দোকান আর দিদা তাঁর সংসারের কাজকর্ম আর ছোট্ট তরকারি-বাগানের পরিচর্যা নিয়ে সদাই মগ্ন থাকেন।

বেশ কয়েকবার আমাদের দু'জনকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁর বাড়িতে। বেশি দূরে না ওঁর বাড়ি, মুইনুখের বাজার থেকে মিনিটতিরিশ টুমটুম চড়ে গেলে। টুমটুম হল একরকম ছোট যাত্রিবাহী শকট, চার-পাঁচজন বসতে পারে। দু'জন চালক দু'পাশে বসে এক রকম বিশেষ ধরনের পুলি লাগানো জটিল হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে চালিয়ে নেয়। আমাদের আনুমায় নেই এরকম যান, শহরের যান। মোটামুটি রকম মসৃণ সমতল রাস্তা ছাড়া এই যান চলে না। আমাদের পাহাড়ি জনপদে চড়াই-উতরাইয়ে এ জিনিস চালানো খুব কঠিন।
অগিনদাদুর বাড়ির কথা মনে পড়লেও মন ভাল হয়ে যায়। কেমন ছিমছাম ছোট্ট বাড়ি, চারপাশ ঘিরে কত যত্নের বাগান, সামনের দিকে ফুলগাছই বেশি, পিছনের দিকে তরিতরকারি আর ফলের গাছ। ওই বাগান দিদার প্রাণের জিনিস। অগিনদাদু ঠাট্টা করে বলেন বাগানটি তাঁর গিন্নির প্রেমিক। আর হবেই বা না কেন, সে যে চিরযৌবন!
বাড়ি বাগান সবসুদ্ধ ঘিরে ঘন সবুজ বেড়ালতার বেড়া। প্রায় দেড় মানুষ উঁচু। সামনের দিকে একটু খোলা, সেখানে বাঁশের গেট। একদিন আমরা বিকেলবেলা গিয়েছিলাম দাদুর সঙ্গে, দিদা বাগানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বাইরের বাঁশের গেট খুলে ঢুকেই অগিনদাদু খুব ঠাট্টা করছিলেন, "কী গো গিন্নি, প্রেমিকটিকে ছেড়ে এইবারে এই বুড়ো স্বামীটার দিকে একবারটি এসো। দেখো কাদের এনেছি আজ। দাদুভাই-দিদিভাইকে ধরে নিয়ে এসেছি গো আজ।"

মায়ের উল্লেখ শুনেই আমার চলা থেমে গিয়েছিল, হঠাৎ মনে পড়েছিল ওই ছবিঘর আসলে ছিল মায়ের নিজস্ব একটা ঘর।

অগিনদাদুর মুখে হাসি ঝলমল করছিল, আমাদের দেখে দিদাও মাটিমাখা হাত নিয়েই ছুটে এলেন হাসিমুখে। আমার কেন জানি চোখে জল আসছিল, আমাদের জন্যও যে পৃথিবীর কোনওখানে এতখানি আন্তরিক আপ্যায়ন অপেক্ষা করে থাকতে পারে এ আমরা ভাবতেও পারিনি।
দাদু আমাদের ঘরে নিয়ে বসালেন, দিদা তাড়াতাড়ি হাতের মাটি ধুয়ে এলেন, বাগানে কাজের পোশাক বদলে অন্য পোশাক পরে এলেন। তারপরে মুখরোচক খাবার-দাবার কতরকম গল্প, সময়ের হুঁশ ছিল না। যখন আমাদের হুঁশ ফিরল তখন সন্ধে গড়িয়ে গিয়েছে।
সেদিন বেশ রাত হয়েছিল বাড়ি ফিরতে আমাদের। আমার বাড়ির লোকেরা প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, শুধু জেগে বসেছিল ধারাল জিভের দিদি মিরি। ফিরতেই খর গলায় শোনাল, "রাজকার্য সামলে এতক্ষণে রানিজি ফিরলেন। এত দেরি হল কেন?"
ততদিনে আর মিরিকে আমার বিরক্তও লাগত না, কেমন দুঃখ হত। নিজের ভাইবোনদের মধ্যে মির্তাক, মেহুথ, মিস্তা কেউ আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাত না। ততদিনে মিতার্ক বিয়ে করে বউ নিয়ে নিজের আলাদা ঘর বানিয়েছে উঠোনের উত্তর দিকটায়, সেখানে থাকে।
মেহুথ আর মিস্তা নিজেদের জীবন নিয়ে মশগুল, নিজেদের কাজকর্ম, বিনোদন, প্রেম ভালবাসা এইসব নিয়ে ব্যস্ত। কিছুদিনের মধ্যেই ওরাও হয়তো নিজের-নিজের সঙ্গী বেছে নিয়ে বিয়ে করে অন্যত্র উঠে যাবে বা এইখানেই কোনও খালি ঘর বেছে নিয়ে মনের মতো সাজিয়ে সংসার পাতবে।
শুধু এই মিরি আমার উপরে দিদিগিরি করতে-করতেই জীবন পার করে দিল। বিয়ে হয়েছিল ওর, কিন্তু বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে বাড়ি এসে পড়ল। একটুও নাকি বনছিল না।
মিরির তিরস্কারের উত্তরে উদাসীন হয়ে বললাম, "কাজ ছিল, দেরি হয়ে গেল। তুমি জেগে বসে আছ কেন? খেয়েছ, নাকি আমার জন্য বসে আছ? আমি কিন্তু খাব না, খেয়ে এসেছি। এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ব।"
এই শুনে মিরি গেল রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে, যা নয় তাই বলে গালগাল দিল আমায়। আমি নির্বিকারে জল খেয়ে শুতে চলে যাচ্ছিলাম ছবিঘরে, ভাবছিলাম ওই আনন্দের বিকেল আর সন্ধেটুকুর জন্য ওই দাম দেওয়াই যায়।
ছবিঘরে প্রায় যখন পৌঁছে গিয়েছি, মিরি গালাগাল দিতে-দিতে কান্নায় ভেঙে পড়ল, বলল, "আজ মা বেঁচে থাকলে পারতিস এরকম অনিয়ম করতে, এই উচ্ছৃঙ্খল হতে?"
তারপরে বিনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লাগল, "আমি এত রাত জেগে খাবার নিয়ে বসে আছি একসঙ্গে খাব বলে। আর উনি গ্রাহ্যই করলেন না, নাকি খেয়ে এসেছেন।"
মায়ের উল্লেখ শুনেই আমার চলা থেমে গিয়েছিল, হঠাৎ মনে পড়েছিল ওই ছবিঘর আসলে ছিল মায়ের নিজস্ব একটা ঘর। মায়ের নানা হাতের কাজ, কাপড়ের কাঠের বাঁশের মাটির নানা শিল্পদ্রব্যে ভর্তি, আজও সেসব আছে একপাশে রাখা বড়-বড় কাঠের বাক্সে। বারো বছর আগে মা যখন মারা যান ওই ঘর আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আমার নিজের বয়সও ছিল বারো।
মনটা কেমন ছলছল করে উঠেছিল, মনে হয়েছিল মিরি আসলে হয়তো জানে না কেমন করে ভালবাসতে হয়। তাই প্রকাশ করে কেবল জ্বালাধরা আগুনে-রাগ। কিন্তু আসলে হয়তো চায় ভালবাসতে।
ফিরে মিরির কাছে এসে নরম গলায় বলেছিলাম, "চলো দিদি, খাব। কেন রেগে যাও এরকম করে? কেনই বা এরকম করে না খেয়ে বসে আছ তুমি?"
মিরি চোখের জল মুছে খাওয়াতে নিয়ে গেল আমায়, বলল, "তবে যে বললি খেয়ে এসেছিস?"
আমি হেসে বলেছিলাম, "খেয়েছি সন্ধেবেলা, এখন আবার খিদে-খিদে পাচ্ছে। চলো। কী আছে আজকে? মাছের চপ? নাকি লঙ্কা চিংড়ি? নাকি কাঁকড়ার ঝোল?"
মিরি হাসছিল, ওর মনের মেঘ কেটে যাচ্ছিল।
আজ দোকানে আমার ছবিগুলো আর আরেনুশের মূর্তিগুলো সাজাতে-সাজাতে হঠাৎ সেইসব দিন মনে পড়ল। কেন যেন মনটা ছলছল করে উঠল। মিরির জন্য? নাকি অন্য কোনও কারণে?
"ওহ, দ্যাখো অরিন, কী অসাধারণ ছবিটা! রংগুলো যেন কল্পলোকের ওড়নার মতো! আর এই গাছগুলো দ্যাখো, ওই নদীটা, ওই নৌকো-সবটা যেন ম্যাজিকদেশের।"
অবাক-খুশিতে ভরা এই গলা শুনে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসি। দোকানে এসে উঠেছেন দু'জন খদ্দের, একজন যুবতী মহিলা আর একজন যুবক। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন যুবতী, পাশে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে চেয়ে আছেন যুবক, যার নাম অরিন।
মহিলার রূপ দেখে আমার দম আটকে আসে, অপূর্ব সুন্দরী। দীঘল

মেদহীন চেহারা, মাখনের মতো রং, গালে গোলাপি আভা, মাথার চুল যেন সোনালি জরি, মুখচোখ একেবারে ছেনিকাটা। মনে হয় মহিলা বেশ ধনীও, দামি-দামি গয়না পরা কানে, গলায়, হাতে। পোশাকও বেশ মহার্ঘ। তার পাশে যুবক নিতান্ত সাদামাটা, একহারা লম্বা চেহারা। এর পোশাকও সাদামাটা।

ছবিটা কিনতে চান ওরা, দরাদরির সময় আমার পাশে আরেনুশও থাকে। কিন্তু সেভাবে দরাদরি আমরা পারি না, খদ্দের মোটামুটি একটা যুক্তিগ্রাহ্য দাম দিতে চাইলেই ছবি বিক্রি করি। তাড়াতাড়িই রফা হয়ে যায়, আরেনুশ ছবিটা প্যাক করে দিতে থাকে।

মহিলা আমার দিকে চেয়ে বলেন, "এই ছবি তোমার আঁকা?"

আমি স্মিতমুখে মাথা হেলাই শুধু, এত রূপ আর এত ঐশ্বর্যের সামনে পড়লে কেমন যেন কথা হারিয়ে যায় আমার, অচেনা একটা অস্বস্তি হতে থাকে।

আমার নীরব হ্যাঁ-সূচক উত্তর শুনে উনি হাসেন, তারপরে একটু তীক্ষ্ণচোখে আমাকে পর্যবেক্ষণ করেন। কী যেন মনে করার চেষ্টা করেন, তারপরে আপনমনেই বলেন, "তোমায় আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কোথায় বলো তো?"

আমিও ভাল করে তাকাই ওঁর দিকে, না আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এমন চেহারা একবার দেখলে আর নিশ্চয়ই ভুলতাম না। তবু মনে করার চেষ্টা করি, কিন্তু মনে পড়ে না।

অল্প হেসে বলি, "আপনি মনে হয় অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন। আমি তো মনে করতে পারছি না আপনাকে আগে দেখেছি বলে।'

উনি কিন্তু মেনে নিলেন না, বললেন, "এখন না, অনেক বছর আগে কোথাও তোমাকে দেখেছি। তোমার বয়স তখন অনেক কম ছিল, কিন্তু তোমার মুখ এরকমই ছিল।"

ছবি কিনে নিয়ে চলে গেলেন ওঁরা। কিন্তু যাওয়ার আগে আর-একবার আমার দিকে চেয়ে মহিলা বললেন, "কোথাও তোমাকে দেখেছি আগে। এই মুখ, এই চোখ, ঠিক এই হাসি। তখন তুমি অনেক ছোট ছিলে। তোমার হয়তো আমার কথা মনে নেই, তা ছাড়া তখন আমাকে দেখতেও অন্য রকম ছিল, অসুখ থেকে সদ্য সেরে উঠেছিলাম তখন।"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম, মহিলা কি খানিকটা অস্বাভাবিক? সম্ভবত তাই, নইলে এমন করে তুমি-তুমি করে কথাই বা বলতে শুরু করলেন কেন তবে? অপরিচিত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে কেউ তো তুমি বলে না!

ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা চলে গেলে আরেনুশের দিকে চেয়ে একগাল এসে নিজের কোণটিতে গিয়ে বসি কাঠের বাক্সের উপরে। ঝোলা থেকে স্কেচখাতা বের করে সাদা পাতায় স্কেচ করতে থাকি পেনসিল দিয়ে। পরের খদ্দের আসা অবধি তো সময় কাটাতে হবে। আরেনুশও নিজের জায়গায় বসে স্কেচখাতা বের করে বিমূর্ত ছবির স্কেচ করছিল।

এত তাড়াতাড়ি দিনের প্রথম বিক্রি হয়ে যাওয়ায় বেশ খুশি হয়েছিলাম। আসলে ছবি বা মূর্তি তো খাবার জিনিস বা কাজের জিনিসপত্রের মতো এত বিক্রি হয় না, শখের জন্য বা রুচির জন্য কিছু মানুষ কেনেন। তেমন মানুষ সেরকম বেশি তো পাই না আমরা! এমন কত দিন যায়, কেবল দোকানে বসে থাকাই সার হয়, একটাও কিছু বিক্রি হয় না। দিনের শেষে সব গুটিয়ে ক্লান্ত দেহে মনে ঘরে ফিরি, পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে। আজকের দিন তো সেই তুলনায় অনেক শুভ দিন।

স্কেচ করতে-করতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম, কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যাচ্ছিল বুঝিনি। আরেনুশও কাজে একদম মগ্ন, ও এমনিতেই কথা কম বলে, কাজের সময় তো একেবারেই কিছু বলে না। যখন অগিনদাদু কাছে এসে বললেন তিনি মধ্যাহ্ন আহারের জন্য বাড়ি যাচ্ছেন, তখন স্কেচখাতা থেকে চোখ তুলে তাকালাম।

বাইরে তখন বাজারের ব্যস্ততা ঝিমিয়ে পড়েছে, দুপুরের রোদে পথগুলো পড়ে আছে এলিয়ে, গাছগুলোর ছায়াও চুপ। এই সময়টা প্রায় সবাই ঘরে চলে যায় দুপুরের খাওয়া খেয়ে একটু বিশ্রাম নিতে। আমরা অবশ্য যাই না, আরেনুশ বাজারের দোকান থেকে কিছু শুকনো খাবার কিনে নিয়ে আসে, দুইজনে দোকানে বসেই খেয়ে নিই। তারপরে ঢকঢক করে এক গেলাস করে জল। দোকানে বসার দিনগুলোয় এই আমাদের মধ্যাহ্ন আহার।

বাড়িতে থাকার দিনগুলোয় অবশ্য আমি দুপুরে মিরির সঙ্গে খাই, এক্ষেত্রে বেশ কয়েক আইটেম দিয়ে আয়োজন করে খাওয়া, মিরিই রাঁধে, ওর রান্নার হাত চমৎকার। ওর সঙ্গে দুপুরে না খেলে ও মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তাই না বলতে পারি না।

আরেনুশ নিজের বাড়িতে নিজেই রান্না করে খায়। মাঝে-মাঝে আমি কোনওদিন ওর জন্য খাবার নিয়ে যাই ঢাকনা দেওয়া পাত্রে। প্রথম দিকে ও খুব আপত্তি করত, ইদানীং আর করে না। হয়তো বুঝেছে আমার কাছে আপত্তি করে লাভ নেই, আমি শুনব না। কোনও-কোনওদিন ওর রান্নাঘরেই রেঁধে দিয়েছি কিছু খাবার, তাতে আপত্তি করেনি ও। মনে হয় খুশি হয়েছে, যদিও মুখে কিছু বলেনি, ও খুব চাপা।

আরেনুশ দুপুরের খাবার কিনতে গিয়েছে, আমি দোকানে একাই বসে আছি, স্কেচও করছি না, একটা ছবির কথা ভাবছি যা এখনও আঁকা হয়নি। এমন সময় এক অদ্ভুত খদ্দের এসে উঠল দোকানে।

AMARBOI.COM

Hindusthan Sweets
হিন্দুস্থান স্বীটস
INCORPORATED IN 1 HINDUSTHAN CONCERN
ISO 9001:2000 & HACCP certified
আমরা শুধু ভেজাল মিষ্টি আবিষ্কার করিনি পাশাপাশি ডায়াবেটিক রোগীদের রসনা তৃপ্তির জন্য প্রতিদিন ডায়েবেটিক মিষ্টি তৈরী করে থাকি। আমরাই তারা যারা মিষ্টি নিয়ে গবেষণা করে। যাদের নাম ছাড়া মিষ্টান্ন শিল্প অসম্পূর্ণ থাকে।
Jadavpur • Ajaynagar • Hiland Park • South City Mall • Selimpur
Phone: 2412-2797/8 (Ext. 1-10), 2412-6048
E-mail:hindusthansweets@gmail.com | Visit: hindusthansweets.com

অদ্ভুত সেই লোকটি এমনভাবে এসে আমার একটা ছবির সামনে দাঁড়াল, যেন শূন্য প্রান্তরের মধ্যে সে আর ওই ছবিটা শুধু আছে। চারপাশের আর কিছু সে দেখছিল না, শুধু ওই ছবিটার দিকে চেয়ে আশ্চর্য মন্ত্রের মতো কী যেন আবৃত্তি করছিল।

আমি গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম, গলা একটু চড়িয়ে বললাম, "আমাদের দোকানে স্বাগত। বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?"

সে স্প্রিং-এর পুতুলের মতো আমার দিকে ফিরল, আমার ভিতরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল ভয়ে না বিস্ময়ে কে জানে। তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল নীল চোখ দুটো আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার চুল উসকো খুসকো, ঝাঁপালো ভুরু, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ, প্রশস্ত কপালে তিনটে সমান্তরাল আনুভূমিক রেখা, তীক্ষ্ণ নাক, বাঁ দিকের গালে একটা নীলচে ছাপ, শক্ত করে চাপা ঠোঁট অল্প কুঁচকে আছে, সবটা নিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত অন্য রকম চেহারা, শিরশির করে ভিতরটা।

তার ঠোঁট নড়ে ওঠে, সে আস্তে-আস্তে বলে, "আই ওয়ান্ডার হোয়াই, আই ওয়ান্ডার হোয়াই আই ওয়ান্ডার, আই ওয়ান্ডার..." একই কথা সে আবৃত্তির মতো বলে যেতে থাকে, বলে যেতে থাকে, যেন মন্ত্রোচ্চারণ করছে।

আমি সম্মোহিত প্রাণীর মতো তার চোখের দিকে চেয়ে বসে থাকি, কিছুতেই চোখ সরিয়ে নিতে পারি না। ধীরে-ধীরে চোখ দুটো ছাড়া তার মুখের বাকি অংশ আমার কাছে আবছা থেকে আরও আবছা হয়ে যায়, যেন ছায়া সেসব। চোখের মণি আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল, আরও গভীর হয়ে ওঠে। যেন সেই মণি এক অন্য জগতের দরজা আর তার সেই অদ্ভুত মন্ত্র যেন সেই দরজা খোলার ছাড়পত্র। চারপাশের সব শব্দ ছাপিয়ে ওর ওই মৃদু আবৃত্তির মতো কথাগুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে আমার কানে ঢুকতে থাকে। ভয়ে আর আশঙ্কায় আমার ভিতরটা কুঁচকে যাচ্ছে কিন্তু ওর সম্মোহন থেকে বের হয়ে যেতে পারছি না। কেন?

আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, লোকটি মন্ত্রের মতো কথাগুলো বলতে-বলতেই আমার দিক থেকে ঘুরে গেল। তারপরে আমার ছবিটার দিকে ওর অস্বাভাবিক লম্বা শীর্ণ আঙুল বাড়িয়ে দিল। ছবির থেকে একচুল দূরে ওর আঙুল থেমে গেল, কাঁপতে থাকল। ছবিটা রাত্রিবেলার ছবি, সেখানে আছে একটা একলা বাতিঘর, অন্ধকার সমুদ্রের জলের উপর দিয়ে বাতিঘরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে, সেই আলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে দূরে একটা নৌকা। যেদিকে বাতিঘরের আলো নেই সেদিকে অন্ধকার আকাশে অনেক-অনেক তারা আর হালকা বাষ্পের মতো ছায়াপথ।

সে আমার দিকে আবার ফেরে, ওর ওই আশ্চর্য চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে বিঁধে নেয় যেন। তারপরে অদ্ভুত ধরা-ধরা গলায় বলে, "আমি জানি। আমি তোমাকে জানি। তুমি স্বপ্নের শিল্পী। তুমি এই ছবি এঁকেছ স্বপ্নে পেয়ে। আমি স্বপ্নের ভিতরে দেখি সিঁড়ি, সিঁড়ি, সিঁড়ি, হাজার-হাজার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে নেমে গিয়েছে উঠে গিয়েছে নেমে গিয়েছে...আর দেখি বলয়, উজ্জ্বল বেগুনি, কমলা, সবুজ, লাল আলোর বলয়-আর দেখি ফেরিয়ান-ফেরিয়ান আর নীহারিকা-নীহারিকা, হালকা ছায়ার মতো, তারপরে সেই হালকা ছায়া হয়ে ওঠে স্পষ্ট থেকে আরও স্পষ্ট, হয়ে ওঠে রাশি-রাশি নক্ষত্র আর উজ্জ্বল বাষ্পরাশি, নক্ষত্রের ঘূর্ণী, ওহ, ওহ, ওহ কী উজ্জ্বল, কী ভীষণ গরম, আমার দম আটকে আসে। তুমি এই স্বপ্ন দেখেছ কখনও? বলো, দেখেছ?"

শেষ দিকে ওর গলা অস্বাভাবিক চড়ে যায়, আমার কানে গর্জনের মতো এসে পড়ে সেই কণ্ঠস্বর।

দিশাহারার মতো পিছিয়ে যেতে থাকি, একসময় দেওয়ালে ঠেকে যাই। চারিদিকের সব মিলিয়ে গিয়ে হঠাৎ কানে এসে পড়ে অদ্ভুত এক সুর, অচেনা বিষণ্ণ এক সুর। দেখি আমি দাঁড়িয়ে আছি এক নির্জন দ্বীপের ঘাটে, কিন্তু সেখানে কোনও নৌকা নেই, যে নৌকাটি আমায় নিয়ে এসেছিল, সেটা ফিরে যাচ্ছে আমাকে নির্বাসন দিয়ে। দ্বীপের ভিতর থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত এক সুর, আমাকে নেশাগ্রস্তের মতো অবশ করে দিচ্ছে সেই সুর।

কিন্তু এই অদ্ভুত দৃশ্য আমি দেখছি কেন? এরকম কোনও অভিজ্ঞতা আমার তো নেই! তা হলে কি এই অদ্ভুত মানুষটা ওর স্মৃতি কোনওভাবে আমার মনের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে?

অস্থির হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেরিয়ে আসতে চাই ওর সম্মোহনবলয় থেকে, পারি না। আমার সমস্ত শরীর পাথরের মতো শক্ত, শুধু চোখ দুটো চেয়ে আছে অপলকে। কানে যাচ্ছে শব্দ। অবস্থাটা এমন যেন স্বপ্নের মধ্যে গলা চিরে চিৎকার করতে চাইছি, কিন্তু কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

লোকটি কেমন করুণ বিষাদমগ্ন গলায় বলে যেতে থাকে, "আমাকে বিস্মরণের দ্বীপে নির্বাসন দিয়ে চলে গেল ওদের নৌকা। বিস্মরণে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই, সেখানে খুঁজে পাই এমিলকে, আনাতকে, আহিরণকে, হিমিলাকে। আরও অনেককে। সবাই ভুলে গিয়েছে তাদের অতীত। এই নামগুলো সব নতুন করে দেওয়া, পরস্পরকে ডাকার জন্য নতুন নাম দিয়েছে ওরা। অতীতের জীবনের সব ভুলে গিয়েছে, কিন্তু ভোলেনি তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে যে ভালবাসা ছিল, সেই ভালবাসাকে। তাই এমিল সুর বাজাতে পারে ওর তারযন্ত্রে। আনাত গান গাইতে পারে খালি গলায়, কী অপূর্ব সেই গান! আহিরণ ছবি আঁকতে পারে, ও আঁকে পাথরের দেওয়ালে।"

শ্রী গোবিন্দ আচার্য্য M.R.A.S. (London)

৫০০ বছরের পুরাতন বাংলাদেশভুক্ত ফরিদপুর জেলার কোটালি পাড়ার রতাল গ্রামস্থ সুবিখ্যাত মনসা বাড়ীর জ্যোতিষ ও তন্ত্রসাধক বংশে বরদাকান্ত বাচস্পতির পুত্র নারায়ণ ঠাকুরের ভ্রাতা, গৌরাঙ্গ ভারতীর পুত্র শ্রী গোবিন্দ আচার্য্য। তাঁর দেওয়া গ্রহরত্ন হইতে অধিক শক্তিশালী সিদ্ধিযন্ত্র ধারণে বিদ্যা, বিবাহ, ব্যবসা, চাকুরী, গুপ্ত শত্রু ও বাস্তুদোষ থেকে স্থায়ী সমাধান হয়।

একমাত্র স্থায়ী ঠিকানা 7/1, যশোহর রোড, কলকাতা-700 028 (দমদম সেন্ট্রাল জেল স্টপেজ)

ডাকযোগে বিচার ও প্রতিকার করা হয়।

মো ঃ 9836038507/(033) 2559-4277

যে কোন চটকদারী বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হওয়ার আগে সেই সম্বন্ধে জেনে তবেই অগ্রসর হবেন। প্রচারক ভক্তবৃন্দ

আমি দেখতে পাই একটা আশ্চর্য সুন্দর বিকেল, সূর্য ঢলে পড়েছে সমুদ্রের বুকে ওই-ই দূরে জলদিগন্তে, রাঙা হয়ে গিয়েছে সমুদ্র, আকাশের মেঘ, সেই রাঙা আভা পড়েছে সাগরতীরের বালিতে। তীরভূমির বালি পার হয়ে নারিকেল গাছের সারি, একটা নারিকেল গাছের মোটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে সুন্দরী এক মেয়ে, তার নীল চোখ দু'টিতে অপার্থিব বিষাদ।

মেয়েটির গলায় নীল ফুলের মালা আর মাথার চুলেও নীল ফুল গোঁজা-সন্ধ্যাতারার মতো বিষন্ন চোখ আকাশের দিকে তুলে মেয়েটি গান গাইছে। সেই গানের ভাষা বুঝতে পারি না, কিন্তু মধুর করুণ সেই সুর বুকের খুব গভীরে চলে যায়। হারিয়ে যাওয়া এক প্রাণের ঘর খুঁজে ফেরার আর্তি সেই সুরে। ও কে? ওই কি আনাত, যার কথা এই মানুষটা বলল এইমাত্র?

তারপরে শুনতে পাই বাজনা, দূরের থেকে কে যেন হেঁটে-হেঁটে আসছে সুর বাজাতে-বাজাতে। ও কে? মনে হয় এমিল। এমিলের এলোমেলো চুলে ঘেরা মুখটি স্পষ্ট হয়, নওলকিশোরের মতো নিষ্পাপ মুখ ওর। আহা, কেমন স্বপ্নের ঘোরে যেন সে হাঁটছে, ওর কালো চোখ দু'টিও স্বপ্নে ভরা। কিন্তু ওর কপালে ওই বাদামি দাগটা কেন? ফরসা কপালে কী উগ্র হয়ে জেগে আছে ওই দাগ! কী হয়েছিল? পড়ে গিয়েছিল ও?

কোথা থেকে এক ভয়ের হাওয়া এসে লাগে, কেঁপে উঠি। কারা যেন আসছে, কারা যেন আসছে। এই গান গাওয়া বাজনা বাজানো স্বপ্নের ঘোরে থাকা এই এদের ধরে নিয়ে ঘুমপাড়ানি ওষুধ দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখবে রাতে।

কারা যেন এমিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ওর আর্ত চিৎকার কানে আসে, ওর হাতের সুরযন্ত্রটি পড়ে গিয়েছে মাটিতে। এমিলের আক্রমণকারী পাঁচজন, সর্বাঙ্গ সাদা আলগা পোশাকে ঢাকা ওদের। সবার মুখে শক্ত সাদা পাথুরে মুখোশ। ওদের মধ্য থেকেই একজন এমিলকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চেপে ধরে রাখল, আর-একজন একটা সিরিঞ্জ বের করে পট করে ওষুধ ইঞ্জেক্ট করে দিল এমিলের বাহুতে। এমিল ঝিমিয়ে পড়ল, কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমে তলিয়ে গেল।

নারিকেলকুঞ্জে আনাতের গান থেমে গিয়েছিল আগেই। এবারে সে দৌড়ে পালাতে থাকে। কিন্তু সেই রকম আরও পাঁচজনের একটা দল এগিয়ে আসতে থাকে আনাতের দিকে, অন্যদিক থেকে। আনাত ওদের দেখে থেমে গিয়ে উলটোমুখে ছুট দেয়, অমনি সেইদিক থেকে পাঁচজনের আর-একদল আসছে দেখা যায়। ভয়ের আর হতাশার একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে আনাতের গলা থেকে, সে সমুদ্রের দিকে ছুটে যেতে থাকে এইবার। ভেজা বালির উপরে আনাতের পায়ের ছাপ পড়তে থাকে, সে সোজা জলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ডান দিক থেকে একটা ফাঁস লাগানো দড়ি ছুটে আসে বিদ্যুৎগতিতে, আটকে যায় আনাতের পায়ে। সে বালির উপরে আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পাঁচজন লোকের একটি দল এগিয়ে যায়, একজন ইঞ্জেকশন দেয়। তারপরে আনাতের অচেতন দেহ স্ট্রেচারে শুইয়ে বহন করে নিয়ে যেতে থাকে বাকি চারজন।

একটা হইচই আর গন্ডগোলে আমার ঘোর ভেঙে গেল হঠাৎ। দেখি সত্যি-সত্যি পাঁচজন লোক ছুটে আসছে দোকানের দিকে। ওদের অবশ্য মুখে মুখোশ নেই, মুখগুলো এমনিতেই পাথুরে। ওদের গায়ে উগ্র লাল আর কালো রঙের ডোরা-ডোরা পোশাক।

দেখতে-দেখতে ওরা এসে দোকানে আসা এই অদ্ভুত লোকটাকে ধরে ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। লোকটি চিৎকার

করে কী যেন বলে উঠল অজানা একটা ভাষায়। অমনই লাল-কালো পোশাকের একজন লোক আঘাত করল ওর মুখে, মানুষটার ঠোঁটের কোনা কেটে রক্ত গড়াতে লাগল।

আমি ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব, কী বলব, কী করব বুঝতে পারছি না। এরকম আগে কখনও দেখিনি তো!

ভাগ্য ভাল সেই সময়েই আরেনুশ ফিরল খাবার কিনে নিয়ে। সে দৌড়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। ওই লাল-কালো পোশাকের লোকগুলোকে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে এখানে? আপনারা কারা? এই লোকটিই বা কে? ওঁর হাত ওভাবে বেঁধেছেন কেন?"

ভাবলেশহীন গলায় ওই পাঁচজনের মধ্যে একজন বলল, "আপনাদের দোকানে গন্ডগোল হওয়ায় আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। এই ভদ্রলোক আমাদের চিকিৎসাধীন রোগী। আমাদের আরোগ্যভবন থেকে উনি পালিয়ে এসেছেন। তাই আমরা ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

গোটা দলটা যখন অদ্ভুত মানুষটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন সেই হাতবাঁধা আহত মানুষটা মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। অদ্ভুত বিষণ্ণ অথচ উজ্জ্বল সেই মুখ, ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে কিন্তু ভিতর থেকে ধিকি ধিকি আগুনের তাপে জ্বলজ্বলে।

সে কোনও কথা বলল না, কিন্তু ওর ওই গভীর আশ্চর্য চোখ দু'টি মন থেকে মনে কথা বলল, নিজের শ্রবণাতীত শ্রবণযন্ত্রে আমি স্পষ্ট শুনলাম সে বলছে, "আবার দেখা হবে আমাদের। ভয় কোরো না, হতাশ হয়ো না, আমরা কিছুতেই হেরে যাব না। আমরা থাকব, আমরা বাঁচব, আমরা উড়ে যাব নক্ষত্রের দিকে।"

তারপরে আর আমার কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আরেনুশ পাশে বসে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে আমায়। চোখেমুখে কুচি-কুচি জলের ছোঁয়া পেলাম। বুঝতে পারলাম আমি চেতনা হারিয়েছিলাম। আরেনুশ চোখে মুখে জল দিয়ে চেতনা ফেরাবার চেষ্টা করেছে।

আমি উঠে বসতে গেলাম, সামান্য টলমল করছিল মাথা। আরেনুশ ধরে-ধরে উঠে বসতে সাহায্য করল। বলল, "এখন ভাল লাগছে?"

আমি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালাম, তারপরে বাচ্চা মেয়ের মতো বললাম, "খিদে পেয়েছে। খাব।"

আরেনুশ খাবারের ঠোঙা নিয়ে এল, জলভরা জলপাত্রও আনল দু'জনের দুটো। পাশাপাশি বসে খাবার ভাগ করে খেতে-খেতে আমরা আস্তে-আস্তে গল্প করতে লাগলাম। গল্প বলতে আমি ওই অদ্ভুত লোকটার দোকানে আসা থেকে শুরু করে কী কী হয়েছিল সেসব বললাম।

আরেনুশ একটু চিন্তিত হল যেন, নিজের মনেই বলল, "তা হলে এরকম লোকেরা আছে যাদের মানসিক সুস্থিতি বিঘ্নিত বলে বলা হচ্ছে।"

আমি খুব মৃদুস্বরে বললাম, "লোকটির মানসিক সুস্থিতি হয়তো সত্যি করে বিঘ্নিত নয়। এই এরাই-এই চিকিৎসক বলে যারা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে, তারাই ওকে ওষুধ দিয়ে ঝিমিয়ে রাখছে, মানসিক শক্তিকে দমিয়ে রাখছে। কারণ ওই অদ্ভুত লোকটি আর ওর মতো আরও কিছু লোক, হয়তো কোনও বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী।"

আরেনুশ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল, অনেকক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ওরিয়ানা, এই নিয়ে আর কোনও কথা আমরা না বলি। অগিনদাদু এলে এসব আর উল্লেখ কোরো না তুমি। করবে না তো?"

আমি বুঝতে পেরেছিলাম আরেনুশ আমাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছে। আমার কিছু-কিছু ব্যাপার না জেনেও আঁচ করতে পারে, তাই হয়তো আশঙ্কা করছে জানাজানি হয়ে গেলে হয়তো আমি বিপদে পড়ব।

আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম, বললাম, "ঠিক আছে আরেনুশ, আমি মুখ বন্ধ করলাম এই বিষয়ে। কিছু আর বলব না। কিন্তু তুমি আমার জন্য এত দুশ্চিন্তা কোরো না, আমার কিছু হবে না।"

কথা শেষ করে হাসলাম, আরেনুশও হাসল। খালি ঠোঙাগুলো মুড়িয়ে-সুড়িয়ে নিয়ে ও উঠে দাঁড়াল, ওগুলো বাইরে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে গেল।

আরেনুশ ফিরে এল একটু পরেই। তারপর আবার আমরা চুপচাপ দোকানে বসে রইলাম। আরেনুশ স্কেচখাতা বের করে একটা মূর্তির পরিকল্পনা স্কেচ করে-করে তুলতে লাগল। আমি এবারে আর স্কেচখাতা বের করলাম না, খানিকক্ষণ এমনি বসে-বসে বিশ্রাম করলাম। তারপরে সময় আর কাটে না দেখে গল্পের বই বের করলাম।

অগিনদাদু দোকানে ফিরলেন বেশ বেলায়, এসে কেমন লাজুক মুখ করে আমাদের বললেন দুপুরে ভরপেট মধ্যাহ্নভোজন করে একটু গড়িয়ে নিতে গিয়েছিলেন, তাতেই চোখটা লেগে গেল। যখন উঠলেন তখন দেখলেন বেলা গড়িয়ে গিয়েছে।

আমরা দু'জনেই হাসলাম, আমি বললাম, "দিদাকে কেন বলোনি ডেকে তুলে দিতে?"

"তোদের দিদার আমাকে ডেকে তুলতে বয়েই গেল। সে তখন তার উদ্যানপ্রেমিকের সঙ্গে ঘোর প্রেমে মত্ত।"

এইবারে গলা ছেড়ে আমরা হাসলাম, হাসতে পেরে যেন বেঁচে গেলাম। দুপুরের অভিজ্ঞতা যেন জমাট পাথরের মতো বসে ছিল বুকের মধ্যে।

সেদিন আমাদের ছবি আর মূর্তির আর কোনও খদ্দের এল না। বিকেল-বিকেল জিনিসপত্র গুটিয়ে ফেললাম। বাড়ির দিকে রওনা হলাম অগিনদাদুর কাছে বিদায় নিয়ে। উনি বরাবরের মতোই হেসে বললেন, "সাবধানে যাস। আবার পরশু দেখা হবে।"

চলতে-চলতে আবার ঘাট, সেইখানে ফেরি নৌকা ধরা। তারপর আমাদের আনুমার ঘাটে এসে পৌঁছানো। সাইকেল জমা রাখার দোকান থেকে সাইকেল দুটো নিয়ে আবার রওনা হওয়া যে যার বাড়ির দিকে।

আকাশে তখনও আলো, সন্ধের আলো। মুইনুখ থেকে এত তাড়াতাড়ি ফেরা আমাদের কমই হয়। অথচ ক্লান্তিতে সব কিছু কেমন আবছা লাগছিল। কে জানে আরেনুশও আমার মতো এত ক্লান্ত হয়েছিল কিনা!

একঝাঁক পাখি উড়ে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে। ওরা আশ্রয়বৃক্ষে ফিরছে। মোড় ঘুরতে একটা মস্ত বড় গাছ পথের ধারে, তাতে রাজ্যের পাখি কিচিরকিচির করছে। সন্ধে নামার আগেই দিনের শেষ আলাপ করে নিয়ে ওরা রাতের মতো নীরব হয়ে যায়। অনেকটা পথ সাইকেল, পাহাড়ি রাস্তা ঘুরে ঘুরে চলছে, আমরা নীরবে সাইকেল চালাচ্ছি। পথের মোড়ে যেখানে এসে আমাদের দু'জনেরই রাস্তা আলাদা হয়ে যায়, সেইখানে থামলাম। দু'জনেই নামলাম সাইকেল থেকে।

মস্ত বড় গোল এক রুপোলি চাঁদ তখন উঠে আসছিল নীল পাহাড়ের কাঁধ পেরিয়ে। দু'জনেই সেদিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বললাম, "পূর্ণিমা আজ!"

দু'জনের এই একসঙ্গে এক কথা শুনে দু'জনেই হেসে ফেললাম, মায়াবী সেই চন্দ্রও যেন আমাদের দিকে চেয়ে হাসছিল। একঝাঁক পাখি উড়ে গেল চাঁদকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে। ঝিঁঝিঁদের সম্মিলিত অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল ঠিক তক্ষুনি।

হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে যে যার পথে চলে যাওয়ার আগে আরেনুশকে বললাম, "সাবধানে যেও, পরশু আবার দেখা হবে।"

সে বলল, "তুমিও সাবধানে যেও।" এই বলেই লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে চালিয়ে দিল, একবারও তাকাল না মুখ ফিরিয়ে। ওর এই ছেলেমানুষি চেনা হয়ে গিয়েছে আমার, মুখ ফেরালেই পাছে দুর্বল হয়ে যায়, তাই ফিরে তাকায় একেবারে বাঁক পার হয়ে যখন আর ফিরে তাকালেও আমাকে দেখতে পাবে না।
পথের বাঁকে ওর চলন্ত অবয়ব মিলিয়ে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করলাম, তারপরে নিজের সাইকেলে উঠলাম। নিজের পথে চলতে-চলতে ভাবছিলাম, কী অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে গেল আজকে দোকানে, কোনও রকম ভূমিকা ছাড়া। পরশু আবার যাওয়া, কে জানে সেদিন কী ঘটবে?
তখন আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, পরশু এমন এক ঘটনা ঘটবে ওই দোকানেই যে আমার আর আরেনুশের জীবন সম্পূর্ণ বদলে যাবে আকস্মিকভাবে।
জ্যোৎস্নাভেজা পথ দিয়ে দ্বিচক্রযান চালিয়ে ঝিঁঝিঁদের বাজনার মধ্য দিয়ে ফিরতে-ফিরতে ওই জীবন বদলে ফেলা ঝড়ের কোনও পূর্বাভাসই সেদিন পাইনি।

{৪}

বাড়ি ফিরে ছবিঘরের বারান্দায় মিরিকে বসে থাকতে দেখে অবাক হলাম। আমার জন্য বসে আছে নাকি?
বাড়িতে ফিরেই আমি সাধারণত ছবিঘরের বারান্দায় সাইকেল তুলে রেখেই ছবি রাখতে ছবিঘরে ঢুকি। বাড়ির এদিকটা নির্জন, অন্যদিকে কোলাহল, সেদিকে অনেক লোকজন। চিরকালই এরকম দেখছি। মিরি ওই কোলাহলের দিকেই থাকে দেখেছি বেশির ভাগ সময়, আজ এই নির্জন ছবিঘরের বারান্দায় একলা-একলা ওকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে অবাক হলাম তাই।
"দিদি, তুমি এখানে?" হালকা করে বললাম ছবিঘরের দরজা খুলতে-খুলতে।
মিরিও হাসল, বলল, "হ্যাঁ, এখান থেকে জ্যোৎস্না খুব সুন্দর দেখায়। বসে দেখছি তাই। তুই আজ অনেক তাড়াতাড়ি ফিরলি।"
আমি আরও অবাক। মিরি জ্যোৎস্না দেখছে! ও তো খুবই বাস্তববাদী মেয়ে, ফুল, পাখি, জ্যোৎস্না, প্রজাপতি এসব তো ওর কাছে কিছুই না! আমার এই ছবি আঁকাকেও কতকাল ও কেবল "বলিহারি শখ বাপু তোর" বলত, কেবল সময় নষ্ট ছাড়া কোনও গুরুত্বই ছিল না এসবের ওর কাছে। আজ ও এইখানে এইভাবে ঘুম-ঘুম নেশা-নেশা গলায় বলছে, সুন্দর জ্যোৎস্না? কী হল ওর? নেশা-টেশা করল নাকি?
অবাক ভাব একেবারেই প্রকাশ না করে স্বাভাবিক গলায় বলি, "হ্যাঁ, আজ দুপুরের পরে আর তেমন খদ্দের ছিল না, আমরা জিনিসপত্র গুটিয়ে তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।"
মিরি বলল, "ভাল করেছিস। আজ এখানে খাবার এনে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব দু'জনে। নাকি তুই বাইরে খেয়ে এসেছিস?"
শেষদিকে ওর গলাটা কেমন আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। আমার কেমন মায়া হল।
ওর দিকে চেয়ে ভাল করে হেসে বললাম, "না রে আজ বাইরে খাইনি। বড্ড খিদে পেয়েছে। তুই দিলে এখুনি খাব।"
শুনে কেমন বালিকার মতো খুশি হয়ে উঠল মুখ, ওই জ্যোৎস্নার আলোতেও বুঝতে পারলাম।
তারপরে আমি ছবিঘরে জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আর মিরি গেল আমাদের দু'জনের রাতের খাবার আনতে। বড় থালায় করে একসঙ্গে সব খাবার সাজিয়ে নিয়ে আর-এক থালা ঢাকা দিয়ে আনল মিরি। বাটিতে-বাটিতে সব খাবার ছিল, জলভরা দুটো চওড়া বেঁটেমতো গেলাসও ছিল।
ও ফিরে বারান্দাতেই একপাশে খাবার সাজাল, গোটানো মাদুর পেতে দিল বসার জন্য। আমি ঘরের লণ্ঠনটা নিয়ে রাখলাম মাঝে। খালি থালা মেঝেয় বসিয়ে তার উপরে অন্য ভরা থালাটা থেকে বাটি-বাটি খাবার আর জলের গেলাস তুলে দিতে-দিতে ও আমায় বলল, "ওরিন, আয় বসে পড়। শুরু করে দে খেতে। এই যে আমিও শুরু করছি।"
বারান্দায় বসে ছোট লণ্ঠনের আলোয় খেতে-খেতে আমরা টুকরো-টুকরো গল্প করছিলাম। মিরিকে খুব অন্য রকম লাগছে আজ। ওর গলার স্বর, ওর হাতের ভঙ্গি, ওর তাকানো সবই যেন বদলে গিয়েছে।
এইভাবে এত যত্ন করে খাবার সাজিয়ে এত নরম গলায় কথা বলতে-বলতে আমার সঙ্গে তো কোনওদিন ও খায়নি! সবসময় ওর গলা খর গলা, শাসনের বা রাগের। আবার কখনও কান্নার।
ওর আবেগ খুব অনিয়ন্ত্রিত। ওর রাগ বা ভালবাসা সবই খুব তীব্র আর জোরালো। আমি সেসব সামলাতে যাইনি কোনওদিন, কেবল নিজেকে ঘিরে রেখেছি উপেক্ষার শক্ত বর্মে। ভুল করেছি কি? আমার কাছে কি ওর আর একটু বেশি মনোযোগ প্রাপ্য ছিল? আমার কি আসলে মনের খুব ভিতরে মিরির জন্য একটা দ্বেষ জমা ছিল, উপেক্ষা দিয়ে কেবল তাকে ঢেকে গিয়েছি সারাজীবন?
খেতে-খেতে টুকরো-টুকরো সাধারণ সাদাসিধে কথা বলছি আমরা। মিরি মাঝে-মাঝেই আমার দিকে চেয়ে কী যেন বলি-বলি করেও বলছে না। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার আছে কি ওর? জিজ্ঞাসা করব? না থাক, বলার হলে আপনিই বলবে। একসময় খাওয়া শেষ হয়ে গেল, কিন্তু মিরির সেই বলি-বলি কথাটা আর বলা হল না। খাওয়া হয়ে গেলে মিরি খালি থালাবাটি সব নিয়ে চলে গেল বড় রান্নাঘরের দিকে, আমি বড় উঠোনের একপাশে কুয়োতলায় বাঁধানো একটু জায়গা, তার পাশে জল ফেলার জায়গায় হাতটাকে ধুয়ে আবার ছবিঘরের দিকে ফিরে এলাম। ওই বড় উঠোনের মাঝখানে বিশাল মাদুরে তখন প্রায় আট-ন'জন ছেলেমেয়ে তুমুল গানের আসর বসিয়েছে। এরা সব আমার জ্ঞাতি ভাইবোন। এত লোক বাড়িতে, সবাই মিলে যেন এক গোটা পাড়া।
ছবিঘরে ফিরে দেখি মিরি ইতিমধ্যেই ফিরে ভেজা ন্যাতা দিয়ে খাওয়ার জায়গা মুছতে লেগে গিয়েছে। ও ঘরের কাজকর্মে একেবারে নিখুঁত, পরিপাটি। অবাক লাগে, সেই বালিকা বয়স থেকে ও খুব ভালবেসে ঘরগেরস্থির কাজ শিখেছে, করেছে, প্রশংসাও পেয়েছে কিন্তু নিজের সংসার করতে গিয়ে করতে পারল না, ফিরে এল বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে। ওর মতো গৃহকর্মনিপুণা আর রন্ধনপটিয়সীকে কেন যে ওর স্বামী সাদরে সাগ্রহে সযত্নে ধরে রাখল না, কে জানে!
মিরি দাওয়া মুছেটুছে চলে গেল হাত ধুতে। ফিরে এসে দাওয়ার সামনের বাগানের যে একটু খালি অংশ, সেইখানে জ্যোৎস্নামাখা ঘাসের উপরে মাদুর বিছিয়ে বসল। আমায় ডাকল, "ওরিন, আয় না এখানে একটু বসবি। এখনও তো রাত তেমন হয়নি, এখনই ঘুমোবি?"
আমি লণ্ঠন রাখতে ছবিঘরে ঢুকেছিলাম, সেখান থেকেই বললাম, "না না, এখনই ঘুমাবো কী? আমি আসছি মিরি।" লণ্ঠনটার প্যাঁচ ঘুরিয়ে শিখাটাকে খুব ছোট করে রেখে ঘর থেকে বের হলাম। মিরির পাশে গিয়ে বসলাম চুপ করে। কোথা থেকে যেন ফুলের সুগন্ধ আসছিল। রাতে ফোটা ফুলের সৌরভ বড় মোহনীয়। আশ্চর্য রুপোলি জ্যোৎস্না, রাতের ফুলের সৌরভ, কোথা থেকে মাঝে-মাঝে ডেকে ওঠা রাতপাখির ডাক উতলা করে দিচ্ছিল আমায়। চুপ করে বসে জ্যোৎস্নায় ভিজতে থাকি আমি আর মিরি।

SARBOJOL

গাছগাছালির ওপাশ থেকে দূরের বড় উঠোনের গান, হাসি, কথা ইত্যাদির কলরব ক্ষীণ হয়ে এসে পৌঁছয় এখানে। এই ছবিঘর আর তার বাগান যেন বাড়ির হয়েও বাড়ির নয়, যেন স্বেচ্ছা-নির্জনতার একটা হালকা আবরণ একে ঘিরে।

একসময় মিরি আধশোয়া হয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে কেমন ঘুম-ঘুম গলায় বলে, "তোর মনে আছে ওরিন, এইখানেই মা সেদিন এইভাবেই মাদুর বিছিয়ে বসেছিল, সেই বিকেলে? মায়ের কথায় তোকে আমি ডেকে নিয়ে এসেছিলাম নিজনিদের বাড়ি থেকে। কত বছর হয়ে গেল, তুই তখন অনেক ছোট, এই হয়তো এগারো কী বারো বছর বয়স তখন তোর...মা তো একদম সুস্থ, স্বাভাবিক ছিল, কেউ আমরা কিছু টের পাইনি...শুধু সেদিন অমন উতলা হয়ে তোকে ডেকে আনাল, সেই দেখে আমার মনটা কেমন করে উঠেছিল।"

আমার মনে পড়ে গেল, মনে ছিলই, কিন্তু মিরির কথায় সেই বিকেলটা স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল স্মৃতির মণিকোঠা থেকে। আকাশ ভর্তি কমলা-গোলাপি মেঘ ছিল সেই বিকেলে, দুপুরে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল মুষলধারে, তারপরে বৃষ্টি থেমে বেরিয়ে এসেছিল এক মায়াবী বিকেল।

আমি আর নিজনি ওদের বাগানের ধারে বাঁশের মাচায় বসে একসঙ্গে পড়ছিলাম একটা গল্পের বই। অনেক ছবি দেওয়া ওই সুন্দর গল্পের বইটা স্কুলের গ্রন্থাগার থেকে তুলেছিলাম এক সপ্তাহের জন্য। আমি পড়ে শোনাচ্ছিলাম, নিজনি শুনছিল, মাঝে-মাঝে আমায় থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করছিল গল্পের কোনও ঘটনা কী চরিত্র নিয়ে, আমিও প্রতিমন্তব্য করছিলাম। মাঝে-মাঝে কোনও হাসি বা মজার জায়গা এলে দু'জনেই হেসে কুটিপাটি হচ্ছিলাম।

সেইখানে ঝড়ের মতো গিয়ে হাজির হল মিরি, হাঁপাতে-হাঁপাতে আমায় বলল, "ওরিন, ওরিন, মা তোকে ডাকছে। শিগগির চল, মা যেন কেমন করছে।"

মিরির গলার স্বরের মধ্যে যে উদ্বেগ ছিল, তার ঝাপটাতেই যেন কেমন টানটান হয়ে গেলাম আমি। বইটা মাচায় রেখেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ে মিরির সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, "কেমন করছে মানে? কী করছে?"

মিরি তখনও হাঁপাচ্ছিল, মনে হয় গোটা পথটাই ও দৌড়ে গিয়েছিল। ও বলল, "মা ছবিঘরের বাগানে বসে আছে। আমাকে বলল ওরে যেখান থেকে পারিস এখনই খুঁজে নিয়ে আয় ওরিয়ানাকে। তাকে আমার একটা কথা বলা খুব দরকার। আজ না বললে বুঝি আর কোনওদিন বলা হবে না।"

মায়ের কোনও অসুখবিসুখ কিছুই ছিল না, মা সংসারের সব কাজই করত কাকিমা-জেঠিমাদের সঙ্গে। শুধু মাঝে-মাঝে ছুটি নিয়ে ছবিঘরে এসে আসন বুনত। ওরকম মা এমনিতেও আগে করত, আমরা ছোট থেকেই দেখছি। ওই ঘরটা নাকি মায়ের বাবা নিজের টাকায় করিয়ে দিয়েছিলেন, কন্যাকে তাঁর শেষ উপহার।

এখন ফিরে দেখলে মনে হয় মায়ের মধ্যেও এক অচেনা রহস্যময়ী সত্তা ছিল, সংসারের হাজারো কাজে ও দুনিয়ার বাস্তবতার চাপে সেই সত্তা সবসময় চাপা পড়ে থাকত। শুধু মায়ের বোনা আসনগুলোর কারুকার্যের মধ্যে যেন সেই সত্তার আভাস পাওয়া যায় একটু-একটু।

মা বাগানের এইখানেই একটা মাদুরে বসে-বসে শখের সুগন্ধী কাঠের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। আমরা যখন বাগানের বেড়ার ছোট্ট বাঁশের গেট খুলে ঢুকছি তখন মা চিরুনি নামিয়ে রেখে হাতখোঁপা করে ফেলল। মায়ের অনেক চুল ছিল, খোঁপাটা হত অ্যাত্তো বড় গোল একটা ফুলের মতো।

কাছে যেতেই মা কেমন এক নরম গলায় ডাকল, "ওরিয়ানা, আয়, বোস। তুইও আয় মিরি, বোস।"
আমি গিয়ে মায়ের পাশে চুপ করে বসে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কে জানে কেন সেদিন অমন করেছিলাম, অত বাধ্য আমি কোনও দিন ছিলাম না। যে কোনও কিছুতেই আমার এক বা একাধিক প্রশ্ন থাকত। অন্যদিন হলে হয়তো বলতাম, "কেন বসব?" কিন্তু সেদিন মায়ের গলার স্বরে কী যে ছিল!
কমলাগোলাপি মেঘের ছায়ায় মায়ের মুখ যে কী অপূর্ব দেখাচ্ছিল সেদিন! যেন মা আমাদের চেনা মানুষ মা নয় আর যেন সে কোনও কল্পলোকের দেবী।
মিরি মায়ের অন্য পাশে বসেছিল। আস্তে-আস্তে বলল, "মা তখন তুমি এমন করে বললে এখনই যেখান থেকে পারিস ডেকে আন ওরিয়ানাকে, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস নিজনিদের ওখানে পেয়ে গেলাম। এমন জরুরি তলব করে ওকে আনালে কেন?"
মা কিন্তু মিরির প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। বরং বলল, "মিরি, তোর বাবা আর জ্যাঠাকে কি ডেকে আনতে পারবি? ওঁরা এখন ঘরেই মনে হচ্ছে, আজ দুপুরের খাওয়া দেরি করে হল, তারপর দেখলাম ওরা বিশ্রাম করছিল। ডেকে আন না রে সোনামণি।"
মিরি অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল, হয়তো সোনামণি শুনে অবাক হয়েছে। মায়ের কথাগুলো আজ একদম অন্য রকম, কেমন যেন স্নেহমাখানো। অন্য সব দিন মায়ের কথাগুলো কেমন কেজো আর শক্ত ধরনের শোনায়, আজকে কেমন আদর-আদর লাগছে, নরম তুলতুলে কথাগুলো, যেন সদ্যোজাত শিশুর নরম গায়ের মতো কথা। অবাক হয়ে বসে থাকি।
মিরি উঠে দাঁড়াল, সামান্য ইতস্তত করে বলল, "ওঁদের কী বলব? বলব মা তোমাদের ডাকছে এক্ষুনি, খুব জরুরি দরকার?"
মা মাথা একদিকে কাত করে বলল "হ্যাঁ, ঠিক তাই বলবি। যা সোনা তাড়াতাড়ি ডেকে আন।"
মিরি বলল, "ঠিক আছে তাই বলছি গিয়ে। ওরা যদি না আসে তা হলে কিন্তু আমার কোনও দায় নেই।"
মা হাসল, বলল, "আসবে, ঠিক আসবে।"
মিরি তবুও দাঁড়িয়ে আছে দেখে মা আবার বলল, "যা সোনামণি, সময় বয়ে যায় যে!"
এইবারে মিরি আর কিছু না বলে চলে গেল দ্রুতপায়ে।
মা আমার দিকে ফিরে কেমন আশ্চর্য একটা হাসি হাসল, সেই হাসি দেখে আমার বুকের মধ্যেটা কেমন যেন করে উঠল। মা যেন একটা কী গোপন সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত থেকে তাকে আর কেউ টলাতে পারবে না।
মা আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "ওরিয়ানা, তুই যেদিন জন্মালি, খুব শুভদিন ছিল। তুই জন্মেছিলি সন্ধেবেলা, আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরে দেবে বলে তখন উঠছিল পূর্ণিমার চাঁদ। আমার কোলেও জ্যোৎস্না ভরে উঠল। ধাই রাইতিরি যখন তোকে আমার কোলে দিল, আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম তোর চোখ দুটো দেখে। কত বছর হয়ে গেল, মনে হয় এই তো সেদিন।"
আমি অবাক হয়ে মায়ের মুখে দিকে চেয়ে রইলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো, মা এমন করে কোনওদিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি তার আগে! কোথায় মায়ের ভিতরে লুকিয়ে ছিল এইসব কথা, এই এত স্নেহ? এমন এক স্নিগ্ধ ভালবাসার ঝরনা যা মিটিয়ে দিতে পারে জন্মজন্মান্তরের তৃষ্ণা?
মিরির সঙ্গে এসে পৌঁছল বাবা আর জেঠামশাই। রীতিমত অবাক। এইভাবে জরুরি তলব করে মা ওদের আগে বোধ হয় কোনওদিন ডাকেনি। মা ওদের দু'জনকে বসতে বলল, ওরা মাদুরে বসল মায়ের মুখোমুখি। মায়ের ডানপাশে আমি বসে আছি একদম কোল ঘেঁষে আর মিরি মায়ের অন্য পাশে বসল।
মায়ের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে ছিলাম আমরা সবাই। মা আস্তে-আস্তে বলল, "আমার ইচ্ছা ওরিয়ানা আজ থেকে ছবিঘরে থাকবে আমার সঙ্গে। আমার কিছু অসমাপ্ত সূচিকর্ম ও যাতে পরবর্তীকালে করতে পারে, তাই সে কাজ ওকে শিখিয়ে যেতে চাই আমি। আমার অবর্তমানে এই ঘর আর সমস্ত শিল্পসামগ্রী ওরিয়ানার হবে।"
আমি চমকে উঠেছিলাম সবচেয়ে বেশি। অন্য সবাইও খুব অবাক হয়েছিল। হাসিমুখে এক মধ্যবয়সি সুস্থসবল সংসারী নারী ইচ্ছাপত্র তৈরির মতো কথা বলছে!
আমি নিঃশব্দে মায়ের হাঁটুর উপরে আমরা হাত রাখলাম। মিরি মায়ের অন্য পাশ থেকে পাশ ফিরে কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে আর আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, কী যে ছিল সেই দৃষ্টিতে! ভয়, রাগ, ঈর্ষা, বিষাদ, সব কিছু যেন এক হয়ে মিশে ছিল।
বাবা আর জেঠামশাই বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। কিছুক্ষণ পরে গলার স্বর ফিরে পেয়ে জেঠামশাই বলল, "বউমা, তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে। কিন্তু অবর্তমানের কথা কেন বলছ বউমা? তোমার এখনও অনেক অনেকদিন বাঁচবার কথা।"
মা অল্প হেসে বলল, "জীবনমৃত্যুর কথা কে বলতে পারে বলুন। কাজটা সেরে রাখা আমার কর্তব্য, তাই সেরে রাখলাম। আপনারা সাক্ষী রইলেন, আশা করি আর কোনও গন্ডগোল পরে হবে না। সব কিছু ঠিকঠাক গুছিয়ে করে রাখাই তো ভাল।"
মিরি মেনে নিতে পারেনি মন থেকে, ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে গিয়েছিল। সেদিন ওই কথার পরে বাবা আর জেঠার সঙ্গে সে চলে গেল বাড়ির অন্য অংশে, যাওয়ার আগে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন দৃষ্টি দিয়েই ভস্ম করে ফেলতে চায়।
সেই রাত্রে খেয়েদেয়ে এসে অনেক রাত অবধি বাইরে এইখানেই ছিলাম মা আর মেয়েতে। মা আমাকে কত সব ছোটবেলার গল্প শোনাচ্ছিল যা আমাকে নিয়েই অথচ আমার নিজের স্মৃতিতে তার কিচ্ছুটির চিহ্নমাত্র নেই।
শেষরাত্রে আমরা ঘুমোতে গেলাম ছবিঘরে। ঘরের মধ্যে একটা চৌকি একধারে। ও ঘরে এমনিতে মা খুব কমই রাত কাটাত বলে বিছানা পাতাও ছিল না, আমরা কম্বল-টম্বল পেতে চাদর দিয়ে ঢেকে একটা অস্থায়ী বিছানা করে শুয়ে ঘুমোলাম।
খুব ভোরবেলা, প্রায় শেষরাত্রে ঘুম থেকে আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল মা। উঠে দেখি মা একেবারে সব সেরে স্নান-টান করে পাটভাঙা কাপড় পরে তৈরি। আমায় বলল, "শিগগির সব সেরে স্নান-টান করে আয় একেবারে। তোর সঙ্গে কথা আছে।"
আমিও দৌড়ে গিয়ে সব সেরে ভাল করে স্নান করে এলাম। শুকনো কাপড় পরে, শুকনো গামছা দিয়ে ভেজা চুল জড়িয়ে খোঁপা করে মায়ের কাছে এসে বললাম, "এইবারে বলো কী বলবে। কী জন্য আলো ফুটতে না-ফুটতে ডেকে তুললে?"
মা হাসল, তখন ভোরের আলো আস্তে-আস্তে ফুটছে চরাচরে। মায়ের হাসিটার সঙ্গে ভোরের আলোর এত মিল! ঘরের কোণের মস্ত কাঠের বাক্স থেকে মা বের করে আনল তার কয়েকটা অসমাপ্ত কাজ। কয়েকটা আসন।
আমিও আসন সেলাইয়ের কাজ জানতাম, নানা রঙিন রেশমি ও পশমি সুতোয় চটের জমিনে নকশা তোলার কাজ মোটা সুচ দিয়ে, আমি পারতাম। আমার আগ্রহ দেখে মা নিজেই শিখিয়েছিল একসময়। মা বলল, "ওরিয়ানা, এই আসনগুলো তোকে সমাপ্ত করতে হবে। আমার এই ইচ্ছে।"
সেই থেকেই আমার ছবিঘরের দিন শুরু হল। খুব ভোরবেলা মা

উঠিয়ে দিত, আমি স্নানটান সব করে এসে বসতাম আসন সেলাই করতে। মা দেখিয়ে দিত একটু-একটু। প্রত্যেকদিন এক ঘন্টা এই কাজ ছিল একদম নিয়মের মতো, তারপরে মা প্রাতরাশ এনে দিত। মা নিজের প্রাতরাশও আনত আমারটার সঙ্গে, দু'জনে একসঙ্গে খেতাম। খেতে-খেতে কথা হত টুকটাক। অদ্ভুত একটা কোমল ভাললাগায় আমার ভিতর-বাহির ভরে যেত। মনে হত, মা যেন সত্যি হয়ে এসেছে আমার কাছে, তার আগে অবধি মা যেন কাছে থেকেও ছিল আমার অনেক দূরের।

খাওয়া হলে আমি স্কুলের পড়া নিয়ে বসতাম, স্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে গেলে সব গুছিয়ে রওনা দিতাম। প্রাতরাশ বেশি করে করা হত বলে তখন আর খেতে ইচ্ছে করত না, দুপুরে টিফিনের সময় খাওয়ার জন্য নানা রকম সুস্বাদু বিচিত্র খাবার মা গুছিয়ে দিয়ে দিত ব্যাগে।

ওই কয়েকটা সপ্তাহ যেভাবে মাকে পেয়েছিলাম, তেমন করে আর কোনওদিন পাইনি। একটা আসন সেলাই শেষ হল তিন সপ্তাহ বাদে। যেদিন সকালের আলোয় সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া সেই শিল্পকর্ম মা দেখল, মায়ের চোখে মুখে সর্ব অবয়বে এক অদ্ভুত শান্তি আর আনন্দের আলো জ্বলে উঠতে দেখলাম।

আমার কপালে আলতো চুমু খেয়ে মা বলল, "ওরিয়ানা, আমার ওরিন, তোকে আশীর্বাদ করি মামণি। তোর জীবন হবে অন্য রকম, অনেক বড়, অনেক ঘটনায় পূর্ণ। তোর জীবনের ধারা এই ছোট্ট জনপদের ছোট্ট বেড়া পার হয়ে চলে যাবে অনেক দূরে, অনেক বড়তে। কখনও যেন ভয় পাস না মামণি, আমি নিজে যেখানেই থাকি না কেন, আমার আশীর্বাদ সবসময় তোর সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে।"

অদ্ভুত আনন্দের সঙ্গে অদ্ভুত এক বিষাদ আমার মনটাকে যেন সাপটিয়ে ধরল। মাকে জড়িয়ে ধরে আমি কেঁদে ফেললাম। জ্ঞানবয়সে সেই প্রথম কান্না আমার। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললাম, "মা, তুমি এমনভাবে কেন বলছ? তুমি কোথায় যাবে? তোমাকে কোথাও যেতে দেব না। তুমি আমার কাছে থাকবে।"

মা আশ্চর্য এক আকাশ-ছোঁয়া হাসি হেসে বলল, "দূর বোকা, কাঁদছিস কেন? যে ডাক এলে সবাইকেই চলে যেতে হয়, সেই ডাক আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আমার জন্য শোক করিস না। আমি জানি আমার জীবনের আসল মন্ত্রটুকু হারিয়ে যাবে না, সে আমি তোর মধ্যে রেখে গেলাম।"

ওইদিনের কথাটা আজও এত স্পষ্ট মনে আছে! এত বছর পরেও! তার তিনদিন পরে, তখন শেষ দুপুর গড়িয়ে বিকেলে মিশছে, আমায় স্কুল থেকে ডেকে নিয়ে এল মিরি। ওর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আশঙ্কা করেছিলাম তা ঘটে গিয়েছে। মিরি আমায় বিস্তারিত কিছুই বলেনি, শুধু বলেছিল, "বাড়িতে জরুরি প্রয়োজন।" আমি যখন বাড়ি এসে পৌঁছলাম তখন বড় উঠোনে লোকে লোকারণ্য। মা উঠোনের মাঝে বড় চৌকিতে শায়িত। দেখে মনে হয় যেন সর্বকর্ম সমাপ্ত করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মধ্যযৌবনের সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্যে পরিপূর্ণা এক নারীকে এমনভাবে চিরঘুমে ঘুমিয়ে পড়তে আগে কেউ দেখেনি বুঝি, তাই সকলের গভীর বিস্ময়। আর প্রিয়জনদের শোক তাকে ঘিরে, তারও প্রকাশ সংযত। ভরা সংসার রেখে এমন বিনা রোগভোগে শান্ত ঘুমের মধ্যে প্রয়াণ পুণ্যের ও সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে বলছিল অনেকে।

আমি শান্ত হয়ে বসে রইলাম মায়ের পায়ের কাছে, চারিপাশের সমস্ত শব্দ, আলো, মানুষদের কথাবার্তা, নড়াচড়া সব কিছু আমার কাছে কেমন কুয়াশাপরদার ওপারের ছবি হয়ে গেল। শুধু সমুদ্র গর্জনের মতো মায়ের সেদিনের কথাগুলো কানে বাজতে লাগল, "যে ডাক এলে সবাইকেই চলে যেতে হয়, সেই ডাক আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আমার জন্য শোক করিস না। আমি জানি আমার জীবনের আসল মন্ত্রটুকু হারিয়ে যাবে না, সে আমি তোর মধ্যে রেখে গেলাম।"

তা হলে সত্যি-সত্যিই মা জানতে পেরেছিল!

পরে শুনেছিলাম মা সেদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেবে বলে বড় ঘরের মেঝেয় বিছানা করে শুয়েছিল, পাশেই ছিল মিরি আর মিস্তা। মিস্তার স্কুল সেদিন ছুটি ছিল আর মিরির তো ততদিনে স্কুল পাস হয়ে গিয়েছে। মিরি, মিস্তা ঘুমিয়ে পড়েছিল, একসময় মিস্তার ঘুম ভেঙে যায়, সে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে। তারপরে মায়ের দিকে চেয়ে কেমন ভয় পেয়ে যায়, মিরিকে ডেকে তোলে। মিরি উঠে দেখতে পায় মা একদম চিরঘুমে ঘুমিয়ে গিয়েছে। ও নিজেই নাড়ি দেখে তারপরে ছুটে গিয়ে সবাইকে ডেকে তোলে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্মৃতি থেকে ছিঁড়ে আসি, মিরির দিকে চেয়ে বলি, "দেখতে-দেখতে কত কাল হয়ে গেল। অথচ মনে হয় এই তো সেদিন! সেই থেকেই তো আমি স্থায়ী ভাবে ছবিঘরে থাকি। মায়ের আসনগুলো শেষ করতে কয়েক মাস লাগল, তারপর নিজের ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।"

মিরি কোমল গলায় আমায় বলল, "তোকে আমি তখন কত কটুকথা বলেছি, এমনকী পরোক্ষভাবে মায়ের মৃত্যুর জন্যও দায়ী করেছি তোকে! অকারণে, একদম অকারণে। আসলে আমার ঈর্ষা ছিল, আমাদের সবাইকে বাদ দিয়ে মা তোকে তার নিজের সবটুকু দিয়ে গিয়েছিল বলে। তখন তো জানতাম না, যে তোকে ছাড়া আর কাউকে সেই অসামান্য উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে পারত না মা। তুই যে আমাদের সকলের চেয়ে কত আলাদা, কত অন্য রকম ঐশ্বর্য তোর মধ্যে, তখন তো বুঝিনি। যদি পারিস, আমায় ক্ষমা করিস বোন।"

মিরি ঝরঝর হয়ে কাঁদতে থাকে, আমি নিঃশব্দে চেয়ে থাকি, কেমন অদ্ভুত মনে হয় সমস্ত দৃশ্যটা। এসব কি ঘটছে বাস্তবে? নাকি স্বপ্ন?

চেয়ে থাকতে-থাকতে আমার চোখও ঝাপসা হয়ে আসে অশ্রুতে। মহাকালের রুদ্ধ কষ্ট আর বেদনার পালকগুলো যেন কোন ভিতরের দরজা ঠেলে বের হয়ে আসতে থাকে। সেই সব সময়ে, যখন মিরি আমার নামে বানিয়ে-বানিয়ে কত সব মিথ্যে অভিযোগ করত আশপাশের লোকেদের কাছে, তারা হয়তো সেসব বিশ্বাস করত না, অথবা হয়তো করত।

আমি নিজে মিরিকে চ্যালেঞ্জ করিনি কোনওদিন, বরং উপেক্ষা করতাম ওই সব অসত্য অভিযোগকে। মনে করতাম আমার কিছু এসে যায় না, যে মিথ্যে বলছে তার অন্যায় হচ্ছে, সে ফল পাবে, আমার কী? অথচ কোথাও একটা বেদনা ঠিকই থেকে যেত, আমি লুকিয়ে ফেলতাম, নিজেকেও জানতে দিতাম না।

একসময় মিরির কান্না থামল, অনেক জল ঝরিয়ে মনে হয় হালকা হয়ে গেল ওর হৃদয়। ওড়নার প্রান্তে চোখ মুছতে-মুছতে আমার দিকে চেয়ে দেখল। দেখেই অবাক হয়ে গেল। সরাসরি জ্যোৎস্না পড়েছিল আমার মুখে, ও যখন মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল তখন বুঝি চোখের জল দেখে ফেলল। আমিও মুখ ছায়ায় সরিয়ে নিতে ভুলে গেলাম।

মিরি আমার মাথাটা আলতো করে টেনে নিল নিজের বুকের মধ্যে, আমি সরে গেলাম না। চুপ করে রইলাম। এই মিরি, আমার দিদি, বয়সে আমার থেকে মাত্র কয়েক বছরের বড়। সেই ছোট্ট থেকে আমার সঙ্গে তার কেমন এক অদ্ভুত শত্রুতার সম্পর্ক! ছোটবেলা মিরিকে হয় ভয় করেছি না হয় ঘৃণা করেছি, পরে বড় হয়ে এক ধরনের তাচ্ছিল্য মেশানো করুণা করেছি মিরিকে।

এখন সেই মিরিকেই মনে হচ্ছিল মায়ের মতো, সেই আমার বারো বছর বয়সে চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলা মা যেন এই কয়েক মুহূর্তের জন্য ফিরে এসেছে মিরির মধ্যে। আর একটু পরেই হয়তো

ভারতের পৌরাণিক ও লৌকিক গল্প

গ্রাফিক নভেল

◆ সীতা

◆ কৃষ্ণ

◆ রাবণ

Bengali Comics,
Paperback edition

Kids Fairytales

series of
25
storybooks

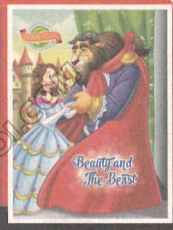

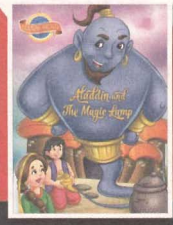

treasury of stories guaranteed to
delight and entertain young children

ছোটোদের রামায়ণ

infinite learning

chhaya prakashani pvt. ltd.

1 Bidhan Sarani, Kolkata 700 073, India
Dial : +91 033 4004 6776, 2257 3157

মিরির মধ্যে এই ভাব আর থাকবে না, হয়তো আবার সে কঠোর হয়ে উঠবে, আবার নিষ্ঠুরতা করতে চেষ্টা করবে আর আমি কঠিন উপেক্ষার বর্মে তা প্রতিহত করব। আবার নিত্যকার লড়াই শুরু হবে আমাদের। তবু এই মুহূর্তটুকু আর-একটু দীর্ঘ হোক, মনে-মনে প্রার্থনা করছিলাম।

মিরি আমার চুলে বিলি কাটতে-কাটতে বলল, "ওরিন, আমি আগামিকাল চলে যাচ্ছি। রাইনা দ্বীপে একটা হাসপাতালে কাজ পেয়েছি। প্রথম একমাস ট্রেনিং চলবে, তারপরে কাজে যোগ দিতে হবে।"

আমি ওর বুক থেকে মুখ তুলে অবাক হয়ে যাওয়া বড়-বড় চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কোনও কথাই বলতে পারলাম না এতখানি অপ্রত্যাশিত ছিল খবরটা।

পরে ভেবে দেখেছি অত অবাক হওয়ার সত্যিই কোনও কারণ ছিল না আমার। মিরি আগেও আমাদের আনুনা জনপদের একটা চিকিৎসালয়ে কাজ করেছে সাময়িকভাবে। কয়েক মাস। তারপরে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল বিয়ের আগে, বিয়ে করে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। আবার বিচ্ছেদ নিয়ে ফিরেও এসেছিল। কিন্তু চিরকাল ও আমাদের ওখানেই থেকে ওইভাবে আমার দেখভাল আর জোরজার করা খবরদারি করে যাবে, সেটাকেই কি খুব একটা স্বস্তির ব্যাপার মনে হত আমার?

আমার নিজের জীবনেরই কি কোনও স্থিরতা ছিল? প্রতিটা মুহূর্তেই

মায়ের ভিতরে লুকিয়ে ছিল এইসব কথা, এই এত স্নেহ? এমন এক স্নিগ্ধ ভালবাসার ঝরনা যা মিটিয়ে দিতে পারে জন্মজন্মান্তরের তৃষ্ণা?

কি অনেক অনেক দূরের কোনও ডাকের জন্য আশা আশঙ্কায় দুলত না আমার মন?

মিরি আস্তে-আস্তে বলতে থাকল, "কাল দুপুরের জাহাজে আমার যাওয়া। বাড়ির সবাইকে আগেই জানিয়েছি, কেবল তোকে জানানো বাকি ছিল। তুই তো আসলে হয় নিজের কাজে মগ্ন থাকিস নয়তো মুইনুখে যাস, তাই বলার ফুরসত পাইনি। আমি মিন্তাকে আর সহালাকে (আমাদের খুড়তুতো বোন, মিন্তার বয়সি) ভাল করে বলে রেখেছি, ওরা তোর কাজকর্ম করে দেবে, ছবিঘর ঝাটপাট দেওয়া, জিনিসপত্র গোছানো, এইসব কাজ করে দেবে। তোর খাবারও ছবিঘরে এনে দেবে। তোর কোনও অসুবিধা হবে না, দেখিস।"

আমি এইবারে হেসে ফেলি, বলি, "উফফ মিরি, তুমি এমন করছ যেন আমি একটা ছ'-সাত বছরের বাচ্চা। আরে, এইসব কাজ আমি করতে পারি না বুঝি? আর খাবার ছবিঘরে এনে দেবেই বা কেন? বরং আমারই তো উচিত বড় রান্নাঘরে গিয়ে মাঝে-মাঝে রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করা, জোগাড়যন্ত্র করে দেওয়া, কুটনো কুটে দেওয়া এইসব। সত্যি বলতে কী আমি ঠিক করেছি, যেসব দিনগুলোয় মুইনুখ যাওয়া থাকবে না, আমি বাড়ির রান্নার সাহায্য করব।"

মিরি কেমন আচ্ছন্ন গলায় বলে, "তুই শিল্পী মানুষ। তোর কাজ যে অনেক বড়, অনেক উঁচু, ও-ও-ওই আকাশের মতো উঁচু। ঘরকন্নার কাজে সময় নষ্ট কি তোর উচিত? তোর এইসব ঘরোয়া কাজ করতে হবে না, মিন্তাও সেই কথাই বলল। তুই শুধু তোর ছবি আঁকা চালিয়ে যা। দেখবি, একদিন তুই অনেক বড় হবি, তোর স্বপ্নের মতো বড়।"

আমি নিঃশব্দে পড়ে থাকি, কথার কি কোনও জবাব হয়? আজ মিরি একদম বদলে গিয়েছে যেন, এমন করে কথা ও এমনিতে বলে না। আজ যেন ওর মধ্যে অন্য কেউ ভর করেছে।

জ্যোৎস্নাভরা আকাশের নীচে অনেক রাত অবধি পড়ে থাকি আমরা দুই বোন, মিরি কত কথা বলে যায়, মাঝে-মাঝে আমি টুকটাক একটা-দুটো কথা বলি। এইভাবে ঘণ্টার পর-ঘণ্টা কেটে যায়।

রাত শেষ হওয়ার কিছু আগে আমরা ছবিঘরে ঢুকি একটু ঘুমিয়ে নিতে। মেঝেয় যেমন তেমন বিছানা করে গড়িয়ে পড়ি। সমস্ত শরীরভরা এক মধুর ক্লান্তি আমাকে মুহূর্তে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। জানি না মিরি ঘুমিয়েছিল কিনা। ও যখন পরদিন আমাকে ঘুম থেকে তোলার জন্য ডাকল, তখন ভালমতো রোদ উঠে গিয়েছে। দেখলাম মিরি একেবারে স্নানটান করে তৈরি। দ্রুত সকালের কাজ সেরে নিয়ে স্নান করে তৈরি হলাম। আজ যে মিরির যাওয়া!

মিরিকে বিদায় দিতে দুপুরে বাড়ির আরও পাঁচজনের সঙ্গে জাহাজঘাটায় গেলাম আমিও। মিরির হাতে ছোট একটা ব্যাগ, ওতেই কয়েকটা কাপড়জামা আর টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে দিয়েছিলাম ওর কথামতো। আর কিছুই নিতে চাইল না, বলল এই প্রথম যাচ্ছে, কোথায় থাকবে না-থাকবে জানে না, বেশি জিনিস নিয়ে গেলে অসুবিধে। পরে আবার মাসতিনেক বাদে বাড়ি আসবে, তখন জিনিসপত্র ভাল করে গুছিয়ে নিয়ে যাবে।

জাহাজ এসে গেল, আমাদের সবাইকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে মিরি উঠে পড়ল। ওদের জাহাজ যখন চলতে শুরু করেছে, আস্তে-আস্তে দূরে সরে যেতে-যেতে ছোট হয়ে আসছে জাহাজের অবয়ব, তখন অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল আমার।

মনে হল আমার দূরযাত্রার জাহাজও এখান থেকেই ছাড়বে, খুব শিগগিরই। তখনও পর্যন্ত যদিও সেরকম কোনও সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি জীবনের কোনও দিগন্তেই, কিন্তু মনে হল বড় পরিবর্তন আসে হঠাৎ, ঝড়ের মতো। উড়িয়ে নিয়ে যায়।

ঠিক তাই হল। ওইদিনের পরদিনই মুইনুখ যাওয়া ছিল, সেইদিন দুপুরেই সেই সব ওলটপালট করে দেওয়া ঝড় এসে আমার আর আরেনুশের জীবনকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে চলল অজানায়।

{৫}

ওই আশ্চর্য দিনটার ঠিক দু'সপ্তাহ পর। মজবুত জাহাজে করে ভেসে চললাম আমি আর আরেনুশ। সম্ভালার দিকে।

অভূতপূর্ব সৌভাগ্যে আমরা মূক হয় থাকি দু'জনেই। সমুদ্রের নীল জলের দিকে চেয়ে আমরা চুপ করে বসে থাকি জাহাজের ডেকে। সাদা ফেনার ফুল উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে প্রপেলারের ঘূরণ লেগে। সম্ভালা থেকে অনুমতি শুধু না, কাজও পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য কাজ না পেলে আমাদের অনুমতি পাওয়াই বা সম্ভব হত কী করে? আরেনুশ কাজ পেয়েছে ভাস্কর্যের, আমি ছবি আঁকার।

যদিও আমরা আশাই করিনি, কিন্তু অনুমতি পাওয়া গিয়েছে সম্ভালার, অধ্যয়নের সুযোগও পাওয়া গিয়েছে। না-না, যোগের স্কুলে নয়, অত যোগ্যতা আমাদের কোথায়? মোটামুটি দিন চলা পরিবারের মেয়ে আমি। লেখাপড়া সাধারণ স্কুলে, সম্ভালার ভাষা অবশ্য আমরাও শিখেছি স্কুলে অল্পস্বল্প। তরতর তরতর করে বলতে

পারব না অবশ্য, কিন্তু কাজ চালাবার মতো বলতে পারি যেমন তেমন ভেবে নেবেন। এখন এই সাঁই সমুদ্রোত্রায় অনেক অভাব কথা যাবে ভাষা আমাতে আর আরেনুশে মিলে।

আরেনুশের অবস্থা আমার চেয়ে ও সঙ্গিন। ওর কেউই নেই, ওর মা আর বাবা দুজনেই পরলোকে যান ওর জন্মের কিছুকাল পরেই, দুজনেরই অদ্ভুত অসুখ। অসুখ করেছিল। ওর ঠাকুরদা আর ঠাকুরমা চেষ্টাবেলায় মানুষ করেছিলেন, তাঁরা পরলোকে যাওয়ার পর আরেনুশ একদমই একা। ওদের কিছু জমিজমা ছিল, সেসব থেকে সামান্য আয় হয় আর ও মূর্তি-টুর্তি বানিয়ে যা বেচতে পারে, তা থেকে যা হয়। ভাবলে অবাক লাগে, সেই আমরাই কিনা চলেছি সঙ্গালা!

আমাদের মনে পড়ছিল সেই দিনের কথা, অদ্ভুত বুড়ো মানুষটার সঙ্গে যেদিন দেখা হল। খর্বনাসা বিরলকেশ খরসা হাসিখুশি বুড়ো মানুষটির সঙ্গে সেদিনই প্রথম দেখা আমাদের। ওই যে সেদিন, সেদিনের কথা বলছিলাম।

আমি আর আরেনুশ সুবর্ণদ্বীপের মুইনুখ শহরে গিয়েছিলাম ছবি আর মূর্তি বিক্রি করতে, ছবি টবি, মূর্তি টুর্তি সব সাজিয়ে বসেছিলাম আগিনদাদ্র দোকানে যেমন বসতাম সপ্তাহের তিনদিন করে। সেদিন দুপুরবেলা বিকিয়ে পড়েছিল বাজার, লোকজন পয়সা বেশি ছিল না, আলসাজড়িত হয়ে পড়ে ছিল পণ্যহাট সব, লোকজন প্রায় সবাই ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করছিল, দ্বিপ্রাহরিক আহারের পরে প্রায় সবাই একটু ঘুমিয়ে নেয়। আমাদের আগিনদাদও বাড়ি চলে গিয়েছিলেন দুপুরের খাওয়া সেরে আর সামান্য বিশ্রাম করতে। আমি আর আরেনুশ দোকানে বেরেই ছিলাম, দুপুরে আমরা অন্ন খেতাম বলে ঘুম পেত না, বলা যায় না, দুপুরবেলাও তো খরিদ্দার আসতে পারে।

ওই সময়েই হাসিমুখ সেই বৃদ্ধ এসে দোকানে ঢুকেছিলেন আর আরেনুশের তৈরি কালো পাথরের একটি ক্ষুদ্র মূর্তির উপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপরে ভাল করে সব চোখ আরও সরু করে দেখছিলেন আমাদের ছবি আর মূর্তিগুলো। যত দেখছিলেন তত ওর সন্দেহ হাসিতে আলো জ্বলে উঠেছিল বেশি বেশি করে।

ভাবনা ছিঁড়ে যায় সামনের দৃশ্যে। একঝাঁক উজ্জ্বল মাছ লাফিয়ে উঠল সমুদ্রের নীল জল থেকে, রোদ্দুরে কেমন ঝিকমিক করে উঠল। তারপরেই আবার জলে ডুব দিল।

ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠি আমি, আরেনুশের হাত চেপে ধরে বলি, "দেখছে তুমি, আরেনুশ দেখছো কী সুন্দর, নয়?"

আরেনুশ হাসে, চাপা গলায় বলে, "এরকম কোরো না, এরকম বাচ্চাদের মতো করলে লোকে কী বলবে? চুপচাপ বসে-বসে দাখো না।"

চুপ করে বসে দেখতে থাকি। ঝকঝকে রোদ্দুরে হিরের কুচির মতো জ্বলছে সমুদ্রজল, আকাশ কী অপূর্ব নীল। সিগালগুলো উড়ছে। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ওরা বেশ অনেক দূর অবধি যাবে। তারপরে গভীর সমুদ্রে পড়লে তখন কী হবে কে জানে! কোনওদিন তো আগে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিইনি। কেবল কল্পনা করেছি।

যেদিন আমরা সঙ্গালায় রওনা হলাম, সেইদিন জাহাজঘাটে আমার বাড়ির লোকেরা সবাই এসেছিল বিদায় জানাতে। আরেনুশের বাড়ির লোক তো কেউ নেই, ওর বন্ধুবান্ধবরা এসেছিল অনেকে। আমি এই ভিড়ের মধ্যে কেবল একটি মুখ খুঁজছিলাম, নিজনির মুখ। নিজনি দৌড়তে-দৌড়তে যখন এল, তখন জাহাজ ছাড়তে আর

বেশি দেরি নেই। জাহাজে উঠবার সঙ্কেত দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
নিজনি এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু, তারপরে মৃদুস্বরে বলল, "ওরিয়ানা, তা হলে চললি? দূর অজানায়? জানিস, আমি মনে-মনে জানতাম, তোরা চলে যাবি। কিন্তু সে যে এত তাড়াতাড়ি, তা বুঝতে পারিনি। আমার সেই নির্জন দ্বীপের গল্পটা আর বলা হল না তোকে।"
এই কথা বলে এক মুহূর্তের জন্য কেমন ছায়াময় হয়ে এসেছিল নিজনির মুখ, তারপরেই আবার মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা রোদ্দুরের মতো হেসে উঠে বলল, "কে বলতে পারে, হয়তো কোনওদিন আবার আমাদের দেখা হবে?"
আমি হেসে বলেছিলাম, "আরে দেখা তো হবেই। আমরা কি চিরকালের মতো চলে যাচ্ছি নাকি? লম্বা ছুটি পেলেই দেশে আসব তো বেড়াতে। তখন তো দেখা হবেই।"
নিজনি রহস্যময় হেসে বলল, "এমনও তো হতে পারে, হয়তো আমিই চলে গেলাম সঙ্গালায়।"
আমি খুশি হয়ে ওর হাতে অল্প চাপ দিয়ে বলি, "খুব ভাল হবে, খুব ভাল হবে তা হলে।"
নিজনি নিজের জামার ভিতর থেকে একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক বের করে আমায় দিল, বলল, "আমার দেওয়া সামান্য উপহার। তোরা জাহাজে উঠলে যখন তোদের নিয়ে জাহাজ চলতে শুরু করবে তার আগে মোড়ক খুলবি না।"
হ্যাঁ, জাহাজ চলতে শুরু করার পরেই খুলেছিলাম। একটা রেশমি রুমাল, উজ্জ্বল নীল রঙের। তাতে সোনালি রঙের এক উড়ন্ত পাখি, সোনালি রেশম সুতোর কাজ। নিজনি যে এত ভাল সূচিকর্ম করতে জানে, কোনওদিন তো টের পাইনি!
রুমালটা মুঠো করে বুকে চেপে ধরেছিলাম, কেমন একটা আশ্চর্য অনুভূতিতে ভরে গিয়েছিল মনটা, সে অনুভূতি বর্ণনা করতে পারি না, ভালবাসা ও বিষাদ তাতে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে আছে।
কে জানে কবে আবার দেখা হবে নিজনির সঙ্গে! একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়ে দিই। রুমালটা জামার ভিতরে গুঁজে রেখেছি। হালকা একটা চন্দনের সুগন্ধ আছে রুমালটায়। বাক্সে-টাক্সে রাখতে ইচ্ছে করে না এই উপহার, সবসময় কাছে কাছে রাখতে ইচ্ছে করে, ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।
স্মৃতি থেকে বাস্তবে ফিরে আসি, আরেনুশ বলছে, "ওরিয়ানা, ওই দ্যাখো, ওই দ্বীপে আছে একটা আগুনপাহাড়। এখন ঘুমন্ত। অনেকদিন আগে ওই পাহাড়ের জ্বালামুখ থেকে বেরিয়েছিল ধোঁয়া আর আগুন, গড়িয়ে নেমেছিল জ্বলন্ত লাভা। অনেক আগুন উগড়ে তারপরে আবার ও ঘুমিয়ে পড়েছে।"
আমাদের জাহাজ তখন দ্বীপটার খুব কাছ দিয়েই যাচ্ছে, দ্বীপটা সবুজে সবুজ। চেয়ে দেখি আগুনপাহাড়টার দিকে, এখন গাছপালায় লতাগুল্ম একেবারে পুরো ঢেকে আছে ওই পাহাড়ে। বিশ্বাস হয় না একদিন ও অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েছিল। কে জানে এখনও হয়তো ওর বুকের গভীরে আছে সেই আগুন, যে কোনওদিন জেগে উঠে বেরিয়ে আসতে চাইতে পারে জ্বালামুখ দিয়ে।
আরেনুশ বলল, "জানো, ওই আগুনপাহাড়ের জ্বালামুখে এখন একটা হ্রদ তৈরি হয়েছে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয়ে হয়ে। আমার এক বন্ধু একবার দেখতে গিয়েছিল।"
আমি আচ্ছন্ন মুগ্ধ গলায় বলি, "দারুণ তো! আগুনের পাহাড়ের মাথায় টলটলে জলের এক হ্রদ। ধ্বংসের বুক থেকে উঠে আসা নতুন সৃষ্টি। স্নিগ্ধ, করুণাময়।"
আরেনুশ জোরে হেসে ওঠে, বলে, "তুমি একেবারে যাকে বলে সবসময় কাব্যি করা মানুষ। বাস্তব এত কবিতার মতো স্নিগ্ধ হয় না ওরিয়ানা। তুমি তো জানো, জানো না?"
আমি কিছু না বলে আচ্ছন্ন চোখে চেয়ে থাকি দ্বীপের দিকে, জাহাজ দ্বীপের থেকে যত দূরে চলে যেতে থাকে, ততই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসে দ্বীপ। একসময় দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায় দ্বীপ। তখন আমি অশ্রুঝাপসা চোখ আরেনুশের দিকে ফেরাই, ও আমার চোখে জল দেখে অবাক হয়ে যায়। আলতো করে আমার হাত ধরে বলে, "কী হল, কাঁদছ কেন?"
আমি অপ্রস্তুতের মতো একটু হাসি, হাতের পাতায় চোখ মুছতে-মুছতে বলি, "পথের পাশে রেখে চলে যাওয়া দ্বীপটুকুর জন্য মনে কেমন করে।"
আরেনুশ হাসে, বলে, "তুমি সত্যি একটা পাগলি।"
এর পরে দিন যায়, রাত কাটে। দীর্ঘ যাত্রাপথ আমাদের। নীল জলের বুক চিরে জাহাজ চলে, আমরা ডেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাওয়ার স্পর্শ নিই। বেশির ভাগ সময়েই ডেকে থাকি আমরা, শুধু দরকারে ভিতরে যাই। আমাদের আলাদা কেবিনও নেই, বড় গণ-কেবিনে শোওয়ার ব্যবস্থা। রাত্রেও আমরা অনেক রাত অবধি ডেকে বসে-বসে আকাশের তারা দেখি, শেষ রাতে ঘুমোতে যাই। এখন পর্যন্ত আবহাওয়া খুব ভাল, আকাশ একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার।
এক রাত্তিরে তারা ঝমঝম আকাশের নীচে বসে ছিলাম আমি আর আরেনুশ পাশাপাশি। একসময়ে ভাল করে তারাগুলো দেখার জন্য শুয়েই পড়লাম দু'জনে। কত-কত তারা! তারায়-তারায় কত বিচিত্র নকশা। ওগুলোকে বলে নক্ষত্রমণ্ডল। কিছু-কিছু চিনতাম আমি আগে থেকেই, এখন আরেনুশ আমাকে অন্যগুলো চিনিয়ে দিচ্ছিল। ওর ঠাকুরদা নাকি ওকে সব চিনিয়েছিলেন।
মধ্যরাত্রি নীল আকাশে ঝকঝকে ওই তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে কেমন এক আশ্চর্য ভয়-ভয় ভাল লাগায় ভরে ওঠে হৃদয়। অকারণেই আরেনুশের দিকে ঘেঁষে আসি, ফিসফিস করে বলি, "আরেনুশ, এই আরেনুশ!"
ও আচ্ছন্ন হাসে, ফিসফিস করে বলে, "কী? কী হল?"
আমি তেমনই ফিসফিস করে বলি, "ওই তারাগুলো অনেক অনেক দূরের সূর্য, তাই না?"
ও বলে, "তাই তো। অনেক অনেক দূরের। ওদের কাছে যেতে গেলে আলোরও লেগে যায় বছরের পর-বছর। আলো সবচেয়ে জোরে ছোটে, সেকেন্ডে পৃথিবীর পরিধির সাতশুণের বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে, অথচ সেই আলোরও লেগে যাবে এত বছর। কত দূরে, কত দূরে ওরা!"
আমি ফিসফিস করে বলি, "ওখানে ওইসব তারাদের ঘিরে আমাদের পৃথিবীর মতো কত-কত গ্রহ আছে নিশ্চয়ই। ওইরকম কোনও গ্রহে সমুদ্রে ভাসছে হয়তো কত জাহাজ। সেই জাহাজের একটায় হয়তো আমাদের মতো দুইজন মানুষ বসে বসে তাদের রাত্রের আকাশ দেখছে। আমাদের সূর্যটাকে হয়তো দেখছে ছোট্ট একটা তারার মতো। ঠিক আমাদের মতোই হয়তো ওরাও কল্পনা করছে ওই দূরের তারার কোনও গ্রহজগৎ আছে কিনা, থাকলে সেখানের প্রাণীরা কেমন। ওহ আরেনুশ কী করে বলি ওদের, 'আমরা আছি আমরা আছি গো!' "
আরেনুশ হাসে, বলে, "তুমি একটু পাগলি গোছের বলে এমন রোম্যান্টিক সুরে বলছ। আসলে হয়তো ব্যাপার খুবই অন্য রকম। ওইখানে হয়তো যারা উন্নত প্রাণী, তারা আমাদের মতো মোটেই না। হয়তো তাদের ইয়া-ইয়া লম্বা-লম্বা শুঁড়, অক্টোপাসের মতো। হয়তো ওরা আমাদের মতো কথা বলে না, অন্য রকম ভাবে যোগাযোগ করে।"
অক্টোপাসের মতো লম্বা-লম্বা শুঁড় শুনে আমি হাসি আটকাতে পারি না, আমার হাসি দেখে ও-ও হাসে। বেশ অনেকক্ষণ হাসতে থাকি আমরা।

তারপরে জ্বলজ্বলে একটা বড় কমলা তারার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলি, "তোমার কী মনে হয় আরেনুশ, ওই তারাটার চারপাশে গ্রহ আছে?"
আরেনুশ বলে, "ওই তারাটা খুব বৃদ্ধ তারা, আর হয়তো কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যে ওই তারা বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। ওখানে গ্রহমণ্ডল না থাকাই ভাল।"
আমার চোখ বড়-বড় হয়ে যায়। বলি, "বৃদ্ধ তারা? তারা বুড়ো হয়? আর কী করে তুমি জানো ওই তারা বুড়ো? আর বুড়ো তারা বিস্ফোরিত হয় তাই বা কী করে জানো?"
আরেনুশ অল্প হাসে, বলে, "এখন কেমন করে সব তোমায় বলি? পরে সময় হলে সব বলব। আমার ঠাকুরদা অনেক কিছু আমায় শিখিয়েছিলেন, ওঁর কাছে নানা রকম বইপত্র আর ছবি ছিল। সেইসব থেকে উনি আমায় শিখিয়েছিলেন।"
আমি চুপ করে তারাটার দিকে চেয়ে থাকি, কেমন একটা রহস্যময় তরঙ্গ আমার ভিতরটা অল্প-অল্প কাঁপাতে থাকে। ভয়-ভয় একটা অনুভূতি যদিও, কিন্তু শুধু ভয়ই না, ওই কম্পন অদ্ভুত সুখের এক কম্পন। মনে হয় আরেনুশ যেন এক রহস্যলোকের প্রহরী, একদিন সে আমাকে জানাবে অনেক-অনেক অজানা কথা, অনেক নিগূঢ় সব তথ্য আর তত্ত্ব। হয়তো আমি সেসবের অনেকটাই বুঝব না, কিন্তু জানতে পেরেই আমার জীবনটুকু কানায়-কানায় ভরে যাবে। রাত বইতে থাকে, আমাদের চোখ ঘুম-ঘুম হয়ে আসতে থাকে। আকাশে ঝিকমিকে তারাগুলোর মধ্য দিয়ে হালকা সাদা মেঘের মতো ওই দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছে ছায়াপথ। যেন আশ্চর্য এক বিস্ময়লোকের দুয়ার। এত স্পষ্ট আগে কখনও দেখিনি। নিজনির ঠাকুরমা ছোটবেলা আমাদের গল্প বলতেন ওই ছায়াপথ নিয়ে, বলতেন ওই পথ হল প্রয়াত মানুষের আত্মার স্বর্গে যাবার পথ, তেমনই তিনি শুনেছেন তাঁর দিদিমার গল্পে। স্বপ্নের মতো ছোটবেলার ওইসব সন্ধ্যারাত্রের কথা মনে পড়ে, কোনও-কোনও বিরল সন্ধ্যায় নিজনির সঙ্গে বসে ওর ঠাকুরমার গল্প শুনতাম তারাভরা আকাশের নীচে, মিরি ডাকতে এলেই আমাদের আসর ভেঙে যেত।
আমাদের গল্প আর হাসির মাঝখানে রাগী ঝড়ের মতো এসে হাজির হত মিরি, সপ্তমে গলা তুলে বলত, "সন্ধে পেরিয়ে কখন রাত নেমে গেছে, এই মেয়ের ঘরে যাওয়ার নাম নেই! চল, শিগগির চল। পড়তে বসবি না? মা খুব রেগে আছে, চল, তাড়াতাড়ি চল।"
ছায়াপথের গল্প থেকে নিজেকে ছিঁড়ে এনে আমাকে বলতে হত, "হ্যাঁ যাচ্ছি চলো। এত চিৎকার করতে হবে না। আসি রে নিজনি, আসি গো ঠাকুরমা।"
আমরা ফেরার পথ ধরতাম, মিরি কেমন চুপসে যেত যেন, হয়তো ওর এত চিৎকারের উত্তরে আমার অমন ধীরস্থির ঠান্ডা মাথা প্রতিক্রিয়ায়।
এত কাল পরে দেশ-গাঁ ছাড়িয়ে এত দূরে চলে আসার পরেও আর সবাইকে বাদ দিয়ে মিরির কথাই কেন বারেবারে মনে পড়ে? আমার বিদায়ক্ষণে মিরি আসতে পারেনি জাহাজঘাটায়, ও তখন দূরের দ্বীপের হাসপাতালে কাজ করছে। ওকে খবরও দেওয়া যায়নি, এত তাড়াতাড়ি সব কিছু ঠিক হয়ে গেল। এখন ভাবলে কেমন মনখারাপ লাগে। পরে যখন ওকে সবাই জানাবে, ও কে জানে কী মনে করবে! ও কি দুঃখ পাবে? ওকে জানানো হয়নি বলে? ও কি কোনওদিন আমাকে অনুযোগ করে বলবে "তোর দুটো হাত ধরে তোকে শুভেচ্ছা দিতে চেয়েছিলাম বিদায়ক্ষণে, তুই সে সুযোগ আমায় দিলি না ওরিন?" নাকি কিছুই মনে করবে না? আমার কী হল না হল তাতে ওর হয়তো কিছুই যায় আসে না। আমাকে একদিন আগে মাত্র জানিয়ে তার পরেই তো সেও চলে গেল দূর দ্বীপে?
জোর করে মিরির ভাবনা মন থেকে মুছে ছায়াপথের দিকে চেয়ে থাকি, সেই ছোটবেলা মনে করতাম সত্যিই যদি মৃত মানুষের আত্মা ওই পথ দিয়ে ভেসে যায় স্বর্গে, তা হলে এই আমাদের প্রয়াত প্রিয়জনের আত্মাও তো নিশ্চয়ই ওই পথেই গিয়েছেন। একদিন আমরাও যাব। আমাদের দেখা হবে আবার?
মা অকস্মাৎ চলে যাওয়ার পরে বারেবারেই মনে হত ও কথা। তার পরে বড় হতে-হতে সংসারের নানা অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে কবে যেন শক্ত বর্মধারী হয়ে গেলাম! বিশ্বাসের ঘরটা বন্ধ করে দিলাম শক্ত করে। সন্দেহবাদী হয়ে গেলাম।
আজ এই নির্জন রাত্রে এই বিশাল বারিধির বুকের উপরে চলন্ত জাহাজের ডেকে শুয়ে ওই ছেলেবেলায় ছেলেমানুষি বিশ্বাসটা যেন টুকটুক করে এই বন্ধ ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলতে লাগল, "খোলো-খোলো, দরজাটা খুলে দাও।"
ফিসফিস করে বলি, "আরেনুশ, এই আরেনুশ।"
সে বলে, "হুঁ, বলো কী বলবে।"
আমি বলি, "ওই যে দেখতে পাচ্ছ, হালকা মেঘের মতো আকাশের তারাদের মধ্য দিয়ে? দেখতে পাচ্ছ?"
সে বলে, "হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ওইটা তো ছায়াপথ।"
আমি কেমন একটা আশা-আকাঙ্ক্ষা দোলা গলায় ওকে জিজ্ঞেস করি, "ওই ছায়াপথের বিষয়ে তোমাকে কিছু বলেছিলেন তোমার ঠাকুরদা? ওটা কি পরলোকগত মানুষের আত্মার যাওয়ার পথ?"
আরেনুশ একটু হাসে, হলে, "না, তা বলেননি ঠাকুরদা। বলেছিলেন ওই ছায়াপথ হল আসলে এক বিশাল নক্ষত্রজগৎ। ওই যে সাদা ধোঁয়ার মতো, ওগুলো আসলে অনেক অনেক দূরের অনেক-অনেক তারা, উজ্জ্বল মহাকাশীয় ধুলো, নেবুলা এইসব। খালি চোখে ওদের অমন মেঘের মতো দেখায়।"
আমি আগ্রহে মাথা তুলে ফেলি, তার পরে একেবারে উঠেই বসি। আবার সেই শিরশিরে অনুভূতি ফিরে আসে, ওই মেঘের মতো ধোঁয়ার মতো-ওসব আসলে অনেক অনেক তারা?
আমি ফিসফিস করে বলি, "আরেনুশ, ওই তারাগুলোকে আলাদা করে দেখা যায়?"
"হ্যাঁ, ভাল দূরবিনে দেখা যায়। এই জাহাজের দূরবিনগুলোর চেয়ে আরও ভাল আরও বড় দূরবিন। বিশাল-বিশাল দূরবিন।"
ভাবতে থাকি, সেই সব দূরবিনগুলোর কথা। বিশাল-বিশাল সব দূরবিন, মানমন্দিরের ঘরে। যেসবের কথা শুধু আমরা বইয়ে পড়েছি সামান্য-সামান্য। সত্যি-সত্যি কেমন ছিল সেসব? কোথাও কি আছে এখনও?
স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলি, "আরেনুশ, তোমার ঠাকুরদা আর কিছু বলেছিলেন?"
আরেনুশ বলে, "হ্যাঁ, ঠাকুরদা বলেছিলেন সেই সময় মহাকাশে দূরবিন পাঠিয়েছিল মানুষ, ভাল করে দেখে ছবি তুলে পাঠিয়েছিল সেই দূরবিন। সেইসব ছবিতে শুধু এই ছায়াপথের ওই কেন্দ্রের দিক না, আরও আরও অনেক-অনেক দূরের ছায়াপথের ছবিও আছে। ওগুলোকে বলত গ্যালাক্সি। আমাদের ছায়াপথটাও একটা গ্যালাক্সি। এক-একটা গ্যালাক্সিতে আছে দশ-বিশ হাজার কোটি নক্ষত্র।"
দশ হাজার কোটি? ওহহ, সে কত? আমার কল্পনা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অথচ কী আশ্চর্য! তবু হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়। চোখ বুজে ফেলি, মনের চোখের সামনে ঝিকমিকে বালির কণার মতো নক্ষত্রেরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে কালির মতো কালো অন্ধকার মহাকাশে। ওহহ, এত, এত, এত তারা? ঠান্ডা ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে।

আরেনুশের দিকে সরে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরি, সে হাসে, বলে, "কী হল?" কাঁপা গলায় বলি, "ভয় করছে, ভয় করছে। ওই কোটি-কোটি তারার কথা ভাবতে গেলে ভয় করছে।"
আরেনুশ আমাকে সাহস দেয়, বলে, "ভয় কীসের? কোনও ভয় নেই। কোটি-কোটি তারা তো কী হয়েছে, সে তো আর আমাদের কাছাকাছি নেই! ওরা অনেক-অনেক দূরে। ওই ছায়াপথের কেন্দ্রে আরও সাংঘাতিক জিনিস আছে, বড়-বড় সব গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই আছে। সে খুব রহস্যময় জিনিস।"
ভয়ে আমার গলা কাঁপে যখন ওকে জিজ্ঞেস করি, "আরও রহস্যময়? আরও সাংঘাতিক? কী আছে ওই কেন্দ্রে?"
আরেনুশ উঠে বসে, বলে, "এখন না, পরে কোনওদিন বলব। এখন ঘুমোতে যাই চলো। রাত অনেক হয়েছে। এখন না ঘুমিয়ে নিলে সকালে উঠতে পারব না। সকালে না উঠলে কত দৃশ্য দেখতে পাব না! শুনলাম কাল আমাদের জাহাজ একটা দ্বীপে থামবে দুপুরে, জল আর খাবার নেওয়ার জন্য। তখন যাত্রীরা নেমে একটু ডাঙায় ঘুরতে পারবে। চলো, এখন ঘুমোতে যাই।"
আমার ঘুমোতে যেতে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না, মৃদু আপত্তি করি, "আর একটু থাকি, আরেনুশ। এখানে ভাল লাগছে।"
আরেনুশ আমার আপত্তি শোনে না, বলে, "না-না, এখন ঘুমোতে হবে। চলো।"
এই বলে শক্ত করে আমার হাত ধরে বড় গণ-কেবিনের এক পাশে যেখানে আমাদের একটুখানি শোওয়ার জায়গা সেখানে নিয়ে আসে। আমরা শুয়ে পড়ি চাদর মুড়ি দিয়ে, আরেনুশ ঘুমিয়ে পড়ে একটু পরেই। আমার আর ঘুম আসে না। কেবিনভরা কত লোক ঘুমোচ্ছে, সবার সম্মিলিত ঘুম-শ্বাসের শব্দে ভরে আছে বাতাস। রাত্রি বয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে ঘুমোনোর চেষ্টা করি, কিন্তু ঘুম আসে না। মাথার ভিতর কোটি-কোটি তারার কল্পনা অদ্ভুত এক নৃত্য করতে থাকে। মনে হয় প্রতিটা তারা যেন এক একটা সত্তা, এক আশ্চর্য সুরের তালে-তালে শূন্যের মধ্যে নেচে চলেছে। সবাই হাত বাড়িয়ে যেন আমাকে দেখাচ্ছে ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকটা, রহস্য, ওইদিকে মহারহস্য এক। কী রহস্য ওদিকে? আরেনুশ বলতে গিয়েও বলল না কেন?
একসময় মনে হয় ওই ভাবনা ভাবতে-ভাবতেই ঘুমের জলে তলিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর এক ঘুমে রাত কাবার, একদম নিটোল ঘুম, কোনও স্বপ্নও-টপ্নও ছিল না। কাঁধের কাছে আরেনুশের নাড়ায় যখন চোখ মেললাম তখন চারিদিকে ফটফটে আলো, যাত্রীরা প্রায় সবাই তখন জেগে, জাহাজে ব্যস্ততাও অনেক বেশি।
আরেনুশ একেবারে ফিটফাট তখন, আমি দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে চাদর-টাদর ভাঁজ করে ফেললাম। তারপর দ্রুত সব সেরে ফিটফাট হয়ে নিলাম। আরেনুশ অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। জাহাজের মাঝের বড় খাবার ঘরে প্রাতরাশ দেওয়া হচ্ছিল তখন, দু'জনেই একসঙ্গে সেখানে গেলাম। খাবার ঘরে আমরা দাঁড়াই আমাদের টিকিটের ক্যাটেগরির লাইনে। আমাদের লাইনের খাবার সাধারণ আর সস্তা। দু'টি করে পাতলা হাতরুটি আর একপাত্র সুপ। খাবার নিয়ে আমরা দু'জনে ডেকে চলে যাই।
দূরে দিগন্তে ছায়ার মতো সেই দ্বীপ দেখা দিয়েছে, ওখানে দুপুরে থামবে জাহাজ। আহ, ডাঙায় একটু হাঁটার জন্য প্রাণ সবার আকুল হয়ে আছে।
দুপুরে সেই দ্বীপে নেমে দেখি চমৎকার সবুজ দ্বীপ, জাহাজঘাটার কাছেই মস্ত এক বাজার। জাহাজের যাত্রীরা ওখানে নানা রকম শিল্পদ্রব্য কেনাকাটা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি আর আরেনুশ ঘুরে-ঘুরে দেখি দোকানপাট, কত সব জিনিস সেখানে, হালকা পালকের পাখা, সূক্ষ্ম সূচিকর্ম করা ওড়না, দারুণ দারুণ সব কাঠের পুতুল, মালা, কানের দুল! ঝিনুকের আর শঙ্খের গয়নাও অনেক দোকানে।
সেই বাজারেই এক দোকানের সামনে এসে বিস্ময়ে স্থাণু হয়ে গেলাম। সেই দোকানে ঝিনুকের মালা পছন্দ করছিলেন সেই চোখ-ঝলসানো সুন্দরী মহিলা, যিনি মুইনুখের বাজারে আমার ছবি কিনেছিলেন আর আমাকে দেখে বলেছিলেন তোমাকে আগে দেখেছি কোথাও। এবারেও এঁর পাশে সেই সঙ্গী যুবক, অরিন।
এঁরাও কি আমাদের জাহাজেরই যাত্রী নাকি? আপার ক্লাস যাত্রীদের আমরা তো দেখার সুযোগ পাই না। ওদের কেবিন, খাবার ঘর, সবই তো আলাদা।
আমি চলেও যেতে পারছিলাম না, দাঁড়িয়েও থাকতে পারছিলাম না। কেমন একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। অরিন আমাদের দেখতে পেলেন, চিনতে পারলেন। মহিলাকে তিনি যখন বলে দিলেন, ঝিনুকের মালা পছন্দ করা ছেড়ে মহিলা এসে আমাকে হাসতে-হাসতে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, "আরে তুমি! সেই আশ্চর্য ছবি-আঁকিয়ে। তুমি সত্তালা যাচ্ছ?

AFAIRS
Asia's Leading Education Exhibition Organiser
Operations in 16 Indian cities & 8 countries worldwide
UAE • South Korea • Thailand • Malaysia
Nepal • Bhutan • Sri Lanka • Bangladesh
The Great India Education Fair
career fair 2015
ADMISSIONS FAIR 2015
12th INDIA & INTERNATIONAL Premier Schools Exhibition
ONE STOP EVENT FOR SCHOOL ADMISSIONS
facebook.com/PremierSchoolsExhibition
facebook.com/AfairsEducationFairs
www.afairs.com

এই জাহাজেই? কী কাণ্ড!”
তার পরে আর আমাদের কোনও ওজর-আপত্তি শুনলেন না ভদ্রমহিলা। সব আপত্তি কাটিয়ে উনি আমাদের দু’জনকেই নিয়ে গেলেন জাহাজে ওঁর কেবিনে। জাহাজের ওইদিকটায় ধনাঢ্য যাত্রীদের কেবিনগুলো সব, প্রত্যেকটা দারুণ। কাঠের মেঝেতে রঙিন কার্পেট, দরজায় জানালায় রঙিন পরদা। ঘর আসবাবপত্রে সাজানো।
আমাদের চেয়ারে বসিয়ে উনি অরিনকে পাঠালেন খাবার আনতে। এব্যাপারেও আমাদের ওজর আপত্তি একেবারেই গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, “আহা, প্রথম আমার ঘরে অতিথি তোমরা, কিছু না খাইয়ে শুধু মুখে ফেরত পাঠিয়ে দেব?”
অরিন খাবার আনতে গেলে উনি পরিচয় দিলেন, ওঁর নাম ত্রিলিনা, অরিন ওঁর বন্ধু ও কর্মচারী। ত্রিলিনার বাবা ছিলেন বিরাট ধনী, অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী। কয়েক মাস আগে ত্রিলিনার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এখন উনি বিশাল সম্পত্তির মালকিন। অরিন আগে ওঁর বাবার কর্মচারী ছিল, এখন ত্রিলিনার নিজের কর্মচারী। অবশ্য ছোটবেলা থেকেই ওঁরা বন্ধু, কারণ অরিন ত্রিলিনার বাবার বন্ধুর ছেলে, সেই সূত্রে ছোট থেকেই পরিচয় ছিল, ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলাও করেছেন।
নীরবে আমরা শুনতে থাকি, এসব অজানা কল্পলোকের কাহিনি বলে মনে হয় আমাদের কাছে। এত ধনদৌলত আমরা কল্পনাতেও

আকাশে ঝিকমিকে তারাগুলোর মধ্য দিয়ে হালকা সাদা মেঘের মত ওই দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছে ছায়াপথ।

আনতে পারি না। ত্রিলিনা উঠে গিয়ে একটা অ্যালবাম বের করে আনেন, আমাদের দেখান ওঁর আরও-আরও নানা লোকজনের ছবি। সুন্দর, সুবেশ মানুষজন সব, দেখাতে-দেখাতে পরিচয় দিতে থাকেন। আমাদের কিছুই খেয়াল থাকে না যে কে কী, কিন্তু সব্বাই যে বেশ ধনী আর সুন্দর সেকথা পরিষ্কার বোঝা যায়।
অরিন আমাদের খাবার নিয়ে আসেন, কমলালেবুগন্ধী একরকম মিষ্টি পানীয় আর চমৎকার চকোলেট-কেক। একটু-একটু সঙ্কোচ লাগলেও আমরা খেতে থাকি, এমন জিনিস আমি বা আরেনুশ কেউ আগে খাইনি। আমাদের সঙ্গে ত্রিলিনা আর অরিনও খেলেন, ত্রিলিনা শুধু পানীয় আর অরিন শুধু কেক। মনে হয় ওঁদের খিদে ছিল না, কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের রীতি অনুযায়ী খেলেন।
ত্রিলিনা বলছিলেন ওঁরা সম্ভালায় বেড়াতে যাচ্ছেন, দেশটার স্থানে-স্থানে ঘুরে বেড়াবেন, পাহাড়ে উপত্যকায়, নদীতে, হ্রদে। সেখান থেকে যাবেন আর-এক দেশে। এইভাবে গোটা পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে আবার ফিরে যাবেন সুবর্ণদ্বীপে, আপন বাড়িতে।
আমি আর আরেনুশ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। এক স্বপ্নের জগতের মানুষ যেন এঁরা, কেমন নির্ভার হয়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়ান! আমরা তো কল্পনাও করতে পারতাম না কাজের আর শিক্ষার সূত্রে না হলে সম্ভালা যাওয়ার কথা!
বিদায় নিয়ে যখন ডেকে ফিরে এলাম তখন জাহাজ আবার চলা শুরু করেছে। আমরা নীরবে বসে-বসে হাওয়ার স্পর্শ নিতে থাকি, মাঝে-মাঝে একে অপরের দিকে তাকাই। মুখে কথা বলার দরকার হয় না, ওই দৃষ্টিটুকুতেই আমাদের অনেক কিছু বলা হয়ে যায়।
সমুদ্রযাত্রায় এর পরের ক’দিন সেরকম আর নতুন কিছুই ছিল না, পরিচিত ঘটনাবলিই ঘটে চলেছিল, সেই সকালে ওঠা থেকে রাত্রে শুতে যাওয়া অবধি। আবহাওয়া অসাধারণ ভাল ছিল, অমন শান্ত সমুদ্র বছরের অমন সময়ে নাকি সচরাচর দেখা যায় না।
দিনের পর-দিন জাহাজ চলে নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে। তারপর একদিন সম্ভালার উপকূল দেখা দিল দিগন্তে। জাহাজের সমস্ত যাত্রী, যারা প্রথম যাচ্ছে তারা তো বটেই, এমনকী আগেও গিয়েছে ওই পথে, সবাই উদ্বেল হয়ে উঠে এমন-এমন জায়গায় সব দাঁড়িয়ে গেল যেখান থেকে ওই সম্ভালার উপকূল দেখা যাচ্ছে।
মুখগুলো সব আনন্দে জ্বলজ্বল করছে, চোখগুলো ঝিকমিক করছে। যারা আগেই সম্ভালা গিয়েছে দেখেছে, তাদের মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি, যারা আগে যায়নি ওখানে তাদের মুখে কেমন আশা-আশঙ্কার দোলন।
আমি আর আরেনুশ পরস্পরের হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকি দিগন্তের ওই ডাঙার আভাসটকুর দিকে। ওই সেই দেশ, যার কথা এত দিন শুধু শুনেছি আমরা। কত রকম গল্প, কত রকম রঙিন কল্পনায় বোনা কত কাহিনি শুনেছি সম্ভালার। আমাদের তরুণ হৃদয়ে কত স্বপ্নের দোলা ওই দেশ নিয়ে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সেই দেশে প্রথম নামব আমরা। কেমন হবে সেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ? আরও-আরও এগিয়ে আসে দূর ডাঙা, আরও-আরও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। হঠাৎ অকারণ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যায় আমার দুই চোখ, অদ্ভুত এক ভয়ে বুকের ভিতরটা কেমন কেঁপে ওঠে, শিরদাঁড়ায় শিরশির করে ওঠে শীতল অনুভূতি। আরেনুশের হাত আর-একটু জোরে চেপে ধরি। সে আমার দিকে ফিরে তাকায়, কিছু বলতে হয় না, সে বুঝতে পারে। সে আমার হাতে পালটা চাপ দিয়ে সাহস দেয়।
আমার অশ্রুসিক্ত চোখে ভেসে ওঠে আমাদের সেই শান্ত সবুজ পাহাড়ি জনপদ আনুমা, তার সেই গাছপালা, তার সেই সব পাখি, তার সেই সরল খোলামেলা মানুষেরা। ওদের সঙ্গে আর কি কোনওদিন দেখা হবে?

{৬}

“তখন আলো ছিল না, অন্ধকারও না, জন্ম ছিল না, মৃত্যুও না, জ্ঞান-ঘন চৈতন্যময় মহাসমুদ্রে ডুবে ছিল সব বস্তু। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জ্ঞানের নদী ঝাঁপ দিয়ে পড়ছিল সমুদ্রে, লীন হয়ে যাচ্ছিল ওই বিরাটে। যে পূর্ণকে না চেয়ে অংশকে চায়, সে তলিয়ে যায়।”
স্মিতমুখ বক্তৃতাকারিণী কথা বলছেন অতি মধুর, অতি সুরেলা গলায়। মাখনরঙের আলগা পোশাক ওঁর, কোমরে নীল রঙের চওড়া রেশমি কোমরবন্ধ। মুখ এত শান্ত আর ভাবলেশহীন যে কেমন ভয়-ভয় করে। আমাদের সেই দ্বীপময় দেশে মানুষ অনেক বেশি প্রাণচঞ্চল। সেখানে মানুষের মুখের রেখায় হাসিকান্নার ওঠা পড়া, চোখের ঝিকিমিকিতে আর মেঘলায় মনের আলোছায়ার খেলা প্রকাশিত হয়।
এখানে এই স্বপ্নের দেশ সম্ভালায় এসে থেকেই মানুষকে দেখছি অদ্ভুত রকমের শান্ত! মুখের রেখায় ভাবপ্রকাশ হয় না, চোখের আলোয় ছায়াতেও না। মানুষেরা যোগমগ্নের মতো যেন। এই কি সেই বিখ্যাত সম্ভালার যোগবিদ্যা? এত ব্যাপ্ত? সকলেই এর অংশীদার?
আরেনুশ আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি, আশপাশে অসংখ্য

তদগতচিত্ত ছাত্রছাত্রী। আমাদের ওরিয়েন্টেশান হচ্ছে। আমরা যদিও যোগের শিক্ষায় ঢুকছি না, আমাদের ক্লাস হবে চিত্রকলার আর ভাস্কর্যের, কাজও করতে হবে সঙ্গে-সঙ্গে, কিন্তু ওরিয়েন্টেশানের সময় নাকি এই একই জায়গায় সকলকে আসতে হয়। এটা নাকি একদম অপরিহার্য। সকলকেই আবশ্যিকভাবে এটা নিতে হয়। বক্তৃতাকারিণী সুরেলা মন্ত্রের মতো বলছেন, "সে কাছে এবং সে দূরে, সে চলে এবং সে চলে না। সে অনন্তকাল স্থায়ী আবার সে মুহূর্তের খণ্ডাংশমাত্রের জন্য দেখা দেয়। সে ব্যাপ্ত করে থাকে সমস্ত জগৎ আবার সে কোথাওই থাকে না।"

অভূতপূর্ব কথায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে থাকি আমরা, শুধু আমার ডান হাত আর আরেনুশের বাঁ হাত শক্ত করে পরস্পরকে ধরে আছে, কিছুতেই আমাদের পথচ্যুত হতে দেবে না। আনুমার পাহাড়ের ওই আলোছায়াময় প্রাচীন গুহা থেকে প্রাচীরগাত্রে খোদাই করা ছবিগুলো যেন আমাদের হৃদয়ের মধ্য থেকে বলছে, "তোমরা অভিভূত হোয়ো না, হৃদয়কে ভয় পেতে দিও না। মুক্তিকে ভুলে যেও না, স্বপ্ন দেখতে বিস্মৃত হয়ো না।"

সেই হাসিমুখ ক্ষুদ্রচোখ খর্বনাসা বৃদ্ধকে মনে পড়ে আমাদের, যাঁর কারণেই বলতে গেলে আমাদের সম্ভালা আসা হল। মুইনুখের বাজারে সেই নির্জন শান্ত দুপুরে আমাদের দোকানে এসে আরেনুশের ভাস্কর্যের শিল্পসৌকর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সেই বৃদ্ধ মানুষটি। অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মূর্তি কিনেছিলেন উনি, আমার আঁকা কয়েকটা জলরঙের ছবিও।

তারপরে খুব ক্যাজুয়ালি আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন যদি আমরা দূরের কোনও দেশে কাজের সুযোগ পাই যাব কিনা! আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড একবার থেমে গিয়ে দুপদুপিয়ে জোরে চলতে শুরু করল, উত্তেজনা গোপনের জন্য মুখ নিচু করলাম। আমি জানতাম ভদ্রলোক সম্ভালার কথা বলবেন।

আরেনুশ খুব ঠান্ডা মাথা ছেলে, ও ধীরে-ধীরে আলোচনার ভঙ্গিতে বলেছিল, "যাব কিনা সেটা নির্ভর করে কোন দেশ, কী কাজ, কতদিনের জন্য কাজ, পারিশ্রমিক কত এইসব ছোটখাটো খুঁটিনাটির উপরে।"

হাসিতে ভদ্রলোকের চোখ সরু হয়ে গেছিল। ফুলের পাপড়ির মতো হালকা, পাতলা, উজ্জ্বল কার্ড বার করে আমাদের দুইজনকে দুটো দিয়ে বলেছিলেন, "আমার বাড়ি সম্ভালায়। পরে যোগাযোগ করলে ভাল করে কথা হবে।"

সম্ভালা! কথাটাই একটা শক্তিশালী মন্ত্রধ্বনির মতো আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে দিয়েছিল সেদিন। হৃদপিণ্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম আমি। অনেক কিছু প্রশ্ন মনের মধ্যে বুজকুড়ি কেটে উঠতে থাকলেও বাকস্ফূর্তি হয়নি। গলাটা কেমন শুকনো-শুকনো লাগছিল, এক চুমুক জল খেতে পারলে ভাল হত মনে হচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে জলপানও অসম্ভব।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা দুইজন তখন, প্রাণচঞ্চল দ্বীপমালার দেশের দুই তরুণ-তরুণীর উষ্ণ দেহমন একটিমাত্র মন্ত্রশব্দে স্থির হয়ে গিয়েছিল। ওই যে কারা যেন বলে সম্ভালার লোকেরা জাদুকর, সত্যি কি তাই? অথচ এমনিতে তো ভদ্রলোককে দেখে কিছুই মনে হয় না! অন্য রকম দেখতে, এই পর্যন্ত।

আমাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের সামনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক অল্প মাথা নুইয়ে বিদায় নেওয়ার আগে বললেন যে, উনি কয়েক দিনের জন্য আপাতত মুইনুখ শহরের সমুদ্রবিলাস অতিথিনিবাসের একশো বত্রিশ

নম্বর ঘরে আছেন। আগ্রহী হলে আমরা যেন পরদিন সকালে যোগাযোগ করি।

পরের দিন সকালেই গিয়েছিলাম আমরা দু'জনেই। আমি আর আরেনুশ। আরেনুশ হাসছিল, আমায় বলেছিল, "দ্যাখ কী কাণ্ড! আমরা যারা কিনা মুইনুখের বাজারে অতি সামান্য দামে ছবি আর মূর্তি বিক্রি করে দিন চালাই, লেখাপড়াও বেশি না আমাদের, সেই তারাও কেমন নেচে উঠেছি সম্ভালা শুনেই। কী প্রমাণ আছে যে এই ভদ্রলোক, কার্ডে যার নাম লেখা ঋতবন্ত, সুমিত্তোস, সেই এত ভারী নামওয়ালা তিনি কি সত্যি কথাই বলছেন? এইসব কার্ড-টার্ড সবই তো জাল হতে পারে? আমাদের ভাঁওতা দিয়ে যে ভোলাচ্ছেন না তার প্রমাণ কী?"

আমি হেসেছিলাম, বলেছিলাম, "আরেনুশ, আরেনুশ, এখনই এত কিছু ভেবে ফেললে? চলো আগে দেখে আসি কী বলেন, আদৌ আমাদের সঙ্গে দেখা করেন কিনা। দ্যাখো, আমাদের কীই বা আছে, আমাদের ঠকিয়ে কী পাবে কেউ বলো? বড়জোর ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে গিয়ে...কী আর করবে? ঠকাবে? বিক্রি করে দেবে? অন্য অত্যাচার করবে? তাতে কী লাভ হবে? চলো দেখেই আসি। ভদ্রলোককে দেখে আমার অমন অসৎ মনে হয়নি। এমনিতেও তো আমাদের জীবনে কিছুই নেই, দিনগত পাপক্ষয়, উঞ্ছবৃত্তি করে চলেছি। নিজেদের একটু জায়গাও নেই পসরা সাজানোর, পরের আশ্রয়ে সঙ্কুচিতভাবে কাজ করতে হয়। চলো, হয়তো আমাদের জীবনে কোনও একটা নতুন কিছু ঘটতে চলেছে, ভাল বা মন্দ। মন্দ হলে কত দূর আর হবে, বড়জোর মৃত্যু। কিন্তু ভাল হলে কী হবে তা কি বলতে পার? অনন্ত সম্ভাবনা। আমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে? আমাদের হারাবারই বা কী আছে বলো?"

স্মৃতির ঘূর্ণির ভিতর থেকে-থেকে বর্তমানে ভেসে উঠি। কথা থামিয়ে স্মিতমুখ বক্তৃতাকারিণী তার অর্ধনিমীলিত চোখ দু'টি একবার তুলে আমাদের সবার উপরে ধীরে-ধীরে বুলিয়ে গেলেন। তারপরে আবার মন্ত্রপাঠের মতো সুরেলা গলায় বলে চললেন, "সে সূক্ষ্ম নয়, সে স্থূল নয়। সে শুভ্র নয় সে কৃষ্ণ নয়। সে বড় নয় সে ছোট নয়। সে লঘু নয় সে গুরু নয়। সে কঠিন নয় সে তরল নয়। সে ঝঞ্ঝা নয়, সে মৃদুবাতাস নয়। সে আকাশ নয় সে পাতাল নয়। সে গোপন নয় সে প্রকাশ্য নয়। হ্যাঁ বা না দিয়ে তাকে জানা যায় না।"

বক্তৃতাকারিণী অনেকক্ষণ বললেন, তারপরে কথা শেষ করে আস্তে-আস্তে মঞ্চ থেকে নেমে মঞ্চের সামনেই দাঁড়ালেন। একজন সহকারিণী এসে ওঁর হাতে একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ দিল। তিনি প্রদীপ নিয়ে মঞ্চে উঠলেন, সহকারিণীও উঠলেন, তাঁর হাতেও আর-একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ। মঞ্চটি ধীরে-ধীরে আলোকিত হয়ে উঠল, ওঁরা সারি-সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন সেখানে, প্রদীপগুলো আগে থেকেই সাজানো ছিল, ওঁরা শুধু নিজেদের প্রদীপের শিখা সলতের ডগাগুলোতে ছুঁইয়ে-ছুঁইয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

তার পরেই শুরু হল ওরিয়েন্টেশনের দ্বিতীয় ভাগ। সমবেত নতুন ছাত্রছাত্রীরা দু'জন-দু'জন করে মঞ্চে উঠতে লাগল, প্রজ্বলিত প্রদীপগুলোর মধ্যস্থলে দাঁড়ানো তখন সেই বক্তৃতাকারিণী। নিজের হাত প্রদীপের শিখার কাছে ঘুরিয়ে এনে আগত ছাত্রছাত্রীদের কপালে সেই হাত ছুঁইয়ে তিনি মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

আরেনুশের সঙ্গে গিয়ে যখন মঞ্চে দাঁড়ালাম, ভয় ভয় করছিল। কিন্তু দেখলাম ভদ্রমহিলার চোখ অর্ধনিমীলিত, উনি আমাদের দেখছেন না সেভাবে, শুধু প্রদীপশিখার তাপের স্পর্শ দিচ্ছেন আর মন্ত্র পড়ছেন, হয়তো তাঁর কাছে পুরো ব্যাপারটাই মসৃণ অভ্যাসের মতো। হয়তো বহু বছর ধরে ওই কাজ করে আসছেন।

পুরো অনুষ্ঠানের পরে আমরা বাইরে বের হয়ে এলাম অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে। বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ময়ূঘান, একজন প্রৌঢ় শিল্পী, ইনিই আমাদের নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন জাহাজঘাটায়। আমাদের নাম লেখা বোর্ড উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন ওখানে। তখন ওঁর সঙ্গে আরও দু'জন তরুণ ছাত্র ছিল, তাদের নাম ওরা বলেছিল বীতপ আর জয়শ। এখন ওদের আর দেখলাম না ময়ূঘানের সঙ্গে, হয়তো ওরা ক্লাস করছে। ময়ূঘান আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, তাঁর মুখে অল্প হাসির আভাস দেখে আমাদের স্বস্তি হয়। হয়তো এর মধ্যে আবেগ নেই, হয়তো এ শুধুই পরিচিতির চিহ্ন অথবা ওঁদের কাছে আমাদের গৃহীত হওয়ার একটা চিহ্ন, তবু মনটা আশ্বস্ত হয়।

উনি আমাদের নিয়ে গেলেন ওঁর কার্যালয়ে। সেখানে কিছু সইসাবুদ আমাদের দু'জনেরই করতে হল নানা কাগজপত্রে। আমাদের কী রকম কাজ করতে হবে আর কীভাবেই বা শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে, উনি সেই বিষয়ে মোটামুটি গুছিয়ে বলে দিলেন। আমাদের বাসস্থান ও আহারের কী ব্যবস্থা হবে, সেও বলে দিলেন।

ওরিয়েন্টেশনের আগে পর্যন্ত আমরা ছিলাম অস্থায়ী ছাউনিতে, খাবার অবশ্য আসছিল প্রতিষ্ঠানের গণ-রান্নাঘর থেকেই। ময়ূঘান বুঝিয়ে দিলেন এর পর আমাদের পৃথক স্থায়ী বাসস্থান দেওয়া হবে আর রান্নাবান্না নিজেদেরই করে খেতে হবে, তার জন্য দোকান-বাজার থেকে জিনিসপত্রও নিজেদেরই কিনতে হবে। এখানে যে কাজ আমাদের করতে হবে তার জন্য আমরা যা পারিশ্রমিক পাব, তাতে ভালভাবেই কুলিয়ে যাবে বলেই মনে হল। এমনকী হয়তো বাড়তিও থাকবে, যা সঞ্চয় করা যাবে।

ময়ূঘানের কথাবার্তা শেষ হতে-হতে সেই ছাত্র দু'জন, বীতপ আর জয়শ এসে পড়ল। আমাদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল, অল্প হাসল, ঠিক ময়ূঘান আমাদের ওরিয়েন্টেশন-হল থেকে নিয়ে আসার সময় যেমন হেসেছিলেন।

আমার বুকের মধ্যে আবার কেমন দুঃখ-দুঃখ ভয়-ভয় ভাবটা ফিরে আসে, এত তরুণবয়সিরাও এত সংযত আর আবেগহীন! আমাদের দ্বীপমালার দেশে তো বন্ধুরা হাতে হাত রাখে, আনন্দে আরও কত ঝকমকিয়ে হাসে, কত কথা বলে। আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি রকম করে। এখানে বীতপ আর জয়শ শুধু অল্প একটু হাসল, পরিচিতির হাসি, "তোমাদের আমরা গ্রহণ করছি" এই নীরব বার্তা দিয়ে আশ্বস্ত করার হাসি।

মনে হয় আগে থেকেই ময়ূঘানের জানাই ছিল ওরা আসবে, হয়তো সেরকম নির্দেশই ছিল। ময়ূঘান ওদের বললেন আমাদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাতে। আজকে আমাদের ক্লাস শুরু হবে না, আজকে সব কিছু ঘুরে দেখে নিজেদের বাসস্থানে গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিকমতো সেটল করার জন্য অবসর দেওয়া হয়েছে।

আমরা বীতপ আর জয়শের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলাম প্রতিষ্ঠানটি। বিশাল জায়গা জুড়ে বিশাল ব্যাপার, অনেক পৃথক-পৃথক ভবন, আর দুই ভবনের মাঝে খোলা জায়গা বা বাগান বা বিশাল-বিশাল প্রাচীন মহীরুহ। পুরোটা ঘুরে দেখা ওই সময়ের মধ্যে অসম্ভব, শুধু যে ভবনগুলোয় আমাদের ক্লাস করতে হবে, সেইগুলো ওরা ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল।

ঘুরেটুরে সব দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল বিকেলের বুকে। বীতপ আর জয়শ আমাদের নিয়ে চলল প্রতিষ্ঠানের ভোজনাগারে। সেখানে তখন অত ভিড় নেই। আমাদের দু'জনের তো খুবই খিদে পেয়ে গিয়েছিল, সেই সকালে সামান্য দু'টি ভুজিয়া আর একপাত্র নোনতা গরম পানীয় খেয়ে বেরিয়েছিলাম, তারপর আর কিচ্ছুটি মুখে দেওয়া হয়নি। বীতপ আর জয়শেরও নিশ্চয়ই চনচনে খিদে ছিল, কারণ সবাই আগ্রহভরে খেতে শুরু করলাম খাবার আসা মাত্র। বেশ ভাল খাবার ছিল, চিকন তন্তুলের সুগন্ধী অন্ন, দু'টি

নিরামিষ ব্যঞ্জন, একটি আমিষ ব্যঞ্জন, শেষপাতে একটি করে মিষ্টি। পেট ভরে খেলাম, মনটাও ভরে উঠল। আহা, ভারী সুন্দর রান্না, পরিবেশনও খুব যত্নের।

এর পরে ওরা আমাদের গ্রন্থাগারে নিয়ে চলল। বিশাল গ্রন্থাগারটি দেখে আমার বিস্ময়ে আর আনন্দে দম আটকে আসার অবস্থা হল। এত বই! এত-এত রোল করা পাণ্ডুলিপি, এত-এত সব ম্যাপ। কী নেই সেখানে? আমাদের দু'জনের মনে হচ্ছিল হঠাৎ দুই কার্ডাল বিশাল আর বিচিত্র শাকে ভরপুর খেতের সামনে পড়ে গেছে! গ্রন্থাগারে থাকতে অনেকক্ষণ ইচ্ছে করছিল, কিন্তু বীতপ আর জয়শ মৃদুস্বরে জানাল এর পরে অনেক-অনেক সময় পাব আমরা এখানে আসার। এখন জরুরি কাজ সেরে নেওয়া দরকার, আমাদের স্থায়ী বাসস্থানে যেতে হবে। সেখানে সব কিছু বুঝে নিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে তো আজকের মধ্যেই।

ওদের কথায় যুক্তি ছিল, তাই আমরা গ্রন্থাগার ছেড়ে ওদের অনুসরণ করে চললাম আমাদের নতুন বাড়ির দিকে। বিশাল-বিশাল প্রাচীন গাছের একটা কুঞ্জ পার হয়েই ছোট-ছোট কুটিরে ভরা এক-একটা জায়গা, তারই একটি কুটিরে আমাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

বাড়িটির চাবি আমার হাতে দিল জয়শ, দরজা খুলে ঘরে ঢুকে মন ভাল হয়ে গেল। চমৎকার একটি আলো হাওয়াওয়ালা ঘর, বড়-বড় জানালা আছে। এটা বসবার, খাবার, কাজের ঘর। এই ঘর পার হয়ে শোয়ার ঘর, সেটিও ছিমছাম। এর এক পাশে রান্নাঘর, অন্য পাশে কলঘর। ঘরে আসবাব বলতে কিছু বসার কাঠাসন আছে। শোয়ার ঘরে আছে একটি বড় মাদুর। আপাতত এতেই আমাদের কাজ চলে যাবে।

অস্থায়ী বাসস্থান থেকে আমাদের জিনিসপত্রগুলো এখানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা এখনই করা হবে বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল জয়শ আর বীতপ। ওদের অনেক ধন্যবাদ দিলাম আমরা।

রান্নাঘরে দেখলাম কিছু-কিছু খাবার জিনিস যেমন কিছু শাকসবজি, কয়েকটা ডিম, কয়েক দিন চলার মতো চাল, ডাল, আটা এইসব আছে। একটি ছোট উনুন আর রান্নার বাসনপত্র আর কিছু থালা, বাটি, গ্লাসও আছে। বড় একটি কলসি আর দু'টি বালতিও আছে দেখলাম। তার মানে প্রথম কয়েকদিন আর আমাদের বাজার করতে হবে না, আমাদের জন্য এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে প্রতিষ্ঠান থেকেই, হয়তো সৌজন্য বা হয়তো এমনই রীতি।

খুশিমনে ঘরদোর ঝাটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে গোছাতে শুরু করলাম। আরেনুশ বালতি ভরে জল আনল কাছের নলকূপ থেকে। কলঘরের চৌবাচ্চা ভরে রাখল। সবশেষে আমি গিয়ে কলসি ভরে জল নিয়ে এলাম। তারপরে উনুনে আগুন দিলাম। রাতের রান্না তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে আজ।

আমাদের কাজকর্মের এই অংশটুকু হতে না-হতেই বীতপ আর জয়শ এসে হাজির আমাদের জিনিসপত্রের বাক্স নিয়ে, অস্থায়ী বাসগৃহ থেকে এগুলো নিয়ে এসেছে ওরা।

আমরা ওদের অনেক ধন্যবাদ দিলাম, ঘরে এসে বসতে বললাম, আর সামান্য উষ্ণ পানীয় খেতে দিলাম। তখনই বানিয়েছিলাম। ওরা বসল। পানীয় গ্রহণ করল। পান করতে-করতে ওদের বেশ খুশি মনে হল, যদিও উচ্ছ্বাস ওরা প্রকাশ করে না। আমরাও ওদের সঙ্গ দেবার জন্য পাশেই বসে পান করছিলাম, বেশি গ্লাস তো ছিল না, আমি আর আরেনুশ ছোট-ছোট দুটো বাটি থেকে হালকা চুমুক দিচ্ছিলাম পানীয়ে।

বীতপ বলছিল যে, আমাদের কাজের জায়গাগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হবে না, ক্লাস করার পরে-পরে আমাদের যেতে হবে দূরের কাজের জায়গায়, পৌঁছনোর জন্য যানবাহন প্রতিষ্ঠান থেকেই দেবে। ওইসব কাজগুলো যারা করাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের চুক্তি আছে বলেই ওঁরা এখানের শিক্ষার্থীদের নেন

কাজের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। পারিশ্রমিকের কিছুটা শিক্ষাখাতে খরচের জন্য সোজাসুজি চলে যায় প্রতিষ্ঠানে আর বাকিটা শিক্ষার্থী-কর্মী পায়। এই রীতি এখানে বহু বছর চলে আসছে। সেই জন্যেই দেশ-বিদেশের ছাত্রছাত্রী যাদের আর্থিক অবস্থা তত ভাল নয় কিন্তু প্রতিভা আছে, তারা সুযোগ পেতে পারে। অবশ্য কিছু যোগশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে শুধু ধনী ছেলেমেয়েরাই শিক্ষা নিতে পারে, কারণ ওসব প্রতিষ্ঠানে বাইরে কাজ করতে-করতে পাশাপাশি পড়াশোনার ব্যবস্থা নেই, ওসব প্রতিষ্ঠানে পুরোপুরি নিজেদের খরচে শিক্ষালাভ করতে হয়। জয়শ বলছিল ওর পরিবারও বেশ দরিদ্র, তাই খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে ওরকম বড় এক যোগশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে সে ভর্তি হতে পারেনি, যদিও ওখানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। এখানে কাজের সুযোগ আছে, তাই পড়তে পারছে।

বীতপ ওকে কোমল সান্ত্বনার মতো সুরে বলছিল, "জয়শ, ওখানের মতো অত নামকরা না হলেও এখানেও তো যোগের ক্লাস হয়, তুমি সেসব ক্লাস করোও। তবু কেন দুঃখ করো?"

জয়শ কিছু বলে না, চুপ করে জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে। তারপরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে, "না-না দুঃখ না, এমনি বললাম, স্মৃতিচারণ। চলো বীতপ, দেরি হয়ে যাবে আর বসলে।"

ওদের পান করা হয়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়াল দু'জনে। তারপরে আমাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন থেকেই নতুন দেশে আমাদের শিক্ষা আর কর্ম পুরোদমে শুরু হয়ে গেল।

{৭}

সপ্তাহতিনেক পরের কথা। প্রথম সপ্তাহটা গেল সব কিছু বুঝেশুনে ধাতস্থ হতে-হতে, তার পরে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই বেশ ছন্দে এসে গেল সব কিছু। আমি আর আরেনুশ কিছু-কিছু সকালের ক্লাস একসঙ্গে করি, প্রধানত চিত্রকলার ক্লাস। দুপুরে একসঙ্গে দু'জনে টিফিন খাই, তার পরেই আরেনুশ চলে যায় এক দূর প্রান্তরে যেখানে অনেক ছোট বড় মিনার আর প্রার্থনালয় তৈরি হচ্ছে, সেখানে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ও ভাস্কর্যের কাজ করে।

আমি দুপুরের পরে যাই গুহাচিত্র অঙ্কনের কাজে, এক চিত্রশিল্পী দলের সঙ্গে একত্রে কাজ করি সেখানে। আমাদের যিনি নির্দেশনা দেন, তিনি একজন প্রাচীনা সন্ন্যাসিনী, কিন্তু খুব শক্তসমর্থ, বয়স ওঁর মুখে এঁকেছে কিন্তু সতেজ দেহমনে তেমন ভাঙন ধরাতে পারেনি। ওঁর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে ভাষা পড়তে পারি না, কিন্তু ধীরলয়ের কথাগুলি এত স্পষ্ট আর ওঁর দেখিয়ে দেওয়ার ভঙ্গি এমন পরিষ্কার যে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না, ঠিক-ঠিক রং-তুলির কাজ ঠিকমতোই হতে থাকে। পুরো দলের সবাই আমরা সুরবাঁধা যন্ত্রের মতো কাজ এগিয়ে নিয়ে যাই।

প্রদীপের পীতাভ আলোয় আর কর্মীদের দেহছায়ায় ওই অদ্ভুত গুহার মধ্যে কখনও স্পষ্ট কখনও ছায়াময় হয়ে উঠতে থাকে গুহার দেওয়ালের ওইসব আশ্চর্য চিত্রমালা। কিছু-কিছু সমাপ্ত, কিছু অর্ধসমাপ্ত, কিছু মাত্র শুরু হয়েছে, কিছু অংশে এখনও হাতই পড়েনি।

আমি প্রদীপ তুলে ধরে এখন দাঁড়িয়ে আছি গুহার ভিতরে, কোথা থেকে যেন মৃদু বাতাস আসছে, প্রদীপের শিখা অল্প-অল্প কাঁপছে। আমার অন্য হাতে রং-তুলির থালা, নির্দেশিকা প্রাচীনা সন্ন্যাসিনী সেখান থেকে তুলি ও রং বেছে, রঙের বাটিতে তুলি ডুবিয়ে ছোট্ট চৌকো পাথরপাটায় পরীক্ষা করে নিয়ে তারপরে কোমল করে তুলি বোলাচ্ছেন গুহার দেওয়ালে আঁকা অলৌকিক অগ্নিপক্ষীর ডানায়। তাপসীর মুখ ধ্যানমগ্নের মতো শান্ত সমাহিত, চোখ অর্ধনিমগ্ন! আমায় এখানের বন্ধুরা বলেছে উনি নাকি অমন আচ্ছন্ন ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই কোনও সুদূরের কারও নির্দেশ অনুভব করেন নিজের হৃদয়ে। সেই অনুসারে কাজ করেন, তাই ওঁর কাজের এইসব মুহূর্তগুলোয় কথা বলা নিষিদ্ধ।

প্রথমটুকু এসে গেলেই উনি আমাকে দায়িত্ব হস্তান্তর করে পরের জনের কাছে চলে যাবেন। শান্ত হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে দেখতে থাকি, হঠাৎ গুহার দেওয়াল মুছে গিয়ে জেগে ওঠে মুইনুখের বাজারের সেই দুপুর, মনে পড়ে ঋতবন্ত সুমিস্তোসে। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে সমুদ্রবিলাস-এ গিয়ে অবাক-মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি আর আরেনুশ। অত বিলাসবৈভবের অতিথিনিবাস আমাদের মতো সাধারণ অবস্থার মানুষের পক্ষে দেখা প্রায় অসম্ভব।

ঋতবন্ত আমাদের ওঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন, সুস্বাদু খাদ্যপানীয়ে তৃপ্ত করেছিলেন, দেখিয়েছিলেন ওঁর শিল্পসংগ্রহ। আরেনুশ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই সংগ্রহের মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "এত সুন্দর!"

উনি আমাদের বলেছিলেন আমরা যদি সম্ভালায় যেতে চাই, তবে উনি ব্যবস্থা করে দিতে ইচ্ছুক। উনি দুনিয়া ঘুরেছেন, শিল্পকলা উনি চেনেন, অনেক নামীদামি শিল্পনমুনা রয়েছে ওঁর সংগ্রহে। কিন্তু আমাদের দুইজনের কাজের মধ্যে উনি এমন কিছু দেখেছেন যা আগে কোথাও দেখেননি। সম্ভালায় ওঁর চেনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আছেন, তা ছাড়া উনি জানেন ওখানে চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের কাজ জানা মানুষের প্রয়োজন। আমরা যেতে চাইলে খুবই স্বাগত।

সেদিন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি আমরা, কুণ্ঠিতভাবে ভাবার সময় চেয়েছিলাম। উনি হেসে ফেলেছিলেন, সস্নেহ চোখে আমাদের দিকে চেয়ে শান্ত, ধীর গলায় বলেছিলেন, "অবশ্যই। এখনই কিছু বলতে হবে না, কয়েকদিন সময় নাও, ভাল করে ভাবো, দুইজনে আলোচনা করো। তারপরে এসে আমাকে বোলো। আমি এখানে আগামী দুইমাস থাকব।"

স্নেহময় প্রৌঢ় মানুষটির কথা ভাবলেই কেমন একটা অদ্ভুত ভাললাগা ছড়িয়ে যায়।

হঠাৎ কাঁধে একটা স্পর্শ পেয়ে অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসি। মুখ ফিরিয়ে দেখি রীতমা। আমার সহশিক্ষার্থিণী ও সহকর্মিণী। দূর এক দেশের মেয়ে রীতমা। আমার মতোই সম্ভালায় এসেছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে। ওর কথা বুঝতে এখনও আমার বেশ অসুবিধা হয়, ওর মাতৃভাষা আমি বুঝি না, ও-ও আমার মাতৃভাষা বোঝে না। সম্ভালার ভাষাতেই আমাদের কথা হয়, কিন্তু ওর কথাগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত টান থাকে, মাঝে-মাঝে খুব অসুবিধা হয় বুঝতে আমার। নির্ঘাৎ আমার কথাও বুঝতে ওর অসুবিধে হয়। তাই আমরা অনেক কিছু হাত-মুখ-চোখের ভঙ্গিতে বোঝাই পরস্পরকে। এতেও কাজ কিন্তু চলে ভালই, নীরবে অনেক কাজ হয়ে যায়।

রীতমা ভারি ভাল মেয়ে, একটা অদ্ভুত শান্ত সমাহিত অথচ আত্মবিশ্বাসী ভাব আছে ওর। শুনছি আর কয়েক মাস পরেই ও যোগশিক্ষায় ঢুকবে।

রীতমার চোখ আর হাতের ভঙ্গি আস্তে-আস্তে বলে, "কী হল ওরিয়ানা? চুপ করে আছ যে! তোমার তুলি থেমে আছে, রং তো একটুও করোনি। কী ব্যাপার? শরীর খারাপ লাগছে?"

সচকিত হয়ে বুঝতে পারি, আমি দিবাস্বপ্নে ডুবে কাজ থামিয়ে রেখেছিলাম। সক্রিয় হয়ে উঠি দ্রুত, রীতমাকে জানিয়ে দিই, "না-না ভাল আছি। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, সে কিছু না। এই দ্যাখো না, এখুনি অনেকখানি কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব।"

অভ্যস্ত হাতে তুলি টানতে থাকি, সূক্ষ্মভাবে রং লাগতে থাকে

পাথরের গায়ে আঁকা ছবিতে। এর পরে আর থামাথামি, ভাবাভাবির অবকাশ দিই না নিজেকে, যন্ত্রের মতো রঙে তুলি ডুবিয়ে চলি আর ছবিতে রং লাগিয়ে চলি।

কিন্তু সংকল্প সত্ত্বেও এর কিছুক্ষণ পরেই আমার হাত কেমন শিথিল হয়ে পড়তে থাকে, চোখে হালকা জ্বালা, মাথার এক পাশে ব্যথা। আমি আবার থেমে যাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলিয়ে বসি। বড় করে শ্বাস নিয়ে ব্যথাটাকে সামলাতে চেষ্টা করি।

রীতমা আমার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপরে আস্তে-আস্তে সন্তালার ভাষাতে বলে, প্রত্যেকটা শব্দ ভাল করে খুঁজে পেতে এনে সতর্ক যত্নের সঙ্গে বলে, "ওরিয়ানা, তুমি একটু বিশ্রাম করো। তোমার মুখ কেমন জানি দেখাচ্ছে, খুব ফ্যাকাসে লাগছে। আমার ভয় করছে। তুমি বিশ্রাম করো, একটু জল খাও। বিশ্রাম করে ভাল লাগলে তারপরে কাজ কোরো।" ওর ওই কোমল কণ্ঠস্বরে ভালবাসা আর উদ্বেগ ছলছল করে। ওই কণ্ঠস্বর যেন কোন বিস্মৃত অতীতের বুক থেকে ঝরনার ধারার মতো ঝরে পড়ে আমার ক্লান্তির উপরে। মায়ের গলা কখনও এরকমই শোনাত তো! আমার সেই মা, ভরা সংসার রেখে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া সেই মহিমান্বিতা নারী। আমাকে সে দিয়ে গিয়েছিল তার সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার শিল্পী মন, তার সৌন্দর্যবোধ। যত্ন করে মা শিখিয়েছিল সূক্ষ্ম কারুকাজ। কিন্তু ওকে বুঝে ওঠার আগেই সে চলে গেল। বারো বছর বয়সের কিশোরী তখন আমি। আরও একটু যদি বড় হতাম তখন, আরও একটু যদি সময় পেতাম!

রীতমা উঠে এসে আমাকে ধরে, আস্তে-আস্তে আমার হাত থেকে তুলি আর প্রদীপ নিয়ে নামিয়ে রাখে। দেওয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে আমায় শুইয়ে দেয়, জলপাত্র থেকে জলপান করায় যত্ন করে। আমি ওকে ধন্যবাদ দিই আন্তরিকভাবে।

একটুখানি বিশ্রাম সত্যিই চাইছে আমার প্রাণ, সেই কোন সকাল থেকে টানা কাজ করে চলেছি, আজ টিফিনও খাওয়া হয়নি। আজ ক্লাসের পরেই আরেনুশ তাড়াহুড়ো করে চলে গেল ওর কাজের জায়গায়, সেও টিফিন খেল না। বলল খুব নাকি তাড়া আছে আজ। আমারও তাই আর একা-একা খেতে ইচ্ছে করল না। খিদে তেমন পায়নি, শুধু এই অদ্ভুত ক্লান্তি।

রীতমা জলপাত্রটা কাছেই রেখে গিয়েছে, সেটা থেকে আর-এক চুমুক জল খাই, তার পরে পাথুরে দেওয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজি। একটুখানি এইভাবে থাকি, দেখি ক্লান্তি কাটে কিনা।

আধোঘুমের ভিতরে শুনতে পাই একটা আশ্চর্য সুর, ঘুমপাড়ানি গানের মতো। মায়ের গলা। নিজেকে অনুভব করি একটা দোলনার মধ্যে, আস্তে-আস্তে কে যেন তাতে দোল দেয়। মা কি আমায় এইভাবে দোল দিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়াত ছোট্টবেলা? মায়ের গলায় এই গান শোনার কথা তো একদম মনে নেই আমার! সচেতন স্মৃতিতে নেই কিন্তু তা হলে কি খুব গভীরে রয়ে গিয়েছিল? বাইরে যেন একটা অদ্ভুত রাত্রি, ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে আর ঘরে প্রদীপের পীতাভ আলো পড়েছে মায়ের তরুণী মুখে। মাকে অত অল্পবয়সি দেখার কোনও স্মৃতিই তো আমার নেই। অথচ কী কৌশলে যেন এখন দেখতে পাচ্ছি। দোলনা প্রায় থেমে এসেছিল, এখন আবার হালকা ধাক্কা পড়ে, আবার দুলতে থাকি। মায়ের গান এখন খুব মৃদু, বাইরের ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে মিশে-মিশে হারিয়ে যাচ্ছে।

তার পরেই দৃশ্য বদলে যায়। নিজেকে দেখতে পাই না আর, দেখতে পাই এক অদ্ভুত বৃক্ষলোক। বিস্তীর্ণ পাথুরে প্রান্তরের মধ্যে একখণ্ড সবুজ মরূদ্যানের মতো জায়গা গাছে-গাছে ছেয়ে আছে। মাটিতে চকচকে সতেজ সবুজ ঘাস, মস্ত-মস্ত সব মহীরুহ উঠে গিয়েছে আকাশের দিকে, জটিল জটার মতো ঝুরি নেমেছে কোনও-কোনও গাছের থেকে। আর কত রকমের চেনা অচেনা লতা, কোনও-কোনওটায় অপূর্ব ফুল ফুটেছে, তার কত রকমের রং আর কী অপূর্ব সুগন্ধ।

পুরো দৃশ্যটার মধ্যে কী যেন একটা সামান্য অভাব ছিল, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি খুব ভোর তখনও, সূর্যোদয় হয়নি, কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যোদয় হল আর সেই আলো যেন রাজরাজেশ্বরের মতো এসে পড়ল ওই বৃক্ষলোকের পাতায়-পাতায় ঘাসে-ঘাসে ফুলে-ফলে। সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য পাখির গান ভরিয়ে তুলল বাতাস। আস্তে-আস্তে পাখিদের গান কমতে-কমতে থেমে গেল প্রায়, তখন শুনতে পেলাম এক মানুষের গলার গান, তার অপরূপ সুরে যেন শূন্যতার হৃদয়ও ভরে ওঠে।

একটা ঝুরিনামা গাছের পাশে দেখলাম সেই মানুষকে যে গান গাইছিল। এক ছোট্ট মেয়ে। চুপ করে ঘাসের উপরে বসে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সে গান গাইছিল, তার পরনে সবুজ পাতা কাঠি গিয়ে গেঁথে তৈরি ঘাগড়া আর গায়ে ফুল

দিয়ে তৈরি জামা, তার মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা, বেশ কয়েকটা ময়ূরপালক মাথায় লাগানো। তার হতে ডাঁটিসমেত পদ্মফুল আর তার মাখনের মতো পায়ের কাছে লুটিয়ে শুয়ে আছে অনেকগুলো সাপ। ফণা মাটিতে নামিয়ে শুয়ে আছে, যেন বুঁদ হয়ে আছে কীসে। এর পরেই ফিরে এল আমার পারিপার্শ্বিকের বোধ, মনে পড়ল আমি গুহাতে গুহাচিত্র রং করার কাজ করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চোখ মেললাম। দেখলাম রীতমা কাজ করছে।

আস্তে-আস্তে এলানো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসলাম, দেখলাম ক্লান্তি কেটে গিয়েছে, মাথার ব্যথাটাও আর নেই। চোখেও আর জ্বালা নেই। অনেক তাজা লাগছে। উঠে নিজের কাজের জায়গায় গেলাম। রীতমা শব্দ পেয়েছিল, বলল, "এখন ভাল লাগছে একটু?"

আমি হেসে বললাম, "হ্যাঁ, এখন আর ক্লান্তি নেই, মাথার ব্যথাটা কমেছে। রীতমা, আমি কি অনেকক্ষণ বিশ্রাম করলাম?"

রীতমা বলে, "না-না এই তো আধঘণ্টা মতো হবে।"

"ধন্যবাদ রীতমা। আমি তা হলে কাজ শুরু করি।"

অবিলম্বে কাজ শুরু করে দিই। মনে-মনে ধন্যবাদ দিই স্বপ্নের সেই মায়ের ঘুমপাড়ানি গান আর সেই অলৌকিক বৃক্ষলোকের আশ্চর্য ছোট্ট গায়িকাকে।

আস্তে-আস্তে রং করতে থাকি। কানের ভিতরে গভীর শান্তির মতো সেই গানের সুর যেন এখনও বাজছে, স্বপ্নের ভিতরের সেই গান, যেই গানের সুরে বিষধর সাপেরাও লতিয়ে পড়ে আছে গায়িকার পায়ের কাছে।

ওই আশ্চর্য বালিকা কে? যত দূর মনে পড়ে অমন কোনও মানুষ আমার এই গোটা জীবনে দেখিনি। এমনকী একটুখানি মিল আছে ওর সঙ্গে তেমন কারওকে দেখিনি। স্বপ্নে ওকে কেন দেখলাম? কী অপরূপ ওর চোখ দু'টি, নীল আকাশের প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে জেগে থাকা দিঘির মতো।

শান্তির ঢেউয়ের মতো আমার কানের ভিতর আবার ভেসে আসে নতুন সুরের ধারা, বুকের ভিতরে বৃষ্টি ঝরতে থাকে, টুপ টাপ টুপ টাপ টুপ টাপ। ঝিকমিকে রোদ্দুরের ভিতর দিয়ে স্বর্ণাভ বৃষ্টিবিন্দু, আনন্দের বৃষ্টি।

তারপর থেকেই ঝলমলে সোনালি রোদ্দুরের দিনে বা শ্যামলছায়া মেঘলা দিনে, ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্নারাতে অথবা তারা ঝিলমিল ঘননীল রাতে সেই আশ্চর্য সুরের মূর্ছনা মাঝে-মাঝেই আমার জগৎ ঘিরে ধরত। এই পৃথিবীর সুর নয় সে, অপার্থিব সুরলোকে তার জন্ম। যখন মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি, কোনও জীবেরই আবির্ভাব ঘটেনি তখন থেকেই যেন ওই সুর অনুরণিত হয়ে চলেছে গ্রহে-গ্রহে, নক্ষত্রে-নক্ষত্রে, নীহারিকার উড়ন্ত আঁচলে, ওই যে আরেনুশ যে ছায়াপথের কথা বলছিল, কোটি-কোটি নক্ষত্র ধারণ করে রেখেছে নিজ দেহে, সেই রকম অনেক-অনেক ছায়াপথ আছে। ঘূর্ণির মতো দেখতে ওরা, সেইসব ছায়াপথের নীল নক্ষত্রতারা বাহুতে-বাহুতে, তাদের বিশাল তেজোময় হৃদয়ের তীব্র জ্যোতিপুঞ্জে। অমৃতের সুরঝঙ্কার, অমৃতের হৃৎস্পন্দন।

{৮}

"আকাশের চাবি, আকাশের চাবি..." কোথায় শুনেছিলাম এই আশ্চর্য কথা দুটো? আকাশের কি চাবি হয়? তালার চাবি হয়, গাড়ির চাবি হয়, দরজার চাবি হয়, কোনও-কোনও বাদ্যযন্ত্রের চাবি হয়, কিন্তু আকাশের চাবি? কে বলেছিল আকাশের চাবির কথা? আরেনুশ বলেনি জানি, তবে কে বলেছিল? আমার সেই পাহাড়ি জন্মভূমির প্রাণের বন্ধুটা, নিজনি?

আজও কাজ করছি সেই গুহায়, বিশাল সেই গুহার অন্য প্রান্তে। এখানেও আর-এক আগুনপাখির ছবি। প্রদীপের কাঁপা-কাঁপা আলোয় আস্তে-আস্তে আগুনপাখির ডানায় কমলা রং বোলাতে-বোলাতে বারেবারে আজ কেন জানি মনের মধ্যে ফিরে আসছে ফেলে আসা সেই আনুমা, সেইসব ঋতুতে-ঋতুতে নতুন গাছে নতুন-নতুন ফুল ফুটে ওঠা সেই প্রিয় জনপদ।

আরেনুশ বলেছিল, আমাদের নতুন দেশে নতুন জীবন হবে, আমাদের সামনে খুলে যাবে গোটা দুনিয়া, আমাদের সুযোগ বেড়ে যাবে অনেক। অসহায়ের মতো আক্ষেপ করতে হবে না শুধু অর্থাভাবে কত কিছু করা হয়ে উঠছে না, নিজেদের আর বন্দি বলে মনে হবে না।

আমি আরেনুশের কথায় সায় দিয়েছিলাম, শুধু ওকে খুশি করার জন্য নয়, নিজেরও সেইসময় তাই মনে হয়েছিল। এখন মাঝে-মাঝে মনে হয় এই জীবন কি চেয়েছিলাম? সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির ডানায় ঢুকে গেলে ক্লান্ত পাখির মতো বাসায় ফিরে যাই, আরেনুশ ফিরে আসে ওর দূর মিনারের প্রান্তর থেকে।

এত ক্লান্ত যে কথা বলতেও ইচ্ছা করে না, কোনও রকমে ভাগাভাগি করে রান্নাবান্না করে কোনও রকমে দুটো মুখে দিয়েই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি, আধোঘুমে আরেনুশ পাশ ফেরে, আমিও ফিরি...কিন্তু পাহাড়-অধিত্যকায় রেখে আসা জনপদটি আমাদের মাঝখানে এসে দেখা দেয়, আমি ভেঙে পড়লে ও আমাকে সান্ত্বনা দেয়, ও ভেঙে পড়লে আমি ওকে...সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে...আমরা এখনও তাজা অনেক, এখনও তাই সতেজ আমাদের আশাবাদ, কিন্তু আস্তে-আস্তে তাপ কমে আসবে, তখন কী হবে?

গভীর অতীতের বুক থেকে আরেনুশের দেখানো সেই রহস্যময় গিরিগুহার প্রত্নমানব-প্রত্নমানবীরা আমাদের আশা জুগিয়ে চলেন, তোমারা ভয় পেও না তোমরা ভয় পেও না, আমরা তোমাদের পাশে আছি।

আমরা উঠে পড়ি শেষরাত্রে, সকালের কাজকর্ম আর স্নান-টান তখনই সেরে, অল্প কিছু খাবার বানিয়ে উপবাসভঙ্গ করে তারপরে হোমওয়ার্ক করতে বসি। শেষরাত আর ভোর ছাড়া আর সময়ই বা কোথায়? রাত্রে করতে পারি, কিন্তু চেষ্টা করে দেখেছি সারাদিনের ক্লান্তির পরে রাত জেগে কাজ করলে কাজ ভাল হয় না। আরেনুশও পারে না রাত জাগতে, তাই আমরা হোমওয়ার্কের জন্য বেছে নিয়েছি শেষরাত আর প্রথম ভোর।

হোমওয়ার্কে পরস্পরকে সাহায্যও করতে পারি আমরা।

ঘণ্টাতিনেকের নিটোল সময় পাওয়া যায় সকালে, ওই সময় অনেক কাজ হয়, তার পরে কাগজপত্তর, পাথরপাটা, রং-তুলি, টিফিন সব গুছিয়ে নিয়ে আমরা ক্লাস করতে চলে আসি।

এইভাবেই নতুন অভ্যাসের ছকে আস্তে-আস্তে খাপে-খাপে বসে যাচ্ছে আমাদের জীবন।

কিন্তু গতকাল মাঝরাতে আরেনুশ ঘুম ভেঙে আমায় আস্তে-আস্তে ধাক্কা দিয়ে ডেকে বলেছিল,"ওরিয়ানা, ওরিয়ানা, ওঠো, ওঠো।"

আমি জেগে গিয়ে অবাক হয়েছিলাম, এত রাত্রে ডাকল কেন, সাংঘাতিক কিছু ঘটল নাকি? আরেনুশ উঠে বসেছিল, চিন্তিতভাবে তাকিয়ে ছিল জানালার দিকে, জানালার বাইরে নিকষ কালো আকাশ, অসংখ্য তারা তাতে। শনশন করে রাত্রি বয়ে যাচ্ছে।

আমি উঠে বসে আরেনুশকে বলেছিলাম, "কী হল, হঠাৎ ডেকে তুললে যে এই মাঝরাত্রে? কোনও জরুরি কিছু?"

আরেনুশ কথা না বলে বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়েছিল, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বাইরের দিকে চেয়ে, তার পরে মুখ ফিরিয়েছিল।

চাঁদ কেন আসে না?

ক্লাসে একদমই মন বসছিলো না কুহেলীর। ক্লাস বাঙ্ক করে চলে যাবে ক্যান্টিনে তারও উপায় নেই। গ্রুপের সব কটাই মন দিয়ে ক্যালকুলাসের অঙ্কে মজে রয়েছে। কিন্তু কোনো ভাবেই ক্লাসে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিলো না কুহেলীর। ঋজুটাও আজ ডুব মেরেছে। নতুন গড়া ব্যান্ড নিয়ে বেজায় ব্যতিব্যস্ত। নেকস্ট উইকে মুক্তমঞ্চ পারফর্ম করবে ওরা। জোর কদমে রিহার্সাল চলেছে। পৌলমিও একদমই মুখ তুলছে না। হাঁ করে গিলে চলেছে অঙ্কের জটিল প্যাঁচপয়জার।

কোনো ভাবে ক্লাসটা কাটিয়ে ক্যান্টিনের দিকে যাবে ভেবেও গেল না কুহেলী। গিয়ে বসে পড়ল লাইব্রেরীতে বই খুলেও মন দিতে পারল না। কুহেলীর আনমনা ভাবটা লক্ষ্য করেছিল মৌমিতা। পাশে এসে বসল। জানতে চাইল কি হয়েছে। মৌমিতাকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে এড়িয়ে গেল কুহেলী। পরের ক্লাসটা করবে না। তবে কী বাড়ি যাবে? কিন্তু সেখানে তো গুমোট পরিবেশ। অথচ কদিন আগেও পরিবেশ ছিল অন্যরকম। দাদা কৌশিক বিয়ে করেছে ওর একদা সহপাঠী মৃত্তিকাকে। বিয়ের আগে থেকেই হবু বৌদি মৃত্তিকাকে চিনত কুহেলী। তাই দুজনের সম্পর্কটা ঠিক যেন পিঠোপিঠি বোনের মতো। কিন্তু বিয়ের চার বছর পেরিয়ে গেলেও বৌদি মা হতে পারে নি। তা নিয়ে অশান্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মাও এ নিয়ে প্রাই অনুযোগ করে। অথচ কনভেন্ট শিক্ষিতা কলেজ শিক্ষিকা বৌদিকে নিয়ে বাড়িতে সবাই গর্বিত ছিল। ডাকসাইটে সুন্দরী না হলেও মৃত্তিকাকে দেখলে চোখ ফেরানো দায়। বিয়ের আগে যে মৃত্তিকাতে দাদা বুঁদ হয়ে থাকত, এখন সেই দাদাই কেমন মনমরা হয়ে থাকে। তার উপর গতকাল এই সব নিয়ে যা হলো বৌদিতো আজ ব্রেকফাস্ট না খেয়েই সকাল বেড়িয়ে গেল। এভাবে কতদিন চলবে।

মৃত্তিকাও ঝোড়ো মন নিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়েছে। কিছুটা উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘোরাঘুরির পর গিয়ে হাজির হলো ঝকঝকে মলের তকতকে ফুডকোর্টে। পেটে খিদে চাগার দিচ্ছে। একটা গ্রিলড চিকেন সালাদ নিয়ে বসল। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না। সন্তান না হওয়া কি তার দোষ। কত কী তো করেছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, স্পেশালটি ক্লিনিক কোথাও কোনো সুরাহা হলো না। সেও তো চায় একটা ফুটফুটে শিশু আসুক কোল জুড়ে। ভাবতে গিয়ে দেখল খাবারটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। একটা কফি নিয়ে এসে টেবিলে বসে ব্যাগ থেকে একটা মেয়েদের প্রত্রিকা বের করে আনমনে পাতা উল্টে দেখতে লাগল মৃত্তিকা। হঠাৎ একটা লেখা পড়তেই থমকাল ...।

লাইব্রেরীতে বৌদির ফোনটা আসতেই চমকে উঠল কুহেলী। ছুটে বাইরে

এসে কল রিসিভ করল। বৌদি কি বলল সবটা বুঝতে পারল না তবে বুখলে তাকে বৌদির খুব দরকার। ব্যাগটা নিয়ে কলেজ থেকে বেরতে যাচ্ছিল কুহেলী হঠাৎ পেছন থেকে ঋজুর ডাক। বন্ধুদের মধ্যে ঋজু ওর বেষ্টফ্রেন্ড। বাড়ির উত্তপ্ত আবহাওয়ার আঁচ তার কাছে আছে। তাই বেশি কিছু না বলে কুহেলীর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। কলেজের গেটের বাইরে যেতেই লটারির টিকিটের মতো ট্যাক্সি পাওয়া গেল একটা। দুজন সওয়ারীকে নিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলল থিয়েটার রোডের দিকে।

মৃত্তিকা সেক্সপীয়র সরণীর জেনোম ক্লিনিকে অপেক্ষা করছে। পাশে কুহেলীও। ট্যাক্সিতে ঋজুকে সব খুলে বলতে হলো না। ঋজুই বলল তুই বৌদির পাশে থাক। খানিকক্ষনের মধ্যেই ক্লিনিকের রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডেকে পাঠালেন । সব শুনে তিনি মৃত্তিকাকে কয়েকটি পরীক্ষা করাতে বললেন। সেই সঙ্গে হাজব্যান্ডকেও নিয়ে এসে কিছু পরীক্ষা করাতে বললেন।

এরপর ক'টা দিন মৃত্তিকা-কৌশিকের জীবন দ্রুতলয়ে বদলে গেল। পরীক্ষায় দেখা গেল মৃত্তিকার ফ্যালোপিয়ন টিউবে ব্লকেজ রয়েছে। যেহেতু কৌশিক-মৃত্তিকা দুজনেই ৩০ পেরিয়ে গেছে তাই চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশান পদ্ধতিতে কৃত্রিম প্রজনন করাতে। তাতে কনসিভ করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উপায়ে প্রেগনেন্সির চাইতে বেশ সহজেই সফল হওয়া যায়। এছাড়া ঝুঁকিও এ ক্ষেত্রে বেশ কম। তাই মৃত্তিকারা আই.ভি.এফ পদ্ধতি অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিল।

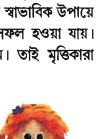

কাল সুখবর এসেছে । মৃত্তিকা সফল ভাবেই প্রেগনেন্সির ফার্স্ট, ট্রাইমেস্টার পেরিয়ে গেছে। বাড়িতে আবার সুপাবন বইছে। এবার পুজোতে ঋজুর ব্যান্ড পারফর্ম করবে পাড়ার প্যান্ডেলের পাশে বাঁধা মঞ্চে। মৃত্তিকা সেদিন ঋজুর ব্যান্ড মেম্বারদের ডিনার করে যেতে বলেছে। কুহেলীকে চোখ টিপে বলেছে- "কিরে তোদের মধ্যে কিছু এগোলো?" কুহেলী তো হাওয়া উড়ছে- "ঋজুকে গোলি মারো আমি এবার পিসি হবো সেটাই ব্রেকিং নিউজ"।

genome™ THE FERTILITY CENTRE

E:- genomee@neotiahealthcare.com
W:- www.lifeatgenome.com
LifeatGenome
(০৩৩) ৩০৮৫৫১১৭/৫১১৮
মো/হোয়াটস্‌অ্যাপ-৯০৫১৮২৫৬৭৮

আরো জানতে

কলকাতা - ৬৭ সেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা- ১৭
গড়িয়া - ১৬৮ গড়িয়া মেন রোড, কলকাতা- ৮৪
শিলিগুড়ি - সিটি সেন্টার, উত্তরায়ণ, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি - ১০
মেদিনীপুর - ১১১৭/২৮৪, স্টেশন রোড, কেরানিতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭১

আমিও গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ওর কাছেই, ও বলেছিল, "ওরিয়ানা, আমার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে, প্রথম থেকেই হচ্ছে, এত দিন গ্রাহ্য করিনি, এখন মনে হচ্ছে কিছু করা দরকার।"
আমি চমকে উঠেছিলাম, ওরও অস্বস্তি হচ্ছে! আমারই শুধু না তবে? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কীসের অস্বস্তি? এখানে ভাল লাগছে না? ফিরে যেতে চাও?"
ও বলেছিল, "ঠিক তা নয়, ক্লাস করতে ভাল লাগে, কাজ শিখতে আর কাজ করতেও, কিন্তু...কিন্তু কোথায় যেন কাঁটার মতো একটা অস্বস্তি, মনে হয়...কী জানি হয়তো আমার মনের ভুল।"
আমি বলেছিলাম, "আমারও অস্বস্তি হয় মাঝে-মাঝে, আমার মনে হয় কেউ আমাদের যেন লক্ষ করছে, যেন ছাঁচে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে...কিন্তু হয়তো মনের ভুল, হয়তো তা না। কিন্তু তোমারও ওরকম মনে হয়?"
আরেনুশের চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে উঠেছিল, "একদম তাই। আমারও মনে হয় কেউ আমাদের যেন লক্ষ করছে, যেন একটা ছাঁচের মধ্যে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে কেউ, জোর করে বেরিয়ে আসছি বারেবারে, কিন্তু ভয় হয় একদিন হয়তো আর পারব না।"
আমি আরেনুশের হাত ধরে অল্প চাপ দিয়ে বলেছিলাম, "ভয় করে কী লাভ আরেনুশ? যদি সত্যিই কিছু ব্যাপার থাকে, কীই বা করতে পারব? কতটুকুই বা শক্তি আমাদের? কিন্তু আমরা পাশাপাশি

ওই কণ্ঠস্বর যেন
কোন বিস্মৃত অতীতের
বুক থেকে
ঝরনার ধারার মত
ঝরে পড়ে আমার
ক্লান্তির উপরে।

থাকব, পরস্পরকে সাহায্য করব। তেমন-তেমন বুঝলে দেশে চলে যাব, সেই পথ তো বন্ধ নয়! সেখানে যা করতাম, তাই করব আবার, দু'জন মানুষের সহজ, সরল জীবন কোনওভাবে চলে যাবে। ভয় করে লাভ নেই আরেনুশ। এভাবে রাত জেগে নিজেদের ক্লান্ত করেও লাভ নেই। এসো ঘুমোই।"
ও মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।
তার পরে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পাশাপাশি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আমরা, আমাদের দুটো হাত পরস্পরকে ধরে ছিল, যেন একে অপরকে সাহস দিচ্ছিল স্পর্শের বৈদ্যুতি-ভাষায়, আস্তে-আস্তে হাত দু'খানাও ঘুমিয়ে পড়েছিল।
ঘুমের মধ্যেও কিন্তু সেই বিঁধে থাকা কাঁটার মতো অস্বস্তিটা থেকে যায়, যেন কেউ লক্ষ করছে আমাকে। যেন আমার হৃদয়, মস্তিষ্ক, মন, বুদ্ধি সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কারা দেখছে, আঁতিপাতি করে কিছু খুঁজছে, যেন কিছু লুকিয়ে রেখেছি কারও কাছ থেকে।
ধোঁয়া-ধোঁয়া সব ছায়া-ছায়া মূর্তি হালকা পায়ে ঘুরছে, চারিদিকে চৈত্র-রাত্রির বাতাসের মতো ফিসফিস, আস্তে-আস্তে ঘন নীল হয়ে ওঠে সব, তার মধ্যে ফুটে ওঠে হালকা-হালকা নীল ঘূর্ণি নকশা। সেই নকশা ক্রমে সোনালি-রুপালি হয়ে তীব্র হয়ে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায়।
সাবধানে উঠে বসি, অতি সন্তর্পণে হাতখানা বের করে নিই আরেনুশের হাতের নীচ থেকে, চেয়ে থাকি আরেনুশের গভীর নিদ্রামগ্ন মুখখানার দিকে, ঘুমোলে ওর মুখ কী কোমল! অকলুষ, অমলিন কিশোরের মতো মুখ! ও-ও কি আমার মতো ওই রহস্যময়দের স্বপ্ন দেখছে? আমি যা দেখলাম, তা কি স্বপ্ন? ভয় পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভয় নয়, সত্যি ভয় না, অন্য রকম একটা অনুভূতি হচ্ছে স্বপ্নটা দেখে। ঠিক যেন ব্যাখ্যাহীন কোনও অস্বস্তির একটু-একটু কিছু ধরতাই পাওয়া যাচ্ছে। এতদিন যেটা ছিল কল্পনা মাত্র, সেটার প্রথম উড়ে আসা পক্ষধূলি যেন এসে লেগেছে চোখে, মুখে, গালে। আমাদের জীবনের মধ্য দিয়েই হয়তো জানতে পারা যাবে, জীবন দিয়ে হয়তো রহস্যকে সমাধান করতে হবে।
তাতে ভয় করে কী হবে? জীবন আমাদের এমন কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? অধৈর্য হয়েও তো লাভ নেই। একটু-একটু করে গ্রন্থি খুলবে এর, আমাদের শুধু বেঁচে চলতে হবে ঠিক সময়ের অপেক্ষায়। আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে হঠাৎ মনে হল, এইসব ভাবনা কি আমার? এও মনে হল কেউ যেন আমাকে সাহস দিচ্ছে। এতটা ভয়হীন ভাবনা কে দুর্বলচিত্ত আমার মধ্যে ভরে দিচ্ছে?
ঘরটা বদলে যায় হালকা নীল রঙে, দরজা-জানলাগুলো অপরাজিতা ফুলের পাপড়ির মতো ঘননীল। ঘরটার অনুভূতি ভারী অদ্ভুত, চৌকো, না গোল, না পিরামিডের মতো কিছুতেই বোঝা গেল না। মাঝেই-মাঝেই আকৃতি বদল হয়, দেওয়াল কখনও সিলিন্ডারের ঘোরানো তলের মতো হয়ে যায়, কখনও সোজা সমতল, কখনও এবড়োখেবড়ো, কখনও বোঝাই যাচ্ছে না দেওয়াল আছে। ছাদও বদলায়, দরজা-জানালাও আকৃতি বদল করছে। এগুলোর রংও বদলে যায়।
ঘরটা বিরাট বড়, এর মাঝখানে কতগুলো আশ্চর্য আকৃতির বসবার আসনে বসে আছে কিছু জীব, খুব ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে সবাই। বুদ্ধিমান জীব সন্দেহ নেই। আকৃতি অনেকটা মানুষের মতোই, আশ্চর্য সর্বাঙ্গ-ঢাকা পোশাক ওদের। পোশাকগুলোর রং বদলায়, কিন্তু কাল রাতে বদলাচ্ছিল না। এরা মানুষ কিনা বুঝতে পারি না, মানুষও হতে পারে, যন্ত্রমানবও হতে পারে, আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবও হতে পারে।
এরা মুখে বিশেষ কথাবার্তা বলে না, হাতের আঙুলে চিকমিক করা আংটির মতো বহু যন্ত্র বসানো, তারই মাধ্যমে এরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করছে, শব্দহীন এক আশ্চর্য ভাষায়। আলোর ভাষা। এদের সামনে বিশাল দেওয়াল জুড়ে ফুটে উঠেছিল দু'জন পার্থিব মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের চিত্র, একদম সমস্ত সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম তরঙ্গ ইত্যাদি দেখানো, আরও বহু কিছু আছে। আমাদের চেনা নয় সেসব, এদের প্রযুক্তি আমাদের থেকে বহুগুণ উন্নত। মাঝে-মাঝেই বিশেষ-বিশেষ, অংশে গিয়ে এরা আরও ভাল করে বিশ্লেষণ করছিল।
প্রথম-প্রথম স্বপ্নে এদের যখন দেখতাম তখন এত স্পষ্ট হত না, নীলঘূর্ণি এসে সোনালি-রুপালি আলোর চর্কিবাজির মতো কীসব এনে ফেলে ছবি মুছে দিত। কিন্তু ইদানীং আর অমন হয় না, স্পষ্ট দেখি ওদের ঘর, দেওয়াল, আসবাবপত্র আর ওদের সবাইকে। বহু রকমের যন্ত্রপাতি আছে ঘরটিতে, কিছুই আমার চেনা নয়।
প্রথমে বুঝতেই পারতাম না ওই ছবিগুলো কী। পরে আস্তে-আস্তে অনুসন্ধান করে বুঝি মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের ছবি। তারও আরও অনেক পরে অনেক-অনেক পালা স্বপ্ন দেখার পরে বুঝতে শুরু করি ও দুটো আমাদের দু'জনের। মাঝে-মাঝে ওরা আমাদের পুরো চেহারাও পরদায় ফেলে দ্যাখে।
বহুদিন থেকে দেখছে, ব্যস্ত হয়ে অঙ্ক করছে, ওদের কথাবার্তা

বিশেষ নেই। বললেও কি আমরা কিছু বুঝতাম? কিন্তু বুঝতে পারি কিছু একটা নিয়ে ওরা ভারী উদ্বিগ্ন। কী হতে পারে? নিরীহ আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে এমন কী থাকতে পারে যা ওই উন্নত জীবেদের এত উদ্বিগ্ন করে তুলেছে?

নাকি উদ্বিগ্ন নয়? ওরা উত্তেজিত? ওরা কি কিছু করতে চাইছে আমাদের নিয়ে? সেটা কী? সেটা কি আমাদের পক্ষে ভাল না খারাপ? আমাদের পক্ষে শুভফলদায়ক নাকি তার উলটো?

মাঝে-মাঝে অসহায় লাগে, মনে হয় যদি ওরা এদের ইচ্ছেমতো উদ্দেশ্যমতো আমাদের ভিতরে কোনও পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, আমাদের কি কিছু করার আছে? আমরা ওদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহৃত দুটো সামান্য জীবন ছাড়া তো কিছু না! আমাদের ভাল বা মন্দের ধারণার সঙ্গে ওদের ধারণার কোনও সামান্য মিলও কি আছে?

ভাবনা থেকে জোর করে ছিঁড়ে এসে কাজে মন দিই। আজকে মাথাব্যথা বা ক্লান্তি নেই, আজকে ভাল করে টিফিন খেয়েছি কাজে আসার আগে। রীতমা এইমাত্র কাজে এল, ওর কি একটা স্পেশাল ক্লাস ছিল আজ, তাই আগে থেকে অনুরোধ করে রেখেছিল দেরিতে কাজে আসবে।

এসেই রীতমা কাজের পোশাক চাপিয়ে নিয়ে চটপট কাজে লেগে গেল। আমার পাশেই কাজ করছিল। কাজ করতে করতেই হেসে বলল, "ওরিয়ানা, আজকে ভাল আছ তো?"

আমি হেসে আবার ধন্যবাদ দিই ওকে, বলি, "তুমি না থাকলে সেদিন যে কী হত। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে রীতমা।"

রীতমা হাসতে-হাসতে বলে, "আরে ধন্যবাদ দেওয়ার কী আছে এত? বন্ধু তো আমরা। দেখেছ ওরিয়ানা, এখন দু'জনেই কী চমৎকার সম্ভালার ভাষা বলতে পারি? আসলে কথা বলতে-বলতেই ভাষা শেখা হয়। শুধু বই পড়ে কি আর ভাষা শেখা যায়?"

{৯}

তার পরে দিন যায়, রাত যায়। আমরা কাজকর্ম করি, খাই দাই, ঘুমোই আর স্বপ্নে দেখি সেই অনন্ত ঘর আর তার অন্তহীন বদলে যেতে থাকা দেওয়াল, ছাদ, দরজা, জানালা...সকালে উঠে অবশ্যপালনীয় নিত্যকর্মের মতো সেই কথা বলাবলি করি আমি আর আরেনুশ, আর কেউ এসব জানে না।

এই অর্ধ-ধ্যানমগ্ন সম্ভালার অধিবাসীদের মধ্যে যারা আমাদের সঙ্গী ছাত্র ও সহকর্মী, তাদেরও আমরা এসব বলতে পারি না কখনও, আমাদের যারা নির্দেশক ও শিক্ষক তাদের তো আরওই না। ভয় বা সংকোচ নয়, অন্য কারণে বলতে পারি না, মনে হয় বললেই যেন ওরা অবাক হয়ে তাকাবে, মুখের মায়ালু ভাব দূর হয়ে যাবে, স্বপ্নাচ্ছন্ন অর্ধনিমীলিত চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে খুলে যাবে, শান্তির ঘুম থেকে আচমকা জেগে উঠে যেন ওরা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠবে।

কেন দু'জনেরই এরকম মনে হয়, কে জানে! কিন্তু মনে হয়, তাই আমরা কিচ্ছু বলি না কাউকে। নিজেরা-নিজেরা শুধু আলোচনা করি, কিন্তু কোথাওই পৌঁছতে পারি না সেই আলোচনা থেকে। অচেনা অরণ্যের কিনারের অজানা সাগরতটে অবোধ মানব-মানবীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি যেন, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না কী আছে ওই তরঙ্গায়িত অসীম নীলের ওইপারে?

একদিন আমাদের চিঠি এল দেশ থেকে, ডাকজাহাজ মাসে একবার আসে, হিসেব করে ছুটির দিনের দুপুর নাগাদ এসে ঘাটে ভেড়ে, আগ্রহী লোকেরা ভিড় করে থাকে জাহাজঘাটায় সেদিন, আমরাও যাই। সেদিনও গেছিলাম যেমন গত ছ'মাসে ছ'বার গিয়েছি। প্রথম মাসে আমাদের দু'জনেরই চিঠি ছিল, আরেনুশের বন্ধুদের কাছ থেকে আর আমার আপনজনদের কাছ থেকে। মুখ আটা খামের ভিতরে ওদের নিজেদের হাতে লেখা চিঠি। আমরা খামের উপরে অনেক করে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে না খুলে ঘরে নিয়ে এসেছিলাম, ঘরে এনে খাম খুলেছিলাম। সারাদিন ওই চিঠিতেই বুঁদ ছিলাম দু'জনেই, খাওয়া-নাওয়া সব ভুলে। রাত্রেই উত্তর লিখে পরদিন ফিরতি ডাকজাহাজে দিয়েছিলাম। তার পরে গত পাঁচ মাস আর চিঠিপত্র ছিল না। প্রত্যেকবার এসে হতাশ হয়ে ফিরে যেতাম, আজকে দু'জনেই অবাক চিঠির মোটা-মোটা দু'খানা খাম পেয়ে। ঘরে এসে খুলতেই ঠং করে আমার খামের ভিতরের একতাড়া কাগজের ভাঁজের ভিতর থেকে গড়িয়ে পড়ে একখানা সোনালি রঙের ধাতব রিং আর আরেনুশের খাম থেকে একখানি ত্রিভুজাকার রুপোলি ধাতবপাত। অত্যন্ত অবাক হয়ে যাই আমরা দু'জন, অবাক হয়ে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে বোবা হয়ে বসে থাকি। কী করব বুঝতে পারি না দু'জনের একজনও।

এরকম জিনিস আগে কোথাও দেখেছি কি? কে আমাদের এগুলো পাঠাল? কী এগুলো? কেনই বা আমাদের পাঠাল?

খামে প্রেরকের নাম-সাকিন কিচ্ছু নেই, আমরা ওই তাড়া-তাড়া কাগজ আঁতিপাতি করে খুঁজি, আরও-আরও অবাক হয়ে যাই। অচেনা লিপিতে ক্ষুদে-ক্ষুদে করে বহু-বহু কিছু লেখা, কোথাও রেখাচিত্রও আছে, কিন্তু বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমাদের বোধগম্য হয় না। সম্পূর্ণ অচেনা ভাষা, এমনকী রেখাচিত্রগুলি অদ্ভুত। আমি তো আমি, বহুকাল ধরে বিমূর্ত শিল্প নিয়ে নাড়াচাড়া করা আরেনুশও কিছুই বুঝতে পারে না। তা হলে কি কোথাও কোনও ভুল হয়েছে?

AMARBOI.COM

ভুল করে অন্যের চিঠি আমাদের হাতে এসে পড়ল?
না, তাও তো না, এই তো খামের উপরে জ্বলজ্বলানো বড়-বড় করে লেখা আমাদের নাম, ঠিকানা! দুই ভাষায়, একটা সম্ভালার ভাষায়, একটা আমাদের মাতৃভাষায়। তা হলে এই রকম অদ্ভুত সব লেখা কেন? এই দু'খানা ধাতব বস্তুই বা কেন? কেউ কি প্র্যাকটিকাল জোক করল আমাদের সঙ্গে?
একেবারে অসম্ভব যে তাও না, কিন্তু খুবই কম সম্ভব। কার কী লাভ এই-এই এত দূরে, এত খরচ করে রসিকতা করার? সেরকম কোনও বন্ধু বা আত্মীয়, উঁহু, মনে তো পড়ে না!
ডান হাতের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে সাবধানে তুলে নিই রিংখানা, মসৃণ সুন্দর সোনালি রঙের বালা। শিশুদের হাতের গোল সোনার বালার মতো। শুধু অসাধারণ মসৃণ। আলোর কাছে তুলে ঘোরালাম, রঙের ছটা ছিটকে উঠল ওর ধাতব গা থেকে। কোথাও কোনও নকশা নেই, একদম নিটোল। এবারে বাঁ হাতের করতল প্রসারিত করে তাতে রাখলাম রিংটা, চেয়ে রইলাম ওটার দিকে। কে এ জিনিস পাঠাল?
কষ্টিপাথরের ঘষা দিয়ে দেখব সোনা কিনা? কিন্তু সোনার হলেই বা কী, না হলেই বা কী? নতুন সংস্কৃতিতে সোনা এখন আর জরুরি বা দামি জিনিস কিছু নয়, আর পাঁচটা ধাতুর মতো সাধারণ।
আরেনুশও রুপোলি ত্রিভুজটা নিয়ে আমার মতোই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে খানিকক্ষণ দেখে তারপরে হাতে রেখেছে। ওর ত্রিভুজটা ভরাট, আমার রিংটা যেমন শুধু একটা বৃত্ত, ওরটা তা নয়, ভরাট একটি ত্রিভুজাকার পাত। কোনও নকশা নেই ত্রিভুজটায়, তিনখানা শীর্ষবিন্দু খুব সূক্ষ্ম।
অনেকক্ষণ জিনিসদুটো দু'জনে মিলে দেখতে থাকি, কোনও রহস্যভেদ হয় না। বেলা বেড়ে উঠতে থাকে, আমরা যুক্তি সাজাতে চেষ্টা করি এর পিছনে কী আছে সেই নিয়ে, আমাদের কল্পনা বারেবারে সেই পরিবর্তনশীল রহস্যময় ঘরখানির সঙ্গে এটাকে মেলাতে চায়, হয়তো ওরাই এদুটো পাঠিয়েছে আমাদের কাছে।
জল্পনা-কল্পনা অনেক করে শেষে তাড়া-তাড়া দুর্বোধ্য কাগজপত্র আর ধাতব ত্রিভুজ আর বালা রেখে যেই আমরা উঠতে যাব, অমনই ত্রিভুজটা শব্দ করে ওঠে, বালাটাও। ত্রিভুজের এক শীর্ষবিন্দু একটু লেগেছিল রিংটার উপরে, মৃদু ধাতব শিসধ্বনির মতো শব্দ করতে-করতে ত্রিভুজ গড়িয়ে ঢুকে পড়তে থাকে বালার মধ্যে, একসময় পুরো ঢুকে গিয়ে কট করে আটকিয়ে যায়।
এখন একটি ত্রিভুজ আর তার তিন শীর্ষবিন্দু ছুঁয়ে শক্ত হয়ে আটকানো বলয়। ঘরের আলো আচমকা অন্য রকম হয়ে গেছে। আমরা পরস্পরের হাত চেপে ধরে উত্তেজনায় নিশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছি। এসব কী হচ্ছে এখানে?
বলয়বদ্ধ ত্রিভুজ লাফিয়ে ওঠে শূন্যে, ঝকমকে জোরালো আলো বেরিয়ে আসে ওদের গা থেকে, ওরা ঘুরপাক খেতে থাকে ঘরের বাতাসে, মৃদু পিঁ পিঁ পিঁ শব্দ হতে থাকে। তাড়া-তাড়া চিঠির কাগজের মধ্যে ঝড়ের ঘূর্ণি লাগে যেন, বলয়বদ্ধ ত্রিভুজ ওগুলোর উপরে এসে আলো ফেলে, ঝড়ের মতো হাওয়া কাগজগুলো ওলটপালট করে, কিন্তু অন্য কোথাও হাওয়া নেই।
আমি আরেনুশের হাত ধরে আছি, আমাদের দু'জনের হাতই কাঁপছে, ঘেমে যাচ্ছে, বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ মেলে চেয়ে আছি কাগজ আর ত্রিভুজ-বলয়ের কাণ্ডকারখানার দিকে। একবার ঢোক গিললাম, গলার মধ্যেটা বালি-বালি লাগছে, ভীষণ তেষ্টা, অথচ জল খেতে যাওয়া অসম্ভব।
কী মনে করে একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, এখন ভরা দিনের আলো থাকার কথা, তপতপে দুপুর এখন। অথচ বাইরেটা অদ্ভুত বেগুনি আর কমলা রঙে ভরে আছে, গাছের মাথা-টাথা কিছুই দেখতে পেলাম না, আমরা কোথায়? এখনও নিজেদের ঘরেই আছি, কিন্তু তীব্র কোনও তরঙ্গ আমাদের ঘরখানি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে বাইরের জগৎ থেকে। জানালার বাইরে উজ্জ্বল বেগুনি আলো ঝলকে ওঠে, আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিই। একখানি চিঠির কাগজ তাড়া থেকে আলাদা হয়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায় বাতাসে, ত্রিভুজ-বলয়ের অদ্ভুত আলো ওর ছায়া ফেলে দেওয়ালে, অমনই ওই অদ্ভুত চিত্রলিপির মাঝ থেকে ত্রিমাত্রিক চলচ্ছবি বেরিয়ে দেওয়ালে অভিনীত হতে থাকে। সেই চলচ্চিত্রমালার মধ্য থেকে আমাদের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ আসে, বুঝতে অসুবিধা হয় না, কারণ কোনও ভাষা বা কথা ছিল না, অন্য কোনও উপায়ে মন থেকে মনে সরাসরি সংযোগ সাধন করছিল নির্দেশগুলো।
অভিভূত হয়ে আমরা আমাদের শ্রবণাতীত শ্রবণযন্ত্রে শুনতে থাকি এক অদ্ভুত ইতিহাস। আমাদের পৃথিবীর ইতিহাস, যার সঙ্গে পরতে-পরতে জড়িয়ে আছে গ্রহান্তরের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা। আমরা শুনতে পাই সেই ইতিহাস, যে ইতিহাস ও ঘটনামালা সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ জানা নেই আমাদের। কেউ-কেউ কোথাও-কোথাও তাঁদের সূক্ষ্ম, সংবেদনশীল মনের মধ্যে কিছুমাত্র টের পেলেও অন্যেরা কিছুতেই তা গ্রহণ করেনি, অথবা প্রমাণহীন বিশ্বাসমাত্রের ঠান্ডা ঘরে ঠেলে দিয়েছে।
আজকে এই কমলা-বেগুনি অজানা তরঙ্গের জালে আমাদের ঘরখানিকে পার্শ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ওই গভীর মহাকাশের অচেনা গ্রহের সভ্যতার স্বর আমাদের বলে যেতে থাকে আশ্চর্য সব ঘটনার কথা।
আস্তে-আস্তে আমাদের দমবন্ধ অস্বস্তি আর তৃষ্ণায় বালি-বালি হয়ে আসা গলা শান্ত হয়ে আসে, কোমল শান্তি এসে আমাদের ভিজিয়ে দেয় গ্রীষ্মপারের প্রথম বৃষ্টির মতো। শান্ত হয়ে আমরা শুনতে থাকি।

{১০}

আমাদের বিস্ময় তখন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সামনে দেখছি সেই সীমাহারা গোল ঘরটি, এতদিন যা স্বপ্নে দেখেছি। একদম ত্রিমাত্রিক প্রতিটা জিনিস আর সেখানকার জীবনের একদম দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতায় দেখছি। ঘরের দেওয়াল বলে কিছু নেই, দূরের উজ্জ্বল কুয়াশায় মিলিয়ে গিয়েছে ঘরের প্রান্ত। নীলাভ শুভ্র আলোয় ঘরটির সবটুকু উদ্ভাসিত।
লম্বা, আলগা, পা পর্যন্ত ঝোলা পোশাক পরে ঘরের মধ্যে ঘুরেফিরে যারা কাজ করছেন, তাঁদের মানুষের মতোই অবয়ব, যদিও মনের ভিতরে বুঝতে পারি ওঁরা অন্য প্রজাতির জীব, মানুষের তুলনায় অন্য রকম। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ওঁরা ওই রকম আকৃতি গ্রহণ করেছেন মাত্র। ওঁদের প্রকৃত চেহারা হয়তো আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ মনুষ্য-মস্তিষ্কে গ্রহণ করতে পারব না, হয়তো ভয়ে দিশাহারা হয়ে মরে যাব, সেই ব্যাপার বিবেচনা করেই আমাদের মতো অবয়ব ধারণ করেছেন হয়তো, কে জানে!
ওঁরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করছিলেন হাতের সবক'টা আঙুলে আর কবজিতে পরা অংটি আর বালার মতো জিনিসের মধ্যে বসানো উজ্জ্বল রত্নজাতীয় জিনিসগুলোর মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোর সাহায্যে। সেই আলোয় এত অবিস্মরণীয় সূক্ষ্ম রঙের ঘোরাফেরা যে, আমরা নেশাগ্রস্তের মতো হয়ে যাচ্ছিলাম।
একসময় ওঁদের নিজেদের মধ্যে আলো দিয়ে চলা কথাবার্তা কমে এল। কমতে-কমতে একদম শান্ত হয়ে গেল। ঘরজুড়ে এখন শুধু

AMARBOI.COM

সেই নীলাভ শুভ্র আলো, যেমন প্রথম থেকেই আছে। কোথায় এ আলো দেখেছিলাম আগে? কোথাও কি দেখেছিলাম? মনে পড়ে, পড়ে, পড়ে না।

ওঁদের মধ্য থেকে একজন উঠে এলেন নিজের আসন ছেড়ে, আসনগুলো যে কী দিয়ে তৈরি কে জানে, দেখা গেল তিনি উঠে আসার পর আর সেখানে কিছু নেই। এই ব্যক্তি বেশ দীর্ঘাঙ্গ, দীর্ঘ কৃষ্ণকেশ পিঠের উপরে মেলা, অপূর্ব সুন্দর কালো চোখ দু'টি ঝকঝক করছে, নিখুঁত ছেনিকাটা নাক-মুখ-চিবুক। চেহারা খুবই সুন্দর, ব্যক্তিত্ব একেবারে জ্বলজ্বলে।

ইনি এসে ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন, অমনই বাকিরা নিজের-নিজের আসন ছেড়ে ডান এবং বাঁ পাশ থেকে একে-একে এসে দাঁড়ালেন এর পাশে-পাশে। মধ্যস্থলের ইনি সম্ভবত এঁদের সকলের নেতৃস্থানীয়।

এঁরা মনুষ্যাকার, কিন্তু নারী না পুরুষ বোঝা যায় না। হয়তো এঁরা সেরকম কিছু হতেও চাননি। হয়তো লিঙ্গনিরপেক্ষ চেহারাই ধারণ করেছেন ইচ্ছে করেই। নারীর কোমলতা আর করুণার সঙ্গে পুরুষের দৃঢ়তা আর কাঠিন্য এমনভাবে মিলিয়েছেন যে বিস্ময়ে আমাদের চোখ কেবলই স্থির চেয়ে থাকে।

মাঝের ব্যক্তি এগিয়ে এলেন সামনে, উনি যেন আমাদের দেখতে পাচ্ছেন। হয়তো উনিও আমাদের দেখছেন ত্রিমাত্রিক ছবির মতো, অথবা অন্য কোনও প্রযুক্তি আছে, আমরা জানি না।

উনি ডান হাত তুলে ধরলেন, হাতের পাতা ছড়ানো, অভয়মুদ্রার ভঙ্গি। ওঁর হাতের কবজি ঘিরে যে উজ্জ্বল বালার মতো জিনিসটা, তার একটা প্রান্তে ঝলমলে সবুজ আলো জ্বলে উঠল, তার পরে গোটা বালাটাই সবুজ আলোর বলয়ের মতো হয়ে গেল। অন্য যারা ওঁর ডাইনে আর বাঁয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সবার ডান হাতের বালাতেই দেখলাম সবুজ আলোর একটু-একটু ছটা। আমার চোখে কেমন নেশা লাগে, কিন্তু চোখ সরাতে পারি না। ওই আলোর ভাষা কী করে বুঝব?

হঠাৎ মাথার ভিতরে হালকা একটা ঝাঁকুনির মতো লাগে, তার পরেই মনের ভিতর কথা শুনতে পাই।

ব্যক্তিত্ব-জ্বলজ্বলে গভীর সুন্দর একটা কণ্ঠস্বর বলছে, "ওরিয়ানা, আরেনুশ, আমরা তোমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পেরে খুব আনন্দিত। পৃথিবীর কয়েকশো নির্বাচিত মানুষের মধ্যে তোমরা অন্যতম। তোমাদের ভাল থাকা ও সুস্থসবল থাকার উপরে বহুলাংশে নির্ভর করছে আমাদের কাজের সাফল্য। তোমরা কি বুঝতে পারছ?"

যদিও বুঝতে পারছিলাম, শুধু ভাবলেই উত্তর পৌঁছে যাবে, তবু আমরা দু'জনেই একসঙ্গে বলি, "পারছি, বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনাদের এই কাজ, সেটা কী কাজ?"

মধ্যস্থলের ব্যক্তির হাতের বলয়টির উজ্জ্বল সবুজ আলো বদলে গেল স্নিগ্ধ নীল আলোয়, অন্য সকলের হাতের বলয়েও টুকরো-টুকরো নীল আলো এখন। আর তাদের সবাইকে ঘিরে নরম একটা হালকা সাদা আলো স্বচ্ছ ওড়নার মতো ছড়িয়ে পড়ল।

আবার সেই গভীর গলাটি তেমনই ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক কিন্তু করুণাভরা সুরে আমাদের জানাল, "আমাদের কাজ এই পৃথিবীর মানুষের মনকে আবার জ্ঞানবিজ্ঞানের আর অনুসন্ধানের কাজে ব্রতী করা। তাদের মনকে শক্তিশালী মায়া আর মোহ থেকে মুক্ত করা।"

আবার দু'জনেই উদগ্র আগ্রহে একই সঙ্গে প্রশ্ন করি, "কেমন করে করবেন সেই কাজ?"

গভীর স্নিগ্ধ করুণাময় সেই স্বর আমাদের মনের মধ্যে বলে চলে, "কাজটা কঠিন। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যথাসাধ্য। এই কাজ সফল না হলে পৃথিবীর মানুষের নক্ষত্রলোকে পৌঁছনোর ব্যাপারে আরও-আরও অনেক দেরি হয়ে যাবে। মহাপ্লাবনের আগে পৃথিবী পৌঁছেছিল এক ক্রান্তিলগ্নে, মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছিল, ক্ষুদ্র পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে মহাপৃথিবীতে বিস্তৃত হয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করেছিল।"

এই পর্যন্ত বলে কণ্ঠস্বর থেমে যায়, মধ্যস্থলের ব্যক্তির হাতের বলয় লালচে আলোয় বদলে গেল, বাকি সবার হাতেও তাই, ওদের ঘিরে সেই আলোর ওড়নাটা এখন রক্তাভ বেগুনি।

অদ্ভুত একটা বিষাদে আর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম আমি, সেই বিষাদ আর ক্লান্তি আমার ভয়কে ছাপিয়ে উঠল। আমি বলে ফেললাম, "তার পরে? তার পরে কী হল?"

সেই গলাটি আবার কথা বলে উঠল, "কিন্তু আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা পৃথিবীকে সন্দেহের চোখে দেখে, তারা বলে যান্ত্রিক উন্নতি প্রকৃত জ্ঞান নয়, মনের শক্তিকে ঠিকমতো না সন্ধান করে ক্রমাগত যান্ত্রিক উন্নতি করে-করে মানুষের সভ্যতা অসামঞ্জস্যে ভুগছে।"

রুদ্ধশ্বাসে আমরা শুনতে থাকি। এখন আর প্রশ্ন করার মতো অবস্থা নেই, স্বর যেন হারিয়ে ফেলেছি। সবল, তেজস্বী, গভীরতাব্যঞ্জক অথচ করুণামাখা স্বরটি মাঝে-মাঝে অল্প-অল্প বিরতি দিয়ে বলে যেতে থাকে।

"যান্ত্রিক উন্নতি ঘটাতে-ঘটাতে উন্নতির ধারা এতটাই অসামঞ্জস্যে ভুগতে থাকে যে পৃথিবীর জীবকুল আর পরিবেশের মধ্যে যে মসৃণ একটা আদানপ্রদানের ভারসাম্য ও বোঝাপড়া থাকে, সেটা চাপের মুখে পড়ে ও ভেঙে পড়তে থাকে। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এই সুযোগটা নিয়ে চাপ বাড়াতে থাকে, একসময় সব ভেঙে পড়ে। মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয় মানুষের সভ্যতা। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা যুক্তি দিয়েছিল নতুন করে সভ্যতা যখন শুরু হবে তখন মানসিক আর আত্মিক উন্নতির সাধনায় জোর দেওয়া হবে। এই যুক্তি আসলেই অগ্রাহ্য করার মতো ছিল না, তাই মহাপ্লাবন আটকানোর মতো অবস্থানে আমরাও ছিলাম না তখন। শুধু কিছু-কিছু ছোট-ছোট মানুষ দল যারা প্লাবন থেকে রক্ষা পেয়ে নতুন বসতি গড়েছিল, তাদের কাছে আগের সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিছু-কিছু রয়ে গিয়েছিল।"

এইখানে কণ্ঠটি বিরতি নেয়। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি আশা-আকাঙ্ক্ষা স্পন্দিত হৃদয়ে। এর পর কী হল?

আবার কথা শুরু হয়, "বেঁচে যাওয়া মানুষেরা আস্তে-আস্তে আবার সভ্যতা গড়ে তুলল, এই সভ্যতায় প্রাধান্য পেল মানসিক ও আত্মিক সাধনা। কিন্তু যত দিন যায় ততই এই সাধনাও হয়ে ওঠে একধরনের আচ্ছন্নতা ও মোহ। অনুসন্ধিৎসা কমে যেতে থাকে, মুক্তচিন্তার আবহ আবছা হয়ে যেতে থাকে। যেসব মানুষেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, বারেবারে যাচাই করা ইত্যাদি সহকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবেন বলে আশা করা হয়, তারাই যেন দীর্ঘ মোহনিদ্রায় ঢলে পড়তে থাকে।"

এইখানে এসে আবার কণ্ঠস্বর থামে। তার পরে খানিকটা বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে ধীরে-ধীরে বলে, "তখন আমরা সবাই মিলে একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা পৃথিবীর সভ্যতাকে সাহায্য করব।"

আবার কণ্ঠস্বর থামে, সামনে ওদের মূর্তিগুলো আবার নীলাভ শুভ্র আলোর ওড়নায় ঘেরা হয়ে যায়। আমার চোখে আরাম হয়, আগের ওই রক্তাভ বেগুনি আলোয় চোখে বড্ড লাগছিল। শুধু তাই না, তার সঙ্গে কেমন একটা শিরশিরে ভয় চারিয়ে যাচ্ছিল। ওই আলোর মধ্যে যেন কেমন রাগী-রাগী ভাব ছিল। হয়তো আমার কল্পনামাত্র, ওরা হয়তো রাগ-অনুরাগ ভয় অভয়, এসবের ঊর্ধ্বে। ওই রঙের আলো হয়তো নেহাতই কিছু বিশেষ কথাবার্তার চিহ্ন। তবু এখন আলোর রং স্নিগ্ধ নীলাভ শুভ্রতায় বদলে যেতে দেখে

স্বস্তির শ্বাস ফেললাম।
এইবারে অনেকক্ষণ চুপ ওই স্বরটি। রুদ্ধশ্বাস নীরবতার ভিতরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি আমরা দু'জন, পাথরের মূর্তির মতো। একসময় আরেনুশ সামান্য ছটফট করে উঠে বলে, "কীভাবে আপনারা পৃথিবীর মানুষদের সাহায্য দেবেন বা দিচ্ছেন?"
দীর্ঘকেশ সেই মধ্যস্থলের ব্যক্তির মুখটি দেখে মনে হল হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠেছে, তিনি নিজের দুই হাত প্রসারিত করে সামনে বাড়ালেন, সবক'টা আংটিতে জ্বলে উঠল নানা রঙের আলো, বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল ইত্যাদি। রামধনুর সাত রঙের আলো তো বটেই, তারই সঙ্গে আরও অবর্ণনীয় কত লুকনো রঙের ঝলমলে আলো। বাকি সবার হাতের আংটিগুলোও জ্বলে উঠেছে ততক্ষণে নানা রঙিন আলোয়। এ রকম অচেনা নৃত্যোৎসব যেন, আলোর নৃত্য।
গভীর সুরেলা করুণাময় গলাটি আবার শোনা গেল, "সেই কথাই তোমাদের এখন আমরা জানাব। শুধু শোনাব না, দেখাবও। মন দিয়ে শোনো আর দেখেও নাও।"
আস্তে-আস্তে ওদের সামনে একটা আলোকস্তম্ভ দেখা যায়, স্বচ্ছ স্তম্ভ, কোমল সবুজ আলো দিয়ে তৈরি তার দেওয়াল। স্তম্ভের মাথা উঠে গেছে উপরে, শেষ দেখা যায় না। কণ্ঠস্বরটি বলে, "আমরা পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের মধ্যে একশোজন মানুষকে নির্বাচিত করেছি। এরা প্রায় সকলেই তরুণ বয়সি, কেউ-কেউ এখনও

বাসা বাঁধতে শুরু করেছে একজোড়া সাদা পাখি। কী পাখি তা জানি না, সুন্দর দেখতে। পুঁতি-পুঁতি লাল চোখ, কমলা ঠোঁট।

কিশোর। সমস্ত মানুষদের দেহ ও স্নায়ুতন্ত্র স্ক্যান করে এদেরই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়েছে ভবিষ্যতের দায় বহনের জন্য। তার পর আমরা আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে এই নির্বাচিতদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন এনেছি, ওদের মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার কিছু-কিছু বিশেষ জায়গা অধিকতর শক্তিশালী ও সক্রিয় করে তুলেছি। এই একশোজন নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে তোমরা দু'জন অন্যতম।"
বক্তব্যের এখানে এসে কণ্ঠস্বর থামে, আমরা চমকে উঠেছি তখন দু'জনেই। মনে পড়ে যাচ্ছে সেইসব রহস্যময় স্বপ্নগুলো।
বিরতির পর কণ্ঠস্বরটি আবার শুরু করে কথা বলতে, বলে, "আমরা এখন তোমাদের বাকি নির্বাচিত মানুষদের চিত্র দেখাব এই আলোকস্তম্ভের ভিতরে। ওই সব মানুষদেরও কারওকে-কারওকে দেখানো হয়ে গিয়েছে বাকিদের চিত্র, কারওকে কারওকে এখনও হয়নি। কালক্রমে তোমরা সব নির্বাচিত মানুষেরা একত্রিত হবে একদিন। একসঙ্গে তোমরা কাজ করবে। তোমরা ও তোমাদের সন্তানসন্ততিরা এগিয়ে নিয়ে চলবে সভ্যতার ধারা।"
কণ্ঠটি থেমেছে আবার। আমাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের সামনে স্বচ্ছ আলোকস্তম্ভের ভিতরে ফুটে ওঠে এক কিশোরীর মূর্তি। সে খোলা জানালার ধারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে কিন্তু কিছু দেখছে না, গভীর চিন্তায় সে মগ্ন, তাঁর সুন্দর ভুরু দু'টি সামান্য কুঞ্চিত। কণ্ঠস্বরটি সরব আবার, বলে, "এই মেয়েটির নাম মিরিভা। সম্ভালারই এক ছোট্ট পাহাড়ি গাঁয়ে থাকে সে। মেয়েটি ছোট থেকেই অনুসন্ধিৎসু। গাঁয়ে সে থাকে ওর মা আর সৎবাবার সঙ্গে। সামান্য কিছু শিক্ষা পেয়েছে গ্রামের পাঠশালায়। এখন জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের কাজ করে, ঘরের কাজকর্মও করে। ও আমাদের একজন নির্বাচিতা। যথাসময়ে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তোমাদের।"
মিরিভা! আহ, ওর নামটা আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় মিরির কথা, বুকটা কেমন মুচড়ে ওঠে।
মিরিভার মূর্তি ততক্ষণে মিলিয়ে গিয়েছে, সেখানে যার মূর্তি ফুটে উঠছে, তাকে দেখে আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একবার থেমে গেল, তার পরই দুপদুপ করে চলতে থাকল। আলোকস্তম্ভের মধ্যে তখন উজ্জ্বল হাসিখুশি মুখে পাহাড়ি পথ দিয়ে গুনগুন করতে-করতে উঠে আসছে নিজনির মূর্তি। নিজনিই তো? নাকি ওইরকম দেখতে অন্য কেউ? কণ্ঠস্বরটি বলে, "এই মেয়েটির নাম নিজনি। এ তোমাদের আনুমা জনপদেরই মেয়ে। একে তোমরা চেনো, তাই পরিচয় আর দিলাম না। এও আমাদের একজন নির্বাচিতা।"
এর পরে নিজনির ছবি মুছে গেল, সেখানে ফুটল এক তেজস্বী বলিষ্ঠ চেহারার যুবকের মূর্তি। যুবক বলে বোঝা যায় না প্রথমেই, কারণ ওর মুখ দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন আর মাথায় জটাজুটের মতো চুল। সে বসে আছে একটি নৌকোয়, নৌকোটি একটা নদীর উপরে থেমে আছে একপাশে, কাছি দিয়ে বাঁধা আছে নদীর ধারের একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। ঢেউ লেগে-লেগে অল্প-অল্প দুলছে নৌকোটি। নৌকোর উপরে গাছের পাতার ছায়াজাল আর রোদ্দুর। ছেলেটি একটা বই পড়ছে মন দিয়ে।
কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল, "এই ছেলেটির নাম ভোলতিক। এও খুব অল্পবয়স থেকে অনুসন্ধিৎসু ও সজাগ। এর মানসিক শক্তিও অনেক। এ তোমাদের আনুমার কাছেরই একটি দ্বীপের মানুষ। এর বাবা ও মা পরলোকগত, আত্মীয়স্বজন বলতেও তেমন কেউ নেই। এ এখন একা-একাই নিজের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। এই ভোলতিকের পূর্বপুরুষদের কাছে প্লাবনপূর্ণ সময়ের কিছু জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি রক্ষিত ছিল। ভোলতিক উত্তরাধিকারসূত্রে সেইসব পেয়েছে। তার পরে নিজের সাগ্রহ চেষ্টায় সেইসব বিষয়ে চর্চা চালিয়ে গিয়েছে। এখনও সেই কাজই চালিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গেও উপযুক্ত সময়ে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে।"
আবারও রহস্যময় ভয়ে আর একইসঙ্গে আনন্দে কেঁপে ওঠে আমার ভিতরটা। নিজনি তা হলে শুধুই কল্পকাহিনি বলেনি! ও সত্যি করেই ভোলতিককে দেখেছিল! নিজনির বলা গল্পটা মনে করতে চেষ্টা করি। মনের চোখে ফুটে ওঠে একটা গুহার ভিতরে সারি-সারি স্ফটিকের পুতুল, নানা রকম যন্ত্রপাতি আর নোটবইয়ে রাশি-রাশি আঁকজোক। ভোলতিকের গুহা। এক লোকবসতিহীন দ্বীপে। নিজনি সেইখানে গিয়ে পড়েছিল ঘটনাচক্রে। গল্পের শেষটুকু আর আমাকে বলার সময় পায়নি নিজনি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা মোটেই শেষ হওয়া গল্প নয়, বাস্তবে কাহিনিমালা সবে খুলতে শুরু করেছে।
ততক্ষণে আলোকস্তম্ভের ভিতরে অন্য নির্বাচিত মানুষদের মূর্তি একে-একে আসছে, রহস্যময় কণ্ঠস্বরটি মানুষগুলোর নাম, পরিচয় ইত্যাদি বলছে আমাদের। আমার চোখের উপর দিয়ে, মনের উপর দিয়ে শুভ্র তুলো মেঘের মতো ভেসে যাচ্ছে মুখগুলো। কোনও মুখ ধারালো চিকন, কোনও মুখ ভরাট গোলগাল। কোনও চোখ ছুরির মতো তীক্ষ্ণ, ঝকঝকে উজ্জ্বল, কোনও চোখ কোমল, শান্ত স্বপ্নমগ্ন। কেউ-কেউ দিঘল চেহারার, কেউ-কেউ ক্ষুদ্র। কত রকমের সব

মানুষ, নানা দেশে তাদের ঘর। নানা রকম অবস্থার মানুষ তারা। শুধু একটাই মিল, এরা সকলেই নির্বাচিত। একদিন সকলেই একত্রিত হব আমরা সবাই। কিন্তু কোথায়?
আলোকস্তম্ভের ভিতর দেখা মানুষগুলোর মধ্যে নিজনি ছাড়া আর-কোনও পূর্বপরিচিত মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাই নাম পরিচয় সেভাবে স্মৃতিতেও দাগ কাটছিল না, ভেসে-ভেসে চলে যাচ্ছিল মেঘের মতো ছায়া ফেলে ফেলে। এক সময়ে, তখন মনে হয় সত্তর কী একাত্তরতম নির্বাচিতকে দেখানো হচ্ছে, চমকে উঠলাম আমরা। আলোকস্তম্ভের ভিতরে ত্রিলিনার মূর্তি। তার সেই তীব্র চোখ ঝলসানো রূপ, যা একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। নাম পরিচয় সবই বলে গেল রহস্যকণ্ঠ, স্পন্দিতবুকে শুনতে-শুনতে একবার দৃষ্টিবিনিময় করে নিলাম আমি আর আরেনুশ।
ত্রিলিনার পরে একের পর-এক অপরিচিত মুখ, তারপরে আবার ছিয়াশি কী সাতাশিতম মানুষটার ছবি দেখে আমার অন্তরাত্মা চমকে ওঠে। এ তো সেই লোকটা। সেই যে মুইনুখের বাজারে অগিনদাদুর দোকানে পসরা সাজিয়ে বসতাম আমরা, সেখানে একদিন এসেছিল এক অস্বাভাবিক মানুষ, সেই লোকটার মূর্তি দেখছি এখন। সেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল নীল চোখ দুটো, সেই উস্কোখুস্কো চুল, ঝাঁপালো ভুরু, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ, প্রশস্ত কপালে তিনটে সমান্তরাল আনুভূমিক রেখা, তীক্ষ্ণ নাক, বাঁ দিকের গালে একটা নীলচে ছাপ।
রহস্যকণ্ঠ বলে চলে, "এই যুবকের নাম তিশর। একে মনোরোগী হিসাবে চিহ্নিত করে বিস্মরণের দ্বীপে চিকিৎসাধীন করে রেখেছে এর আত্মীয়স্বজনেরা। কিন্তু এই যুবক আসলে গোপনে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করত, সেই সম্পদ সে পেয়েছিল এক বৃদ্ধ শিক্ষকের কাছ থেকে। সেই শিক্ষকের আকস্মিক পরলোকগমনে তিশর অত্যন্ত মানসিক আঘাত পায়, অসংলগ্ন আচরণ করতে থাকে। তখন তাকে বিস্মরণের দ্বীপে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। সে এখন সুস্থ। একদিন এর সঙ্গেও তোমাদের সাক্ষাৎ হবে।"
আবার নীরবে দৃষ্টিবিনিময় করি আমি আর আরেনুশ, সেই দোকানে আরেনুশও তো তিশরকে দেখেছিল, ওকে তখন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিস্মরণের দ্বীপে। ওর নামটা অবশ্য আমরা তখন জানতাম না।
এর পরে একের পর-এক আরও কত মানুষের মূর্তি দেখা দিল। মিলিয়ে গেল। ওদের সবার নাম পরিচয় দিল রহস্যময় কণ্ঠটি। সব নির্বাচিতকে দেখানো হয়ে গেলে ওই গোল ঘরের মধ্য থেকে আলোকস্তম্ভটি মিলিয়ে গেল।
মধ্যস্থলের ব্যক্তি আমাদের উদ্দেশ করে আবার ডান হাত তুললেন, সবক'টা আংটিতে আর বলয়ে স্নিগ্ধ আকাশনীল আলো ফুটল। রহস্যকণ্ঠটি বলল, "ওরিয়ানা, আরেনুশ, তোমাদের সহযোগীদের মূর্তি তোমরা দেখলে। হয়তো এদের কোনও-কোনও মুখ ও নাম তোমাদের স্মৃতিতে ভেসে থাকবে, বেশিটাই তলিয়ে যাবে গভীরে। কিন্তু চিন্তা কোরো না, সবই থেকে যাবে। দরকারে ঠিকই তোমরা স্মরণ করতে পারবে। এখন তোমরা নির্ভয়ে তোমাদের কাজ করে যাও। আমরা তোমাদের পাশেই আছি। কোনও ভয় কোরো না, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা চেষ্টা করলেও তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এখন আমরা তবে বিদায় নিই। তোমরা বিশ্রাম করো।"
এই কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই অদ্ভুত নেশা-নেশা ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছিলাম এক অপূর্ব সুর বাজছে সমস্ত ভিতর বাহির জুড়ে। মেঝেতেই লুটিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমরা। আধো ঘুমে দেখেছিলাম মিলিয়ে যাচ্ছে সেই সীমাহারা ঘরটি।
বহুক্ষণের নিটোল শান্তির ঘুম ঘুমিয়েছিলাম আমরা সেদিন। ঘুম ভেঙে যখন উঠে বসলাম তখন বিকেল। উঠে দেখেছিলাম সব কিছু পরিপাটি গোছানো, চিঠির খামে করে আসা সেই সমস্ত কাগজ নিঁখুত করে একথাক করে আমাদের বইয়ের নীচে রাখা, সোনালি বালাটি আর সোনালি ত্রিভুজটি নিরীহ দু'টি গৃহসজ্জার উপকরণের মতো বইগুলোর পাশে রাখা।
সব কিছু স্বাভাবিক, বাইরে সুন্দর এক বিকেল, ঝিরঝিরে হাওয়া। আমরা শেষ বিকেলে স্নান-টান করে রাতের রান্নাবান্নায় লেগে গেলাম। দুপুরের খাওয়া হয়নি বলে বেজায় খিদেও পেয়ে গিয়েছিল। রাতের খাওয়া সন্ধেবেলাতেই সেরে নেব বলে ঠিক করলাম। পরের দিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে-থাকতে উঠেই তো আবার নিয়মিত কাজকর্মের আর পড়াশোনার শুরু। আবার ছ'দিন পরে ছুটি।

{১১}

একজোড়া সাদা পাখি এসে বাসা বেঁধেছে আমাদের ছোট্ট কুটিরের ঘুলঘুলিতে। একদিন কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে দেখি সামনের বড় ঘরটার ঘুলঘুলির মধ্যে কুটোকাটা খড় ঘাস এনে দিব্যি বাসা বাঁধতে শুরু করেছে একজোড়া সাদা পাখি। কী পাখি তা জানি না, সুন্দর দেখতে। পুঁতি-পুঁতি লাল চোখ, কমলা ঠোঁট। একটা পাখির গলা ঘিরে উজ্জ্বল লাল দাগ, কলারের মতো। মনে হয় ওটা পুরুষ পাখি। অন্যটার গলায় রঙিন কলার নেই, সাদা।
আরেনুশ ফিরলে ওকে দেখাই আমাদের এই নতুন অতিথিদের। পাখি দুটোকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা আমাদের মনেও আসেনি, বরং মনে হল এই জায়গায় আমরা যেমন থাকার অধিকার পেয়েছি, তেমনই ওদেরও পূর্ণ অধিকার।
পরদিন একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছিলাম, তখনও দিব্যি দিনের আলো ছিল। ফিরে দেখি ওরা বাসা বানানো সম্পূর্ণ করেছে। মেয়েপাখিটা বাসায় বসে আছে আর ছেলেপাখিটা সুরেলা গলায় ডাকতে-ডাকতে একবার উড়ে বাইরে যাচ্ছে, আবার উড়ে ফিরে আসছে। ওর সঙ্গিনী বাসা থেকে মাঝে-মাঝে সুর মেলাচ্ছে। ওদের আনন্দ আর খেলা দেখে মন ভাল হয়ে গেল আমার।
সেই থেকে পক্ষিযুগল আমাদের ঘরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। ওরা ওদের মতো থাকত, আমরা আমাদের মতো। কোনও পক্ষ অন্য পক্ষকে বিন্দুমাত্র অসুবিধা করেনি। ভোরবেলা ওরা জেগে বাসা ছেড়ে বাইরে গাছে গিয়ে বসে সূর্যোদয়ের প্রার্থনার মতো গান গাইত। আমরা তখন শেষরাত্রির আর প্রথম ভোরের কাজে ব্যস্ত দু'জনেই। প্রথমে ভেবেছিলাম বাসাতে বুঝি কিছুদিনের মধ্যেই ডিম পাড়বে, ডিম ফুটে ছানা হবে, ওরা মায়ে বাবায় পালা করে বাচ্চাদের খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে একদিন ছানারা উড়তে শিখলে সবাই মিলে চলে যাবে। কিন্তু দেখলাম, তা নয়। ওদের বাসাতে কোনও নতুন প্রাণের আগমন চিহ্ন দেখলাম না। রহস্যময় ব্যাপার! আশপাশেও এরকম পাখি দেখিনি। তবে আমরা তো সেভাবে পাখি চিনি না। মাঝে-মাঝে ভাবতাম পাখি দু'টি কোথা থেকে এল এখানে? তার পরে একসময় নিজেদের জীবনের নানা ব্যস্ততায় আমরা পাখি দুটোকে নিয়ে আর বেশি চিন্তা করা বন্ধ করে দিলাম।
একদিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে শুনেছিলাম, কে যেন গুনগুন করে গান গাইছে। ঠিক গানও নয়, প্রার্থনার মতো কিছু। তারপর চোখ মেলে দেখি আরেনুশ বিছানায় নেই। সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি বড় ঘরে, যেখানের ঘুলঘুলিতে পাখি দু'টি থাকে, সেখানে যাওয়ার দরজাটা খোলা। পা টিপে-টিপে এসে ওই ঘরে ঢুকে দেওয়ালের পাশেই দাঁড়াই।
ঘুলঘুলি দিয়ে আবছা জ্যোৎস্না আসছে, সেই আলোতে দেখি পাখি

দুটো চুপ করে বসে আছে আর তাদের সামনেই, নীচে ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে আরেনুশ এক রহস্যময় প্রার্থনাসঙ্গীত গাইছে। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে এতই পবিত্র এক গোপনতার আবরণ যে আমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পা টিপে-টিপে আবার ফিরে এলাম বিছানায়। আমার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল অজানা অশ্রুতে, সে দুঃখের অশ্রু নয়, সে আনন্দের অশ্রু নয়, সে এক বুক উথলানো অজানা অনুভবের অশ্রু। হয়তো এই অনুভব এতদিন আবছা হয়ে আসত আমার কাছে, এখন যখন চারিদিক নিশীথনিদ্রায় মোড়া তখন ওই শীত চন্দ্ররশ্মির আভায় প্রার্থনারত বন্ধুটি আর তদগত ওই রহস্যময় শুভ্র পক্ষী দু'টি আমার সেই অনুভবকে স্পষ্ট আর তীব্র করে তুলেছে। দু'হাতের পাতায় যতবার চোখ মুছি, ততবার চোখ নতুন করে ঝাপসা হয়ে যায়। কেবলই আশঙ্কা হচ্ছিল, আরেনুশ যদি ফিরে আসে? যদি শব্দ পায় কোনও? যদি বুঝতে পারে আমি জেগে আছি? ওকে তো জানাতে চাই না যে ওর গোপন আকুল প্রার্থনাসঙ্গীত আমি শুনে ফেলেছি। এইসব ভাবনার মধ্যেই মনে হয় কখন গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলাম।

আরেনুশ মাঝে-মাঝে দিনলিপি লেখে, ঠিক দিনলিপিও নয়, নিজের মতো কিছু কথা। স্মৃতিচারণ, কল্পনা, ভাবনাচিন্তা এইসব। আমি একদিন দেখার অনুমতি চেয়েছিলাম, সে আমায় তখন বলেছে যখন খুশি আমি দেখতে পারি। তারপর থেকে প্রায়ই খাতাটা খুলে পাতা উলটাই আর পড়ি। পড়ে-পড়ে আশ মেটে না, কেমন অদ্ভুত সুন্দর লেখার ধরন আরেনুশের। অনাসক্ত অথচ অনুরাগী। এক জায়গায় সে লিখেছে, 'আমি আরেনুশ। একজন প্রস্তরশিল্পী, ভাস্কর। স্মৃতির মধ্যে পিছন ফিরে যতদূর চোখ যায় শুধু দেখতে পাই নানা আকার আকৃতির পাথর। গোল, লম্বা, চ্যাটালো, চৌকো, শক্ত, কোমল, কালো, সাদা, সাদার উপরে বাদামি, এইরকম সব পাথর। নানা ধরনের নানা রঙের পাথর। আর আমার হাতে ছেনি-হাতুড়ি। পাথরগুলোর মধ্য থেকে যেন নীরব আবেদন আমার দিকে ছুটে আসছে, বলছে আমাদের মুক্তি দাও, বোবা পাথর হয়ে পড়ে থাকার থেকে আমাদের মুক্তি দাও। যেন পাথরের ভিতরে বন্দিনী, দুঃখিনী রাজকন্যা আমাকে বলছে তাকে শিলাকারাগার থেকে মুক্ত করতে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যেতাম আর ছেনি-হাতুড়িতে পাথর খুদে-খুদে বানাতাম ফুলদানি, ফুল, পাখি, পাখা, কাপপ্লেট...' পাতা উলটে যাই, আরেনুশের লেখা খুব নৈর্ব্যক্তিক, কোথাও কখনও ওর পিতৃমাতৃহীন শৈশবের কথা ও লেখে না, এমনিতে কথাবার্তাতেও বলে না। আমি এক জায়গার মানুষ বলে জানি। আরেনুশের ঠাকুরদা-ঠাকুরমাও তো কবেই স্বর্গে গেছেন, ওদের কথাও বলে না। আরেনুশ খুব অন্তর্মুখী।

শুধু মাঝে-মাঝে গভীর কোনও মুহূর্তে আমাকে বলে, "ওরিয়ানা, তোমার কি মনে হয় আমাদের এই জীবনের পরে অন্য কোনও জীবন আছে? সেখানে হারানো প্রিয়জনেদের সঙ্গে দেখা হয়?" আমি ওর চুলগুলো ঘেঁটে দিতে-দিতে বলেছিলাম, "আমি তো জানি না আরেনুশ, কিন্তু বহু মানুষ বিশ্বাস করে আছে। আর এ জীবন চলতে-চলতে পরজীবনের কথা হয়তো সত্যি করে জানার উপায় নেই। হয়তো সেটাই ভাল। আরেনুশ, তুমি বলো আমায়, তোমার যদি ইচ্ছে করে সব বলো আমায়। এই পার্থিবজীবনে শুধু আমরা শুনতে আর বলতেই পারি, শোক ও আনন্দ প্রকাশই শুধু করতে পারি, হাসতে-কাঁদতেই শুধু পারি, আর তো কিছু পারি না। মনের মধ্যে বাঁধ দিয়ে রেখে কষ্ট পেয়ো না আরেনুশ, সব বলে হালকা হয়ে যাও।"

আরেনুশ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর তাকিয়ে থাকে, তারপর চোখ বুজে ফেলে, আস্তে-আস্তে বিড়বিড় করে বলে, "বলব, যা বলতে ইচ্ছে করে সব বলব। ওরিয়ানা, তোমাকে এমন করে কাছে পাওয়ার তো কথা ছিল না, কে আমাদের এভাবে কাছে এনে দিল? কে আমাকে, এই ভিখারিকে দিল এত আশার অতিরিক্ত?"

"এই আরেনুশ, কী হচ্ছে? ভিখারি আবার কে বলল তোমায়?"

"বলবে আবার কে? আমি কি জানি না?"

"কিচ্ছু তুমি জানো না আরেনুশ, কিছু জানো না।"

আবেগ সামলাতে না পেরে আমি আমার ঠোঁট চেপে ধরি ওর ঠোঁটে, কান্নায় ডুবে যায় আমাদের সব কথা, পবিত্র প্রেমাশ্রু আমাদের ভিতর-বাহির ধুইয়ে দেয়! এমন করে কে আমাদের তৃষার্ত হৃদয় সুধায় ভরে দেয়? সে কি শুধুই অনেক দূরের অনেক অচেনা কিছু হতে পারে? সে কি আমাদের খুব কাছেই থাকে না? খুব কাছে, অন্তরের অন্তরে?

পরদিন আমার ছুটি ছিল কাজে, প্রবীণা তাপসী মনোসংযোগের জন্য দূরবর্তী গুহায় প্রস্থান করেছেন, ফিরবেন ক'দিন পরে। এই ক'দিন আমাদের চিত্রাঙ্কনের কাজের ছুটি।

ক্লাসের পরে আমি তাই আরেনুশের সঙ্গে যাই ওদের সেই দূর মিনারের প্রান্তরে। ভারী সুন্দর প্রান্তরটি, একটি সবুজ পাহাড়ের পায়ের কাছ থেকে ছড়িয়ে গেছে দূরে নদী পর্যন্ত, দূরে দেখা যায় জঙ্গল, এত দূর থেকে গাছের ঘন নীলচে সবুজ রেখার মতো লাগে।

এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মস্ত-মস্ত নানা রকম পাথর আনানো হয়েছে, এইসব বিশাল-বিশাল কালো, সাদা, লাল, বাদামি পাথরখণ্ড নিয়ে আসা হয়েছে কয়েকশো মাইল দূরের পাথরখনি থেকে। এইখানে সারাদিন কাজ চলে এখন, খাড়া হয়ে উঠছে বহু মিনার, মন্দির, স্তম্ভ, খিলাম, অর্ধগোলের মতো স্তূপ...

এখানে যারা কাজ করে তারা অনেকেই ভিন্ন-ভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির মানুষ। তত্ত্বাবধান অবশ্য সম্ভালার লোকেরাই করে থাকে, তাদের তো আবার সব নির্দেশই যোগের দ্বারা প্রাপ্ত, তাই অন্য কেউ নির্দেশনার কাজ করতে পারে না। যদি সে করেও, কী করেই বা তা যথাযথ হবে? তার তো আর দূরাগত যোগনির্দেশ গ্রহণের ক্ষমতা নেই যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা? অকাট্য যুক্তি!

আরেনুশ কাজ করে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে ওর গ্রুপের সঙ্গে, আমি তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি নিয়ে ঘুরে-ঘুরে দেখি শিল্পীদের, স্থপতিদের, ভাস্করদের...

কথা কম কাজ বেশি নীতি এখানে, কাজের প্রয়োজনে যেইটুকু কথা না বললেই নয় শুধু সেইটুকু কথা এরা বলে আর মগ্ন হয়ে কাজ করে। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি ছেনি-হাতুড়ির ঘায়ে পাথরে-পাথরে কী আশ্চর্য সূক্ষ্ম নকশা ফুটে উঠছে! যেন পাথরে লেখা কবিতা, পাথরে গাওয়া গান, মূক পাথর কথা বলে উঠছে আশ্চর্য ছন্দে-ছন্দে।

এই ছেনি-হাতুড়ির ঘায়ে পাথরে ভাস্কর্যের সঙ্গে যেন আমাদের জীবনের কোথাও একটা মিল আছে! শুরুতে আমরাও থাকি একেবারে লেপাপোঁছা পাথর, ঘটনাচক্র-সুখদুঃখ-আনন্দবিষাদ-হারানোপ্রাপ্তি-ভালমন্দ-আলোকঅন্ধকার আমাদের জীবনের উপরে প্রতি মুহূর্তে ক্রিয়া করে চলে ছেনি-হাতুড়ির মতো, কোন অজানা শিল্পীর হাত দিয়ে। আস্তে-আস্তে গড়ে ওঠে নকশা।

প্রতিটি জীবন আস্তে-আস্তে স্বাতন্ত্র্যে সৌন্দর্যে জ্বলজ্বল হয়ে ওঠে। কোন ঘটনার অভিঘাত যে আমাদের কীভাবে পালটে দেবে সে কি আমরা জানি? হয়তো সেই শিল্পী জানে যে আমাদের জীবন খোদাই করে করে নকশা করছে! সে কে? সে কি আমাদের খুব কাছেই থাকে? নাকি সে অনেক দূরের? সে কি নিরাসক্ত শিল্পী শুধু, নাকি আমাদের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না তাকেও দোলায়?

চুপ করে শান্ত হয়ে বসে থাকি একখণ্ড পাথরের উপরে, মস্ত আর-একটা পাথর বিরাট স্তূপের মতো পড়ে আছে, সে আমাকে ছায়া দেয়। শিল্পী যেখানে বসেছেন, সেই জায়গার উপরে ছায়া দিচ্ছে একটা মস্ত ছাতা, ডাঁটিটা মাটিতে গাঁথা। শিল্পী একমনে কাজ করে যান, আমি ওর সুন্দর ছন্দে বাঁধা কাজ দেখি আর ভাবি এই মানুষ কি সত্তালারই, নাকি এও আমাদের মতো কাজ নিয়ে দূর দেশ থেকে এসেছে?

চেহারা দেখে সব সময় বোঝা যায় না, কথাও তো মানুষটা বলে না একদম, নইলে উচ্চারণ শুনলেও অন্তত বোঝা যেত সত্তালারই অধিবাসী নাকি অন্যখানের। ওর মুখ একদম মগ্ন, কিছুটা বিষণ্ণও। তবে সত্যিকার মন বোঝার উপায় নেই ওই শান্ত মগ্ন মুখ দেখে। কোনও-কোনও মুখ দেখে যেমন ভাবসংঘাত বোঝা যায়, এর ক্ষেত্রে একেবারেই তা বোঝা যায় না।

অনেকক্ষণ একটানা কাজ করে সে থামল একটু, ছেনি-হাতুড়ি নামিয়ে রেখে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল হয়ে যাওয়া কারুকাজটির দিকে, তারপরে উঠে পড়ল। সবচেয়ে কাছের যে জল-উৎসটি আছে সেদিকে এগিয়ে গেল ধীরে-ধীরে। আহা হয়তো খুব তৃষ্ণা পেয়েছে ওর। ভঙ্গিটাও ক্লান্ত। এতক্ষণ একটানা কাজ করল তো!

আরেনুশের কথা মনে পড়ে গেল, সেও হয়তো কাজ করতে-করতে ক্লান্ত আর আমি কিনা বসে-বসে অন্যের কাজ করা দেখছি! ছি ছি। আত্মগ্লানি হল আমার, উঠে পড়লাম। শিল্পী জলপান করে ফিরে আসছিলেন। আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, "কী অপূর্ব আপনার প্রস্তরশিল্প। আমি এতক্ষণ একেবারে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিলাম! আশা করি আপনার কোনওভাবে মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাইনি।"

উনি বললেন, "আরে না-না, কিছু মনোযোগে ব্যাঘাত হয়নি। আসলে অন্যদিন কেউ তো এভাবে এসে দেখে না, মাঝে-মাঝে তত্ত্বাবধায়ক এসে ঘুরে দেখে নির্দেশ দিয়ে চলে যায়, তাই আজ একটু অবাক হয়েছিলাম। দেখুন তো কী কাণ্ড, আমাদের পরিচয়ই তো হয়নি! আমি সীমন, এদেশের মানুষ নই, পূবের দিকের দ্বীপখণ্ডে আমার বাড়ি। মাত্র কিছুদিন আগে এই কাজ পেয়ে সত্তালায় এসেছি।"

আমি বললাম, "আমি ওরিয়ানা। আমিও এদেশের নই। দক্ষিণের দ্বীপমালার দেশের আমি। আমি চিত্রশিল্পী, গুহাচিত্র অঙ্কনের দলে কাজ করি। এখন ক'দিন আমাদের ছুটি তত্ত্বাবধায়ক ও নির্দেশক তপস্বিনী গিয়েছেন দূরের মাঠে। তাই এইখানে আসি। হঠাৎ ছুটি পাওয়া একটি দারুণ জিনিস, তাই না?"

আমি হাসি। সেও হাসে কিন্তু হাসিটা দ্রুত মিলিয়ে যায়, আস্তে-আস্তে সীমন বলেন, "আমি ক'দিন ছুটি পেলে বাড়িতে যেতাম। আমার দু'টি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে রেখে এসেছি, কবে যে আবার ওদের দেখতে পাব! উপায় নেই তাই আসতে হল, আমরা খুব দরিদ্র। ক'টা দিন গেলে যদি একটু গুছিয়ে বসতে পারি, তবে ওদের আনব। ওদের মা প্রত্যেকবার চিঠিতে লেখে ওরা খালি বাবাকে খোঁজে।"

সীমনের গলা কাঁপছিল, আমার গলা সহানুভূতিতে গাঢ় হয়ে এল, আমি বললাম, "অবশ্যই আনবেন। দেখবেন বেশি দেরি হবে না আপনার, যিনি এত বড় শিল্পী তাঁকে কি স্রষ্টা বেশিদিন বঞ্চিত রাখতে পারেন?"

সীমন তেমনই কাঁপা গলায় বলেন, "আহা, আপনার কথা সত্যি হোক। বাচ্চা দুটোর জন্য মনটা যে কী আনচান করে কী বলব! একটা একদম ছোট্ট, সবে কথা ফুটছে আর-একটা আর-একটু বড়। এই সময়েই কিনা চলে আসতে হল আমার! কীই বা উপায় ছিল!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে।

আমি আস্তে-আস্তে বলি, "আমারও বাপ-মা-আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে চলে আসতে হল। আমি আর আমার বন্ধু এসেছি। তবু বন্ধু দু'জনে আছি, সে একটা ব্যাপার। আমাদেরও বারেবারে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। উপায় যে একেবারে নেই তাও না, তবু থেকেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত। নিজেদের দেশ-গাঁ যে আবার কবে দেখতে পাব, আদৌ পাব কিনা কে বা জানে!"

নিজের অজান্তে আমারও দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

সীমনের স্বভাবত ভাবসংঘাতবিহীন মুখ আশ্চর্য কোমল হয়ে আসে, সে আমার দিকে তাকায়, ঠিক যেন পাথরের দেওয়ালে একটা জানালা, সে জানালা দিয়ে ওর ভিতরের মানুষটি চেয়ে দেখছে, এতটাই পরিবর্তন ওর মুখে। দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। আস্তে-আস্তে প্রায় ফিসফিস করে সে বলে, "না-না কেন দেখতে পাবেন না, নিশ্চয়ই পাবেন। এখানের কাজ শেষ করে ছুটি পেলেই তো যেতে পারবেন।"

আমি বলি, "তা হয়তো পারব। আপনি কি আমার বন্ধুকে চেনেন, সীমন? তার নাম আরেনুশ, সেও প্রস্তরশিল্পী।"

সীমন হাসেন, বলেন, "চিনি। আরেনুশ। খুব ভাল শিল্পী। আগে তো সে অন্য এক শিল্পীর দলের সঙ্গে সাহায্যের কাজ করত, এত ভাল হাত দেখে এখন ওকে নিজে-নিজেই করতে দিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক। দেখবেন, আরেনুশ খুব দ্রুত স্থায়ী কাজ পেয়ে যাবে, আপনারা স্থায়ী সংসার পেতে ফেলতে পারবেন।"

আমি শব্দ করে হেসে ফেলি, বলি, "আরে আমরা বন্ধু শুধু। আর দু'জনেরই এখনও ছাত্রাবস্থা চলছে। গোটা সকালটা আমরা তো ক্লাস করি, মধ্যাহ্নের ছুটির পরে কাজে যাই। এইভাবে ছাড়া তো খরচ চালাবার উপায় নেই।"

সীমন বলেন, "হয়ে যাবে। খুব পাকা হাত আরেনুশের। ওর ভাল চাকরি হয়ে যাবে। ততদিনে আপনাদের ছাত্রাবস্থাও শেষ হয়ে যাবে। তার পরে ঘরসংসার...আহা, একটা ভালবাসায় ভরা সুখময় ঘর, একটুখানি বাগান, দু'টি শিশু খেলে বেড়ায়, এসব যদি না থাকে সারাদিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে ফেরার জন্যে, তবে জীবন কীসের জন্যে বলুন?"

লোকটির জন্য সত্যিই সমবেদনা অনুভব করি, শান্তির আর ভালবাসার ঘরসংসার ছেড়ে মানুষকে জীবিকার তাড়নায় কোথায় না-কোথায় চলে যেতে হয়!

নিজেরা যখন এসেছিলাম, তারুণ্যে টগবগ করা মন, সেরকম কোনও পিছুটান তো ছিল না আমাদের! একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো ছিল। সবকিছু এমন হঠাৎ করে হয়ে গেছিল আমাদের! মনে পড়ে যায় ঋতবন্ত সুমিন্তোসকে, সেই হঠাৎ করে চেনা হয়ে যাওয়া মানুষটা, সেই মুইনুখের বাজারের ছোট্ট দোকানটি, পরে দোকানের একটু অংশে আমাদের দু'জনের পসরা সাজিয়ে বসে থাকা, ঋতবন্ত এসে আটকে গেলেন শিল্পমালায় একদিন, আমাদের নেমন্তন্ন করলেন ওর অতিথিনিবাসে দেখা করতে...সব কিছু পরের পর ছবির মতো আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল!

আমরা প্রায় সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়েই ভেসে পড়েছিলাম, কিছুই তো জানার উপায় ছিল না আমাদের। না আমার, না আরেনুশের। অথচ একদিন ঋতবন্তর সুপারিশ চিঠি নিয়ে আমরা ভেসে পড়লাম ওঁরই কিনে দেওয়া টিকিট নিয়ে। টিকিটের সম্বলও যে আমাদের ছিল না, ঋতবন্ত সেও বুঝেছিলেন।

আমি আর আরেনুশ নিজেও বুঝেছিলাম, বলাবলিও করেছিলাম যে এতখানি বিশ্বাস করা অনুচিত, মাত্র তো কয়েকদিনের আলাপ। আসলে আমাদের কিছুই জানার উপায় ছিল না। জানার চেষ্টাও যে করিনি তা নয় কিন্তু সমাজের যে স্তরের মানুষেরা সত্তালার সব কিছু খোঁজখবর রাখত তারা ছিল অনেক উঁচুতে। আমাদের নাগাল

থেকে অনেক দূরে।
শেষ পর্যন্ত অজানায় পাড়িই দেওয়া ঠিক করলাম, আসলে সেখানেও তো কিছু ছিল না আমাদের, উঞ্ছবৃত্তিই প্রায় করতে হত। সেই হিসাবে যে কোনও নতুন জায়গাই একটা পরিবর্তন তো বটে।
নতুন দেশে এসে নতুন কাজ, নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ধাতস্থ হতে-হতেই কেটে গেল কত-কতদিন! তার পরে কত রকম ঘটনাই না ঘটে গেল, যাকে বলে ঘটনার ঘনঘটা। অদ্ভুত এক শক্তিশালী স্রোতের মতো ঘটনার চক্র আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। কোথায়?

{১২}

"ওঁরা ঋদ্ধজপ, মানবজাতির কল্যাণে অক্লান্ত। ওঁদের দৃষ্টি কখনও ব্যাহত হয় না, তাঁদের জাদু দর্পণে তাঁরা সমস্ত জগৎ দর্শন করেন। দর্শন করেন বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। তাঁদের চিন্তার শক্তি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। দূরত্ব বলে আসলে কিছুই নেই তাঁদের কাছে, তাঁরা মুহূর্তমধ্যে যে-কোনও স্থানে উপস্থিত হতে পারেন বা সাহায্য প্রেরণ করতে পারেন। তাঁদের কাছে আছে অফুরান আলোর উৎস, সব অন্ধকার দূরীভূত হতে পারে তাতে। ন্যায়ের পথে যারা কাজ করতে চায়, তাদের ওঁরা দেন ওঁদের অফুরন্ত শক্তি ও সম্পদের অংশ। ওঁদের শক্তি ও সম্পদ অনন্ত, ওঁরা মানুষের কর্মফল পর্যন্ত বদলে দিতে পারেন।"

দেখতে-দেখতে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে আসে। সবক'টা মশাল তখন জ্বলছে, মঞ্চ ঘিরে অনেক প্রদীপও জ্বলে উঠেছে।

বক্তার কণ্ঠস্বর গভীর ও সুরেলা, আমরা মন দিয়ে শুনছিলাম। বক্তা সেইদিনই এসেছিলেন আমাদের শিক্ষালয়ে। দূর শৈলাশ্রমের একজন যোগী। দেখতে তরুণ চেহারার, কিন্তু আসলে নাকি তিনি বহু বছর বয়সি। বহুকাল নির্জনবাসে যোগাভ্যাস করার পরে নাকি এসেছেন লোকালয়ে। ওঁর সঙ্গেই এসেছেন আরও দু'জন যোগী আর বেশ কয়েকজন শিষ্য ও অনুগামী।
শিক্ষালয়ের সকলের জন্যই আমন্ত্রণ ছিল সেই যোগীর প্রদত্ত প্রভাষণ শোনার জন্য। এমনকী সেদিনের ক্লাসগুলো পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছিল যাতে সবাই শুনতে আসতে পারে। শুধু প্রভাষণই নয়, আরও বহু রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল সেইদিন।
আমি আর আরেনুশ পাশাপাশি বসে শুনছিলাম বক্তার গভীর, সুরেলা গলার উদাত্ত প্রভাষণ। কেমন যেন করছিল ভিতরটা, সেই ত্রিভুজ আর বলয়ের কথা মনে পড়ছিল, সেই রহস্যময় ছবি প্রক্ষেপণ মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল সেই অদ্ভুত অপার্থিব মহাকাহিনি। ওই কাহিনি নিজেদের চোখে দেখা, নিজেদের কানে শোনা হলেও আমাদের কাছে ছিল অর্ধেক স্বপ্ন অর্ধেক কল্পনার মতো, কিন্তু আমাদের জীবন সেটা বদলে দিয়ে গিয়েছিল।
আমি একবার নীরবে আরেনুশের দিকে তাকালাম, সেও আমার দিকে তাকাল। গোপনে আমার হাতে হালকা চাপ দিয়ে মনে হয় বোঝাতে চাইল, শান্ত থাকো।
ওঁর ওই প্রভাষণের পরেই আমরা ছাত্রছাত্রীরা সকলেই ওঁকে অনুসরণ করে চললাম মণ্ডলাকার এক বিশেষ চিত্রকর্ম দেখতে। এই যোগীর সঙ্গে আরও দু'জন যোগী এসেছেন, ইনি যখন আমাদের কাছে বক্তব্য রাখছেন তখন বাকি দু'জন আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থলের পবিত্র বৃত্তাকার ভবনের একেবারে মাঝের ঘরের মেঝের মধ্যখানে সেই চিত্রকর্ম রচনায় ব্যস্ত। সূক্ষ্ম রঙিন বালি দিয়ে নাকি রচনা করা হয় সেই ছবি। আমাদের ওঁরা সেই চিত্র রচনার পদ্ধতি শিখিয়েও যাবেন। ওই চিত্রকর্ম থেকে উত্থিত প্রভাব নাকি জগতের শুভ ও কল্যাণ করে থাকে।
বক্তৃতার পরেই আমরা উৎসুক তরুণতরুণীর দল ওঁকে অনুসরণ করে চললাম মধ্যভবনের দিকে। আমাদের সঙ্গে আমাদের শিক্ষক ময়ূঘানও চললেন।
প্রতিষ্ঠানের মধ্যভবনটির নাম, উশীরপ। সম্ভালার ভাষায় এর অর্থ মধ্যাহ্নের সূর্যরশ্মি। ওই ভবনটি সবচেয়ে বড়। ভবনের উপরের ছাদ গম্বুজাকৃতির, তার কিছু অংশের অস্বচ্ছ পাথুরে ঢাকনা সরিয়ে দেওয়া যায়, স্বচ্ছ অংশের ভিতর দিয়ে তখন দেখা যায় আকাশ। রাত্রির আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণে ওই অংশ ব্যবহার করা হয়।
আরেনুশ খুবই আগ্রহী ছিল জ্যোতির্বিদ্যার কাজ করতে, তাই প্রতিষ্ঠানে আমাদের নিয়মিত ক্লাস শুরুর সপ্তাহতিনেক পরেই একদিন গিয়ে ভাল করে দেখে এসেছিল উশীরপ ভবন। ওখানের জ্যোতির্বিদেরা ওকে সব যত্ন করে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। ও ওখানে কাজ করতে আগ্রহী জেনে ওকে নাকি এও জানিয়েছিলেন যে প্রথম বছরেই ওকে ওঁরা গ্রহণ করতে পারবেন না, পরের বছর নানা পরীক্ষা-টরিক্ষা নিয়ে তবেই কাজে নিতে পারবেন।
আরেনুশ সেই দিন রাত্রে আমাকে উশীরপ ভবনের ভিতরটা কেমন দেখতে আর ওখানে জ্যোতির্বিদেরা কী করেন সেইসব সাগ্রহে বলছিল। স্বাভাবিকভাবেই ও কিছুটা আশাহত হয়েছিল তখন তখনই ওখানে কাজ করতে সুযোগ না পাওয়ায়। বলছিল যে, ও ভেবেছিল অন্তত সপ্তাহান্তের ছুটির দিনগুলোয় ও যদি স্বেচ্ছাশ্রমও দিতে পারত ওখানে, তা হলেও অনেক কিছু শিখতে জানতে পারত, মনে শান্তি পেত।
আমি হেসে ফেলেছিলাম, বলেছিলাম, "সপ্তাহে ছ'দিন অমানুষিক পরিশ্রম করেও তোমার মনে শান্তি নেই? আবার ছুটির দিনেও কাজ করতে চাও? অত কাজ করলে তোমাকে অতিমানুষ মনে হবে, তখন ভয় করবে আমার।"
ও হেসে বলেছিল, "জানো ওরিয়ানা, ওখানে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেন ওঁরা, কিন্তু ওসব আসলে কী ধরনের বস্তু, কত দূরে, সেইসব নিয়ে দেখলাম সেরকম মাথাব্যথা নেই। ওঁরা গ্রহনক্ষত্রের পরিবর্তনশীল স্থানাঙ্ক এক বিশেষ ধরনের গণনায় কাজে লাগান। আমার আশঙ্কা হয়, হয়তো মানুষের ভাগ্যগণনায়..."
আমি ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই উৎকণ্ঠিত গলায় বলেছিলাম, "তাই বললেন ওঁরা? জ্যোতির্বিদ্যাকে ওঁরা ভাগ্যগণনার কাজে লাগাচ্ছেন?"
আরেনুশ বলল, "না-না, সেটা তো ওঁরা বললেন না। বললেন, ওই গণিত নাকি কোনও মহৎ উদ্দেশ্যের গণিত, এখনও নাকি আমার বুঝবার সময় হয়নি। যথাযথ দীক্ষিত ব্যক্তিই কেবল সেসব অনুধাবন করার অধিকারী।"
আজ অনেকের সঙ্গে উশীরপ ভবনের দিকে যেতে-যেতে সেসব কথা মনে পড়ছিল। ভবনের সামনে বিরাট এক সূর্যঘড়ি, চত্বরের পাথরের উপরে গোল করে ছক কাটা, মাঝের স্থায়ী প্রস্তরদণ্ডটির ছায়া বিভিন্ন সময় নির্দেশক রেখায় পড়তে থাকে সারাদিন জুড়ে। এখন মধ্যাহ্ন প্রায়।

ভবনের একেবারে সামনে এসে চোখ তুলে তাকাই উপরে, উপরের গম্বুজ ভারী সুন্দর, নীলকমলা কাচের নকশা আছে কিছু অংশে, সেই নকশায় এখন দুপুরের রোদ্দুর ঝলকাচ্ছে। কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দের সঙ্গে মনে পড়ল উশীরপ, মধ্যাহ্নের সূর্যরশ্মি।
ভবনের সম্মুখ দুয়ারে দাঁড়িয়েছিলেন দু'জন ব্যক্তি। দুই যুবক। এঁরা সম্ভবত সহযোগী জ্যোতির্বিদ, কারণ আমি শুনেছিলাম প্রধান জ্যোতির্বিদ বেশ বৃদ্ধমানুষ। অতিথি যোগী দুয়ারের ব্যক্তিদের বললেন, "মণ্ডল চিত্রাঙ্কনের কক্ষে আমাদের নিয়ে চলুন অনুগ্রহ করে।"
ওই দুই ব্যক্তি অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে যোগীকে ও আমাদের সবাইকে নিয়ে চললেন। বড় দরজা দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে ঘুরতে হল আমাদের গোটা দলটিকে। দীর্ঘ একটি বলয়াকৃতি বারান্দার মতো চলছে, অনুমান করে নিলাম প্রধান বড় কক্ষটিকে বেড় দিয়ে এই বারান্দা। নিজে আগে কখনও এই ভবনে আসিনি, আরেনুশের কাছেই শোনা। এখন মিলিয়ে-মিলিয়ে নিচ্ছি।
অনেকটা পথ ওই ঘোরানো বারান্দা দিয়ে হেঁটে তারপরে মূল কক্ষে ঢুকলাম সবাই। ঘরটি এত বড় আর এতটাই খালি যে প্রথমেই একটা অদ্ভুত চমক লাগে। ছাদ অনেক উঁচুতে, সেই গোল গম্বুজাকৃতি ছাদ। দেওয়ালের উপরে বড়-বড় গোল-গোল জানালা আর আরও উপরে জাফরির মতো গোটা ঘরের দেওয়াল জুড়ে। দিনের আলো কোমল হয়ে এসে পড়ছে ঘরে। ওই আলো, ওই বিশালত্ব, ওই ঘরের বিচিত্র স্থাপত্যকৌশল, সবটাই কেমন একটা অবাক করে দেওয়া ভাব এনে দেয়। আমরা সবাই শান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কেউ কোনও কথা বলছিলাম না।
মস্ত বড় সেই ঘরের মেঝের উপরে গোল একটা বৃত্তাকার জায়গা ভাল করে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। সেইখানেই মণ্ডল চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত দুই যোগী। বৃত্তাকার জায়গায় রঙিন বালি দিয়ে ফুটিয়ে তুলছেন আলপনার মতো চিত্র, লতা-ফুল-পাখি-অগ্নিশিখা জলের ঢেউ-দুর্গ প্রাচীর-জাহাজ ইত্যাদি।
ওঁদে ডান পাশে রাখা রঙিন বালির পাত্রগুলো, চকচকে ছোট-ছোট ধাতব বাটি, তাতে মিহি করে চালুনি দিয়ে চেলে নেওয়া রং। মেশানো বালি লাল, কমলা, নীল, সবুজ, বেগুনি, খয়েরি, গোলাপি আরও কতরকমের যে রং!
বালি দিয়ে চিত্র ভরাট করার কায়দাও চমৎকার, একটা ফাঁপা নলের মতো জিনিসের মধ্যে বালি ভরে একটা সূক্ষ্ম শলাকা দিয়ে নলটা কাঁপানো হয়। নলের খোলামুখ রাখা হয় চিত্রের যে জায়গা ভরাট করা হবে তার উপরে। ওই কম্পনের কারণে বালি ঝরতে থাকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে, বিভিন্ন নকশায়। এইভাবে আগুনের শিখায় একরকম কাঁপনের বালি, জলের ঢেউয়ের জন্য আর-এক রকম, লতার জন্য এক রকম, ফুলের জন্য আর-এক রকম।
আমরা, যোগীর সঙ্গে আগত ছাত্রছাত্রীরা সবাই অভিভূতের মতো দেখতে থাকি এই আশ্চর্য শিল্পকলা। এমনকী আমাদের শিক্ষক ময়ূখানও অবাক ও মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন। অবশ্য এখানের বেশির ভাগ মানুষই তো যোগ সম্বন্ধীয় কিছু শুনলেই অভিভূত হয়ে যান। আর এখানে তো স্বয়ং সিদ্ধযোগীরা শিল্পকর্ম করছেন। মুগ্ধ হওয়ার তো কথাই।
মণ্ডল চিত্রাঙ্কন চলবে বহুক্ষণ, প্রায় গোটা দিন। কাজের মাঝে সাময়িক বিরতি নিয়ে তিনজন যোগী উশীরপ ভবনের সম্মুখে সূর্যঘড়ির কাছে এলেন। আমরা সকলেই অনুসরণ করলাম। ওঁরা আশ্চর্য এক মন্ত্রগান গাইলেন আমাদের সামনে। তার পরে মধ্যাহ্নভোজের ছুটি হল সবার।
সেইদিন অতিথি যোগীদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থাও ছিল প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানের মস্ত বড় সাধারণ ভোজনালয়ে খাওয়া-দাওয়া হল, নানা ধরনের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ও পানীয় ছিল। আমাদের খুব ভাল লাগছিল, নিজেদের ঘরে নানা কাজ সামলে রেঁধেবেড়ে খাওয়া যা হয় তার মধ্যে বহুবিধ আয়োজন থাকে না, শুধু প্রয়োজন মেটাবার মতো রান্নাটুকু হয়। তা ছাড়া আমাদের সংস্থানও অল্প।
কাষ্ঠাসনে সারি দিয়ে বসেছিলাম আমরা, সামনে পাতা আর পানীয়পাত্র, যত্ন করে পরিবেশনকারীরা আহার্য ও পানীয় দিয়ে যাচ্ছিল আমাদের। সম্ভালায় আসার পর সেই প্রথম আমাদের এত আপ্যায়ন পাওয়া। অভিভূতের মতো আহার গ্রহণ করছিলাম আমরা। এত সব সুস্বাদু নানা পদে প্রধান আহার আর শেষ পাতে নানা রকম মিষ্টি জীবনেও আমাদের জোটেনি। তৃপ্তি করে খাচ্ছিলাম আমরা। সব ছাত্রছাত্রীদের দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে ঘণ্টাখানেকের মতো লাগল।
মধ্যাহ্ন আহারের পরে কিছুক্ষণ ছুটি আমাদের মানে ছাত্রছাত্রীদের। যোগীরা চলে গেলেন মণ্ডল চিত্রাঙ্কন সমাপ্ত করতে। আমাদের প্রায় ঘণ্টাতিনেক ছুটি। সূর্যাস্তের পর আবার বিশেষ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। ময়ূখান চলে গেলেন নিজস্ব চিত্রশালায়, তাঁর কিছু কাজ ছিল। ছাত্রছাত্রীরা কেউ-কেউ চলে গেল ঘরে বিশ্রাম করতে, কেউ-কেউ আবার আশপাশেই গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম আর গল্প করতে লাগল। আমরাও গাছের ছায়াতেই বসলাম বন্ধুদের সঙ্গে।
বন্ধুদের কথাবার্তা প্রায় সবই যোগের ক্লাসে ঢুকতে পারার আকাঙ্ক্ষার কথা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কথাই নানা ভাবে, ভঙ্গিতে। কেমন একটা ক্লান্তি লাগে আমার। এই যে এত যত্ন করে ছবি আঁকা শেখা, মূর্তি বানানো শেখা, কারও কি সেই নিয়ে একটাও ভালবাসার কথা থাকতে নেই? নতুন কিছু তৈরি করা যায় নাকি, নতুন কোনও পদ্ধতি সৃষ্টি করা যায় নাকি, সেই নিয়ে কোনও আকাঙ্ক্ষা কারও নেই?
বুকের ভিতরটা কেমন ঠান্ডা বিষাদে ভরে যায়, চুপ করে বসে থাকি। বন্ধুদের কথাগুলো আস্তে-আস্তে কেমন দূরাগত গুঞ্জনের মতো হয়ে আসে, ঘুম এসে পড়তে থাকে আমার দু'চোখে। এত তৃপ্তির মধ্যাহ্ন আহার তো স্মরণকালের মধ্যে হয়নি, ঘুম আসাই তো স্বাভাবিক।
আরেনুশ আমাকে ঘুমে ঢুলে পড়তে দেখে সাবধানে ধরে রাখে যাতে আমি না পড়ে যাই। তার পরে বন্ধুদের কাছে মাফ চেয়ে আমরা যাই আমাদের গ্রন্থাগারের দিকে। সেখানে মস্ত-মস্ত স্তম্ভের পাশে ছায়াময় নির্জনতায় চুপচাপ শুয়ে পড়ি।
আরেনুশ শোয় না, পাশে বসে থাকে। ও সঙ্গে সবসময় একটা ব্যাগে কিছু বই রাখে, সেই বই বের করে পড়তে থাকে। আমাকে হেসে বলে, "তুমি ঘুমিয়ে নাও, আমি ঠিক সময়ে তোমাকে ডেকে তুলব।"
ওর বই পড়তে থাকা অবস্থার শান্ত, ভাবুক মুখটা দেখতে-দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তলিয়ে যাই মধুর শান্তির ঘুমে।

{১৩}

ঘুম ভাঙল আরেনুশের ডাকে। আমার কাঁধের কাছে আস্তে-আস্তে ঠেলা দিতে-দিতে মৃদু গলায় ও ডাকছিল, "ওরিয়ানা, ওঠো, ওঠো। আরে চোখ খোলো। এই দ্যাখো সূর্যাস্তের সময় হয়ে গিয়েছে।"
উঠে বসে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ডলতে-ডলতে দেখি সূর্যাস্ত আসন্ন। মায়াবী রাঙা আলো ছড়িয়ে আছে চরাচরে, সূর্য নেমে এসেছে পশ্চিম দিগন্তের একেবারে কাছে, ওইখানের মেঘগুলো সোনালি জরিওয়ালা ওড়নার মতো ঝলমল করছে।
উঠে দাঁড়াই, গ্রন্থাগারের এই জায়গাটা মাটি থেকে বেশ উপরে,

এইখান থেকে একেবারে ওই অস্তদিগন্ত পর্যন্ত কোনও গাছ বা বাড়িঘরের আড়াল নেই। অপূর্ব সূর্যাস্ত অবারিত আমার সামনে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি। প্রতিদিন ঘটা এই ব্যাপার, সূর্যাস্ত, অথচ কী অসাধারণ এর সৌন্দর্য যেন অনন্তের হৃদয় আবরণ সরিয়ে দেখা দেয় কয়েক মুহূর্তের জন্য।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল আরেনুশ, আমি ওর দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলি, "কী অপরূপ সুন্দর, না?"

কেন যে ফিসফিস করে চাপা গলায় বললাম কে জানে! হয়তো মহান সৌন্দর্যের মধ্যে কোনও সন্ত্রাস্ত গোপনতা থাকে, তাই তার মুখোমুখি হতে গেলে আপনা থেকেই মৃদুতা আর মুগ্ধতায় ভরে যায় নিজের অস্তিত্বটুকু। আর সমস্ত হৃদয় ভরে যায় ব্যাখ্যার অতীত কোনও শ্রদ্ধায়।

আরেনুশ আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল, শুধু, কিছু বলল না। ওর হাসিটুকু দিয়েই বুঝিয়ে দিল যা বোঝানোর।

সূর্যাস্তের পরে বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান হওয়ার কথা। তিনজন যোগীর সঙ্গে শিষ্য ও অনুগামী মিলিয়ে আরও জনাদশেক সাধক এসেছিলেন, তাঁরা সারাদিন ছিলেন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অতিথিনিবাসে। সেখানেই তাঁরা প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা করেছেন।

অনুষ্ঠান দেখার জন্য আমি আর আরেনুশ রওনা হই নির্দিষ্ট জায়গার দিকে। উশীরপ ভবনের উত্তর দিকে ছোট একটি মাঠ, পার হয়ে আর একটি ক্ষুদ্র ভবন, মিত্তা। সেই ভবন পার হলেই বিশাল এক মাঠ, দীর্ঘ-দীর্ঘ ফলবান বৃক্ষ দিয়ে গোল করে ঘেরা। সেই মাঠেই অস্থায়ী মঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছে, সেইখানেই নৃত্য প্রদর্শন করবেন সাধকগণ। মঞ্চটি একটু উঁচু জমির উপরে, সামনে ঢালু মাঠ, সেখানে দর্শকরা বসেছে। মঞ্চ বলতে যেমন জমকালো ব্যাপার মনে হয়, সেরকম ঠিক না, উঁচু জমির উপরে একটা চৌকো মতো জায়গা ঘেরা হয়েছে রঙিন কাগজের শিকলি দিয়ে, চার কোণে চারটে কাঠের খুঁটি, সেগুলোর মাথায় মাথায় রঙিন পতাকা উড়ছে। আরও কিছু খুঁটি আছে মঞ্চ ঘিরে, সেগুলোয় পতাকা নেই, সেগুলোয় জ্বলন্ত মশাল এনে এনে বাঁধা হচ্ছে।

দেখতে-দেখতে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে আসে। সবক'টা মশাল তখন জ্বলছে, মঞ্চ ঘিরে অনেক প্রদীপও জ্বলে উঠেছে। আগুনের আভায় অদ্ভুত মঞ্চটি ও তার চারপাশ সবই কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত সাজসজ্জা করা একদল লোক আসে, এদের গায়ে রঙিন পোশাক, বহু রকমের কুঁচিদেওয়া সেই পোশাক, মাথার চুলগুলো চূড়া করে বাঁধা, তাতে গোঁজা রঙিন পালকের গোছা। এরা নিয়ে এসেছে অদ্ভুত সব বাজনা। মঞ্চ ঘিরে দাঁড়ায় তারা। অপেক্ষা করে সঙ্কেতের।

দূর থেকে আগুনের দু'টি শিখা এগিয়ে আসতে লাগল। আরও কাছে এলে বোঝা গেল ও দু'টি জ্বলন্ত মশাল। দু'জন দু'টি মশাল নিয়ে এগিয়ে আসছে। মঞ্চের উপরে তারা এসে দাঁড়ালে দেখা গেল সর্বাঙ্গঢাকা অদ্ভুত পোশাক তাদের, এমনকী মুখও রঙিন মুখোশে আবৃত। বিশাল গোল বহু পালকগাঁথা মুকুট তাদের মাথায়। এরা হয়তো মণ্ডলচিত্রাঙ্কনের দুই যোগী হতেও পারেন, কিন্তু বোঝার উপায় নেই এখন। মঞ্চভূমিটুকু এখন উজ্জ্বল মশালের আলোয়। এদের পোশাকে অদ্ভুত কারুকার্য, ঘন নীল আর কালো জমিনের উপরে লাল আর হলুদ আগুনের শিখা যেন লকলক করছে, এইরকম নকশা পোশাকে।

এই দুই মশালধারীর পাশে আরও দুই মশালধারী এসে দাঁড়াল, তাদেরও সাজসজ্জা প্রায় একই রকম, তবে তাঁদের পোশাকে নীল জলের উপরে সাদা ফেনামাখা ঢেউ আর সন্তরণরত মাছের ছবি আঁকা। তারপরে আরও দু'জন এসে এদের দু'পাশে দাঁড়াল, সাজসজ্জা প্রায় এক, এদের পোশাকে জঙ্গল আর ছুটন্ত বন্যজন্তু আঁকা। তারপরে এল আরও দু'জন, তাদের পোশাকে ঝড়ের মেঘ আর বজ্রবিদ্যুতের নকশা আঁকা।

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে, মঞ্চ ঘিরে বাদকেরা চুপ, নিঃশব্দে জ্বলছে মশালগুলো, মাঝে-মাঝে আগুনের সোনালি ফুলকি উড়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে।

এই রুদ্ধশ্বাস সভার মাঝখানে যেন শূন্য থেকে ভেসে উঠল আর-একজন, এঁর মাথায় সাদা পালকের বিশাল মুকুট, এর পোশাকে জ্বলজ্বল করছে শত-শত তারা। সকলের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে সে দুই হাতে এক বিশাল শঙ্খ তুলে ফুঁ দিল। গম্ভীর সুরেলা শব্দ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিগন্তে। সেই মুহূর্তে বাদ্যকরদের বাজনাও উঠল বেজে। মঞ্চে শুরু হল নৃত্য।

সেই অপূর্ব নৃত্যের বর্ণনা করতে পারি সেই সাধ্য নেই। যতটা না সেই নাচ দেখবার ও শোনবার, তার চেয়েও অনেক বেশি অনুভব করবার।

শুরুতে ছোট-ছোট দোলায়িত ভঙ্গিতে নাচছে শিল্পীরা, বাজনা বাজছে ধীরলয়ে, কোথা থেকে আশ্চর্য কণ্ঠসঙ্গীতও ভেসে আসছে, সমবেতকণ্ঠে। অথচ কণ্ঠসঙ্গীতের কোনও শিল্পীকে তো দেখছি না। তা হলে কি কল্পনা, নাকি শিল্পীরা রয়েছেন আমাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে?

বেশ কিছুক্ষণ ধীর লয়ের সঙ্গীত ও ধীর শান্ত নৃত্য, যেন দখিনা বাতাস বইছে বসন্ত-পুষ্পিত বনভূমি আর সুনীল সমুদ্রের উপর দিয়ে। আকাশে শুভ্র মেঘ, দূরের পাহাড়ে তুষারশৃঙ্গে ঝকমকে রোদ্দুর খুশির হাসি হয়ে ছড়িয়ে আছে। আস্তে-আস্তে নাচের গতি বাড়তে থাকে, সঙ্গে বাজনাও হয়ে ওঠে দ্রুতলয়ের ও তীব্রতর। ওই সঙ্গীতও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

মঞ্চে আর শিল্পীদের যেন আলাদা করা যায় না, ঘূর্ণি উঠেছে সেখানে, মনে হচ্ছে আকাশে ঝড়ের মেঘ ফুঁসে উঠছে, বিদ্যুতের ঝিলিক ঝলকে-ঝলকে উঠছে, বজ্রপাতের শব্দ মিশে যাচ্ছে গানে, সমুদ্র যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে, পাহাড়ের শৃঙ্গ উড়ে গেল বিস্ফোরণে, সেই পাহাড় এখন আগ্নেয়গিরি, ঝলকে-ঝলকে সোনালি অগ্নিস্রোত বেরিয়ে আসছে, ওই স্রোত গলন্ত লাভার স্রোত। আকাশের বিদ্যুচ্চমক ভেদ করে নেমে আসছে প্রলয়ের উল্কাদল।

ওই আশ্চর্য নৃত্য দেখতে-দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, মনে হচ্ছিল মাটি-জল-আগুন-বাতাস ভেদ করে যেন উঠে যাচ্ছি তীক্ষ্ণ একটা তিরের মতো, ওই দূরে শূন্য কালো আকাশের বুকের গভীরে জ্বলজ্বল করছে নক্ষত্রের হীরকদ্যুতি।

কেমন একটা অসহায় ভয়ে মন অবশ হয়ে আসে, হাত বাড়াই অবলম্বনের আশায়। কার হাত যেন আমার বাড়ানো হাত ধরে নেয়, ওই হাতের স্পর্শ উষ্ণ আর সহৃদয়, আমার ভয় কেটে যায়। সম্বিৎ ফিরে দেখি আরেনুশ আমার হাত ধরে রেখেছে, কৃতজ্ঞচোখে চেয়ে থাকি, জানি অন্ধকারে দেখতে পাবে না, তবু কেমন করে যেন বুঝতে পারি কৃতজ্ঞতার নীরব এ ভাষা ও বুঝতে পারছে।

আস্তে-আস্তে আবার মঞ্চে ধীরলয়ে নেমে আসে নাচ, প্রলয়নৃত্যের পরে আবার শান্তিময় মধুর নৃত্য। আবার যেন আকাশে জ্বলজ্বল করে তারারা, এক পাশে দেখা দেয় চাঁদের ফালি, হাসিমুখের মতো। ঝড়ের বাতাস শান্ত হয়ে আবার সুমধুর দখিনা হাওয়া হয়ে যায়। সমুদ্র আবার শান্ত, সেখানে মাছেদের সাঁতার খেলা, জঙ্গলও আবার শান্ত। হরিণের দল ঘুরে বেড়ায়, তাদের মাথায় বড়-বড় আঁকাবাঁকা শিঙের বাহার। অসংখ্য রংবেরঙের ফুলে যেন ভরে উঠেছে অরণ্যভূমি, যেন নতুন জীবন, নতুন আশা। প্রলয়ের পরে কি এমনিভাবেই নতুন সৃষ্টির সূচনা হয়?

সমস্ত অনুষ্ঠানাদি শেষ হতে-হতে বেশ রাত হল। অনুষ্ঠানের পরে

AMARBOI.COM

রাতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল ছাত্রছাত্রীদের জন্য। প্রত্যেককে একটি করে শালপাতার মোড়ক দেওয়া হচ্ছিল আর একপাত্র স্নিগ্ধ মিষ্ট পানীয়। মোড়কের ভিতরে শুকনো খাবার ছিল। অনেকেই মোড়ক খুলে সেখানেই বসে খেয়ে নিচ্ছিল।

আমার কেন যেন খিদে ছিল না, অদ্ভুত ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়তে চাইছিল সর্বশরীর। আরেনুশও বুঝতে পারছিল যে আমি আর পারছি না বসে থাকতে, খাওয়া তো দূরের কথা। আমাদের খাদ্যপানীয় সব হাতে নিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের কুটিরের দিকে ফিরে চললাম।

বড়-বড় ঝাঁকড়া গাছের কুঞ্জ পার হয়ে আমাদের আবাসগুলোর কাছে এসে যখন পৌঁছলাম তখন দেখি সেই দিকে একেবারে চুপচাপ, আলো শব্দ, হইচই, আনন্দ কোলাহল সেসবের কিছুই সেখানে পৌঁছয়নি। সেখানে তারা ঝলমলে রাত্রির আকাশের নীচে নির্জন হয়ে পড়ে আছে ঘুমন্ত কুটিরগুলো। আকাশে চাঁদ ছিল না, কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ ওঠার কথা প্রায় শেষরাতে।

কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না আমার, আরেনুশ বুঝতে পেরেছিল, জোরাজুরি করেনি। ও মোড়ক খুলে আস্তে-আস্তে খাচ্ছিল, আমি ওর পাশে বসে ছোট-ছোট চুমুক দিয়ে ঠান্ডা জল পান করছিলাম। বসে থাকতে যেন আর পারছিলাম না, মনে হচ্ছিল গড়িয়ে পড়ে মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়ি। ওহ ক্লান্তি, এত ক্লান্তি!

আরেনুশ কী যেন বুঝে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে মোড়ক মুড়ে

জাদুদর্পণে তাঁরা সমস্ত জগৎ দর্শন করেন। দর্শন করেন বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। তাঁদের চিন্তার শক্তি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

ফেলে হাত ধুয়ে এল। তার পরে আমাকে দুই হাতে করে তুলে নিয়ে শোয়ার ঘরে চলল। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু এত ক্লান্ত যে প্রতিবাদ হল খুব মৃদু। আরেনুশ অল্প-অল্প হাসছিল। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গায়ের উপরে চাদর দিয়ে ঢেকে বলল, "তুমি ঘুমোও ওরিয়ানা। আমি আজকে একটুখানি রাত জাগব। কাজ আছে। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও, ঘুমোও।"

আমি ওকে অস্ফুটে ধন্যবাদ দিয়ে পাশ ফিরে শুলাম। তার পরেই ডুবে গেলাম অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্নে দেখলাম, উজ্জ্বল একফালি নীল আলো, সোজা উঠে গিয়েছে উপরে। সেই আলোর দুই পাশে দু'টি উজ্জ্বল সাদা আলোর ফালি, একইভাবে উঠে গিয়েছে। তার দু'পাশে দু'ফালি উজ্জ্বল নীল আবার। সব আলো যখন জ্বলে উঠল, তখন ঠিক যেন আলো দিয়ে তৈরি ময়ূরপেখম।

তার পরে ওই আলোরা নাচতে শুরু করল। ঘুরতে থাকল ফালি-ফালি আলো। তীক্ষ্ণ তরবারির মতো অন্ধকার কেটে-কেটে ঘুরতে থাকল আলোর ধারা।

তার পরে ফোয়ারার মতো একঝাঁক সাদা আলো জ্বলে উঠল, তার পরে উড়ন্ত পরদার মতো উজ্জ্বল সবুজ আলো, আলোর ময়ূরপেখমের নীলগুলো এখন বদলে গিয়েছে উজ্জ্বল লালে, আর সাদাগুলো রক্তাভ বেগুনিতে। সবই পাগলের মতো নাচছে এখন একইসঙ্গে, উজ্জ্বল আলোর তরবারিরা এখন পরস্পরকে কাটতে-কাটতে ঘুরছে, লাল আলোর ভিতর দিয়ে সাঁ করে ঘুরে যাচ্ছে সবুজ আলোরা।

অদ্ভুত নেশা ধরানো এই আলোকনৃত্য দেখতে-দেখতে ভাবছিলাম এই আলোরা কিছু বলতে চাইছে কি? এ কি কোনও ভাষা? কোনও সংকেত? কোনও কবিতা? নাকি শুধুই আনন্দনৃত্য?

এর পরেই আলোর নৃত্য যখন উন্মাদনা পার হয়ে সুহুদ্দ হয়ে উঠল, তখন এলো সুর, প্রথমে একটা হালকা সুরেলা টান শুধু, উষার প্রথম পাখিটির গানের মতো। তার পরেই যেন একই সঙ্গে বেজে উঠল অনেক সুরযন্ত্র, সুরে-সুরে ভরে উঠল আকাশ।

অপূর্ব এক গান হচ্ছিল যেন সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে; গানের মধ্যে কথাও ছিল, প্রথমে ধরতে পারিনি, তার পরে একসময় গানের কথাগুলো শুনতে পেলাম। আশ্চর্য সুন্দর সেই কথাগুলো...

"সময়ের গিঁটখোলা রাতে
আকাশের চাবি তোর হাতে
এই হাত রাখি সেই হাতে
আলোর অমৃত বরষাতে..."

সেই অপার্থিব মাধুর্যময় সুরে ও গানে ডুবে যাচ্ছিলাম, ভারী মধুর সেই অনুভব। পুরোটাই স্বপ্নের ভিতরে, তবুও যেন সব কেমন অন্য রকম। স্বপ্ন দেখতে-দেখতেও যেন বুঝতে পারছিলাম এটা স্বপ্ন। সুরে আর গানে ডুবতে-ডুবতে মনে পড়ল আনুমার পাহাড়ি পথ দিয়ে নিজনি আসত গুনগুন গান গাইতে-গাইতে। সেই গানেই কি এই 'আকাশের চাবি' কথাটা আগে শুনেছিলাম?

কী আশ্চর্য কথা দু'টি! আকাশের চাবি! সেই চাবি দিয়ে আকাশ খুলে ফেলে তার গোপন ঐশ্বর্য বুঝি পাওয়া যায়? অথবা অমৃতের আশীর্বাদ?

{১৪}

তার পরে দিন যায়, রাত কাটে। স্বাভাবিক ছন্দেই সব কিছু চলে, কিন্তু তবু কোথাও কোথাও যেন নতুন কিছু দেখি। মাঝে-মাঝে যেন স্ফুলিঙ্গের মতো ঝিকিমিকি দেখি কোনও-কোনও মানুষের চোখে, যা আগে দেখিনি। কথাবার্তা ও কাজকর্মের মধ্যেও যেন কোথাও নতুনত্ব দেখা দিয়েছে খুব সামান্য হলেও। এই পরিবর্তন শুরু হয়েছে সেই নৃত্যানুষ্ঠানের পর থেকেই।

সম্ভালায় ঋতবন্ত সুমিস্তোসকে যখন আমরা দেখতে পেলাম, তখন আমাদের সেখানে কেটে গিয়েছে প্রায় এক বছর। এর আগে আমরা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা যে করিনি তা নয়, করেছি, কিন্তু শেষ অবধি সেই চেষ্টাগুলো ফলপ্রসূ হয়নি।

প্রথম দিকে তো নিজেদের কাজকর্ম পড়াশোনা ইত্যাদি নিয়েই হিমশিম খাচ্ছিলাম, তার সঙ্গে ছিল নতুন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চাপ। তার পরে সেইসব যখন থিতিয়ে গেল তখন সেই অদ্ভুত স্বপ্ন আর রহস্যময় অনুভূতি।

মাঝে-মাঝে আমার আর আরেনুশ, দুইজনেরই মনে হত ফিরে যাই আনুমায়, সেখানে ছবি এঁকে মূর্তি বানিয়ে যেভাবে টিমটিম করে দিন কাটছিল, সেই রকমই না হয় কেটে যাবে বাকি জীবনটা। হয়তো ঘর-সংসারও হবে তারই মধ্যে, হয়তো সুখে-দুঃখে যেমন আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের জীবন কেটে যায়, তেমনই কাটবে। তো, সেই ফিরে যাওয়াও হল না, হয়তো আরেনুশ আর আমি দু'জনেই ফিরে যাওয়াকে এক ধরনের পরাজয় স্বীকার করা বলে মনে করেছিলাম, আমাদের তরুণ হৃদয় সেই পরাজয় কিছুতেই স্বীকার করতে চায়নি।

তার পরে তো কত ঘটনাই ঘটে গেল একে-একে, সেই অদ্ভুত

স্বপ্নগুলো সব, সেই ত্রিভুজ আর বলয়, সেই অজানা জগতের উন্নত জীবদের দ্বারা দেখানো নানা নির্বাচিত মানুষের কাহিনি, তাদের বলা অকল্পনীয় সব রহস্যকথা...

মাঝে-মাঝে কেমন একটা অস্থির অধৈর্যে কেঁপে উঠতাম, ওঁরা যে বলেছিলেন আমাদের সবাইকে ওঁরা ডেকে নেবেন, পথ দেখিয়ে নেবেন, সে কি সত্যি? যদি সত্যি হয়, তবে কবে?

তার পর আমরা দিনের পর-দিন বেশি-বেশি করে যেন জড়িয়ে পড়তে লাগলাম এমন সব ঘটনাচক্রে, যেখানে আমাদের নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিতান্ত হালকা ব্যাপার হয়ে গেল। সবই যেন অমোঘ কোনও নিয়মের দ্বারা ঘটে চলেছে, আমরা কেবল নিজেদের ভূমিকা পালন করছি মাত্র।

যাই হোক, অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন ঋতবন্তর খোঁজ পাওয়া গেল। একদিন সকালের ক্লাস করেই আমাদের ছুটি হয়ে গেল। সেদিন ওই গুহাচিত্র বা মিনারের মাঠে কাজ বন্ধ। বিরাট এক বাৎসরিক উৎসবের শুরু সেদিন। পরপর তিনদিন পড়া আর কাজ সব থেকেই ছুটি সবার। উৎসবের আয়োজনে যারা থাকবে,

তাদের অবশ্য ব্যস্ততা থাকবে, আর যারা শুধুই উৎসব দেখবে তাদের প্রায় সময়-বিলাস।

খুশি মনে আমি আর আরেনুশ ফিরছিলাম আমাদের ঘরের দিকে। আমি বললাম, "ওহ, অনেকদিন পরে নিজেদের মতো সময় কাটানো যাবে দিনকয়েক। উৎসব দেখতে বিকেলে বেরোলেই হবে। কী বলো, আরেনুশ?"

ও হাসল, কিছু বলল না। ও কথা কম বলে এমনিতেই। আর যেখানে হাবেভাবেই বোঝা যাচ্ছে সেখানে আর মুখে বলার দরকার কী, এই ধারণা ওর। ও বোঝে না, যেসব কথা খুব আনন্দের, অথচ যেসব কথা বেশি শোনার বা বলার সুযোগ পাওয়া যায় না, সেগুলো মুখে বলতে আর কানে শুনতে ইচ্ছে করে।

বিকেলে আমরা উৎসব দেখতে গেলাম। রঙিন ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব। বিশাল-বিশাল সব পাখনাওয়ালা লেজওয়ালা রঙিন ঘুড়ি। কোনওটা কাগজ দিয়ে, কোনওটা হালকা কাপড় দিয়ে বানানো, ঘুড়িগুলো উড়ছে বিকেলের নীল আকাশে। মস্ত সবুজ মাঠ লোকে লোকারণ্য, পরম আনন্দে ঘুড়ি উৎসব দেখছে সবাই।

আমি দেখতে দেখতে পরিপার্শ্বের জগৎ ভুলে যেন চলে গেলাম এক অন্য লোকে। ঠিক আমার মাথার উপরে ভাসছিল বিশাল এক নীল ঘুড়ি, তার গায়ে সোনালি দু'টি বড়-বড় চোখ। ওই সোনালি চোখ দু'টি যেন আমাকে দেখছে, দেখছে, দেখছে। আমার শরীর যেন হালকা হয়ে গেছে পালকের মতো, যেন আমার পায়ের তলায় আর মাটি নেই, যেন আমিও ঘুড়িটার মতো বাতাসের মধ্য দিয়ে ভাসতে-ভাসতে চলে এসেছি নীল আকাশের কাছাকাছি। এইবারে ছুঁয়ে দেখব আকাশ। আচ্ছা, নীল আকাশ ছুঁলে আমার হাতে নীল রং লেগে যাবে কি? কিন্তু কই, নীল আকাশটা তো ছোঁয়া যায় না, সেটা তো কেবলই আরও আরও-আরও উঁচুতে সরে-সরে যায়! যখন সম্বিৎ ফিরল তখন দেখি আরেনুশ আমাকে শক্ত করে ধরে আছে, বলছে, "বাড়ি চলো ওরিয়ানা, বাড়ি চলো। তুমি পড়ে যাচ্ছিলে, আমি কোনওক্রমে ধরে ফেলেছি। চলো, ঘরে ফিরে বিশ্রাম করবে চলো।"

পরম যত্নে আমায় ধরে-ধরে ঘরে নিয়ে এল আরেনুশ। শুইয়ে দিল বিছানায়, জল এনে দিল গেলাস ভরে। জল খেয়ে ভিতরটা শান্ত হল আমার। তার পরেই খুব লজ্জা লাগল, ছি ছি আমার জন্য ওরও উৎসব দেখা হল না। ওর কাছে মাফ চাইলাম খুব দীনভাবে।

আরেনুশ হাসল, বলল, "কেন? মাফ চাইছ কেন? কী অপরাধ করলে তুমি?

কুণ্ঠিত গলায় বললাম, "আমার জন্য তোমার ঘুড়ি উৎসব দেখা হল না।"

আরেনুশ চুপ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে, তার পরে আস্তে-আস্তে বলল, "জানো ওরিয়ানা, তোমার মতো পাগল কমই আছে। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকবে, আর আমি উৎসব দেখব? এটা ভাবলেই বা কেমন করে?"

সেইদিন সন্ধেবেলা দূর উচ্চভূমির দিক থেকে সরল গাছঘেরা পথটা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এল এক সওয়ার। তার পরনে লম্বা আলগা নীল পোশাক, সোনালি জরির পাড় তাতে। সন্ধের আলোয় ঝলমল করছে সেই জরি। ঘোড়া ছুটিয়ে সে সোজা এল আমাদের কাছে, বলল, "ভয় পেও না। আমি তোমাদের এক বন্ধুর কাছ থেকে আসছি। সে তোমাদের জন্য একটা ছোট উপহার পাঠিয়েছে।"

এই বলে সে আমাদের দিল একটা ছোট্ট বাক্স, রুপোলি চৌকো বাক্স, লাল রেশমি রুমাল দিয়ে বাঁধা।

ওটা আমাদের দিয়েই সে বিদায় জানিয়ে চলে গেল ঝড়ের মতো। ঘোড়ার পায়ে ছিটকে ওঠা পথের ধুলো থিতিয়ে পড়ল যখন, তখন শুনি দূরে কোথায় শাঁখ বাজছে, সন্ধ্যার উপাসনা বুঝি শুরু হল কোনও প্রার্থনালয়ে। আকাশে তাকিয়ে দেখি ফুটে উঠেছে সন্ধ্যাতারা। ওটা নক্ষত্র নয়, গ্রহ। ওখানে একদিন মানুষের পাঠানো যন্ত্র অবতরণ করেছিল, আমরা জানি। কিন্তু সেসব সেই প্লাবনপূর্ব সময়ের কথা, অনেকেই বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে ওসব গল্পকথা, কল্পনা।

ঘরের ভিতর এসে দরজা বন্ধ করলাম। বাতি জ্বালালাম। জানালাগুলো সব বন্ধ করলাম। তার পরে কাপড়ের গিঁট খুলে কৌটো খুললাম। একগোছা কাগজের মতো পাতলা রুটি ছিল রুপোলি কৌটোর মধ্যে। প্রত্যেকটা রুটির উপরে সূক্ষ্ম কাঠির আঁচড়ে লেখা অনেক কিছু। সম্ভালার ভাষায়।

ভাল করে আলোর সামনে ধরে পড়তে শুরু করি দু'জনে।

একটুখানি পড়েই বোঝা গেল এটা ঋতবন্তের কাছ থেকে আসা চিঠি। অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য রুটির উপরে লেখা, যাতে পড়া হয়ে গেলেই রুটি খেয়ে ফেলে প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া যায়। সেই বিধিও চিঠির শুরুতেই লেখা ছিল।

ততদিনে অদ্ভুত চিঠির ব্যাপারে আমাদের আর সেরকম অবাক ভাব নেই, ওই যে ত্রিভুজ আর বলয় বুকে নিয়ে আশ্চর্যতম চিঠি এসেছিল, তারপর থেকেই আমাদের মন পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে। চিঠিতে লেখা ছিল,

"প্রিয় ওরিয়ানা ও আরেনুশ,

আমি ঋতবন্ত সুমিত্তোস লিখছি তোমাদের। এইভাবে লেখার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, কিন্তু আমার অন্য উপায় ছিল না। লেখাটি পড়া হয়ে গেলে তোমরা রাতের খাবার হিসেবে এই রুটি খেয়ে ফেলবে সঙ্গে-সঙ্গেই। এর এককণা প্রমাণও যেন কোথাও না থাকে, তা হলে তোমাদের ও আমার উভয়ের তো বিপদ হবেই, উপরন্তু অন্য বিরাট বিপর্যয়ও ঘনিয়ে আসতে পারে।

ওরিয়ানা, আরেনুশ, তোমাদের কি মনে আছে যে মুইনুখের বাজারে তোমাদের ছবি ও মূর্তির দোকানে আমার সঙ্গে তোমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়? সে প্রায় বছরখানেক আগের কথা। তোমাদের সম্ভালায় আসার আর তার পরে তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষা আর কাজকর্মের সব খবরই আমি রেখেছি, কিন্তু বিশেষ কারণে দেখা করতে পারিনি । সেইজন্যও ক্ষমাপ্রার্থী আমি, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও আমার কোনও উপায় ছিল না।

তখন আমার পূর্ব পরিচয় তোমাদের দিতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম আমি সম্ভালায় গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত। আমার সেই পরিচয় সত্য। তবে আরও বড় পরিচয় হল উচ্চলোকের যে সভ্যতা পৃথিবীর

মানুষদের বাঁচাতে চাইছে আচ্ছন্ন বাধ্যতার মগ্নতা থেকে, করে তুলতে চাইছে অনুসন্ধিৎসু ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাদক্ষ আমি তাঁদের একজন কর্মী। এইরকম আরও বহু কর্মী তাঁদের রয়েছে এই পৃথিবীতে। আমাদের কাজ হল নির্বাচিত মানুষদের সাহায্য করা, রক্ষা করা ও পথপ্রদর্শন করা। তবে ওঁদের নির্দেশ অনুসারেই কাজ করতে হয়। ওঁদের নির্দেশ অনুসারেই এইভাবে যোগাযোগ করতে হচ্ছে।

এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই ভাল করেই জেনে গিয়েছ যে তোমরা ওঁদের নির্বাচিত একশোজন মানুষের মধ্যে অন্যতম। বাকি নির্বাচিতদের পরিচয় ও চেহারাও নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ, হয়তো কারওকে-কারওকে তোমাদের মনেও আছে। শীঘ্রই তোমাদের দেখা হবে ওদের অনেকের সঙ্গেই।

কিছুদিন আগে তোমাদের প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন যোগী ও অনুগামীরা গিয়েছিলেন নানা অনুষ্ঠান করতে, সেইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল প্রভাষণ, মণ্ডল চিত্রাঙ্কন ও নৃত্যকলা প্রদর্শন। এই দলটি আসলে আমার মতোই ওই উন্নত সভ্যতার কর্মী। সাংকেতিক ভাষায় তাঁরা সেই কথা জানিয়েছেন ও উপযুক্ত মনগুলোয় প্রভাব সৃষ্টি করেছেন।"

চিঠির এই অংশে এসে আমরা পড়া থামিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাই। মনে পড়ে সেই প্রভাষণ, আমি আস্তে-আস্তে পুনরাবৃত্তি করি যোগী যা বলেছিলেন সেইদিন, "ওরা ঋদ্ধজপ, মানবজাতির কল্যাণে অক্লান্ত। ওঁদের দৃষ্টি কখনও ব্যাহত হয় না, তাঁদের জাদুদর্পণে তাঁরা সমস্ত জগৎ দর্শন করেন। দর্শন করেন বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। তাঁদের চিন্তার শক্তি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। দূরত্ব বলে আসলে কিছুই নেই তাঁদের কাছে, তাঁরা মুহূর্তমধ্যে যে-কোনও স্থানে উপস্থিত হতে পারেন বা সাহায্য প্রেরণ করতে পারেন। তাঁদের কাছে আছে অফুরান আলোর উৎস, সব অন্ধকার দূরীভূত হতে পরে তাতে। ন্যায়ের পথে যারা কাজ করতে চায়, তাদের ওঁরা দেন ওঁদের অফুরন্ত শক্তি ও সম্পদের অংশ। ওঁদের শক্তি ও সম্পদ অনন্ত, ওঁরা মানুষের কর্মফল পর্যন্ত বদলে দিতে পারেন।"

আরেনুশ আবার সেইদিনের মতোই আমাকে ছুঁয়ে শান্ত হতে বলে, স্পর্শের ভাষায় জানায় ভয়ের কিছু নেই। আমরা আবার পড়তে শুরু করি চিঠি।

এবারে যা লেখা তা বেশ সাংঘাতিক।

"ওরিয়ানা, আরেনুশ, ভাল করে মন দিয়ে এই অংশটা বুঝে নাও। উন্নত সেই মিত্রসভ্যতার এই সক্রিয় সাহায্যের খবর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। তারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই আক্রমণ হবে সরাসরি মনের উপরে, তাই স্মৃতি ও চিন্তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সেইজন্য সেই মিত্র ও রক্ষকদের পরিকল্পনা কিছুটা বদলে গিয়েছে। সব কিছু এখন অনেক দ্রুততালে করতে হবে। তাই যদিও উপযুক্ত সময় হয়নি, তবু নির্দেশ এসেছে তোমাদের আজ রাতেই পালিয়ে এসে যোগ দিতে হবে আমার সঙ্গে। দেরি হলে সর্বনাশ হবে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা কালই আক্রমণ করবে, তোমরা প্রতিষ্ঠানে থাকলে ওদের নাগালের মধ্যে পড়ে যাবে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। অন্য মানুষরা ওদের দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে তোমাদের হত্যা করে পুড়িয়ে দিতে পারে। যদি তোমাদের মন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়, ওরা সম্ভবত এই পথই নেবে।

তাই, তোমাদের আজ রাত্রেই পালাতে হবে। মন দিয়ে শোনো কী করবে। এই লেখাটা পড়া হয়ে গেলেই রুটিগুলো সব দুইজনে ভাগ করে রাতের আহার হিসাবে গ্রহণ করবে।

তার পরে মধ্যরাত্রে সোজা বেরিয়ে আসবে। কাগজপত্র কিছু আনার দরকার নেই, সেসব আর বাকি যা জিনিসপত্র আছে সব ফেলে নিজেরা বেরিয়ে আসবে, বেরিয়ে সোজা পশ্চিমের দিকে চলতে থাকবে। আমাদের কর্মী কয়েকজন থাকবে, তারা তোমরা নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার পরে তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সোজা পশ্চিমে চলতে-চলতে তোমরা একটি টিলা দেখতে পাবে, সোজা টিলাটিতে উঠবে, পার হয়ে অন্য দিকে নামবে। সেখানে দেখতে পাবে বিশাল এক প্রান্তর, লম্বা-লম্বা দেবদারু গাছ সেই মাঠে। গাছগুলোর পাশ দিয়ে পায়েচলা পথ গিয়েছে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট গোলমতো ঘাসে ঢাকা জায়গায়। পাথর দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। সেইখানে তোমরা অপেক্ষা করবে। আমি সেইখানেই আসব তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমার সঙ্গে আরও দু'জন সহকর্মী থাকবেন। আমরা তোমাদের নিয়ে যাব তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট পথে, সেই পথ দিয়ে তোমরা গন্তব্যে পৌঁছবে।

এইখানে চিঠি শেষ করছি। তোমাদের জন্য ভালবাসা ও শুভেচ্ছা।

ইতি

ঋতবস্তু"

আবার আমরা নীরবে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করি। অদ্ভুত এই চিঠি, কিন্তু এর অর্থ একদম পরিষ্কার। এখন প্রশ্ন হল আমরা কী করব? বিশ্বাস করে এগিয়ে যাব? এটা যে কোনও ফাঁদ নয়, তারই বা ঠিক কী?

অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে যায়, সেই যখন আমরা আনুমায় থাকি, মুইনুখের বাজারে প্রথম দেখা হয়েছে ঋতবস্তুর সঙ্গে, উনি ওঁর পরিচয়লিপি সম্বলিত ছোট্ট ফলকটি আমাদের দিয়ে বলেছেন কোন অতিথিনিবাসে উনি আছেন। আমরা যেন সেখানে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করি। তখনও তো আমাদের শুধু বিশ্বাস করেই এগিয়ে যেতে হয়েছিল সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে। আমাদের দিক থেকে নিঃসন্দেহ হওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না, আমাদের তেমন কোনও চেনাজানাজন কোথাও ছিল না যারা ঋতবস্তুর স্তরের মানুষদের খবরাখবর রাখতে পারে।

সেই কথা দু'জনেরই মনে পড়ে যায়, হেসে ফেলি আমরা। বুঝতে পারি সেদিন যেমন অজানায় পাড়ি দিয়েছিলাম বিশ্বাস করে, আজও তাই করতে হবে আমাদের। এখন তো আমরা আরও আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়েছি। সেদিন হয়তো সুযোগ অস্বীকার করে আনুমায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তবু নেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু এখন এই চিঠির নির্দেশ অমান্য করা শতগুণ অসম্ভব। তা ছাড়া নিজেদের জন্য বহু সংখ্যক অন্য মানুষকে বিপদে ফেলাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

নীরবে দু'জনে-দু'জনের দিকে চেয়ে হাসতে থাকি, আস্তে-আস্তে হাসির মধ্যে কুচি-কুচি বিষাদ মিশে যায়। মানুষের জীবনে এত শত প্যাঁচ আর গ্রন্থি কেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাতের খাওয়ার জোগাড় করি। রান্নাবান্না কিছুই তেমন ছিল না, শুকনো কিছু মিষ্টি ছিল শুধু। গেলাসে-গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে থালায় ওই মিষ্টি আর এই সাংকেতিক রুটিগুলো বেড়ে নিই দু'জনে। অন্যদিন খেতে-খেতে আমরা গল্প করি, আজকেও চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আর গল্প জমছিল না। উদ্বেগ আর অজানার ভয় সামনে নিয়ে কি আর মন শিথিল করা যায়?

কোনও রকমে খেয়ে উঠে বাসনপত্র এক কোনায় সরিয়ে রেখে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি একটু বিশ্রাম করতে। ঘুম তো আজকে আসবে না, শুধু একটু চোখ বুজে নেওয়া আরকী।

প্রতিষ্ঠানের মিনার থেকে প্রহরে-প্রহরে ঘণ্টা বাজে, মধ্যরাত্রে বাজে ঠিক বারোটা ঘণ্টা। ওই ঘণ্টা শুনলেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

শুয়ে-শুয়ে বিছানায় হাত বোলাই। ঘুটঘুটে অন্ধকার তো নয়, বাইরের জ্যোৎস্না, সেই আলো নানা ফাঁকফোঁকড় দিয়ে এসে পড়ছে। সেই আলো-আঁধারিতে চেয়ে-চেয়ে দেখি ঘরের দেওয়ালগুলো, তাকগুলো। এই এক বছরে ছোটখাটো কত শখের জিনিস, ঘর সাজানোর জিনিস সব জমা হয়েছে আমাদের ঘরে।

একমুহূর্তে এইসব পিছনে ফেলে চলে যেতে হবে। ঋতবন্তের পাঠানো লোকেরা এই ঘরদুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেবে সব প্রমাণ লোপাট করতে, অগ্নি গ্রাস করে নেবে সব। একথা ভাবতেই অদ্ভুত মায়ায় ভরে যায় মন।
মায়া করেই বা কী হবে? এ তো মনে-মনে জানাই ছিল, একদিন সব ছেড়ে যেতে হবে।
হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে ছ্যাঁকা লাগার মতো লাফিয়ে উঠি বিছানা থেকে। আমাদের ঘরের ঘুলঘুলিতে আশ্রয় নেওয়া পাখি দুটোর কথা মনে ছিল না এতক্ষণ!
আরেনুশও উঠে বসেছে, বেশ উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হল, ওরিয়ানা?"
আমি শুকনো গলায় কোনও রকমে বলি, "আরেনুশ, আমাদের পাখি দুটো? আমরা চলে গেলে ঘরে দুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেবে ওই ঋতবন্তের লোকেরা, কিন্তু পাখি দুটোর কী হবে?" অদ্ভুত ভয়ে আর কষ্টে আমার স্বর কেমন বদলে গিয়েছে তখন।
আরেনুশ আমাকে সান্ত্বনা দেয়, বলে, "পাখিদের সহজাত অনুভূতি আমাদের থেকে অনেক বেশি সূক্ষ্ম। ওরা আগুনের তাপের আভাস পাওয়ামাত্র উড়ে চলে যাবে। আর, ওদের বাসায় তো ডিম বা ছানা নেই, তুমি শুধু-শুধু ভয় কেন পাচ্ছ?"
ও যাই বলুক, আমার ভয় যায় না। বিছানা ছেড়ে মাঝের ঘরটায় আসি। জ্যোৎস্নামাখা ঘুলঘুলির বাসায় পাখি দুটো চুপটি করে বসে আছে, ডানায় মুখ গোঁজা, ওরা হয়তো ঘুমাচ্ছে।
আরেনুশ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাত বাড়িয়ে আমাকে বেষ্টন করে কানে-কানে বলল, "ওদের বলে দাও যে আমরা চলে যাচ্ছি আর একটু পরেই।"
আমার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে তখন, মায়ায়, দুঃখে, ভালবাসায়। দু'জনেই একসঙ্গে এগিয়ে যাই ঘুলঘুলির দিকে একটু, মুখ তুলে দেখি ঘুমন্ত পাখি দুটোকে। কোথা থেকে এসেছিল ওরা কে জানে! আবার কোথায় চলে যাবে কে জানে!
একটা পাখি প্রথমে জেগে উঠল, ডানা থেকে ঠোঁট তুলে একটু এগিয়ে এসে আস্তে করে ডাকল। হয়তো কিছু বলল। কিন্তু আমরা তো ওর ভাষা বুঝি না। যে বোঝে, সে শোনামাত্র জেগে উঠল। অন্য পাখিটা। সেও ঘুলঘুলির এইধারের দিকে এগিয়ে এসে গলা বাড়িয়ে আমাদের দেখল।
আরেনুশ বলছিল, আমাদের মাতৃভাষাতে, "আমরা চলে যাচ্ছি রে। আর একটু পরেই চলে যাব। তোরাও চলে যাবি, তোদেরও চলে যেতে হবে। ভাল থাকিস তোরা। আবার কোনওদিন হয়তো আমাদের সঙ্গে দেখা হবে তোদের।"
আমি অবাক হয়ে আরেনুশের দিকে চেয়ে ছিলাম, ওই ঘুলঘুলি দিয়ে আসা জ্যোৎস্নায় ওর আবছা মুখ দেখছিলাম আর দেখছিলাম ওর চোখ চিকচিক করছে।
পাখি দুটো পাশাপাশি বসে আমাদের চুপ করে দেখছিল। কে জানে ওরা কী বুঝছিল।
আমরা আর ঘুমোতে গেলাম না, মেঝেতেই বসে রইলাম।
একসময় দূর থেকে ভেসে এল মাঝরাত্রির ঘণ্টাধ্বনি ঢং ঢং ঢং...ঠিক বারো বার বেজে থামল।
দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। জ্যোৎস্নাশিহরিত শান্ত রাত্রি বাইরে। কে বলবে এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এত ভয়, এত অনিশ্চয়তা, এত পলায়নচেষ্টা, এত আগুনসম্ভাবনা?
আমাদের তো কিছু নেওয়ার কথা নেই, ঝাড়া হাত-পায়ে দ্রুত পশ্চিমের দিকে চলতে শুরু করি। হঠাৎ দেখতে পাই সেই সাদা পাখি দুটো আমাদের আগে-আগে উড়ে চলেছে, যেন পথ দেখিয়ে। আনন্দে পরস্পরের হাত চেপে ধরি আমরা।
অনেক দূরে গিয়ে পিছন ফিরে দেখি আগুনের দীপ্তি দেখা যায় অন্ধকার ভেদ করে, আমাদের ফেলে আসা ঘর জ্বলছে দাউ দাউ। আমরা পশ্চিমের দিকে আরও দ্রুত চলা শুরু করি। পাখি দুটো আমাদের সামনে সামনে উড়ছে। ওরা কি তবে এইজন্যেই এতদিন আমাদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল?
আরও-আরও দ্রুত যেতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব পার হয়ে যেতে হবে চেনা বসতির সীমানা। আমরা হালকা পায়ে এইবারে দৌড়তে থাকি। দেখতে-দেখতে পার হয়ে যাই বসতির সীমানা। এইবারে কী? শুধু পশ্চিম দিকে যাওয়ার পথনির্দেশটুকু জানি।
দ্রুত পায়ে চলতে-চলতে দেখতে পাই টিলা, এই টিলাটাই পার হওয়ার কথা ছিল চিঠিতে। আমরা টিলায় উঠতে শুরু করি। পাখি দুটো বাতাসে ডানা ছড়িয়ে ভেসে চলেছে আমাদের উপরে-উপরেই। টিলায় উঠেই দেখতে পাই অন্য দিকে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঠিক যেরকম লেখা ছিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমরা টিলার গা বেয়ে ওই মাঠের দিকে নামতে শুরু করি।

{১৫}

একটু-একটু হাঁপ ধরছিল এতখানি চড়াই উঠে আবার একটুও না থেমে উতরাই পথে নামতে। আরেনুশ আমার হাত ধরল। দু'জনেই হাঁপিয়ে শ্বাস টানছিলাম, একটু থেমে সামান্য বিশ্রাম নিলাম। তার পরে দু'জনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম।
আমি জানি দু'জনেই ভাবছিলাম, "কী অবস্থা আমাদের! ভাল করে জানা নেই শোনা নেই যাকে, তার একটা কী সঙ্কেত পাওয়ামাত্র ঘরবাড়ি কাজকর্ম নিশ্চিত ভবিষ্যৎ সব একনিমেষে পিছনে ফেলে বেরিয়ে এসেছি মাঝরাত্রে। বিশ্বাসের কি এতটা জোর হতে পারে? নাকি মনে-মনে আমরা জানি এ না করে উপায় নেই আমাদের?"
দ্রুতপায়ে আবার নামতে থাকি, তারপর আর একটু হাঁটতেই পৌঁছে যাই সেই বিশাল প্রান্তরে।
লম্বা-লম্বা দেবদারু গাছে ভরা এই প্রান্তর, গাছগুলোর পাশ দিয়ে চলা এক সরু পথ। সেই পথ দিয়ে এগোই আমরা। আকাশে ভরপুর জ্যোৎস্না। আকাশে প্রায় পূর্ণ চাঁদ, আশ্চর্য মায়াবী আলোয় চরাচর ধুয়ে যাচ্ছে।
প্রান্তরের দেবদারুর সারি পার হয়ে এক জায়গায় একটু খালি জায়গা, ঘাসে ঢাকা একটা গোল মাঠের মতো। সেইখানে এক অদ্ভুত বড় গোল পাথর, বড়টাকে ঘিরে আরও তিন-চারটে ছোট-ছোট গোল পাথর। চাঁদের আলোয় নীল মনে হচ্ছে পাথরগুলোকে। এই জায়গাটার কথাই তো লেখা ছিল চিঠিতে! নাকি এইরকম জায়গা আরও আছে?
আমরা একপাশের একটা গোল পাথরের কাছ ঘেঁষে বসে পড়লাম হাঁটু মুড়ে। মনে-মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক সংশয়, কিন্তু কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়ার উপায় নেই, কোনও সংশয়েরই নিরসন এখন হবে না। আমাদের কেবল অপেক্ষা করতে হবে।
রাত বাড়ছে, ঝিঁঝির ঐকতান ঢেউয়ের মতো উঠছে আর নামছে। চাঁদ আর তারারা ঢলে পড়ছে পশ্চিমে, নতুন তারারা উঠে আসছে পুব দিগন্তের আড়াল থেকে।
পাখি দুটো বসে আছে একটা ঝাউগাছে, ওরা একদম চুপ। আমাদেরই মতো অপেক্ষা করছে ওরা। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?
কোথা থেকে যেন বাঁশির সুর উঠে আসে ঝিঁঝির ঐকতান ছাপিয়ে। একটুখানি বেজেই থেমে যায়। ঠিক তখনই দেবদারু গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এইদিকে এগিয়ে আসতে থাকে তিনজন মানুষের অবয়ব। সর্বাঙ্গঢাকা আলগা জোব্বার মতো পোশাক তাদের। আরও

কাছে না এলে চেনার কোনও উপায় নেই। বুক ঢিবঢিব করে আমার, আরেনুশের হাত চেপে ধরি শক্ত করে। সেও আমার হাতে পালটা চাপ দিয়ে সাহস জোগায়। ওদের মধ্যে কি সত্যিই আছেন ঋতবন্ত সুমিন্তোস, নাকি পুরোটাই একটা জটিল ফাঁদ? ওহ, উদ্বেগে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়, কিন্তু উপায় নেই, সহ্য করতেই হবে এই অনিশ্চয়তা।

ওরা আরও কাছে আসার পর চিনতে পারি ঋতবন্তকে। ঋতবন্তের মুখ দেখেই মনটা শান্ত হয়ে গেল। কতদিন পরে দেখা। সে-এ-এ-ই দূর মুইনুখে দেখা হয়েছিল আমাদের, এতদিন পরে আবার এখানে, এই জ্যোৎস্নারাত্রে, এই রহস্যময় প্রান্তরে। কতটুকুই বা চিনি ওঁকে, কতটুকুই বা জানি! অথচ কেন যেন ওই মুখ দেখে, ওই হাসি দেখে ভাল লাগে, ভয় দূর হয়ে যায়। যেন গতজন্মের প্রিয় মুখ, এগিয়ে এসেছে নতুন জীবনে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে।

আমি আর আরেনুশ এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে সম্মান জানাই। সম্মান জানাই অন্য দু'জনকেও। ঋতবন্ত পরিচয় করিয়ে দেন ওঁদের সঙ্গে, ওঁদের নাম সমশ আর তানিক। আমাদের নামও জানিয়ে দেন ওঁদের। পরিচয়পর্ব সংক্ষিপ্তই হয়, আমাদের এখনই যেতে হবে। ওঁদের কথামতো আমরা এগোতে থাকি ওদের সঙ্গে, প্রথমে সমশ, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঋতবন্ত আর আমাদের পরে আসছেন তানিক।

গোল মাঠ থেকে বের হয়ে আবার দেবদারু গাছগুলোর পাশ দিয়ে সংকীর্ণ পায়ে চলা পথ। আস্তে-আস্তে ঝোপজঙ্গল বাড়তে থাকে, এখন শুধু দেবদারু না, আরও নানা রকম গাছপালা আর লতাপাতা চারিপাশে। হঠাৎ উপরে চেয়ে দেখি। সেই পাখি দুটো আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে-চলতে হঠাৎ আমাদের সামনে ঘন গাছের জটিলতা পরিষ্কার হয়ে এক সুবিশাল খোলা মাঠ দেখা দেয়। সেই খোলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক মহামহীরুহ, তার ডালপালা ছড়িয়ে গিয়েছে চারিপাশে অনেক অনেক দূর অবধি। ডালপালা নেমেও এসেছে মাটির কাছাকাছি। রহস্যময় সেই গাছের দিকে যতই আমরা অগ্রসর হতে থাকি, ততই অদ্ভুত এক অনুভূতিতে গায়ে কাঁটা দেয়। ভয় নয়, আনন্দ নয়, শীত নয়, কীসের যেন অজানার শিহরন।

মহামহীরুহের পাতায়-পাতায় জ্যোৎস্না ঝলকাচ্ছে। মাটিতে আলোছায়ার জাফরিকাটা। হালকা হাওয়ার হিল্লোলে কেঁপে-কেঁপে নেচে-নেচে উঠছে সেই আলোছায়ার নকশা।

গাছের মূল কাণ্ডটা ঘিরে ঘন হয়ে মাটিতে নেমে এসেছে বাঁকাচোরা বড়-বড় শাখাপ্রশাখা, গর্ভগৃহের মতো আড়াল করে রেখেছে জায়গাটা। এইখান পর্যন্ত এসে ঋতবন্ত, তানিক আর সমশ দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়েছি। সাদা পাখি দুটো উড়ে গিয়ে বসেছে গাছের ডালে। সব স্তব্ধ এখন, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত কোনও শব্দ নেই। যেন এক মহা মুহূর্ত সমাগত, জড়, চেতন সবাই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে সেই মুহূর্তটির জন্য।

নৈঃশব্দের বুক ভেদ করে আবার বেজে উঠল সেই আশ্চর্য সুর, বাঁশির সুর। বাঁশির সেই সুর হালকা ঢেউয়ের মতো যেন কাঁপিয়ে তুলছে সব, জড় চেতন সবকিছু। ওই জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দুলে উঠছে, এই রাত্রির ঠান্ডা-ঠান্ডা বাতাস যা এতক্ষণ চুপ ছিল, ওই সুরে সাড়া দিয়েই যেন আবার নেচে উঠল।

ওই সুর যেন সংকেত এক। বাঁশি নীরব হতেই মহাবৃক্ষের কাণ্ডের প্রধানে শাখাপ্রশাখা নেমে জটিল করে রেখেছে, সেই ছায়াময় জায়গাটা থেকে অদ্ভুত জাদুর মতো বের হয়ে এল দু'জন ব্যক্তি। তাদের গায়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা লম্বা আলগা জোব্বার মতো পোশাক। কিন্তু এবারে এই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নারী, একজন পুরুষ।

হাসিমুখে তাঁরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঋতবন্ত, সমশ আর তানিক পরিচিতের মতো হাসলেন তাঁদের দিকে চেয়ে। তার পরে আমাদের পরিচয় দিলেন ওঁদের। আমাদেরও জানালেন ওঁদের নাম, নীলক আর সম্মা।

আমাদের দিকে ফিরে ঋতবন্ত বললেন, "ওরিয়ানা, আরেনুশ, এইবার তোমাদের যেতে হবে এঁদের সঙ্গে। ওরিয়ানাকে নিয়ে যাবেন সম্মা আর আরেনুশ, তুমি যাবে নীলকের সঙ্গে। আমাদের তিনজনের সঙ্গে এবারের মতো বিদায়। পরে আবার দেখা হবে।"

আমাদের বিদায় জানিয়ে ঋতবন্ত, সমশ আর তানিক ফিরে চললেন জ্যোৎস্নাধৌত সেই মাঠের উপর দিয়ে। ওই পথ দিয়েই এসেছিলাম আমরা। ওঁরা ফিরে চললেন, আমাদের ফেরার কথা নেই, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে অজানার দিকে। সম্মা কাছে এসে আমার হাত ধরলেন,

Invest Mart

শেয়ার মার্কেট ট্রেনিং করে
Govt. Certificate + চাকুরী
Income 10-12,000/-
ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা
H.S. বয়স-18-30yrs.

বহিরাগতদের জন্য আলাদা Batch এর সুব্যবস্থা আছে
Duration 1 - 6month
চাকুরীর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি Investmart দেয় না।
কলকাতায় এই প্রথম অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে শেয়ারের উন্নত প্রশিক্ষণ
পেশাদারী প্রশিক্ষণ নিন
Practical with live Software
ক্লাসের মধ্যেই রেকর্ডিং - এর সুব্যবস্থা
AC, Wi Fi Campus
Be an Independent Investor
Free
Account opening
Trading Software
Back office Software
Trade on smart phone, Tablets
Technical Support
INVESTMART
4 Fairlie Place,
4th Floor, Kolkata-700001
(Beside Reserve Bank, Opposite Fairlie Railway Reservation Centre, Near Millenium Park)
www.investmartkolkata.com
9331235472
9681224863

নীরবে আলতো করে মাথা দুলিয়ে জানালেন যেতে হবে। নীলক আরেনুশের কাঁধে হাত রেখেছিলেন, উনি ওকে নিয়ে যাবেন।
আমি খুব মৃদু গলায় বললাম, "আমরা একসঙ্গে যেতে পারি না? সেরকম কোনও ব্যবস্থা নেই?"
নীলক নিরাবেগ কিন্তু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, "না ওরিয়ানা, এখানে যার-যার নিজের পথে চলা ছাড়া উপায় নেই। এ পথ সাধারণ পথ নয়, প্রতিটি ভিন্ন-ভিন্ন মনের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন পথ। একের পথ অন্যের জন্য খোলে না। এমনকী আমরাও শুধু রওনা করিয়ে দেব মাত্র, যেতে হবে তোমাদের একা-একাই।"
বুঝতে পারলাম সত্যিই একসঙ্গে যাওয়ার উপায় নেই। এই পথও মনে হচ্ছে একেবারেই অন্য ধরনের পথ।
ভয় হবে ভেবেছিলাম কিন্তু কেমন ঠান্ডা, বিষণ্ণ, একাকিত্বে ভরে গেল আমার ভিতরটুকু। আরেনুশের দিকে ফিরে তাকালাম, ম্লান হেসে মাথা কাত করে বিদায় জানালাম। সেও ওইভাবেই বিদায় জানাল।
আস্তে-আস্তে আমার ঠোঁট নড়ে উঠল, মৃদুস্বরে বললাম, "পৌঁছে দেখা হবে। ভালভাবে যেও আরেনুশ, তোমার যাত্রা শুভ হোক।"
ওরা চলে গেল গাছের কাণ্ডের ডান দিকে, ছায়ার ভিতরে, যেন মিলিয়ে গেল। সম্মা আমাকে নিয়ে গাছের কাণ্ডের বাঁ দিকে চললেন।
ডালপালা, লতাপাতা হাত দিয়ে আলতো সরিয়ে সম্মা দেখালেন

পাখি দুটো বসে
আছে একটা
ঝাউগাছে, ওরা
একদম চুপ।
আমাদেরই মত
অপেক্ষা করছে ওরা।

একটা বেশ বড় গোলমতো কঠিন পাথর পড়ে আছে মাটিতে। উনি আশ্চর্য কোমল মায়াময় স্বরে আমাকে বললেন, "ওরিয়ানা, এই পাথর একমাত্র তুমি ঠেললেই সরে যাবে, তখন দেখতে পাবে এটা একটা সুড়ঙ্গের মুখ। ধাপে-ধাপে পাথরের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নীচে। তোমাকে সেই পথে সোজা নেমে যেতে হবে। ভিতরে অন্ধকারে দেখার জন্য একটা বাতি দেব তোমায়, সেই বাতি কেবল তুমি ভিতরে নামলেই তবে জ্বলে উঠবে, এখানে জ্বলবে না। তুমি নেমে গেলেই সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ হয়ে যাবে, এই পথে আমি প্রবেশ করতে পারব না। শুধু আমি না, আর অন্য কেউই পারবে না। এ অভিযাত্রাটি একান্ত তোমার। একদম ভয় পেও না, বাতির আলোয় সোজা এগিয়ে যাবে। পথ তোমাকে সেই দেখাবে যে তোমাকে চায়। সুড়ঙ্গ যখন শেষ হবে তখন দেখবে সূর্যনগরীতে পৌঁছে গিয়েছ।"
আমি চুপ করে শুনছিলাম, সম্মা নিজের কাঁধে ঝোলানো পেটিকা থেকে বের করলেন একটি ছোট গোলাপফুলের মতো দেখতে জিনিস। মনে হল স্ফটিকের তৈরি, ভিতরে সামান্য একটু যেন আলোর আভা।
উনি হাত বাড়িয়ে জিনিসটা আমার হাতে দিয়ে হাতের মুঠি বন্ধ করে দিলেন। তার পরে আলতো করে কপালে চুম্বন করে কী যেন বললেন, সেই ভাষা বুঝলাম না। কিন্তু মনে হল আশীর্বাদ করলেন। তার পরে আমার চেনা ভাষায় বললেন, "ভয় পেও না ওরিয়ানা, সেই যারা পৃথিবীকে রক্ষার চেষ্টা করছেন আচ্ছন্নতা আর অবসাদ থেকে, তাঁদের আশীর্বাদ তোমার সঙ্গে আছে। ওই পাতাল পথে চলতে-চলতে তোমার নানা চৈতন্যময় অভিজ্ঞতা হবে, সবই তোমার স্মৃতিতে থেকে যাবে। তোমার বন্ধু আরেনুশেরও তার পথে নানা অভিজ্ঞতা হবে। তোমার ও তোমার বন্ধু আরেনুশের অভিজ্ঞতা কখনও মিলে যাবে, কখনও ভিন্ন হবে। সূর্যনগরীতে পৌঁছে তোমরা যখন আবার পরস্পরকে ফিরে পাবে তখন অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিতে পারবে।"
স্ফটিক-গোলাপটি সাবধানে কোথাও গুঁজে রাখতে হবে। হাত দুটো মুক্ত থাকা দরকার। কোথায় রাখি? ভাবতে-ভাবতে গলার উত্তরীয়টি খুলে কোমরে জড়িয়ে বেঁধে নিই, ওর ভাঁজের একপাশে গুঁজে নিই স্ফটিক-গোলাপ। সম্মা স্মিত হাসিমুখে দেখছিলেন, এখন মাথা হেলিয়ে নীরবে জানান, সব ঠিক আছে।
মাটিতে পড়ে থাকা বড় গোল শিলাখণ্ডের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে বসি। তার পরে দুই হাতে ঠেলা দিই যত দূর জোরে পারি। ঠেলা দিয়েই মনে হল এত জোর দেওয়ার দরকার ছিল না, মসৃণভাবে গড়িয়ে সরে গেল পাথর। স্ফটিক-গোলাপের ভিতরের মৃদু আলোটি ততক্ষণে একটু জোরালো হয়েছে, সেই আলোয় দেখা গেল ধাপে-ধাপে পাথুরে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে।
উঠে দাঁড়াই, সম্মার দিকে একবার তাকাই। সম্মা স্মিতমুখে আমাকে ইঙ্গিত করেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে। আমি পা বাড়াই সিঁড়ির দিকে। সম্মা ডান হাতের পাতা তুলে অভয়ের ভঙ্গি করে বলেন, "যাত্রা শুভ হোক।"
এই অন্ধকার অজানা সুড়ঙ্গে শুধু আত্মবিশ্বাস সম্বল করে নেমে যেতে হবে। এরকমই কোনও পথে হয়তো এতক্ষণে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে আরেনুশ।
সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখি, তার পরে পরের ধাপ, তার পরে তার পরের ধাপ। দেখতে-দেখতে নেমে আসি অনেক নীচে, সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ হয়ে যায় পিছনে।

{১৬}

অন্ধকার, এখন এক বিপুল অন্ধকার আমাকে ঘিরে। রহস্যময়, স্পন্দিত অন্ধকার। যেন এ শুধুই পাথুরে সুড়ঙ্গ নয়, যেন এ চৈতন্যময়। আমার সঙ্গে যেন কথা বলতে চায় স্পন্দনের ভাষায়। এ অন্ধকার যেন রহস্যময় মাতৃগর্ভের মতো অন্ধকার।
কোমরে গুঁজে রাখা স্ফটিক-গোলাপটি হাতে নিই। গোলাপের প্রতিটি পাপড়ি আস্তে-আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, লাল আর গোলাপি আলোয়। সেই আলোয় দেখতে পাচ্ছি একটা পথ, কঠিন পাথুরে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে পথ চলে গিয়েছে সর্পিল ভঙ্গিতে, মাঝে-মাঝে আরও জটিল বাঁক আছে।
মন থেকে ভয় কেমন করে জানি দূর হয়ে গিয়েছে। পায়ে-পায়ে আমি এগিয়ে চলেছি ছোট্ট এই জ্যোতির্ময় গোলাপের আলোয়। আস্তে-আস্তে আমার চলার ছন্দ মিশে যায় কোনও এক অচেনা ছন্দের সঙ্গে, আমার সচেতন মন থেকে মিলিয়ে যায় এই হাঁটার ব্যাপারটা। আমার দেহ চলতে থাকে স্ফটিক-গোলাপের আলোর দেখানো পথ দিয়ে আর আমার মন উন্মুখ হয়ে থাকে অন্য কিছুর জন্য।
ধীরে-ধীরে মনের চোখের সামনে ছবি ফুটে ওঠে, অন্য সময়ের ছবি, অন্য মানুষদের ছবি। কিন্তু ওদের কখনও না দেখলেও একাত্মতা অনুভব করি। যে পৃথিবী আমি দেখিনি, যে সভ্যতা আমার জন্মের বহু আগেই তলিয়ে গিয়েছে প্রলয়বন্যায় ও বিস্মৃতিতে, সেইসব উঠে আসতে থাকে আজকে

এই আশ্চর্য পথযাত্রায়।

প্রথমে দেখি এক অদ্ভুত মানুষকে, একদম একলা নিঃসঙ্গ একটি মানুষ। দীর্ঘদেহ এক প্রৌঢ়। নিঃসঙ্গ কিন্তু দিশাহারা বা দুঃখী নয়, সবল, শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসে জ্বলজ্বল করছে তার চোখ দু'টি। হেমন্তের অরণ্যে বাদামি রং ঝরাপাতার স্তূপের উপরে বসে আছে সেই মানুষটা, ওর রুক্ষ চুলে ধুলোটে রং. ওর ছেঁড়া জোব্বায় দূরবিসর্পী পথের ইতিহাস লেগে আছে ধুলো কাদা কাটাকুটোর নকশা হয়ে। কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালালো সে, ছোট্ট-ছোট্ট ফুলকি উড়ে যাচ্ছে...আগুনের মাঝখানে সে নামিয়ে দিল একটা শুকনো ডাল, খয়েরি ঝোলা থেকে বের করে আগুনে দিল একমুঠো ধূপ, সুগন্ধ উড়ে যাচ্ছে হেমন্তসন্ধ্যার ঘন বাতাসে...
মানুষটার সোনালি চোখের তারায় আলো জ্বলছে, সে দেখতে পাচ্ছে ঘূর্ণিবাতাসে ওড়া অসংখ্য মুখ, হালকা নরম কচি মুখ, ঝামাটে হয়ে যাওয়া প্রবীণ মুখ, শিকারি বাজের মতো নিষ্ঠুর মুখ, শিমুলতুলোর মতো কোমল মুখ, মুখের সারি ভেসে যাচ্ছে অন্তহীন। হঠাৎ সে দেখল কবরখানা, শক্ত বরফে ঢাকা আদিগন্ত বিস্তৃত ভূমি, পুরোটা জুড়ে শুধু কবর আর কবর, যত দূর চোখ যায়...শুধু চ্যাটালো চৌকো-চৌকো পাথর, কোথাও-কোথাও শুকনো ফুল। অনন্ত মৃত্যুপ্রান্তরে কোথাও কেউ নেই, কেউ না, কেউ না, জনপ্রাণী নেই কোথাও...
তার পরেই দেখল ওই তো কারা আসছে, তীব্র লাল রং ওর চোখ ঝলসে দিল হঠাৎ, অযুত নিযুত মানুষ হেঁটে আসছে, টকটকে লাল পোশাক ওদের সবার। সে মুখ দেখতে চায়, ওদের মুখ দেখতে চায়, ওরা কারা, ওরা তরুণ না প্রৌঢ় না বৃদ্ধ, ওরা নর না নারী, ওরা বাবা না মা না পুত্র না কন্যা? ওরা কি কারও ভাই কারও বোন? কারওর মুখ সে দেখতে পায় না, শুধু অনন্ত লাল রং মিছিল চলে তুষারপ্রান্তর জুড়ে, অন্তহীন স্পন্দিত রক্তের মতো...
জোব্বাপরা লোকটি আগুনে আরও কাঠ দেয়, আরও কাঠ দেয়, তার পরে ঝোলা থেকে বের করে লম্বা হাড়সুদ্ধ এক দীর্ঘ মাংসখণ্ড, শক্ত আর শুকনো, সে আস্তে-আস্তে আগুনে ঝলসায় সেটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে, ক্ষুধার্তের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতে থাকে দগ্ধ মাংসের রুচিকর ঘ্রাণ...
সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর এখন, জোনাকিরা জ্বলছে আগুনের ফুলকির মতো, কুলায়প্রত্যাশী পাখিরা কিচিরমিচির করে নিচ্ছে রাত্রির আশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে...মাংসে কামড় বসায় মানুষটা, আরামের একটা শব্দ করে, আগুনের আভায় সে কল্পনায় দেখছে সোনালি ঈগল ওড়ে রোদ্দুরে...
এই হেমন্ত অরণ্য আর একলা মানুষটি মিলিয়ে যায় এর পরে। দেখতে পাই এক তৃণ রোমাঞ্চিত সবুজ প্রান্তর, অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নানা রঙের ঘাসফুলে একেবারে পূর্ণ। কত মৌমাছি আর ভ্রমর যে উড়ে বেড়াচ্ছে ফুলে-ফুলে! আনন্দময় এক বসন্ত অপরাহ্ন।
সেই মাঠ দিয়ে আসছে দু'জন মানুষ। একজন সাদা চুল সাদা দাড়ির এক বৃদ্ধ মানুষ, আর-একজন এক কাজলনয়না কিশোরী মেয়ে। ওরা কথা বলছে চলতে-চলতে। মাঠের একপাশে নদী, ওরা নদীর তীর বরাবর হেঁটে আসছে। হয়তো গ্রামে ফিরছে।
চলতে-চলতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করে, "তোমার কী ভাল লাগে, কাজলমেয়ে?"
কাজলমেয়ে বোঝা নামিয়ে একটু দাঁড়ায়, চুলে পরা লাল ফুলের মঞ্জরীতে হাত বোলায় নরম করে, তার পরে কোমল দৃষ্টি মেলে তাকায় বৃদ্ধের মুখের দিকে, বলে, "ভাল লাগে তিরতির করে বয়ে যেতে থাকা জলের শব্দ, খুশি-খুশি সবুজ ঘাস, আর রোদপোহানো পাথরের পাশ দিয়ে যা বয়ে যায়, ভাল লাগে শরতের উজ্জ্বল দিনে ফড়িং-প্রজাপতিদের লীলাময় ওড়াউড়ি দেখতে।"
বুড়োমানুষটা হাসে, বলে, "কারওকে কখনও বলেছ এসব?"
কাজলমেয়ের উজ্জ্বল চোখে ছায়া পড়ে আসে, সূর্যের উপরে মেঘ এসে পড়ে যেমন আবছায়া পড়ে, তেমন। মাথা নেড়ে বোঝায় বলেনি কারওকে।
"কেন?" বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে।
মেয়েটা উত্তর দেয় না, চুপ করে চেয়ে থাকে দূর দিগন্তের দিকে, ওই দূরে যেখানে আর-একটু পরেই সূর্যাস্তের হোলিখেলা আরম্ভ হবে। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করে দিয়ে বোঝা তুলে নেয় ফের, চলতে শুরু করে।
বৃদ্ধ এখনও ওর পাশে পাশে, বলে, "তুমি কিন্তু বলো নাই গো মেয়ে যে কেন এইসব কথা কারওকে বলো নাই।"
খুব আস্তে-আস্তে মেয়েটা বলে, "কী হবে এসব বলে?"
বুড়োমানুষটা হাসে, "কিছুই হবে না, তবু তো মানুষে মানুষকে বলে অনেক কথাই।"
কাজলমেয়ে ঝেঁঝে ওঠে, "না। এই ভাললাগাগুলিন কখনও কাউকে বলা যাবে না, এগুলোর মর্ম আজ আর কেউ বোঝে না, বুঝত যারা, তারা কেউ আর বেঁচে নেই। আর মর্ম না বুঝলে কী মানে থাকে এসব কথার? হাসিঠাট্টার বস্তু হয়ে যায়। একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে যায় সেই শ্রোতার কাছে, যদি এই কথাগুলোর ভিতরের মানে সে হৃদয় দিয়ে বুঝতে না পারে।"
"ঠিকই বলেছ মেয়ে। আমি তবু বলেছিলাম, মানুষে শোনে নাই, প্রথমে ঠাট্টা করেছিল, পরে রেগে গিয়েছিল, খেপে গিয়েছিল তবু বলেছিলাম। শেষে ওরা সবাই মিলে আমারে মেরে ফেলল।"
অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সেই মেয়ে, ওর গভীর কালো চোখের তারায় বিস্ময় ও বেদনা টলটল করে, ও তাকিয়ে দেখে বুড়োমানুষটার সাদা জোব্বা, সাদা লম্বা দাড়ি আর সাদা চুলের দিকে আর সমুদ্রের ফেনার মতো সাদা ওর হাসির দিকে, ফিসফিস করে বলে, 'বুড়া, কারা তোমাকে মেরে ফেলল? ওদের কী বলেছিলে তুমি?"
সাদা দাড়ি সাদা চুলের হাসিমুখ বুড়া বলে, "ওদের এই তো বলেছিলাম, বলেছিলাম নদীরা তোমার বোন, পাহাড়েরা তোমার ভাই, গাছ ও পশুপাখি তোমার আত্মীয়, এই পৃথিবী তোমাদের মা, ওদের ভালবেসো, ওদের যত্ন কোরো। ওরা মানল না, ওরা বলল, না-না, আমরা অনেক সোনা চাই, আমরা অনেক হিরামানিক চাই, অল্পে আমাদের সন্তুষ্টি নেই। আমরা পৃথিবীর বুক খুঁড়ে তুলে আনব সব সোনা, সব হিরামানিক। বুড়া, তোমার কথা আমরা মানি না, তোমাকে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ভাসিয়ে দেব নদীর জলে।"
বুড়ো বলতে-বলতে তাকায় নীচের দিকে, তিরতির করে জল বয়ে যাচ্ছে পাথরে-পাথরে কথা বলতে-বলতে।
কাজলমেয়ে যে বুড়োর মুখ থেকে চোখ সরায় না, ওর গভীর কালো চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। সে মোছে না, পশ্চিমের সূর্য সেই অশ্রুতে আবির রং ধরিয়ে দেয়। আকাশের মেঘে-মেঘে কমলা, গোলাপি, লাল রং ছড়িয়ে পড়ছে।

তার পরে এদের ছবি মিলিয়ে গেল। এরা মিলিয়ে গেলে অনেকক্ষণ ধরে নতুন কোনও দৃশ্য নেই, শুধু নীরবে হেঁটে চলেছি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে, মাঝে-মাঝে পাথুরে দেওয়ালে হাত রাখছি চলতে-চলতে। দেওয়াল কোথাও-কোথাও চিকমিক করছে, নানা রকম নীল, সবুজ, লাল পাথর সেসব জায়গায়, আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে।

তার পরে আস্তে-আস্তে নূতন এক ছবি ফুটে ওঠে। দেখতে পাই নক্ষত্রখচিত এক আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে এক এলোকেশী

মেয়ে, তার মুখ অন্ধকারে ঢাকা। দেখতে পাই না সেই মুখের রং, দেখতে পাই না তার চোখ কেমন। শুধু তারার আলোয় দেখি তার ছায়াময় দেহসীমা। সে উর্ধ্বমুখী হয়ে দেখছে আকাশ, দেখছে তারার মালা দুর থেকে আরও-আরও দূরে ছড়ানো মণিদীপের মতো, নক্ষত্রসরণি বেয়ে চলে গেছে কত-কত-কত দূরে, অনাদ্যন্ত কাল ধরে ওরা অতন্দ্র।

মেয়েটির কাছেই এক নদী, ভিজে বালির তীররেখা পার হয়েই জল, শান্ত নদীটি বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে, বাতাস খুব শান্ত, আকাশও খুব শান্ত। নক্ষত্রগুলোও যেন দপদপ করে না, পাছে এই নিসর্গব্যাপ্ত শান্তি ছিঁড়ে যায়!

মেয়েটি ভিজে বালির উপরে পা ফেলে-ফেলে একদম জলের ধারে এসে দাঁড়ায়, এক পা বাড়িয়ে পায়ের পাতাটি জলে ডোবায়। ওই ঠান্ডা, শান্ত নদীটির গর্ভ কেমন? মাতৃগর্ভের মতো উষ্ণ কোমল আশ্রয় কি মিলবে না সেখানে?

আস্তে-আস্তে বালুকাময় তীরে এলিয়ে বসে পড়ে মেয়েটি, তারার আলো রাত্রির কালোয় মিশে গেছে বিন্দু-বিন্দু দুধের মতো, ওই যে ওই উপরে জ্বলছে বড় লাল তারাটা...ওটাই কি মঙ্গলগ্রহ? এত লাল কেন? সেখানে কি যুদ্ধের দেবতা রাত্রিদিন শুধু লাল রক্তের আবির ছড়ায়?

মেয়েটি গুনগুন করতে থাকে, যেন বহুকালের ভুলে যাওয়া গান তার গলায় আসতে গিয়েও আসছে না। সে গান দিগন্তব্যাপী বিষাদের গান, দগ্ধ হৃদয়ের ভস্মঘ্রাণ তাতে।

হঠাৎ গান থামিয়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়, শীতল কালো জল ডাকছে ওকে, একদিন ওই শীতল নীল অন্ধকার থেকেই কি এসেছিল সে? চোখ মেলেছিল আলো আর লোকভরা কোলাহল কলরবে ভরা এই দুনিয়ায়? ভুলে গিয়েছিল সেই নীলাঞ্জনঘন স্নিগ্ধ তারাময় অন্ধকার? সেই অনন্ত বিভাময় বিভাবরী?

জলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল সে, সহসা কালো আকাশে তীব্র আলো জ্বেলে পিণ্ডাকারে উল্কা জ্বলে উঠল... থেমে গেল সে, আস্তে-আস্তে পিছিয়ে আসতে থাকল, উল্কার আলোয় সে সহসা অন্ধকার ভেদ করে পথ দেখতে পেয়েছে, ওই জলে না, ওই ঠান্ডা কালো নদীর গর্ভে না, অনে-এ-এ-এক দূরে, তীব্রোজ্জ্বল হিরণ্ময় অগ্নি জ্বলে উঠেছে, ওই আগুনের উজ্জ্বল গর্ভে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ওকে...

মিলিয়ে গেল ওই নক্ষত্ররাত্রির আশ্চর্য মেয়ে। সুড়ঙ্গের এইখানে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক, বাঁকটি পার হয়েই দেখি পথ বেশ চওড়া হয়ে গিয়েছে। ডান দিকের পাথুরে দেওয়ালে জলধারা। হয়তো এই জল আসছে পাতালের কোনও গোপন উৎস থেকে।

জলধারার পাশেই দেওয়ালে আশ্চর্য পাথুরে নকশা ঝিকিয়ে উঠল স্ফটিকগোলাপের আলোয়। এইসব আশ্চর্য নকশা হয়তো তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিকভাবেই, অথবা হয়তো এও আমার মনগড়া ছবি। কোনটা সত্যি কোনটা কল্পনা কে বলবে? জীবনের এমন এক জটিল বুননের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি যেখানে স্বপ্ন, সত্যি আর কল্পনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলতে থাকি। আবার ছবি ফুটে ওঠে। এইবারে শীতল ছবি। এক তুষারাবৃত শীতস্তব্ধ অরণ্য, বেশির ভাগ গাছই পত্রশূন্য, উলঙ্গ তপস্বীর মতো সমাধিস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নরম তুষারে ঢেকে যাচ্ছে। দুপুর থেকেই নতুন করে তুষারপাত শুরু হয়েছে, আকাশ ধূসর, কালচে, একটুও ফাঁকা নেই কোথাও, পুরোটা যেন কম্বলে ঢাকা। চিরহরিৎ পাইন গাছেরা দাঁড়িয়ে আছে তুষারের নকশা সর্বাঙ্গে নিয়ে, সূচের মতো সরু পাতার গোছায়-গোছায় তুষার।

কোথাও কোনও শব্দ নেই, প্রাণী নেই, শীতে জঙ্গলের পশুপাখিরা দূরে কোথাও চলে গেছে, পাখিরা পরিযানে, সরীসৃপেরা ও উভচরেরা শীতঘুমে...হয়তো এখনও আছে পাঁশুটে নেকড়েরা ...হয়তো দূরে কোথাও জটলা পাকাচ্ছে... একদল মানুষ হেঁটে এল শীতের বনে, পাঁচজন লোকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, বাকি তিনজনের কোমরে শিকল, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা।

জঙ্গলের মধ্যে গর্ত করা, এখানে আগেই লোক এসেছিল, সেই গর্ত নরম তুষারে ঢেকে যাচ্ছে, বন্দিদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে গর্তের কাছে দাঁড় করানো হল, অস্ত্রধারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্তৃত্বওয়ালা লোকটি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে এদের অপরাধের বিবরণ দিয়ে বোঝাল কেন মারা হচ্ছে, এরা মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিচ্ছে, এদের ক্লান্ত, হতাশ মুখে জীবনের চেয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষার রংই বেশি করে ফুটে উঠেছে।

নৃশংস নরঘাতক দস্যু শাসক সেজে তাদের জাতির শুভশক্তিকে প্রতিদিন পীড়িত করে চলেছে...এরা শেষ চেষ্টা করেছিল ওই দানবকে গুপ্তহত্যার...সফল হয়নি, আজ সকালে এরা ধরা পড়ে গেছে। তিনজনে তিনজনের মুখের দিকে তাকাল, সবচেয়ে যার বয়স কম, তাকে বাকি দু'জন কপালে চুমো খেল। দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেটি ওদের জড়িয়ে ধরল। তার পরেই গুলির শব্দ...দেহ তিনটি গড়িয়ে পড়ে গেল গর্তে। এইবারে মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে ওদের।

মাটি-মাটি-মাটি...পৃথিবী...পৃথিবীর আলিঙ্গন...ধুলো থেকে এসেছিল তারা, ধুলোখেলা খেলেই বড় হয়েছে, ধুলোতেই ফিরে গেল...ওই যে অস্ত্রধারীরা ফিরে যাচ্ছে...ওরাও একদিন তো ওই মাটিতেই ফিরে যাবে, এই দুই দলের আবার দেখা হবে হয়তো কোনওদিন...

মিলিয়ে গেল নিহত ও হত্যাকারীরা, মিলিয়ে গেল সেই বিষণ্ণ শীতার্ত অরণ্য। আবার ফিরে এল চারিপাশের বাস্তবতা, পাথুরে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ-দীর্ঘ-দীর্ঘ এই যাত্রা। এই যাত্রার সমাপ্তি কখন? সত্যিই কি অপরূপ আলোর ভোরে ওই পারে গিয়ে পৌঁছতে পারব?

অপরিসীম বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে আসে হৃদয়, মনে পড়ে একটু আগে দেখা ওই মানুষগুলোকে, ওই তরুণ ছেলেটি। কত অল্পবয়সে ওকে চলে যেতে হল সব ছেড়ে?

এই কি আমাদের পৃথিবীর ইতিবৃত্ত, এই কি ছিল আমাদের সভ্যতা? কী ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী দিন ওসব! এত এত মৃত্যু, এত এত হত্যা...

আমার দগ্ধ হৃদয়ের উপর আগুনের বর্শাফলকের মতো নেমে আসে আর-এক ঘটনামালার ছবি। এবারে দেখি মরুভূমি, দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। কিছু বাদামি-বাদামি পাহাড় এলোমেলো ছড়ানো, গাছপালা বলতে বেশির ভাগই ক্যাকটাস জাতীয়, কোনও-কোনও ক্যাকটাস এতই বড়, এতই উঁচু যে দেখলেই ভয় লাগে। ভরপুর গ্রীষ্ম, তাপমাত্রা এমনিতে বেশ উঁচুতে থাকে, তবে ক'দিন ধরে প্রবল বর্ষণ চলছে, সেইজন্য তাপমাত্রা কিছু কম। গাড়ির পর-গাড়ির সারি চলেছে মরুভূমির পথ দিয়ে, দূরে কোনও একটি বিন্দুর দিকে চলেছে, তারের পর-তার পাতা হয়েছে অনেকদিন ধরে, নির্দিষ্ট স্থানে চলে গিয়েছে আসল বস্তু, আজকে সকালে আসল পরীক্ষা।

এখানে একটা ক্যাম্প, আরও তিনটে ক্যাম্প আছে, সব মিলে চারটে, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণস্থানের উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে-পশ্চিমে। আকাশ মেঘে ঢাকা, প্রবল বৃষ্টি চলছে, সারারাত ধরে, সকালে বৃষ্টি

না থামলে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হবে। এই ক্যাম্পে বেশ অনেক লোক, এরাই প্রধান নির্মাতা, কিন্তু এরাও নিশ্চিত নয় আদৌ পরীক্ষা সফল হবে কী হবে না সেটা নিয়ে।
বেতারযন্ত্র চলছে, এরা নিজেদের মধ্যেও স্বাভাবিক কথাবার্তা চালাতে চেষ্টা করছে কিন্তু উদ্বেগ কমে না। এরা জানে না কী হবে বিস্ফোরণে, হয়তো বাতাসে আগুন ধরে যাবে, হয়তো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। হয়তো কিছুই হবে না, বিস্ফোরণই হয়তো হবে না।
জটলা থেকে একটু দূরে জানালায় মুখ রেখে বাইরের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভেজা অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে এক তরুণ। অন্ধকারে দেখা যায় না পথ, ওই পথ দিয়েই তো ক'দিন আগে জিনিসটা নিয়ে গেল সেনাবাহিনীর থেকে আসা সহায়করা, পথটার নাম মৃত্যুর অভিযাত্রা।
ওরা যায়, ওরা ফিরে আসে, ওরা কথা বলে, ওরা আরও কত কী করে, ওরা এসবের নাম দেয়, ওরা ওকে কত কথা জিজ্ঞেস করে, ও সাধ্যমতো জবাব দেয়, কিন্তু ওর মন পুরোপুরি টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছে।
ও নিজেই মাঝে-মাঝে বোঝে না, ও কে? এদের সঙ্গে কেন? ওর কি এখানে থাকার কথা ছিল? যে ওর সব ছিল, তাকে নিয়ে গেল কোন পথে কে? ও কেন আর দেখতে পেল না?
এই তো মাত্র ক'দিন আগে, ক'দিন আগেও ছিল তার সেই প্রাণসখী। ও দেখতে গিয়েছিল, ওর মনে পড়ে ওর হাতের মধ্যে

একবার দেখেছিলাম স্বপ্নের মতো একটা অবস্থায়, ভোরবেলার সবুজ অরণ্যে যে বসেছিল একলা, গান গাইছিল।

ওর সখীর হাত দু'খানা...মেয়েটার চকচকে নীল চোখ দুটো আস্তে-আস্তে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসছে, সে চলে যাচ্ছে চিরদিনের মতো। ওর তরুণ অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল অসহায় অভিমানে, "কেন-কেন-কেন? আমাকে এখানে রেখে কেন তুই, কেন তুই, কেন তুই, একা-একা চলে যাচ্ছিস?"
হঠাৎ চমকে ওঠে ছেলেটি, কে যেন তার ঘাড়ে টোকা দিয়েছে! ও পিছনে ফিরে অবাক, ওর সহকর্মী আর-এক তরুণ, সে ওকে সানস্ক্রিন লোশন নিতে সাধছে, নিজে সে মেখেছে খাবলা-খাবলা। সবাইকেই ওরকম দিয়েছে, লোকে আরও ঘাবড়ে গেছে এই শেষরাত্রে সানস্ক্রিন পেয়ে, একেই উদ্বেগে আধাসেঁকা সব! বাকি আছে শুধু এই একজন।
ও জটলার বাইরে জানালার কাছে আলাদা হয়ে ছিল, ওর ঘটনা জানে বলে কেউ ওকে বিরক্ত করে না, কিন্তু এখন হঠাৎ এই সানস্ক্রিন...ও হাত বাড়িয়ে নেয়, হাসে, মুখে মাখতে থাকে। হাজার সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করতে পারবে কি এই এক সূর্যের সানস্ক্রিন? অবশ্য তার কিছুই এসে যায় না, তার যে সব ছিল, সেই যে ওকে একা ফেলে চলে গেল!
ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ঘটল বিপুল বিস্ফোরণ। প্রথম দেখা গেল তীব্র আলোর ঝলক, তার পরে শোনা গেল শব্দ। বিস্ফোরক যেখানে ছিল সেই দূরে দেখা গেল বিচিত্র মেঘকুণ্ডলী, ক্রমশ প্রসারিত হতে-হতে যা উপরে উঠছে। মহামৃত্যুর প্রতীকের মতো। আর এই পর্যবেক্ষকদের মুখের উপরে ভয়ের আর বিষাদের মেঘছায়া। এই ছায়ায় তাদের কাটাতে হবে বছরের পর-বছর। শুধু তাদের না, গোটা পৃথিবীকেই।

তার পরে মিলিয়ে গেল এই ছবি কিন্তু মন থেকে বিষাদ মিলালো না। হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে অসহায় কষ্টে। হতাশা গ্রাস করতে চাইছে ভিতর-বাহির। অবসাদে ভেঙে পড়তে চায় পা দুটো, কিন্তু উপায় নেই, চলতেই হবে। কার কাছে কে জানে মনে-মনে প্রার্থনা জানাই, "শক্তি দাও, শক্তি দাও। এমন কিছু দেখাও যেখানে আশা আছে, জীবন আছে, আলো আছে।"

এই প্রার্থনায় সাড়া দিয়েই কিনা কে জানে, ফুটে উঠে এক অন্য ছবি। অদ্ভুত এক যান, জমাট শূন্যতার মধ্য দিয়ে নেমে আসছে, নীচে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত এক সমতল, অচেনা অন্য জগৎ। পাউডারের মতো ধুলায় ঢেকে আছে সব। এদিক-ওদিক পড়ে আছে ছোট-বড় গোল-গোল গর্ত। অন্ধকার সব গর্ত, গ্রহাণু সংঘর্ষে এসব গর্ত তৈরি হয়েছে কত-কত লক্ষ লক্ষ বছর আগে, এখনও প্রায়ই নতুন গর্ত হয়, নতুন সংঘর্ষ হলে। এ উপগ্রহের চারপাশে বাতাসের পোশাক নেই, এ শুধু পাথুরে এক উপগ্রহ।
যান দ্রুত নেমে যাচ্ছে একখানা অন্ধকার গর্তের দিকে, যানের ভিতরে অদ্ভুত পোশাকে আবৃত ছেলেটা লাফিয়ে এসে হ্যান্ডেল আঁকড়ে ধরল, নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে হবে। নইলে ওই গর্তে পড়ে গেলে উঠে আসা খুব অনিশ্চিত। কয়েকটা রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত, তার পরেই যানের নিয়ন্ত্রণ ওর হাতে এসে গেল। ওর সঙ্গী ছেলেটা পাশে এসে ওর দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল, হাসি ফুটল না ভাল করে, এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল সঙ্গীটি।
বহু দূরে, বহু-বহু দূরে, এদের জননীগ্রহে অসংখ্য মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়ে কাজ করছে মিশন কন্ট্রোলে, বড্ড দ্রুত পাঠানো হয়েছে তাদের, হয়তো আরও-একটু সময়ের দরকার ছিল, প্রযুক্তি আর-একটু এগোলে ভাল হত, কিন্তু ওদের অকালপ্রয়াত নায়ক যে দশক না ফুরাতেই পাঠাতে চাইল! সে যে শুধু বলে গেল, তার পরে আর সময় দিল না, হাজারদিনের নেতৃত্ব শেষে আততায়ীর অব্যর্থলক্ষ্য বুলেট ওকে নিয়ে চলে গেল চলন্ত গাড়ি থেকে। শুধু রয়ে গেল প্রতিধ্বনিময় ওর লাইনখানা-এ দশক শেষ হওয়ার আগেই আমরা ...আমরা চন্দ্রবিজয় সম্পূর্ণ করব...করব...করব..."
তখন নেমে পড়েছে, নেমে পড়েছে, সেই যান নেমে পড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে উপগ্রহের অচেনা মাটিতে, মিশন কন্ট্রোলে সব লোকেরা সেলিব্রেট করছে।
আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যায় এই ছবি। ফিরে আসে পাথুরে সুড়ঙ্গের বাস্তবতা। এখন আর ভয় নয়, বিষাদ নয়, এক মধুর ক্লান্তিতে ভরে যায় দেহ। মনে আর হতাশা নেই এখন, মনে হচ্ছে টুকরো-টুকরো আলোর শিখা যেন দেখতে পেয়েছি অন্ধকার ভেদ করে। শীতার্ত দীর্ঘ পথের শেষে এক উষ্ণ নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার মতো।
কোথা থেকে যেন ভেসে এসেছে দক্ষিণা হাওয়ার আশ্বাস, বলছে, "বসন্ত আসে শীতের পরেই, রিক্ত বৃক্ষের শাখায়-শাখায় নতুন জীবন জেগে ওঠে বিপুল শক্তি নিয়ে। মৃত্যুকে পার হয়েই তবে অমৃতে পৌঁছানো যায়।"
পাথুরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ি। একটুখানি বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।
বিশ্রামরত অবস্থাতেই দেখি ফুটে উঠেছে এক অপূর্ব মানমন্দির, এর উপরটা গোল গম্বুজাকৃতি। সাদা পাথরের এই মানমন্দিরে

মনোযোগ দিয়ে দূরবীক্ষণ ঠিকঠাক করছে কয়েকজন তরুণ-তরুণী আর তাদের শিক্ষিকা এক প্রৌঢ়া। তাদের মুখে চাপা উত্তেজনা, আজ রাত্রিটা তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, আজকের রাতের পর্যবেক্ষণে মহাকাশের এক বিরাট রহস্য উন্মুক্ত হবে। এই ছবিটা দেখতে-দেখতে আরও-আরও আশায় ভরে উঠেছিল মন। আস্তে-আস্তে ছবি মিলিয়ে গেল।

আমার ক্লান্তি কেটে গেল, হৃতশক্তি ফিরে এল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। স্ফটিকগোলাপের আলো অদ্ভুত কোমল মায়াবী নীল হয়ে উঠেছে এখন। ওই আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলি আবার। সূর্যনগরী কত দূরে আর? ভোরই হতেই বা কত দেরি?

আবার ছবি, অপূর্ব সব চিত্রমালা। নীল জলের আবরণ জড়ানো এক অপরূপ গ্রহ, তার উপরে মেঘেদের কারুকাজ দেখা যাচ্ছে, জলের মধ্যে মাথা তুলে থাকা এক মহাদেশের অংশও দেখা যায়। আমাদের পৃথিবী, অনেক-অনেক উপর থেকে দেখা। আহ, কে দেখেছিল, কারা দেখেছিল এরকম?

তার পরে দেখি লাল একটা গ্রহ, ধুলোর ঝড় ওঠা লালচে জমি। সেখানে এক মোচার মতো পাহাড়। মঙ্গলগ্রহ। তার পরে নানা রঙের মেঘে ঘেরা বৃহস্পতিগ্রহ, বলয়ঘেরা শনিগ্রহ দেখি অবিশ্বাস্য স্পষ্টতায়।

তার পরে দেখি নেবুলা, নক্ষত্রদের জন্মগৃহ। সেখানে নতুন নক্ষত্র তৈরি হচ্ছে নেবুলার স্বচ্ছ বাষ্পীয় ধুলিময় আঁচলের আড়ালে। দেখতে-দেখতে অবাক হয়ে যাই, এইসব বুঝতে পারছি কেমন করে? এসব তো আমার চেনা কিছু নয়! তার পরেই মনে পড়ে। আমার এ অভিযান তো সেই তাঁদেরই ইচ্ছায়, যাঁরা আমাদের নির্বাচন করেছেন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নতুন সভ্যতার জন্য। ওঁরাই হয়তো সরাসরি জানিয়ে দিচ্ছেন মন থেকে মনে।

এইবারে দেখতে পাই দূরের এক নক্ষত্র, জ্বলজ্বল করছে। তার পরে যেন কাছে চলে এল, অনেক-অনেক বড় এখন। সেই নক্ষত্রের উপরে নিখুঁত কালো টিপের মতো কিছু, ওটা গ্রহ। নক্ষত্র আর আমার দৃষ্টিরেখার মাঝে এখন। ক্রমে আরও অনেক ছবি। এই নক্ষত্র ঘিরে অনেক গ্রহ। আরও কাছ থেকে দেখি একটা গ্রহের ছবি, চমৎকার নীল সমুদ্রে ঘেরা গ্রহ, আমাদের পৃথিবীর মতো বা হয়তো তার থেকেও ভাল। জীবপালিনী সেই গ্রহ, উদ্ভিদে প্রাণীতে সমৃদ্ধ।

ওই নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলীতে এইরকম গ্রহ বেশ কয়েকটি। কে জানে এইবারে হয়তো আর অতীতের ছবি নয়, হয়তো ভবিষ্যতের কিছু দেখছি। হয়তো ওই গ্রহগুলোয় একদিন অবতরণ করবে পৃথিবীর মানুষেরা।

অপূর্ব এক হিল্লোল এসে যেন আমাকে ছুঁয়ে যায়, মনে হয় কাছিয়ে এসেছি যেন গন্তব্যের। অমারাত্রির অন্ধকার পার হয়ে তবে কি এইবারে আলোর সকাল?

হঠাৎ শুনি কোথায় যেন বেজে উঠল বাঁশি, তার সঙ্গে আরও নানা সুরযন্ত্র। অপরূপ সুরে ভরে উঠল আমার সমস্ত চেতনা। এবারে দেখি অন্ধকারের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই অপার্থিব মেয়েটি, আগেও যাকে একবার দেখেছিলাম স্বপ্নের মতো একটা অবস্থায়, ভোরবেলার সবুজ অরণ্যে যে বসেছিল একলা, গান গাইছিল। আজ আবার দেখি তাকে, আজও তার গায়ে ফুলের বসন, পরনে সবুজ পাতার ঘাগরা। মাথায় চূড়া করে বাঁধা চুল, রঙিন ফুলের মঞ্জরিতে সাজানো। আজ তার হাতে এক তারওয়ালা সুরযন্ত্র, কোমল আঙুলে সেই তারে ঝঙ্কার তুলছে সে। আর সঙ্গে গাইছে গান। কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে বাঁশির সুর। সে এক অমৃতময় সঙ্গীত, তুলনাহীন সুরনির্ঝর।

মেয়েটির পায়ের কাছে আজও সেদিনের মতোই ফণা নামিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে সাপেরা। আরও পড়ে আছে বাঘ সিংহ বন্য-মহিষ-হরিণ-হাতি-গণ্ডার ইত্যাদি নানা বন্যজন্তু। সবাই বুঁদ হয়ে আছে সুরে। এর পরে ছবি মিলিয়ে গেল কিন্তু সুর রয়ে গেল। সেই সুর ক্রমশ মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠল আর নীলাভ শুভ্র আলোয় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল স্ফটিক-গোলাপ। একসময় অবাক হয়ে দেখলাম আমার সামনে সোনালি আলোয় ঘেরা গোল একটা দরজার মতো, তার ওপারে খোলা আকাশ। তা হলে পৌঁছে গেলাম শেষ পর্যন্ত?

এই দুয়ারটুক পার হলেই তবে সেই সূর্যনগরী? আমি ডান হাতে শক্ত করে স্ফটিক-গোলাপ চেপে ধরে দুয়ার পার হয়ে এলাম। সামনে এক আশ্চর্য উপত্যকা-নগরী আর সেখানে অপরূপ এক ঝকঝকে সকালবেলা। পাহাড়ের মালায় ঘেরা উপত্যকা। প্রতিটা পাহাড়ের শৃঙ্গ তুষারে আবৃত আর সেগুলো ঝকমক করছে রোদ্দুরে। আকাশ স্বচ্ছ নীল, সূর্য ঝকমক করছে দিগন্তের বেশ কিছুটা উপরে। সূর্যোদয় হয়েছে বেশ অনেকক্ষণ আগে।

আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে সেই সুর যা সুড়ঙ্গ থেকে বের হওয়ার আগেই শুনতে শুরু করেছিলাম। সেই অমৃতময় সুরসুধা যা অনেকদিন আগে প্রথম শুনেছিলাম ক্লান্ত অর্ধচেতন অবস্থায়, স্বপ্নের কুয়াশায় ডুবে গিয়ে। তারপর থেকে সেই সুর আমার সঙ্গে-সঙ্গেই রয়েছে চেতনার গভীরে। আজ কিন্তু স্বপ্ন বা কল্পনা নয়, সত্যি করেই শুনছি এই সুর।

স্ফটিক-গোলাপ তুলে ধরলাম চোখের সামনে, সে এখন নিজের আলো নিভিয়ে ফেলেছে, বাইরের আলোয় চিকমিক করছে। আরেনুশ বের হয়ে এল একটা গাছের পাশ থেকে, আমাকে দেখতে পেয়েছে। হেসে এগিয়ে এল। আমিও এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। যেতে-যেতে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখলাম যে সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে বের হয়েছিলাম তার কোনও চিহ্ন নেই। যেন জাদুর মতো মিলিয়ে গিয়েছে।

পরস্পরের হাত ধরে পাশাপাশি দাঁড়ালাম আমি আর আরেনুশ। সামনে এক অজানা নগরী। যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটা অনেকটা উঁচুতে, এখান থেকে পুরো নগরী ছবির মতো দেখা যাচ্ছে।

অজস্র দীর্ঘ-দীর্ঘ সবুজ বৃক্ষ সেখানে আর তার মধ্যে মধ্যে কিছু সুন্দর-সুন্দর অট্টালিকা আর উঁচু-উঁচু মিনার। নগরীর পথগুলো পাথর দিয়ে মোড়া। আর কত যে বাগান সেখানে! কোনও-কোনও বাগানে ফোয়ারা। অপূর্ব সুন্দর।

নগরীর মাঝখানে এক উচ্চ ভবন, তার উপরটা গম্বুজের মতো। সেই গম্বুজের শীর্ষে একটা বিরাট গোল ধাতব চাকতি, সেটা ঝলমল করছে সূর্যের আলোয়। হয়তো ওই চাকতি সূর্যের প্রতীক, কে জানে! হয়তো এর জন্যই এই নগরীর নাম হয়েছে সূর্যনগরী, কে জানে! অবশ্য সবই তো পরে জানতে পারব আমরা।

এর পরের মুহূর্তে আর-এক বিস্ময়। হঠাৎ পাখির ডাক শুনে উপরে তাকিয়ে দেখি সেই পাখি দুটো। ওরাও এসেছে। অন্য পথে।

সুরের ধারা বয়ে চলেছে। সেই সুরের মধ্য দিয়ে সূর্যালোকিত সূর্যনগরীর দিকে এগিয়ে যাই আমরা চার নবাগত। আমরা দু'জন মানুষ আর ওই দু'টি পাখি। জানি, এই পাখিরা এখানেও আমাদের সঙ্গে থাকবে।

অমৃত আশাবরীতে অভিষিক্ত হয়ে আমরা এগিয়ে চলি আমাদের আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে।

ছবি: দেবাশিস দেব

আলোছায়ার কথাকলি

সুমন মহান্তি

AMARBOI.COM

অনেকদিন পর নদীর কাছে ফিরে গিয়েছে সায়ম। চরাচরে চাদর মেলে স্তব্ধতা, বটের শরীরে পাখিদের মুখরতা থেমে যায়। বটের নীচে ঘাটের সিঁড়ির ধাপে সে দাঁড়িয়ে থাকে। বটের ঘন অন্ধকারে শোনা যায় মৃত্যুগান। ঝাপসা মেঠোপথ পেরিয়ে কেউ যেন হেঁটে আসে। স্পষ্ট তার মুখ দেখতে পাচ্ছে সায়ম। টলোমলো পায়ে এগিয়ে আসছে রাই। আদর করে অনেকে বলত, রাইকিশোরী। রুপোলি ফ্রক পরেছে রাই। মুখে নিষ্পাপ হাসি। হাসলে তাকে তো কখনই এমন সুন্দর লাগত না। শোলার কুচি বাসা বেঁধেছে তার চুলে, ডানহাতের মুঠো আলগা হয়ে পড়ে গেল মাটির পুতুল। আশ্চর্য, রাই একফোঁটা কাঁদল না। তার মলিন, নিষ্প্রভ চোখের মণিতে সূর্যমুখী আলো ফুটে উঠল। জড়ানো গলায় সে সায়মকে ডাকল তারপর, "আয়, ভাই, দেখে যা ভাদুর মূর্তি কিনেছি কেমন। ঘরে লুকিয়ে রেখে এসেছি।"

একঝাঁক বালিহাঁস গোল হয়ে শূন্যে উড়তে-উড়তে মিলিয়ে গেল। হারিয়ে গেল শিলাবতী নদী, তার বিস্তীর্ণ বালি আঁচল, রাই, মাটির পুতুল, হলুদ বটফল। চোখের সামনে এখন গোলাপি দেওয়াল। ধাতস্থ হতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল সায়ম। ছিপছিপে দেওয়ালঘড়ি বুঝিয়ে দিল দুপুর শেষ হয়ে আসছে। বেসিনে গিয়ে চোখেমুখে জল দিল সায়ম। শরীরে এখনও নরম আলস্যের ফেনা। স্বপ্নের আলোড়ন থিতিয়ে পড়লেও অচেনা বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সায়ম। রাই এত বছর পর রোববারের দুপুরে স্বপ্নে ফিরে এল কেন? বাইশ

বছর আগে তার এই খুড়তুতো বোনটি তো পার্থিব জগতের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছে। সবাই ভুলে গিয়েছে তাকে। একবারও কেউ তার নাম উচ্চারণ করে না। তার চলে যাওয়াটা এক হিসেবে অনিবার্য ছিল। জন্মের কয়েক মাস পরই ব্রেন প্যারালিসিস আক্রমণ করেছিল তাকে। বারোয় পা দেবার পর এপিলেপসি হানা দিল। যখনতখন তার খিঁচুনি শুরু হয়, গোঙাতে থাকে সে, চোখের মণি উলটে যায়। হাঁটার ভঙ্গিটিও স্বাভাবিক নয়। অনেক সময় তার আচরণ অস্বাভাবিক, হাতের কাছে যা পায় ছুড়ে দেয়। স্বাভাবিক ভাবেই তার কোনও খেলার সাথী ছিল না। দশ-বারোটি পুতুল নিয়েই সে আহ্লাদে থাকত। ডক্টরেরা বলেই দিয়েছেন, এ মেয়ে বেশিদিন বাঁচবে না। রাই অবশ্য বেশিদিন ভোগেনি। আঠারো পেরনোর আগেই এক শীতের রাতে রাই তার পুতুলপৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। শোক নয়, বরং স্বস্তির আবহ বেজেছিল চারদিকে। অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছিল মেয়েটা শেষটায়। আহা মরে বেঁচেছে।

সায়মও তাকে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। এত বছর তার মনে রাইয়ের কোনও ছবি ভেসে ওঠেনি। দেশের বাড়িতে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

ভাদ্রেশ্বরী উৎসবের প্রতি রাইয়ের খুব টান ছিল। রাই বলত, ভাদুপুজো। অন্য মেয়েরা দল বেঁধে সেই উৎসবের আয়োজন করলেও রাই ছিল একা। একটি পুতুলকে সে ভাদু হিসেবে কল্পনা করে নিয়ে মালা পরাত, শালপাতার ঠোঙায় নকুলদানা আর অঙ্কুরিত ছোলা সাজিয়ে প্রসাদ দিত আর সেই পুতুলটির পাশে প্রদীপ জ্বালিয়ে সুর করে-করে গাইবার চেষ্টা করত। কোন অবচেতনের গভীর থেকে রাই এতদিন পর ভেসে উঠেছে তা সায়ম জানে না। শুধু জানে রাই আবার অন্ধকার বিস্মৃতির স্তূপে চাপা পড়ে যাবে। হাজার ব্যস্ততা আর চেনা মানুষের মুখের ভিড়ে তার কোনও জায়গা থাকবে না। সংসারের এটাই নিয়ম। রাইকে ধরে রাখতে হবে। মস্তিষ্কের ধূসর কোষে সংকেত পাঠিয়ে বলতে হবে, রাখো। রাইয়ের জন্য হ্রস্বতম জায়গা অন্তত রেখে দিও।

অস্থির সায়ম বিছানায় বসে ডায়েরির পাতা খোলে। ঘোরের মধ্যে সে লিখতে শুরু করে—

জেগে থাকে ওই গ্রাম সিনেমা সিরিয়ালে
ঘুমঘোর শিলাবতী স্মৃতির মশাল জ্বালে
বুকের ভিতর বাজে সোনার ভাদুগান
ভাদ্রেশ্বরী স্মৃতি আজ অকাল ভাসানে যান॥

সায়ম থামে। রাই কবিতা নয়, গানের অক্ষর হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কোনও ক্ষতি নেই। সে তো এই ক'দিন গান লেখার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। কষ্ট করে ভাবতে হচ্ছে না কিছুই। কিশোরবেলার টুকরো দৃশ্যগুলো জুড়ে-জুড়ে ধ্বনিময় কোলাজ হয়ে যাচ্ছে। আনন্দঘন উচ্ছ্বাসে সে শুরু করে আবার—

ভাদুর পাশে প্রদীপের মালা রাতজাগা পালা করে
কিশোরীরা সব ভাদুগান গায় প্রসাদ পাতায় ভরে।

ভাদ্রেশ্বরী আজ জলে, রিংটোনে গান চলে
বিশ্বায়নের মন্ত্রে ভাদু কোথাও ঠাঁই না পান॥
জানলার বাইরে তাকিয়ে অশ্রুমতী মেঘ খুঁজে পেতে চাইছিল সায়ম। অন্যরকম লেখা গান, তার সৃষ্টির নতুন বাঁক। রাই আজ তাকে উপহার দিয়ে গেল। কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে না পারলে এই অনাবিল আনন্দ পূর্ণতা পাচ্ছে না। ছুটির দুপুরেও অদিতি বাড়ি নেই। ইদানীং বাইরের জগতে অদিতির ব্যস্ততা বেড়েছে। অদিতি এই বয়সে সারাক্ষণ তাকে জড়িয়ে থাকবে আশা করে না সে। বারোবছর বিবাহিত জীবনের পর মুগ্ধতা বা রোমাঞ্চ অবশিষ্ট থাকে না। আপাতত তাদের দু'জনের মধ্যে অঘোষিত ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে। কেন, কখন তা শুরু হয়েছিল তা মনে নেই।এই মুহূর্তে চা দিয়েই সৃষ্টিসুখ সেলিব্রেট করা যাক। সায়ম দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। রোহনকে তার প্রাইভেট টিউটর পড়াচ্ছেন। প্রিয়নাথ দুপুরে কখনও ঘুমোন না। খবরের কাগজ মুখস্থ করেন বা টিভিতে নিউজ চ্যানেল দ্যাখেন। কিচেনের দিকে পা বাড়াতেই প্রিয়নাথের গলা ভেসে আসে, "চা দরকার?"
ঠিক তার উপস্থিতি টের পেয়ে গিয়েছেন! তৃতীয় নয়ন আছে সম্ভবত।
"বেশ। আমি বানিয়ে দিচ্ছি।"
কোনও কাজেই এই মানুষটি স্বাধীনতা দেবেন না তাকে! সায়ম তেতোমুখে তাকায়। প্রিয়নাথ মৃদু হেসে বললেন, "চা তেষ্টা আমারও পাচ্ছে। তোমার বানানো চা আমার পছন্দ হবে না। তার চেয়ে আমার তৈরি চা অনেক তৃপ্তিতে চুমুক দিতে পারবে।"
সসপ্যানে জল বসিয়ে প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করেন, "বাড়িটার জীর্ণ দশা খেয়াল করেছ?"
"হ্যাঁ।"
"কী ভেবেছ?"
সায়ম মনে-মনে বলল, 'ভাবছি। গান আমার যায় মরে যায়।'
"উত্তর দিলে না কিন্তু," প্রিয়নাথ গম্ভীরভাবে বললেন।
"তুমিও ভাব।"
প্রিয়নাথের তির্যক গলা, "কেন, আমি শুধু ভাবব কেন? ভবিষ্যতে তোমরাই থাকবে। মানুষ অমর নয়। আমার সেভেন্টি হয়ে গেল। তা হলে দায়িত্বটা কার হওয়া উচিত?"
"সারাতে হবে," সায়ম চোখ সরিয়ে নিল।
"আচ্ছা। তা সেটা কীভাবে হবে? প্ল্যানিং করেছ কোনও? দায়সারা উত্তর আমি পছন্দ করি না।"
চিনচিনে রাগ হলেও শান্ত, সংযত থাকার চেষ্টা করে সায়ম। তর্ক করে কোনও লাভ নেই। এভাবেই প্রিয়নাথ একটার পর-একটা প্রশ্ন করে যাবেন। বিরোধিতা চলবে না। সংসারের প্রতিটি ব্যাপারে তিনিই শেষ কথা। ক্ষুব্ধ হলেও সায়ম কখনও বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেনি। গৌরচন্দ্রিকা চলছে। সমস্যার কথা পেড়েছেন নিজে এবং নিজেই তার সমাধান করবেন। ছেলেকে জানানো তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সায়মকে অক্ষম প্রমাণ করে স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেবেন।
ফুটন্ত জলে চা পাতা ফেলে প্রিয়নাথ স্বগতোক্তির সুরে বলেন, "নো প্ল্যানিং। আমাকেই করতে হবে সব। বাড়ি সারানোর কাজ পাকা মাথার কাজ। সময় লাগবে। খরচা হবে। দেখা যাক! কতটুকু পারব জানি না।"
"অদিতি কোথায় গিয়েছে?" সায়ম কথা ঘোরায়।
"জান না?"
"না।"
"ফোন করে নিলেই হয়। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?" দু'চামচ চিনি দিলেন প্রিয়নাথ।
হেসে ফেলে সায়ম, "তোমাকে বলে যায়নি?"
"হাসলে কেন?"
"এমনি।"
প্রিয়নাথ ঘাড় নেড়ে বলেন, "পাবলিক চরিয়ে খেয়েছি। ইঙ্গিতই যথেষ্ট। আমাকে সে না জানিয়ে গিয়েছে শুনে খুশি হচ্ছ। অদিতি আসলে তোমাকে ইগনোর করছে। আমাকে নয়।"
হেসে ফেলাটা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। অদিতির শ্বশুরপ্রীতি সাংঘাতিক। পুত্রবধূ হিসেবে প্রিয়নাথই নির্বাচন করেছিলেন। তখন তার দ্বিতীয়বার বিয়ে করার ইচ্ছেটাই মরে গিয়েছিল। প্রথম থেকেই সায়মের ইচ্ছা ছিল লাভ ম্যারেজ করবে। সে সুযোগ আর হল না। কেউ তার দিকে এগিয়ে আসেনি। দীঘল চোখের মাধুরী কবিতায় এলেও বাস্তবে অধরাই থেকে গেল। মায়ের তখন লাস্ট স্টেজ চলছে। ওরাল কার্সিনোমা। শেষ ইচ্ছে, একমাত্র সন্তানকে সংসারী দেখে যাবেন। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় দশদিনের মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেললেন প্রিয়নাথ। মায়ের মুখ চেয়েই সে ফাইনাল রাউন্ডে 'হ্যাঁ' বলেছিল। নিস্পৃহ সায়ম রেজিস্ট্রি ম্যারেজের সময়ই প্রথম দেখেছিল অদিতিকে। তার জীবনের দ্বিতীয় নারী।
"ফাইন। ফ্লেভারটা আসছে," প্রিয়নাথ সসপ্যানের উপর ঈষৎ ঝুঁকে পড়েন, "মাঝেসাঝে অবাক হই তোমাকে দেখে। সাংসারিক বুদ্ধি কবে যে হবে! তখনই বুঝি অদিতি একেবারে রাইট সিলেকশান। সংসারটা গুছিয়ে করতে পারবে।"
নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করে সায়ম।
একটা কাপ বাড়িয়ে প্রিয়নাথ বলেন, "নাও। কেমন লাগছে বলবে?" ছোট্ট চুমুক দিয়ে মিথ্যে বলল সায়ম, "নাইস।"
মৃদু অবিশ্বাসে তাকিয়ে থাকেন প্রিয়নাথ। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁর। সায়ম তড়িঘড়ি চা শেষ করে। সর্বনাশ, এবার হয়তো বিস্তারিত জেরা আরম্ভ হবে। প্রিয়নাথ কখনও নিরপেক্ষ হতে পারেন না। ঘুরেফিরে তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থন অদিতির দিকেই থাকে। নিজের ঘরে ফিরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সায়ম। নির্জনতা বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। তবে এমন কিছু দুর্লভ মুহূর্ত থাকে যখন একা থাকাটা জরুরি। ছন্দপতনের দুঃখে সায়ম বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে। নীচে নামাটাই ভুল হয়েছিল তার।

{২}

মাঝে-মাঝে চেনাবৃত্তের পরিধি ছাড়িয়ে ক'টা দিন কোথাও যেতে ইচ্ছে করে। একা কোনও নির্জন দ্বীপে চলে যাওয়ার তীব্র নেশায় তোলপাড় হয় শরীর। মনে একবার মেঘলা অভিমান জমেছিল তার, কাউকে না জানিয়ে হলিডে হোমের বুকিং সেরে শনিবারের দুপুরে বেরিয়ে পড়েছিল সে। অচিন কোনও দ্বীপ নয়, পরিচিত সমুদ্রসৈকত দিঘা। হলিডে হোমের ম্যানেজার কাগজপত্র দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন,
"লেখা আছে ফ্যামিলি! আপনি দেখছি একা এসেছেন!"
সায়ম উত্তর দিয়েছিল, "ওরা আসতে পারেনি।"
"আপনি একা থাকবেন?"
"হ্যাঁ।"
"দুঃখিত। আপনাকে অ্যালাও করতে পারছি না।"
"কেন?" সায়ম অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিল।
"এখানে কোনও হোটেলেই কাউকে একা ঘর দেওয়া যাবে না। তেমনটাই ডিসিশান হয়েছে।"
"কারণটা জানতে পারি?"
ম্যানেজার সরাসরি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ধীরগলায় বললেন, "এখানে অনেকে সুইসাইড করতে আসে, পেপারে পড়েননি?"
সায়ম ইঙ্গিতটা স্পষ্ট বুঝতে পারল। এত দূর এসে ফিরে যেতে হবে শেষপর্যন্ত!
সে আত্মহত্যা করতে আসেনি বললে লোকটি বিশ্বাস করবে না। তাকে কি খুবই বিধ্বস্ত, বিমর্ষ দেখাচ্ছে? ভাঙচুরের চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার মুখের রেখায়!
মরিয়া সায়ম রাগত ভঙ্গিতে বলেছিল, "বুকিং করে এসেছি। তা ছাড়া আমি এই ব্যাঙ্কের স্টাফ।"

ম্যানেজার ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলে নিলেন। ফোন রেখে মৃদু হেসে বললেন, "ঠিক আছে। ঘরের চাবিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সন্ধেয় সমুদ্র দেখল সায়ম, হোটেলে খেয়ে নিল। দু'পেগ পান করার পর আর ইচ্ছে হল না। ব্যালকনিতে ঠায় বসে থাকল সে। স্নায়ুকোষ জুড়ে ঘুমের বাজনা বাজে। ঘুম তবু আসে না। ব্যালকনি ঢেউবারান্দা হয়ে যায়। দূরে ঝাউবনের আড়ালে তারা মিলিয়ে যায়। সমুদ্র পিয়ানো আর শোনা যায় না। অদিতি, প্রিয়নাথ দু'জনেরই উদ্বিগ্ন ফোন এসেছে সন্ধের মুখে। রাত দশটায় শ্রুতিপারে রোহনের ভেজা গলা বেজে উঠতেই তার মনে টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছে। ঢেউবারান্দায় সংসারের ছায়া। তাকে ফিরতে হবে। সে ছাপোষা মানুষ, সংসার তার সাধের একতারা। বাউন্ডুলে এ জন্মে আর হওয়া গেল না। একটা দিন বৃত্তের বাইরে স্বাধীনভাবে থাকার আত্মবিশ্বাস তার নেই। রিমঝিম স্নায়ুকোষ আশ্রয় খুঁজে পেতে চাইছে।

ভোরেই ফেরার বাস ধরেছিল সায়ম। নির্ঘুম রাতে একান্ত অন্ধকারে ভেসে উঠেছিল কিছু অক্ষর। 'তুমি যদি বসে থাকো চুপচাপ / গান দিয়ে জড়াব যে অল্প / সব তারা নিভে গেলে ঝাউবনে / শুরু হবে আমাদের গল্প।'

সেই শুরু। সায়ম ডায়েরিতে চুপিচুপি একটার পর-একটা লিখে গিয়েছে। মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেনি অনেক দিন। কথায়-কথায় রমিতকে বলে ফেলেছিল শেষে।

"গান?" রমিত আশ্চর্য চোখে তাকাল।

"হ্যাঁ।"

"কী করে বুঝলে ওগুলো গান?"

"সেভাবেই চেষ্টা করেছি।"

রমিত হেসেছিল, "সুর বসবে, কম্পোজ় হবে। তারপর তো গান বলা যায়। লিরিক্স বলে ভেবে ফেলাটা বোকামো। পাগলামো করছিস কিন্তু।"

নিষ্প্রভ, আশাহত চোখে তাকিয়েছিল সায়ম।

রমিত ঘাড় দোলায়, "তুই কাউকে জানিস না। কেউ তোকে চেনে না। মফস্‌সলে থাকিস। পারফরমিং আর্টের অনেক সিঁড়ি থাকে। এমনিতেই ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড সিস্টেমের ঠেলায় মিউজ়িক ইন্ডাস্ট্রির নাভিশ্বাস উঠছে। পার্ক স্ট্রিটের মিউজ়িক ওয়ার্ল্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সিডি বিক্রি পড়তির দিকে। বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে হবে তোকে। আবেগ সরিয়ে রাখ।"

"তা হলে?"

"নিজের কাছেই রেখে দে। বাইরে টেনে বের করার চেষ্টা করিস না। ঠোক্কর খাবি। সৃষ্টির আনন্দ গোল্লায় যাবে।"

নিষেধ শোনেনি সায়ম। শিল্পীদের ই-মেল অ্যাড্রেস জোগাড় করে পাঠিয়ে দিয়েছে। কেউ সাড়া দেয়নি। রমিতের কথাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। চেষ্টা তবু ছাড়েনি সে। আবার ই-মেল, কুরিয়ার। মোবাইলে মেসেজ করে সায়ম, 'প্লিজ় একটিবার পড়ে দেখুন।' রাতারাতি কেউ তার লেখা গান করে ফেলবে না। অন্তত তার প্রয়াস গান হিসেবে উত্তীর্ণ হতে পারে শুনলেই প্রত্যয়ী হবে সে। সরাসরি ফোন করার সাহস সে পায় না।

অপেক্ষায় ক্লান্ত হতে-হতে সুনীতকে ফোনে ধরল সে।

"হ্যালো, কে বলছেন?"

"আমি গান পাঠিয়েছিলাম," পরিচয় দিল সায়ম।

"পেয়েছি। তবে কী জানেন, মিউজ়িকের জগৎ এখন ক্রাইসিসের মধ্যে যাচ্ছে। সিডি করার আপাতত প্ল্যান নেই," সুনীত আন্তরিক এবং ভদ্র। "জাস্ট মতামত জানাবেন। মানে..."

সুনীত বললেন, "শিওর। সময় পেলে অবশ্যই চোখ বোলাব। রাখছি।"

সাত মাস কেটে গিয়েছে তারপর। দু'বার মেসেজ করে মনে করিয়ে দিয়েছে সায়ম। তরুণ সুনীত গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয়। দেশবিদেশে প্রচুর ফাংশন করেন। ব্যস্ততার তুঙ্গে থাকা এমন একজন তাঁর লিরিকসের কথা ভুলে যেতে পারেন। ব্যস্ত বলেই হয়তো সুনীত মেসেজের উত্তর দিতে পারেননি।

মোবাইলটা কোথাও বাজছে। স্ক্রিনে দুটো মিস্‌ড কল। শেখরদা তাকে ডাকছেন। একেই বোধ হয় টেলিপ্যাথি বলে। সাহস করে শেখরদাকে নতুন লেখা গানটি দেখানোর কথা মাথায় এসেছিল একটু আগে। শেখরদা শুনে হয়তো হেসে ফেলবে। সর্বনাশ, ব্যর্থ পার্টটাইম কবি এবার গান লিখেছে! শেখরদা চিরকালই উন্নাসিক। কবিতার নিষ্ঠাবান পাঠক। গানপাগল। বন্ধু রমিতের ভাষায় 'এ গ্রেড ইন্টেলেকচুয়াল।' আর্কিটেক্ট শেখর পাঠক তার জ্ঞাতিসম্পর্কের দাদা। ষোলো বছরের বড় এই মানুষটির সঙ্গে তার টিউনিং মিলে যায়। বয়সের বাধা অতিক্রম করে শেখরদা তার একজন কাছের মানুষ। কাছের মানুষ হলেও তাঁর বাড়িতে ঘনঘন যেতে ইচ্ছে করে না। এখন না গিয়ে উপায় নেই। বারবার কেউ এভাবে ডাকলে সাড়া যে দিতেই হয়।

{৩}

গেট খোলা, লনে গোড়ালি ডুবে যাওয়া ঘাস, চারদিকে আগাছার জঙ্গল। লোকে বলে, 'জাহাজবাড়ি'। অনন্ত সবুজ সমুদ্রের মাঝখানে নিঃসঙ্গ জাহাজ হয়ে বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে। মার্বেলের নেমপ্লেটে লেখা 'ধ্রুপদ'। ধুলোমলিন, ঝাপসা নামটি খুব মনোযোগ দিয়ে না দেখলে আজকাল বোঝা যায় না। দেড়বছর আগে এই লোহার গেট দিয়ে ধ্রুবর নিষ্প্রাণ দেহ বেরোতে দেখেছিল সায়ম। বাগনানের কাছে মর্মান্তিক বাইক-দুর্ঘটনা ধ্রুবকে কেড়ে নিল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ও দেয়নি। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ধ্রুব মাত্র পঁচিশেই চলে গেল। তখন থেকেই বাড়িটির কোণে মৃত্যুর ঘ্রাণ অনুভব করে সায়ম। দোতলায় মস্ত বড় ঘর। শেখরদা প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন 'হাওয়াঘর'। চারপাশে তিনতলা বাড়ির জঙ্গল হাওয়া আটকে দিয়েছে এখন। দিনের অধিকাংশ সময় এই ঘরেই থাকেন শেখরদা। চোখধাঁধানো ইন্টিরিয়র ডেকরেশন সৌন্দর্য হারিয়েছে। অগোছালো, অবিন্যস্ত অবস্থা। দেওয়াল আলমারি, র‍্যাক, বইপত্র আর সিডিতে ঠাসা। টেবিলেও বই এবং সিডির ভিড়। একটি বই আধখোলা। কয়েকটা সিডির খাপ টেবিলের নীচে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে আছে। মেঝেতেও ইতস্তত জিনিসপত্র ছড়ানো। ধূপের মিহি সৌরভ ভেসে আসছে নাকে। ফুলদানিতে পচা জল, ফুল শুকিয়ে গেলেও জল ফেলার সময় হয়নি। কড়ে আঙুলে গরম কিছু টের পেতেই লাফিয়ে উঠল সায়ম। ধূপদানিটা ধাতব শব্দ করে গড়িয়ে পড়ল টেবিলের নীচে। ইজিচেয়ারে আধশোয়া শেখর চোখ খুলে তাকালেন। বিরক্ত গলায় বললেন, "মুডটা নষ্ট করে দিলি।"

কড়ে আঙুলে হাত বুলিয়ে সায়ম বলে, "বিকেলবেলা ধূপ জ্বালিয়ে বসে আছ কেন?"

কানে গোঁজা হেডফোন খুলে দিলেন শেখর, "নাকে বদগন্ধ আসছিল খালি। টোটাল পলিউশান। টিভিনিউজ দেখার পর থেকেই গন্ধটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বাগদাদে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে পঁচিশজন ছিন্নভিন্ন। ঝাড়খণ্ডে বাস উলটে গিয়ে বারোজন স্পট ডেড। কোথাও আশি বছরের বৃদ্ধাকে খুন করে ডাকাতি। নাবালিকাকে গণধর্ষণ। চারদিকে রক্ত। আর রক্ত এত দুর্গন্ধ নিয়ে থাকা যায়?"

সায়ম নিরুত্তর থাকে। ধূপ জ্বালানো প্রায় বাতিকের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। প্রথম দিকে মর্গের গন্ধ পেতেন, খেতে বসেই বমি উঠে আসত গলা বেয়ে, শ্বাসকষ্ট হত ঘনঘন। তখন থেকে ধূপ কেনা শুরু। ধূপের পাশাপাশি নিয়মিত রুমফ্রেশনারও কেনেন শেখরদা। ধূপের আগুন কখনও নেভে না মনে হয়।

"গান শুনছিলে?"

"তুই এসে গানটার বারোটা বাজিয়ে দিলি।"

"সরি টু ডিসটার্ব ইউ। চলে যাচ্ছি।"

ঝাঁঝালো গলায় শেখরদা বলেন, "শাট আপ। ফর্মালিটি করবি না। গুরুদেবের পোস্টার আনতে বলেছিলাম। এনেছিস?"

আমতা-আমতা করে সায়ম, "না, এখনও জোগাড় করা যায়নি। আসলে..."

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিরুপে চোখ নাচালেন শেখর, "মনে ছিল না। তাই না? বাজার, দোকান, সংসার ছেলের টিউশান। লম্বা ফর্দ শোনাবি। পলিসি আর বন্ড ম্যাচিওরিটির ডেট কিন্তু ভুলে যাবি না। দশদিন আগে থেকে মেমরিতে লোড হয়ে যায়। প্যাশন শব্দটাই মানুষের জীবন থেকে লোপাট হয়ে যাচ্ছে। লিভিং বডি উইদাউট সোল। চারদিকে জ্যান্তমড়ার দল গিজগিজ করছে। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ছুটে মরছে। কাল এক ছোকরা হানা দিয়েছিল। সে নাকি তরুণ প্রথাভাঙা কবি। লিটল ম্যাগের সম্পাদক। বিজ্ঞাপন দেবার জন্য ধরেছিল।"

"আচ্ছা," সায়ন অভিজ্ঞতায় জানে এখন প্রশ্ন করা চলবে না।

"কথাবার্তায় তুখড়। মুখে যেন পপকর্ন ফুটছে। কবিরা আজকাল অনেকেই নির্জনতায় বিশ্বাসী নয়। পারলে চোঙা ফুঁকে নিজেদের জাহির করে বেড়ায়। তিনটে নমুনা পড়ে দেখলাম। মালুম হল মালটা শুধু শব্দ নিয়ে খেলা করেছে। শব্দের কারসাজি আর ফাঁকি। আমি না বোঝার ভান করতেই গালভরা তত্ত্ব কপচে দিল। অতিচেতনা, নিরাবেগ, শব্দের স্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি-ইত্যাদি। প্যাশন কোথায় জিজ্ঞেস করতেই গলা গম্ভীর করে বলল, 'শূন্য আবেগের যুগ চলে এসেছে কবিতায়। শব্দই ব্রহ্ম।' আমি হেসে বোঝালাম ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মা আছে। আত্মা মানে অনুভব। চূড়ান্ত প্যাশনের পর গভীর অনুভব। কাঠগোলার মালিক, প্রোমোটার, ঘুষখোর অফিসার, মর্গের ডোম শূন্য আবেগে চলে। তেতো মুখ দেখে বোঝা গেল, গিলছে না। হজম হচ্ছে না। তখনই বুঝলাম ব্যাটা আধমরা কবি। বুঝলি?"

"না।"

"গুচ্ছের কবিতা লিখে কাগজ আর সময় বরবাদ করবে। দাগ থাকবে না। গুলঙ্গারের গান শুনেছে কিনা প্রশ্ন করলাম। মুখ সরু করে জবাব দিল রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া কিছু সে শোনে না। আমাকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রেম বোঝাচ্ছে! তখনই ব্যাটাকে জ্বলন্ত ধূপকাঠির ছ্যাঁকা দেওয়ার ইচ্ছে হল। এর পর হয়তো বলে বসবে, ওসব বাজারি গানটান।"

"সত্যি ছ্যাঁকা দিলে?" কৌতূহলে সায়ম নড়েচড়ে বসে।

শেখরদার মুখে সরল হাসির তরঙ্গ, "না, হাজার হোক ছেলের বয়সি। তবে পরোক্ষে শাস্তি দিয়েছি। গুলঙ্গারের লেখা দশটা গান মন দিয়ে শুনতে হবে। প্রত্যেকটা গানের প্রথম চার লাইন লিখে আনতে হবে। হোমটাস্ক করেছে দেখালেই, ওকে হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দেব।"

সায়ম হাসে, "তোমার উদ্দেশ্যপূরণ হবে না। নেট থেকে লিরিক্‌স পেয়ে যাবে। চল্লিশটা লাইন টুকতে কতক্ষণ আর লাগবে।"

গাল চুলকোয় শেখরদা, "রাগের মাথায় এই বেসিক ব্যাপারটা মাথায় আসেনি। আমারই ভুল। তবে আমার ঘরে ঢুকে তুই যে ছ্যাঁকা খেয়েছিস এটা পোয়েটিক জাস্টিস। ভি আই পি হয়ে গিয়েছিস। ফোন করলে তবে তোর পায়ের ধুলো পড়ে।"

নীলাবউদি প্রায় নিঃশব্দে ট্রে নামিয়ে রাখলেন। একবার হাসার চেষ্টা করলেন। হাসি নয়, ক্যানভাসের বিষণ্ণ আঁচড়। দরজা ভেজিয়ে চলে গেলেন। শেখরদা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

"চা ঠান্ডা হয়ে যাবে যে!" সায়ম বলল।

বিহ্বলতা ভেঙে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ শেখরদা, "বেরসিকের মতো বিহেভ করিস না। তুই ছাড়া কার সঙ্গে শেয়ার করব বল?"

শেখরদা একটা সিডি বের করে আনেন র‍্যাক থেকে, "গুরুদেবের গান, বহুশ্রুত নয়। বেস্ট সং কালেকশনে থাকে না। শুনলে বুঝতে পারবি।"

শেখরদার কাছে গুরুদেব হলেন কিশোরকুমার। কিশোর সম্পর্কে ভীষণ স্পর্শকাতর, কোনও সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। ঝুরিভাজা মুখে পুরে কাপে চুমুক দিয়ে শেখরদা খুশিতে মাথা নাড়েন, "লাভলি। অনেক দিন পর নীলা জম্পেশ বানিয়েছে। তোর খাতিরে।" গান শুরু হয়, 'ইয়ে মেহফিল ইউঁ হি সাজেগী/ দুনিয়া ইউঁ হি চলেগি / জো ধড়কন কিসিকি রুকে / তুম রুকো না / তারা টুটে কোই

অগর/ অম্বর খালি না হোগা / রশন আপনি রাজ করো / সোচো না তুম কব ক্যায়া হোগা।'
শেখরদার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু। বিব্রত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ধরা গলায় বলেন, "চোখে মনে হয় অ্যালার্জি হয়েছে।"
সায়ম চুপ করে বসে থাকে। চিরকালের আমুদে মানুষ, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, মুখে হাসি লেগে থাকত সারাক্ষণ। ধ্রুবর অকালবিয়োগের পর দু'মাস স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর গান আর লিরিক্স নিয়ে মেতে উঠলেন। স্তব্ধতা হয়তো তাঁর কাছে শোক এবং শূন্যতার নিষ্ঠুর রূপ। সেই শূন্যতা ভুলতে শব্দ-সুরের মূর্ছনাকে আঁকড়ে ধরেছেন শেখরদা। গান শেষ হতেই শেখরদা তাকালেন, "কেমন লাগল?"
"ভাল।"
"মন ভোলানোর জন্য বলবি না। বাংলায় তর্জমা করে বুঝিয়ে দে। তবেই বুঝব গানের আত্মায় একাত্ম হতে পেরেছিস।"
"এই মেহফিল।"
বিরক্ত হয়ে থামিয়ে দিলেন শেখরদা, "মেহফিলের বাংলা হয় না?"
"আমি নিখুঁত হিন্দি জানি না। অনুমানে বোঝার চেষ্টা করি,"
সায়ম বলল।
"ও কে। শুরু কর।"
"এই জলসাঘর এভাবেই সাজবে / পৃথিবী এমন ছন্দেই চলবে / কারও হৃৎস্পন্দন থামলেও / তুমি থেমো না।"
"হচ্ছে। এগিয়ে চল।"
অসহায় চোখে সায়ম তাকায়, "কোনও তারা যদি খসে পড়ে / আকাশ খালি হয় না / নিজের আলো জ্বেলে বেঁচে থাকো/ কবে কী হবে তুমি ভেবো না।"
"এই জন্যই তোকে ডাকি," শেখরদা উঠে এসে জড়িয়ে ধরেন, "জলসাঘর থাকবে। আমি না থাকলেও পৃথিবী নিজের ছন্দে চলবে। এই হাওয়াঘরের উত্তরাধিকার তোকে যদি দিতে পারি! এখানে সুরের মূর্ছনা কখনও যেন থেমে না যায়। চল, ছাদে গিয়ে দাঁড়াই।"
পশ্চিমদিকে পি ডব্লিউ ডি বাংলো। বাংলোর ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছে বকেদের বাসা। বিকেলের শেষে গাছটিতে বকেদের উড়ে-উড়ে ফিরে আসা অনেকবার দেখেছে সায়ম।
শেখরদা বললেন, "কী ভাবলি?"
"কোনটা?" সায়ম বিভ্রান্ত।
"এত ভাইটাল ইস্যুটা ভুলে গেলে চলবে? আর-একজনকে পৃথিবীর আলো দেখতে দে।"
"অদিতি রাজি নয়। মা হওয়ার ব্যাপারে জোরজার করতে তো পারি না।"
শেখরদা মাথা ঝাঁকায়, "বারবার বোঝাবি। আমাদের মতো ভুল করিস না। তোদের প্রজন্ম সবাই একটিকে নিয়েই অস্থির। নিজেদের অপূর্ণ স্বপ্ন সবেধন নীলমণির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছিস। নাচ-গান-ড্রয়িং-সাঁতার। ভাল রেজাল্ট। সোনার কেরিয়ার। অসহিষ্ণু, যান্ত্রিক করে দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের। একমাত্র বন্ধু বোকা বাক্স। দেখেশুনে আমার জঙ্গি হতে সাধ হয়। সচ্ছল মধ্যবিত্তর জীবন থেকে ভাই, বোন ইত্যাদি কনসেপ্টগুলো মুছে যাবে একদিন। পাশের বাড়িতে এক বাবা গতকাল সন্ধেতে পাড়া মাত করে চেঁচাচ্ছিল, 'ইউনিট টেস্টে কম পেয়েছিস এত, ছি, মুখ দেখাতে পারব না। তোর জন্য গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে।' ওঁকে আজ সকালে আচ্ছা করে শুনিয়েছি, 'মশাই, আপনি দেখছি মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। ছেলের কম মার্কসের কারণে গলায় দড়ি দিলে গিনেস বুকে নাম উঠে যাবে। দেরি করছেন কেন?' মুখচোখ লাল করে তিনি চলে গেলেন। এ জন্মে হয়তো আর আমার মুখই দেখবেন না। ধ্রুব ক্লাস নাইনে অঙ্কে সিক্সটি পেয়েছিল। তবু সে শিবপুর থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে পেরেছিল।"
শেখরদা আত্মমগ্ন হয়ে পড়েন, "স্নেহ খুব অভিমানী। হারালে ফিরে পাওয়া যায় না। আমি এখন যদি চাকরি ছেড়ে দিই কাজের অভাব নেই। নীলা কী নিয়ে থাকবে বল? ঠাকুরঘরে ঠাঁই নিয়েছে। লক্ষণ সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমার মতো যদি একটিবার বুঝত গানই ঈশ্বর, সুর ঈশ্বরের সাধনা।"
"বোঝাওনি কেন?"
"কম চেষ্টা করিনি। আমিই নাকি পাগলামো করি! ওই বন্ধঘরে পাথরের মূর্তির সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে। ইচ্ছে হয় নকুলদানা, বাতাসার থালা ছুড়ে ফেলে দিই। সামলে নিই নিজেকে। মনে আঘাত পাবে। এখন দাম্পত্যকলহের সময় নেই, ইচ্ছেও নেই। নিজের মতো থাকুক। ডিসটার্ব করব কেন?"
হঠাৎ নির্বাক হয়ে যান শেখরদা। শব্দহীনতার মোড়কে ঢেকে যায় বিকেলের উচ্ছ্বাস। শেখরদার চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে। শুধু ডানহাতের তর্জনীটি মৃদু সঞ্চালিত হয়। সেই মুদ্রা প্রার্থনার ভঙ্গিতে সন্ধে আবাহন করে। শান্ত, নির্মোহ সন্ধে।

{৪}

নতুন লেখা গানের কথা শেখরদাকে বলা গেল না। আত্মমগ্ন বিষাদে শেখরদা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন ছাদের কিনারায়। প্রায় চুপিসারে সে পালিয়ে এসেছে। একটা সিগারেট ধরানোর জন্য তেঁতুলতলার মাঠে বাইক স্ট্যান্ড করে সায়ম দাঁড়িয়ে পড়ে।
এই প্রাচীন শহর আর ভাঙাচোরা অলিগলি পেরিয়ে সে আর কোথাও পৌঁছতে পারবে না। তার বন্ধুরা বরং সিঁড়ি ভেঙে উঠেছে। ঠিকানা বদলেছে। শহর থেকে নগর, নগর ছাড়িয়ে বিদেশ। গণ্ডি অতিক্রম করে স্কাইলাইন স্পর্শ করে ফেলার যোগ্যতা আর সাহস দেখিয়েছে। প্রথম যৌবনে ভেবেছিল সাধারণ হবে না। ভিড়ের একজন হবে না। অসাধারণ হওয়ার চাবিকাঠি খুঁজে পায়নি সে। পঁচিশে পা দিয়ে বুঝল, লাখ-লাখ বেকার যুবক-যুবতীর ভিড়ে সে একজন মাত্র। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্কে ভোগে দিন। হাত্যে হয়ে পায়ের নীচে মাটি খুঁজছিল সে। একটার পর-একটা চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে। লাগছে না। পঁচিশখানা কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে মুষড়ে পড়েছিল। এবার সে পাগল হয়ে যাবে। তারপর চাকা ঘুরল। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে চাকরি পেল সায়ম। সে তখন নামমাত্র বিবাহের পর নিঃসঙ্গ পুরুষ।
অনেকদিন লজ্জা এবং গ্লানিতে বাইরের জগতে বেরোতে পারেনি সে। আত্মীয়-পরিজন, স্বল্পপরিচিত মানুষদের ফিসফাস চলেছিল প্রায় ছ'-সাত মাস। টিপ্পনি ভেসে আসত কানে। নিশ্চয়ই শারীরিকভাবে অক্ষম। তাই বউটা পালিয়েছে। কী জানি বাবা। অত্যাচারও করেছিল হয়তো। ন'দিনের মাথায় না হলে নতুন বউ চলে যায়? এভাবে বেশিদিন চললে সে পুরোপুরি ইনসমনিয়ার রোগী হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত সে এই বঙ্গদেশের নিরীহ, আপসপ্রিয় চাকরিজীবীদের একজন হয়ে গিয়েছে। পরপর তিনটি রুরাল ব্রাঞ্চে পোস্টিং ছিল। পরে ইউনিয়ন নেতাদের ধরেটরে হেডকোয়ার্টারে বদলি হতে পেরেছে। এই শহরেই ব্যাঙ্কের হেডকোয়ার্টার। ডিগ্রি এবং স্বাবলম্বী হবার চাপে কবিতা অনেকদিন আগেই বিদায় নিয়েছিল। প্রিয়নাথ এই একটি ব্যাপারে প্রসন্ন হয়েছিলেন। যা হোক, ছেলেটা শেষ পর্যন্ত বুঝেছে। ওদিকে জেলখানার উঁচু পাঁচিল। নিবিড় নীরবতায় পড়ে আছে প্রায় জনশূন্য মাঠ। ঘনায়মান স্তব্ধতাকে ভয় পেল সায়ম। একবছর আগে তাদের বিছানা আলাদা হয়ে গিয়েছে। পরোক্ষে রোহন এখন অদিতির বডিগার্ড। একবার ভোরের দিকে সায়ম অদিতিকে জড়িয়ে ধরেছিল। আবেশে অদিতির বুকের সাদা জ্যোৎস্নায় মুখ রেখেছিল সে। হঠাৎ রোহনের তীব্র কান্নার আওয়াজে দু'জনেই ধড়মড় করে উঠে বসল। আক্রোশে ফুঁসছে রোহন। বালিশ ছুড়ে দিল রাগে। তার নরম আঙুল আঁচড়ে দিতে চাইছে অদিতিকে। রোহনের ধারালো দৃষ্টির সামনে লজ্জায় কুঁকড়ে গেল সায়ম। পরের রাত থেকে বিছানা বদল। ঘরবদল। ইদানীং চুপিচুপি সরেজমিনে তদন্ত করে তারা মিলিত হয়।
এদেশে বাৎসল্য আগে, যৌনতা পরে। এখনই সায়ম যৌবনকে আলবিদা জানাতে রাজি নয়। এখনও যে নিজেকে প্রাণবন্ত যুবক

ভাবতে ইচ্ছে করে!
রাস্তা আর অন্ধকার নেই। দু'দিকে দোকানপাট, লোকজনের ভিড়। বিনম্র ভঙ্গিতে নিওন আলো মাখছে দেবদারু, রাধাচূড়া, নিম। সায়মের মাথায় গানের সুর জেগে উঠতে চায়। আলোস্নাত পাতারা অল্প হাওয়ায় দুলে-দুলে চলে আর সেই হাওয়া সঙ্গত করে শব্দরা ভেসে আসে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড নিজের ছন্দেই জেগে থাকবে কোটি-কোটি বছর। সে তারা হতে পারবে না। তা বলে কোনও সার্থকতা ছাড়াই সে নিঃশেষ হয়ে যাবে? অস্থির হাত অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিয়ে গতি বাড়িয়ে দেয়। হারমোনিয়ামের রিড কখনও ছোঁয়নি তার আঙুল। সুরতালের প্রাথমিক জ্ঞান তার নেই। গান সে তবু লিখে যাবে।
ভাবনায় বুঁদ হয়ে বাড়ি পৌঁছতেই সে দেখল অদিতি ডাইনিং ঘরে বসে আছে। অদিতি যেন তার অপেক্ষাতেই ছিল। ঠোঁটে হাসির আভাস,
"কোথায় গিয়েছিলে?"
"ঘুরতে," নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করে সায়ম।
"হুটহাট বেরিয়ে যাও। বলে যেতে পার না?"
"কাকে বলব? তুমি জানিয়ে গিয়েছিলে?"
অদিতির মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য, "না। লিঙ্ক ফেলিওর হলে বলা সম্ভব নয়। তোমার কোনও কাজ আছে?"
কাজ অবশ্যই রয়েছে। শব্দরা দলবেঁধে উড়ে যাচ্ছে দূরে। ধরে ফেলতেই হবে। সেজন্য পড়িমড়ি ছুটে আসা। এই কাজের কথা মুখে বলা অসম্ভব। অদিতির মুখে হয়তো শ্লেষ ফুটে উঠবে। সায়ম নিশ্বাস ফেলে, "না, তেমন কাজ নেই।"

ধন্য শ্বশুর-বউমার যুগলবন্দি। একটা দিন দেরি করে উঠেছে, সে রিপোর্টও ঠিক পৌঁছে গিয়েছে। ক্ষুব্ধ সায়ম আপনমনে গজগজ করে।

"মান্নাবাজার যাব। টুকটাক কেনাকাটা করব। রেডি হব তো?"
"হ্যাঁ।"
"কেনাকাটা করতে কিন্তু সময় লাগবে। বিরক্তি দেখাবে না। আগে থেকে বলে রাখলাম।"
অদিতি এই সুরভিত সন্ধেয় ঠান্ডাযুদ্ধের ইতি ঘোষণা করেছে। ভাবালাপের পূর্বাভাস তার চোখেমুখে। দীর্ঘস্থায়ী মনান্তর কার আর ভাল লাগে! অদিতি আসলে খেয়ালি মেঘ। কখন বৃষ্টি ঢালবে, কখন গুমট রাখবে, নিজেই জানে না।
"রোহন যাবে না?"
"না। ওর ম্যাথ্‌সের টিউটর আসবেন।"
নব্বই বছরের পুরনো মার্কেট এই মান্নাবাজার। সংকীর্ণ রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম। এই হাঁসফাঁস গরমেও মানুষের ভিড়ের কমতি নেই। শপিং থেরাপি মানুষের বেস্ট মেডিসিন। ফেসবুকে এক বন্ধু লিখেছিল। খাঁটি কথা। মানুষজনের মুখে সুখী আভা। ভিড় ঠেলে এগোতে হিমশিম খেল সায়ম।
নরম গলায় অদিতি বলে, "বেশি কেনাকাটা করব না। রোহনের জন্য কটন টিশার্ট নেব। এই গরমে লাগবে। আর আমি দুটো কুর্তি কিনব।"
"আচ্ছা।"
"শুনলে হবে না, খরচা আছে। কুর্তির খরচ তোমার," অদিতি আলতো চিমটি কাটে, "ওটা জরিমানা। ঝগড়া করার শাস্তি।"

মান্নাবাজার জলুস বাড়িয়ে রঙিন হতে শুরু করেছে এখন...

{৫}

দিনের শুরুটা মন্দ হল না। অদিতি ধূমায়িত চা নিয়ে হাজির। আড়মোড়া ভেঙে সায়ম হাসে, "হঠাৎ বেড টি?"
"কেন? মাঝে-মাঝে পাও না?"
"তা পাই। অনেক দিন জোটেনি বলে মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি।"
অদিতি বলে, "আরামের জীবন। বেড টি। মেয়েদের কপালে এমন আয়েস কখনও জোটে?"
লঘু চালে বলে সায়ম, "অপেক্ষা করো। সময় ঠিক আসবে। বুড়োবুড়ি বেলা পর্যন্ত পড়ে থাকব। তুমি তখন গেঁটেবাতে অস্থির। আমি চা বানিয়ে মুখের সামনে ধরে দিচ্ছি।"
রসিকতার উত্তর দিল না অদিতি। ব্যস্তভাবে বলে, "অনেক কাজ আছে। রান্নাপর্ব চলছে। একজন তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন। ফ্রেশ হয়ে নীচে যাও।"
"কে?"
"বাবা।"
"ইউ মিন বিডিওসাহেব! হঠাৎ জরুরি তলব?"
"দরকার আছে," অদিতি আঁচলে মুখ মোছে।
"তুমি জানো?"
"অল্পস্বল্প। কাল নবেন্দুবাবু এসেছিলেন," অদিতি বালিশ গুছিয়ে রাখে। প্রোমোশনের শেষ ধাপে বিডিওর দায়িত্ব পেয়েছিলেন প্রিয়নাথ। অবসরের পরও পেশার খোলস ছাড়তে পারেননি। গলার সুরে কর্তৃত্ব। শাণিত যুক্তি সাজিয়ে বিরুদ্ধমতকে দমিয়ে দিতে পারেন। ঠান্ডা মাথার লোক। সিদ্ধান্ত নিতে পারেন চট করে। নবেন্দু সরকার এই শহরের এক নম্বর প্রোমোটার। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় তার অবিশ্বাস্য শ্রীবৃদ্ধি রূপকথার গল্পকে হার মানায়। গিফ্‌টের দোকানে বসে মাছি তাড়াত একসময়। কাউন্টারে খদ্দের অমিল। নবেন্দু এখন একডজন ধনী ব্যবসায়ীকে অনায়াসে পকেটে রাখার সচ্ছলতায় পৌঁছে গিয়েছে। বছরে কমপক্ষে দু'মাস সপরিবার বিদেশে ঘুরতে যায়।
কোনও ভূমিকা ছাড়াই প্রিয়নাথ প্রসঙ্গে এলেন, "নবেন্দু এই বাড়িটা ভেঙে অ্যাপার্টমেন্ট বানাতে চায়।"
অনুমান মিললেও বিরসমুখে দাঁড়িয়ে থাকে সায়ম। গতকাল বিকেলে বাবা বাড়ি সারানোর কথা তুলেছিলেন। সিদ্ধান্ত যে অলরেডি নিয়ে ফেলেছেন বলেননি। সংসারটাকে ব্লক অফিস ভেবেছেন। প্রিয়নাথ জরিপের চোখে তাকান, "তোমার কী মত?"
"আমি তো কিছুই জানি না।"
"ডিটেল্‌সে বলছি। পাঁচকাঠা জায়গা। প্রোমোটার মার্কেট ভ্যালু, পোজিশন ইত্যাদি দেখে এগোয়। পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হবে। আমরা দুটো ফ্ল্যাট রাখব। কোন তলায় সেটা পরে ঠিক করব। ফ্ল্যাট ছাড়াও লিকুইড ক্যাশ পাব। টাকার অঙ্কটা দরাদরি করে ফাইনাল হবে। ভেবে দেখলাম ডিলটা মন্দ নয়। বাড়ির বয়স বাহান্ন হল।"
একটু থেমে প্রিয়নাথ বলেন, "তুমি নজর করো না। রোদ-জল-ঝড় খেয়ে বাড়ি ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে। প্লাস্টার খসে পড়ছে চারদিকে। বৃষ্টি বেশি হলে জল চুঁইয়ে পড়ে। রিপেয়ার করাতেই কমপক্ষে চার-পাঁচ লাখ বেরিয়ে যাবে। তুমি জন্মানোর ছ'বছর পর বাড়িটা কিনেছিলাম। আশা করি তুমি এসব জানো।"
"হ্যাঁ।"
"ক'দিন চিন্তিত ছিলাম। ওয়েআউট পাচ্ছিলাম না। মেরামতের পিছনে টাকা ঢালা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। দু'দিন বাদে আবার সমস্যা হতে পারে। তোমার মায়ের ট্রিটমেন্টে প্রচুর খরচ হয়েছিল। আমার হাতে তেমন সেভিংস নেই। পেনশনই সম্বল। তুমি এমন কিছু রোজগার করো না। অদিতি পার্টটাইম করে কিছু পায়। তার নিজের শখ-আহ্লাদ আছে। আর্থিকভাবে তোমাদের ব্রাইট প্রসপেক্ট নেই। সো নো

রিপেয়ার, নো রেনোভেশন। নবেন্দুর প্রোপোজাল পেয়ে আমি হাতে লক্ষ্মী পেলাম।"

"কিন্তু..."

হাত তুলে থামিয়ে দিলেন প্রিয়নাথ, "লেট মি ফিনিশ। প্রশাসনে থাকলে একটা গুণ তৈরি হয়। ধৈর্য ধরে শোনা। অস্থিরমতি হলে চলবে না। কম্পিউটার আর ফাইল ঘাঁটা সহজ কাজ। এই বয়সে দৌড়ঝাঁপ করতে পারব না। তোমার আবার ছুটি কম। সবচেয়ে বড় কথা, এই কাজে তোমার প্যাশনের অভাব রয়েছে। ঘরবাড়ি মেরামতে প্যাশন, অভিজ্ঞতা দুটোই লাগে। বাড়ি ভাঙা আর ফ্ল্যাট তৈরি রাতারাতি সম্ভব নয়। টাইম লাগবে। নবেন্দু দেড়বছর বললেও শেষমেশ দু'বছর লেগে যেতে পারে। তদ্দিন কোথায় থাকব আমরা? এই পিরিয়ডটা আমাদের অন্য কোথাও বাসা নিয়ে থাকতে হবে। ভাড়াটে হয়ে কষ্ট করে কাটাতে হবে। সবই অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার। ভাড়া আমাদের দিতে হবে না। এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী সেটা পে করবে নবেন্দু।"

"অদিতি কী বলছে?"

প্রিয়নাথ হাসেন, "ওর সঙ্গে আলোচনা আগেই সেরে নিয়েছি। ও এককথায় রাজি। দাদুভাইয়ের ভবিষ্যৎ আছে। মেধাবী হলে নিজের যোগ্যতায় কেরিয়ার তৈরি করে নেবে। বাকিদের জন্য একটিই ফরমুলা। পয়সা ঢালো, কেরিয়ার বানাও। টাকার থলি নিয়ে রাইট জায়গায় নক করো। সুধীরের ছেলে পাশকোর্সে পড়ছিল। অনার্স জোটেনি। প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে চলে গেল। এখন স্টেটসে আছে। আমি টাকার বন্দোবস্ত করে রাখছি। প্ল্যান করে এগোলে পরে পস্তাতে হয় না। রোহন মাস্ট হ্যাভ ব্রাইট কেরিয়ার। বাড়িটার মায়া ত্যাগ করে অনেক পজিটিভ সলিউশন পাচ্ছি। গড়তে গেলে ভাঙতে হয়। আঁকড়ে থাকার নাম মূর্খামি। এবার তুমি বলো।" নিভন্তস্বরে সায়ম বলে, "আমি আর কী বলব! সবই তো ফাইনাল।" খাদে নামে প্রিয়নাথের গলা, "ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল। তুমি এই বৈষয়িক ব্যাপারগুলো রপ্ত করতে পারোনি। তোমার বয়সে আমিও অত বুঝতাম না। পরে অনেক ঘাটের জল খেয়ে আয়ত্ত করেছি। ডিসিশন একতরফা ভাবতে পারো। জোর দিয়ে বলছি, এতে তোমাদের ভাল হবে। তোমাকে নিমরাজি মনে হচ্ছে।"

"একদম না," নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল সায়ম।

"তোমার প্রতিটি এক্সপ্রেশন পড়ে ফেলার ক্ষমতা রাখি, বুঝলে? কেননা আমি তোমার বাবা। মেন্টালি প্রস্তুত হও। নবেন্দু কখন কাজ শুরু করতে পারবে বলেনি। অনেক ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করছে। তা হলে ওই কথাই থাকল। ডিল ফাইনাল মনে হয় আগামী সপ্তাহে হয়ে যাবে। দরাদরি চলছে। সবদিক বাজিয়ে আর একবার দেখব। কোনও ফাঁক রাখা চলবে না। আটটা বাজল। তোমাকে রেডি হতে হবে। বাথরুম যাওয়া হয়নি শুনলাম। বেলা করে না উঠে মর্নিংওয়াকের হ্যাবিট করো। শরীর ফিট রাখতে শেখো।"

প্রিয়নাথ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ধন্য শ্বশুর-বউমার যুগলবন্দি। একটা দিন দেরি করে উঠেছে, সে রিপোর্টও ঠিক পৌঁছে গিয়েছে। ক্ষুব্ধ সায়ম আস্তে-আস্তে বারান্দার একটি চেয়ারে বসে পড়ল সায়ম। কেজো সকালের বিচিত্র, পরিচিত শব্দগুলো কানে আসছে। আজ শব্দগুলোর কম্পাঙ্ক তার কানের পরদায় যেন ড্রাম বাজাচ্ছে। বাইকের শব্দ, সাইকেলের টুং টাং বেল, সবজি ফেরি করার হাঁকডাক, কলের জল পড়ার শব্দ। ভীষণ কর্কশ লাগছে সব এখন। এই ঘরটায় যে মায়ের অস্তিত্ব টের পায় সে। মায়ের মুখে হাসির জলতরঙ্গ। তার ঘেমো মুখ যত্ন করে আঁচলে মুছিয়ে দিচ্ছে মা। জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। মাথার কাছটিতে বসে মা কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। পৌষ সংক্রান্তির সময় পরিশ্রমী হাতে বিচিত্র সব পিঠে বানায় মা। লোভে রান্নাঘরের পাশটিতে ঘুরঘুর করে ছোট্ট সায়ম। হঠাৎ সিঁড়ির মুখে ম্রিয়মাণ, কৃপণ আলো। মায়ের মুখ পাণ্ডুর। অন্ধকারে কাতর চোখ, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে মা।

ভেন্টিলেটরের ফাঁকে অশরীরী কোনও মুখ। এক পা-এক পা করে এগিয়ে আসে। কেমো নেবার পর মাথার চুল পুরোটাই উঠে গেল। একটা আয়না তখন ঘরে রাখেনি সায়ম। ভোরের স্বপ্নে একঢাল কালো চুল আর পাটভাঙা নতুন শাড়ি পরে মা করিডরে ঘুরে বেড়ায়। মৃদু চাপা কান্নার ধ্বনিতে শিহরিত হয় সায়ম। মা এভাবেই আসে, কপালে চুমু দিয়ে বলে, 'তুই কেমন আছিস? ভাল থাকিস সবাই। তোদের ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে।'

সায়মের চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, এই বাড়ির পাঁজরে-পাঁজরে মায়ের স্পর্শ আজও রয়েছে। একটা বাড়ির সঙ্গে মানুষের সুখদুঃখের অন্তহীন স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। এই গোপন সম্পদ হারানোর দুঃখ কীভাবে পূরণ করবে তুমি? প্রশাসনে থাকলে নার্ভ কঠিন হয়, সংবেদন কমে যায়, অনুভূতি ঝেড়ে ফেলা শিখতে হয়। তুমি সেই অভ্যেসের দাস হয়ে কাটিয়ে দিতে চাও কেন? এই ঘর নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই আমি। মায়ের অপার্থিব উপস্থিতি হারিয়ে যাবে এবার? লোন অ্যাপ্লিকেশন বেশি জমা পড়েনি। নিয়মকানুন আগের তুলনায় আঁটোসাঁটো হয়েছে। ব্যাঙ্কে সায়ম কাজে ডুবে থাকে। প্রিয়নাথের চোখে যদিও সে ভাবরাজ্যের বাসিন্দা। আজ কাজের চাপ কম বলে মাথায় চিন্তাফড়িং নাচছে। তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চাইছেন প্রিয়নাথ। আর্থিক নিরাপত্তার কোনও নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। অধিকাংশ মানুষেরই বক্তব্য ঘুরেফিরে এক। নট ফিলিং সিকিওরড। সন্তানের পড়াশোনা রয়েছে, আপদ-বিপদ আছে। নিজের অবস্থায় মুষ্টিমেয় মানুষকেই খুশি থাকতে দেখেছে সে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে অভাব আর অসন্তোষ। সায়ম সেইসব মানুষের কথা ভাবছিল যারা হাজার প্রলোভনেও নিজেদের জরাজীর্ণ বাড়িতেই কাটিয়ে দেয়। ভিটের মায়া ছাড়ে না কখনও। নাছোড়বান্দা প্রোমোটাররা গুন্ডা-মাতাল-নেতার ত্রাহস্পর্শে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। অনেকের চোখে তারা দোকাইদা টাইপ। পা দুটো মাটির কয়েক ইঞ্চি উপরে থাকে। ব্যাঙ্কে আসার আগে অদিতি তাকে একপ্রস্থ বুঝিয়েছে। সায়ম অনর্থক জেদ যেন না করে! অদিতির মুখ জুড়ে আজ থইথই লাবণ্য। ভীষণ তৃপ্ত দেখাচ্ছিল তাকে। সোনালি অর্থকরী ভবিষ্যতের স্বপ্নে অদিতি বিভোর। ছিমছাম ফ্ল্যাটে সাজিয়ে-গুছিয়ে তারা থাকবে। নতুন পোশাক, নতুন দেওয়ালের গন্ধ সবাই ভালবাসে।

ঘনিষ্ঠ হয়ে অদিতি বলেছে, "এতকাল তোমার সঙ্গে ঘর করছি। তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাও। খুশি হতে পারো না কেন তুমি? নেগেটিভ ভাবটা ছাড়ো। সবারই শখ-আহ্লাদ আছে।"

টিফিন-ব্রেক শুরু হতে পাঁচ মিনিট বাকি। কম্পিউটার বন্ধ করে উঠে পড়ল সায়ম। কর্মক্ষেত্রে পোশাকি সম্পর্ক বেশি গুরুত্ব পায়। অধিকাংশ স্টাফ সৌজন্যে, পেশার প্রয়োজনে টুকটাক কথা বলেন। দু'-তিনজন তার বন্ধুস্থানীয়, মন খুলে গল্প করে, সরস আড্ডা চলে। এখানে কেউ চিরস্থায়ী নয়। ট্রান্সফার, প্রোমোশন আছে। দলাদলির ফুরসত কম। অস্থির মনকে তরতাজা করার জন্য ক্যান্টিনে উঁকি দিল সায়ম।

তাকে দেখেই দীপেন চেঁচিয়ে ওঠে, "এসো সায়মদা। পেট গড়বড় নেই তো?"

"কেন?"

"গৌতমের সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম। হেরে গিয়েছে। আজ সমস্ত ইয়ংস্টাফদের ঘুগনি স্পনসর করবে", আয়েসে ঘুগনি খাচ্ছিল দীপেন।

"কীসের বাজি?"

দীপেন মুচকি হাসে, "গাঙ্গুলিদাকে নিয়ে বাজি। ব্যাঙ্কের কেউ ওঁকে হাসতে দেখেনি। মুখে সারাক্ষণ হাসির নো এনট্রি বোর্ড। চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম। আলবাত হাসবে। আজ একেবারে দন্তবিকশিত হাসি। মোবাইল ক্যামেরায় ধরে রেখেছি।"

"কীভাবে পারলে?"

চোখ নাচায় দীপেন, "কৌশল জানতে হয়। কাছে গিয়ে বিনয়ের অবতার সেজে প্রশ্ন করলাম, গাঙ্গুলিদা, শুনলাম তোমার একটি মিষ্টি, ফুটফুটে কন্যা হয়েছে। ওতেই কেল্লা ফতে। ছবিটা কোনও টুথপেস্ট

AMARBOI.COM

কোম্পানিকে মেল করলে লুফে নেবে। এই দেখো। ব্যস, দত্ত বিকশিত! একটা কথা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে। বিয়ের পর গাঙ্গুলিদার রাফনেস কমেছে।"

গৌতম বলে, "বিয়ে হলে পুরুষেরা বদলে যায়? নরম মোলায়েম হয়? দূর, আমি শালা কাক হয়ে গিয়েছি। বউ আর মা। দুই শিবির। ঠোকাঠুকি চলছেই। ইহজন্মে আর মনে হয় থামবে না। দাম্পত্য অশান্তি মেটানো যায়। এই যুদ্ধের নো সলিউশন। বিশ্বের জাঁদরেল রাষ্ট্রনেতারা দফায়-দফায় গোলটেবিল বৈঠক করে সমাধান খুঁজে পাবে না। সায়মদা লাকি! দু'জনের মাঝখানে পড়ে স্যান্ডউইচ হওয়া কাকে বলে বুঝলে না। তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।"

নিজের টেবিলে ফিরে সায়ম স্বস্তির নিশ্বাস নিল। পারিবারিক অশান্তি তাকে পোড়ায়নি। তার ব্যাকগ্রাউন্ড মজবুত। দীপেনের মতো গন্ডগ্রাম থেকে উঠে এসে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়নি কিছু। বাড়ি ভেঙে বহুতল উঠবে, প্রাপ্তিযোগ বাজার মূল্যে কম হবে না। ভিটেহারা শরণার্থীর দলে লোটাকম্বল নিয়ে সে হাঁটছে, এমন ছবি কষ্ট করেও কল্পনা করা যাচ্ছে না। লটারিতে সে বরং বাম্পার প্রাইজ পেয়ে গিয়েছে।

তবুও নিজেকে কেন এমন নিরাশ্রয় লাগছে আজ...

{৬}

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে ঘরমুখো হতে ইচ্ছে করছিল না সায়মের। অদিতি তাকে কোন কাজের কথা বলেছিল সে মনে করতে পারল না। এই মুহূর্তে সে যেন বাড়ির ঠিকানা ভুলে গিয়েছে। উদ্দেশ্যহীন বাইক চালিয়ে সে ফ্লাইওভার পৌঁছে গেল। বাইক রেখে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব ধীরে কোথাও বাজে অনাগত ঘন্টাধ্বনি, স্থির, গম্ভীর। দহনবেলা ফুরনোর পর মৃদু মিষ্টি বাতাস কিছু মনে করতে চায়, পারে না। দ্রুতবেগে রিল ঘুরে যাচ্ছে... ক্রমশ অস্পষ্ট হতে থাকা ছবির মিছিল... শেষ বিকেলের চলমান স্রোতে মিলিয়ে যায়। সায়ম প্ল্যাটফর্মটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। স্টেশনটায় পরিচিত ব্যস্ততার আভাস। অনন্ত আকাশ আর সবুজের আবেশে সায়মের মন জুড়িয়ে আসে। না, এই বিকেলে মনখারাপ চিঠি খুলে দেখবে না সে। মনে পড়ে গেল তার। রমিত ফিরে এসেছে। কাল রাতেই পৌঁছনোর কথা ছিল। ট্রেন পাঁচ ঘণ্টা লেট থাকার জন্য আজ ভোরে ফিরেছে। সায়ম আবিষ্কার করে সে একা হয়ে যাচ্ছে। তার নিজস্ব গোলার্ধ চুপিসারে কেমন যেন বেবন্ধু হয়ে পড়েছে। কত মুখ আসে আর চলে যায়। ছাপ রাখে না। নতুন করে কেউ আর তার বন্ধু হতে পারে না। পরিণত হওয়া মানে একটার পর-একটা সম্পর্কের কঙ্কাল চিনে ফেলা। শুধু রমিতই হারিয়ে যায়নি। কলেজে রমিতের সঙ্গে তার আলাপ। দিনে-দিনে সম্পর্ক গাঢ় হয়েছে। রমিতের পায়ে নীচে সর্ষে, ছুটি পেলেই সে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। বৃত্তে বন্দি থেকে নিজেকে নষ্ট করে না। ইলেকশন ডিউটি সেরেই রমিত শিলং বেড়াতে চলে গিয়েছিল। সায়মের যাওয়া হল না। মেঘপাহাড়ের দেশে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছে থাকলেও হয়তো আর সে যেতে পারবে না। অতিরিক্তি ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না তার স্নায়ুকোষ। মাইগ্রেনের মাত্রাছাড়া যন্ত্রণা ঘোরার আনন্দকে মাটি করে দিতে পারে। তিন বছর আগে উত্তর সিকিমে বেড়াতে গিয়ে অভিজ্ঞতা সুখের হয়নি। রমিত এমনিতে বকমবাজ পায়রা। কোলাহলে মুখর মুহূর্ত ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। রমিতের দিনযাপনে শুধু দেশ ঘোরার নেশা, মাছ ধরার নেশা, লোকজীবনের শিকড় খোঁজার নেশা।

পরিবার রমিতের অহংকার। যৌথ পরিবারে তিন ভাই মিলেমিশে থাকে। দুই দাদা পারিবারিক ব্যবসা দেখভাল করেন। যৌথ পরিবার নিয়ে রমিতের গর্ব বেশিমাত্রায় প্রকট। রমিতের মতে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে মানুষ গাছের শুকনো শিকড় হয়ে বেঁচে থাকে। রমিত বিয়ে-থা করেনি। একটি মেয়েকে দত্তক নিয়েছে। নাম দিয়েছে মেঘা। প্রিয়নাথ আবার রমিতকে বেশ পছন্দ করেন। রসায়নটা বোঝা মুশকিল। মানুষকে মাপার তিনটি প্যারামিটার তাঁর। কাজ, সাফল্য, অর্থ। রমিতের তেমন কোনও উচ্চাশা নেই। স্কুলশিক্ষক হয়েই সে খুশি। হিসেবি একেবারে নয়। রোজগারের তুলনায় খরচের হার বেশি। কখনও তার প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ রাস্তায় পড়ে যায়, বুকপকেটে রাখা টাকা বাইরে উঁকি মারে, টাকাসুদ্ধ ব্যাগ ভাতের হোটেলে ফেলে চলে আসে। ভুলোমানুষ হলেও রমিতের পা মাটিতে থাকে, যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে সব কিছু, মানুষ চেনার ক্ষমতা রাখে। দাদারা ব্যবসা সামলায় বলে, সংসারের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব নিয়েছে সে।

বাড়িতে পা রেখেই রমিতের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। প্রিয়নাথের রুম থেকে তার উচ্ছ্বসিত গলা ভেসে আসছে। শহরে পা রেখেই ছুটে এসেছে রমিত। যথারীতি ধুমগল্প চলছে। সায়ম অনুমান করল ঘরে ঢুকেই পায়ের ধুলো নিয়েছে রমিত। বিডিও সাহেব আবার প্রণাম করলে সহজে তুষ্ট হন। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ বলে খোঁচালেও রমিত রাগে না। পরিচিত মানুষদের নির্বিচারে 'তুমি' বলাটা রমিতের মুদ্রাদোষ। প্যাকেট খুলে পাংশুটে রঙের কার্ডিগান মেলে ধরে রমিত, "তোমার জন্য এনেছি। সাইজে হবে কিনা দেখো তো।"

প্রিয়নাথ বলেন, "এসব আবার কেন?"

গালে সূক্ষ্ম হাসির ঢেউ। খুশি গোপন থাকছে না। রমিত ঘাড় দুলিয়ে বলে, "তোমার জন্য আনব না তা হতে পারে? চেরাপুঞ্জি জায়গাটা দেখলাম স্যাঁতসঁতে আবহাওয়া। পাঁচিলে, দেওয়ালে, কারনিসে চারিদিকে শ্যাওলা। কাপড়চোপড় শোকায় না। বাড়িঘর আর মানুষ রোদ দাও বলে আকুতি জানাচ্ছে। কীভাবে যে লোকজন ওখানে বাস করে! হরিবল। কবিরা দেখবে এই চেরাপুঞ্জি নিয়ে বিস্তর আদিখ্যেতা করে গেল। বারোমাস মেঘবৃষ্টি নিয়ে ঘর করা দুর্বিসহ। দশ দিন থাকলে লোকে পাগল হয়ে যাবে।"

সায়ম ফোড়ন কাটে, "কেউ পাগল হয়েছে বলে তো শুনিনি।"

রমিত ঘাড় ঘোরায়, "ছিঁচকাদুনে কবিরা পাগল হত বলেছি। তোর গায়ে লাগছে কেন? মেসোমশাই, চেরাপুঞ্জি যাবার পথটা অসাধারণ সুন্দর। নিরিবিলি। প্রকৃতির শান্ত, উদাস রূপ দেখলে মন ভরে যায়। এদিকে মেঘালয়ে পৌঁছে মেঘাকে নিয়ে ভীষণ সমস্যা হল।"

উদ্বেগে ঝুঁকে পড়লেন প্রিয়নাথ, "মেঘার শরীর খারাপ হয়েছিল নাকি?"

"না। দিব্যি ফিট ছিল। ওখানকার উড়ন্ত মেঘের দল তোমার নাতনিকে কিছুতেই ছাড়বে না। নামের মিল শুনে তাদের কী আহ্লাদ। মেঘা ওখানেই থাকবে। বেঙ্গলে যাওয়া চলবে না। গাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ছিল বারবার। এমন নাছোড়বান্দা যে মেঘার গাল, ঠোঁট ভিজিয়ে দিয়েছিল। ভালবাসার অত্যাচার আর কাকে বলে! পিছু ছাড়ে না। দেখবে খুঁজতে-খুঁজতে ওরা এত দূর চলে এসেছে। এবার ঠিক বৃষ্টি নামবে।"

সায়ম বলে, "আগামী দশদিন বৃষ্টির আশা নেই। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে।"

রমিত হালকা গলায় বলে, "তোমার ছেলেটার মধ্যে শুধু নিরাশা, মেসো। প্রকৃতির মর্জি আবহওয়া অফিস জেনে ফেলল? আমি খবর পেয়েছি ওরা আসছে। আজই টিভিতে দেখবে যে ওরা এসে গিয়েছে।"

প্রিয়নাথ চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "কত টাকার মার্কেটিং করলে?"

"ওখানে স্পেশাল কিছু পাওয়া যায় না। তা দশ হাজারের মতো খরচা হল। সবার জন্য একটা অন্তত কিনে আনতে হয়। না হলে দুঃখ পাবে। দুই দাদা, বউদি, ভাইপো, ভাইঝি, আপনি, অদিতি, তিনজন কলিগ, কাকে বাদ দেব? তোমার ছেলেটার জন্য কিছুই আনা হল না। অদিতির জন্য মেখলা এনেছি। রোহনবাবুর জন্য উলের টুপি। ব্রহ্মপুত্র নদীতে সূর্যাস্তের মুখে বোটিং করলাম। গুয়াহাটিতে একদিনের বেশি থাকা হল না। কামাখ্যা মন্দিরেও গিয়েছিলাম। ওখানে এক সাধু আমার মুখ দেখেই বলে দিলেন, 'যা বেটা, তোর বন্ধুর জন্য মেঘালয় থেকে একবস্তা আনারস কিনে নিয়ে যা। বহুত মোটা হয়ে যাচ্ছে।' তা

গোটা পনেরো কিনেছিলাম। ট্রেনেই সাবাড় হয়ে গেল। আনারস নিয়মিত খেলে দেখবে ফ্যাট জমবে না।"
রমিতের থামার কোনও লক্ষণ নেই। কতক্ষণ এমন গুলতাপ্পি চলবে বোঝা যাচ্ছে না। অদিতি মৃদুগলায় বলে, "টিফিন করে নাও।"
"খেয়ে নিয়েছি।"
"কী খেলে?"
"কচুরি আর ছোলার ডাল।"
অদিতির কপালে ভাঁজ, "এই গরমে আজেবাজে খেয়ে নিচ্ছ। নিশ্চয়ই ফুটপাতের দোকানে খাওয়া সেরেছ। পেটটার বারোটা বাজাবে। রমুদার জন্য এগ চাউমিন বানাচ্ছি। তুমি মিস করলে।"
নতুন কেনা ফ্লুরোসেন্ট বালব উজ্জ্বল আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে করিডর। সেই আলোয় অদিতির চোখ দু'টি আরও বেশি উজ্জ্বল, সুখের নরম বুদবুদ তার মুখে। অদিতি ফিসফিস করে বলে, "বাড়ি-ফ্ল্যাট এসব আবার রমুদাকে বলতে যেও না এখনই। ফাইনাল না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলো না।"
শান্ত উচ্চারণে সায়ম বলল, "ঠিক আছে। গোপনই থাকবে। আস্থা রাখতে পারো।"

রোহনের গাল টিপে রমিত বলল, "তোমার হোমটাস্ক হয়েছে? যা শিখিয়েছিলাম মনে আছে তো?"
"হ্যাঁ।"
"গনগনির মাঠের গল্পটা শুনি।"
রোহন গড়গড় করে বলতে থাকে, "ওখানে ভীম আর বকরাক্ষসের যুদ্ধ হয়েছিল। বকরাক্ষস মরে গেল। হাড়গুলো পড়ে আছে এখনও।"
সায়ম বাধা দিয়ে বলে, "ওগুলো হাড় নয়। ফসিলাইজ্ড কাঠ। বড়-বড় গাছের প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম। ভুলভাল শেখাচ্ছিস টিচার হয়ে।"
চশমা খুলে রমিত হাসে, "বাচ্চারা মিথ পছন্দ করে। নীরস ব্যাখ্যা দিলে ওদের মনে ধরবে না। বাগড়া দিস না। আমাদের গল্প বাকি আছে। হিড়িম্বাভাঙা কোথায় মনে আছে রোহনবাবু?"
রোহন চটপট বলে, "খড়্গপুরের খড়্গেশ্বর মন্দিরের সামনের মাঠ।"
"নাম কেন এমন হল?"
"ভীম হিড়িম্বাকে ওখানে বিয়ে করেছিলেন।"
"ভেরি গুড। তোমার বাবা এসব কিছুই জানে না। তাই রেগে যাচ্ছে। সামনের শীতে গনগনির মাঠে আমরা পিকনিক করব। গনগনি কোথায়?"
"গড়বেতার কাছে। ট্রেনে যেতে-যেতে দেখেছি," রোহন উত্তর দিল, "গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ বেঙ্গল।"
রমিত হাসিমুখে বলে, "দেখছিস, তোর ভোলানাথকে কেমন লাইনে আনছি! শিকড়ের গন্ধ না জানলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ঘরের সামনের নদী জানব না, পার্বণ উৎসব জানব না, লোকগাথাকে অবহেলা করব। রুটলেস প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের দেখে আমার করুণা হয়। বাইক হাঁকিয়ে গোপগড় ঘুরতে যায়, ঝোপেঝাড়ে ঘনিষ্ঠ হয়, বক্স বাজিয়ে পিকনিকে মাতে। এক কলেজ স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে যে এসেছ তা গোপগড়ের কাহিনিটা জানো?' হাতে ট্যাব, চোখে সানগ্লাস, টিশার্টে আমেরিকার লোগো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, 'জানি না।' আমি ছাড়লাম না। বললাম, 'মহাভারত পড়েছ? অজ্ঞাতবাসের গল্প জানো?' ছোকরা পড়েনি। টিভিতে কয়েকটা এপিসোড দেখেছে। অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডবরা বিরাটরাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গোপগড় হল সেই বিরাটরাজার গোশালা। হাফশিক্ষিত ছেলের শোনার ধৈর্যই নেই।"
"প্রোফেশনের সাইডএফেক্ট টের পাচ্ছি। ধরে-ধরে লোকজনকে জ্ঞান দিচ্ছিস।"
রমিত বলে, "না। আমার আশ্চর্য লাগে। মিথ এবং লোকগাথা আমদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। কারও আগ্রহ নেই। নিউইয়র্ক, প্যারিস, ক্যালিফোর্নিয়া জানছে। নিজের শহর, জেলা , সংস্কৃতি, নদনদী চিনবে না?"
"সবাইকে নিজের মতো ভেবে নিতে চাস। এটা তোর মস্ত বড় ভুল।"
মাথা ঝাঁকায় রমিত, "জানি। তবে সবাই কিন্তু ভাবে তার ঘড়িটাই ঠিকঠাক চলছে। চল, এবার ছাদে গিয়ে হাওয়া আর ধোঁয়া খেতে হবে।"
সিগারেট ধরিয়ে রমিত জানতে চায়, "তারপর তোর কেমন কাটল এই গরমে?"
"যেমন চলে। নতুনত্ব কিছু নেই।"
জিনসের পকেট থেকে সিডি বের করে হাতে তুলে দিল রমিত, "তোর জন্য অসমিয়া লোকসঙ্গীতের একটা কালেকশন এনেছি।"
"আমি অসমিয়া ভাষা কী ভাবে বুঝব!" সায়ম অবাক হয়ে বলে।
"সঙ্গীতের ভাষা কোনও বাধা হতে পারে না। সুর-ছন্দ-তাল-দেশকালের পাঁচিল মানে না এই মৌলিক ব্যাপারটা তুই জানিস না উজবুক। ফোক সং মর্ম দিয়ে অনুভব করতে হবে। মাটির গন্ধ, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ জানবি না?"
কথা ঘোরায় সায়ম, "খুব ফোটো তুললি!"
"বাঙালি টুরিস্ট স্পটে গেলে আগে ক্যামেরা নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্পট মন দিয়ে দু'চোখ ভরে দেখার থেকে শাটার টিপতেই আগ্রহ বেশি। ফোটোগ্রাফি করতে এসেছে, না সৌন্দর্য দেখতে এসেছে বোঝা দায়। মেঘাই আনন্দে তুলেছে। প্রিন্ট করিয়ে নিয়ে দেখাব।"
"মেঘা ফিট ছিল?"
"হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট। ওর মনের জোরকে আমি বাহবা দিই। মুখ ফুটে বলি না কখনও। তবে..." থেমে গেল রমিত। অস্থির দেখাল তাকে। চোখেমুখে তার দ্বিধা। উজ্জ্বল হাসিতে খানিক ফ্যাকাসে ছাপ। রমিত চিরকালই বহির্মুখী, তার মুখ এবং মনের মাঝখানে নিষেধের পরদা থাকে না, কোনও দুঃখ আড়াল করার চেষ্টা সহজেই ধরা পড়ে যায়। রমিত নাতিউচ্চ স্বরে বলে, "আকাশ অংশত মেঘলা।"
"বুঝলাম না। মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। এনিথিং রং?"
"আসলে এত সুন্দর পরিবেশ আর আবহাওয়া থেকে ফিরে মানিয়ে নিতে একটু কষ্ট হয়। ঘোরারও হ্যাংওভার আছে," লম্বা শ্বাস নিল রমিত।

{৭}

শহর থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে অদিতির কলেজ। জায়গাটি এক সময় দিনের পর-দিন খবরের শিরোনাম হত। বাস কন্ডাকটররা শহরের স্টপেজে চেঁচিয়ে বলত, 'কারগিল'। বাস এখন কারগিলে যাচ্ছে। অদিতির তখন বিয়ে হয়নি। সমস্তটাই লোকমুখে শোনা। রীতিমত যুদ্ধের চেহারা নিয়েছিল এখানকার গ্রামাঞ্চল। কত ঘর পুড়েছে, কত লাশ পড়েছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষে গ্রামের পর গ্রামে হিংসা ছড়িয়েছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ এখনও মাঝেসাঝে চলে। অদিতি মেলাতে পারে না, এমন চোখজুড়ানো সবুজ, খালবিল, অনাবিল শ্যামলিমার মধ্যেও কিছু মানুষের স্বভাবে এত হিংস্রতা এবং রুক্ষতা কেন?
সহযাত্রী হিন্দোল তার প্রশ্ন শুনে একচোট হেসেছিল। হিন্দোল বয়সে ছোট, পঞ্চায়েত অফিসের কর্মী, স্বভাবে ঠোঁটকাটা। মাথা দুলিয়ে বলেছিল, "মধু বোঝেন? ক্ষমতার মধু? মধু মানে অর্থও হয়। টাকার বাঁটোয়ারা। গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প। একশো দিনের কাজ। আবাস যোজনা। বি পি এল কার্ড। ওই মধু আর ভাগ নিয়েই লড়াই। মানুষের স্বভাব কী আর বদলেছে! জব রিপোর্টে চারশো ফুট কাজ দেখানো হয়ে গিয়েছে। সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দন্ডপাট স্পটে গিয়ে একেবারে তাজ্জব। কোদালের একটি আঁচড়ও পড়েনি। তালেগোলে সব পাশ হয়ে যাবে। করতে বাধ্য হবে। ক্ষমতার হস্তান্তর হয় ম্যাডাম, নেতাদের দাপট কিন্তু বদলায় না।"
তবে এই কলেজই অদিতির ওয়েসিস। পার্ট-টাইমার হিসেবে জয়েন করেছিল। এখন সরকারি নিয়মে ফুলটাইমার। ফিক্সড পে। পূর্ণ

সময়ের আংশিক অধ্যাপিকা। সায়ম মজা করে বলে। প্রিয়নাথ বিয়ের আগেই শর্ত রেখেছিলেন চাকরি করা চলবে না। অদিতি শিক্ষিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রি তার, চাইলে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তাঁর পরিবারের বউ হয়ে এলে চাকরি করা কঠিন হবে। ভাবী শাশুড়ি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। সংসারের হাল অদিতিকেই ধরতে হবে। সায়ম তেমন করিৎকর্মা নয়। প্রিয়নাথের স্পষ্ট কথাবার্তা তার পছন্দ হয়েছিল। ভাবার জন্যে তিনদিন সময় দিয়েছিলেন তিনি। অদিতি যদি মনে করে, স্বাবলম্বী হতেই হবে তিনি জোর করবেন না। তবে সিদ্ধান্তটি যেন সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব হয়। অদিতির অবশ্য এই ব্যাপারে আস্থা ছিল না। স্কুল সার্ভিস কমিশনে পাঁচ-ছ'টির বেশি ভ্যাকেন্সি থাকে না। প্রোফেশনাল কোর্সও সে করেনি। ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় বাবা কার্ডিয়াক অ্যাটাকে চলে গেলেন। রুরাল লাইব্রেরিতে কাজ করতেন। ক্লাস এইট পাশ হলেও, 'ডাইং ইন হারনেস'-এ মা হয়তো কোনও সাধারণ চাকরি পেতে পারতেন। তাও হল না। সম্বল বলতে থাকল শুধু ফ্যামিলি পেনশন। জমিজমা অল্প ছিল। চাষবাস আর কে করবে? বিক্রিবাটা করে ওদ্দায় চলে এলেন মা। মাটির বাড়ি, টিনের চাল, ঢোলকলমির বেড়া। এই দাঁড়াল তাদের নতুন বাড়ির চালচিত্র। প্রথম দিকে মামারা সাহায্য করেছিলেন। নিজেদের সংসার বাড়তেই তাঁরা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এখন অদিতি বোঝে তাঁদের কোনও দোষ ছিল না। মামারা তেমন অবস্থাপন্ন ছিলেন না, দক্ষিণ বাঁকুড়ার রুক্ষ কাঁকুড়ে মাটিতে চাষবাস করে নিজেদেরটা চালাতেই হিমশিম খেতেন।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে একটা রাত সময় নিয়েছিল অদিতি। ছোটবেলা থেকে অভাবের বায়োমাস্যা। কষ্টকে মুখ বুজে মেনে নেওয়া। আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখার বিলাসিতা তাকে মানায় না। প্রস্তাব নিজে থেকে প্রিয়নাথ দিয়েছেন। একটি কানাকড়িও দাবি করছেন না। শহরে দোতলা বাড়ি। ছেলে ব্যাঙ্কে কাজ করে। মা খুঁতখুঁত করছিলেন। তাদের সমাজে পণের রেওয়াজ সাংঘাতিক। সেখানে বিডিওসাহেব বাড়ি এসে সম্বন্ধ করতে চাইছেন। নিশ্চয়ই ছেলের কোনও বড়সড় দোষ আছে। প্রথম বিয়েটা টেকেনি। বউটা কেন স্বামীর সঙ্গে আর ঘর করেনি? পালিয়ে যাওয়ার মনগড়া গল্প শোনাচ্ছে না তো? এদিকে অদিতি সবুজসংকেত দেওয়ার পরই পাকা কথা হবে। রাত্রের ট্রেনের ঝমঝম ধ্বনি শুনতে-শুনতে সেই অদিতি প্রথম জীবনকে স্বপ্নমেদুর বলে ভাবতে পেরেছিল। তার বিয়ের চিন্তায় মা অস্থির হয়ে পড়েছেন। পরের দিন সকালেই সে প্রিয়নাথকে ফোন করেছিল। কখনই সে জড়তায় ভোগে না। পরিবেশ নরম পলিমাটি সরিয়ে কঠিন করে দিয়েছে তাকে। প্রিয়নাথ বলে দিয়েছিলেন আর যোগাযোগ করবেন না। রাজি হলে সরাসরি তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে। সম্ভবত প্রিয়নাথ তার পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। তার স্মার্টনেস বুঝে নিতে চেয়েছিলেন পরোক্ষে। ফোন তুলে প্রিয়নাথ বলেছিলেন, "রাজি?"

"হ্যাঁ।"

"কোনও দ্বন্দ্ব-দ্বিধা?"

"না।"

"সায়মের প্রথম বিয়েটা একটা দুর্ঘটনা। বিস্তারিত জানতে চাইছ না কেন? ঠকে যেতে পারো।"

"আমি ঠিক সময়ে জেনে নেব", একমুহূর্ত দ্বিধা না করেই বলেছিল অদিতি। তার ঠোঁট কাঁপেনি, স্বর কম্পাঙ্ক বদল হয়নি।

"দ্যাট্‌স গুড। আমি এমনই একজনকে পুত্রবধূ হিসেবে চাইছিলাম। তুমি সায়মের জন্য পারফেক্ট ম্যাচ। এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম।" প্রিয়নাথ ফোন ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিডিও অফিসের বড়বাবুর কাছ থেকে তার খোঁজ পেয়েছিলেন প্রিয়নাথ। পরে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেছিল অদিতি। পল্লবী নামের সেই মেয়েটির একটি ফোটোও ঘরে নেই। শুনেছে সে খুব মিষ্টি দেখতে ছিল। বিয়ের ভিডিও রেকর্ডিং করা ছিল, স্টুডিও থেকে নিয়ে আসেনি। কেন আর নিয়ে আসবে? কেন এমন হয়? বিয়ের পর সায়মের সম্বন্ধে দ্বিধা তার একটুও ছিল না। প্রথম বিয়ের দুঃস্বপ্ন সায়মকে কিছুদিন আড়ষ্ট করে রেখেছিল। পরে আগল খুলে যায়।

যখন এই কলেজে পার্ট-টাইমারের চাকরি পেল অদিতি, প্রিয়নাথ বাধা দেননি। সস্নেহে হেসেছিলেন, "এত দিনে স্বাবলম্বী হলে। বেশ। কাজের চাপ কম। মন দিয়ে করবে। ঘরবার সামলানোর এনার্জি তোমার আছে। অনেকে পারে না। সংসার বেহাল, ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে।"

কলেজে এলে কাজের মধ্যে থাকলে অদিতি ভাল থাকে। চারদিন আসতে হয় কলেজে। রোববার বাদে সপ্তাহের দুটো দিন সে ছটফট করে। সায়ম ব্যাঙ্কে চলে গেলে সে একা। রোহন স্কুলে চলে যায়। প্রিয়নাথ বাড়ির বাইরে থাকেন। সাড়ে বারোটা-একটার আগে ফেরেন না। নির্জন সময় তাকে অস্থিরতায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। শালিকের কিচিরমিচির, বাইকের শব্দ, ফেরিওয়ালার ডাক।

অদিতি রোহনকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। পাশের ঘরে সায়ম অঘোরে ঘুমোয়। তার কোনও ভুলের জন্য এই সংসারে ফাটল ধরুক, তা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কমবয়স থেকে সমস্ত শখ-আহ্লাদের গলা টিপে বাঁচতে শিখেছে। কসমেটিক্‌স ছুঁয়ে দেখেনি, দোকানে গিয়ে সবচেয়ে সস্তার চুড়িদার খুঁজেছে, মাসে একদিন মাংসের ঝোল-ভাত খাওয়াই ছিল রীতিমত উৎসব। অনার্স লেভেলে ভূগোল পড়ার সুযোগ পেয়েও সে ভর্তি হয়নি। প্র্যাকটিকাল, টিউশানি। খরচ অনেক। কলেজে পড়ার সময় থেকেই বাড়ি-বাড়ি টিউশানি করে নিজের খরচ জোগাড় করে নিত। অনার্স পাসের পর মা বিয়ের চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিলেন। দেনা-পাওনার সম্ভাবনা প্রায় নেই বলে শুরুতেই অনেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। দু'-জায়গা থেকে তাকে দেখতে এসেছিল এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ফোনে নাকচ করে দিয়েছিল। শুধু এই মানুষটি, প্রিয়নাথ পাঠক, তার মধ্যে কী আবিষ্কার করেছিলেন কে জানে!

এই সংসার শুধু তার আশ্রয় নয়, নিরাপত্তা নয়, আরও অনেক কিছু।

{৮}

সাতসকালেই বাজার সেরে নিয়েছে সায়ম। বাজারে অত বাছাবাছি করে না সে। দু'খানা ব্যাগ ঠেসে সবজি কিনল।

ফেরার সময় আচমকা এক কুকুর বাইকের সামনে এসে পড়ল। মুহূর্তের প্রতিবর্তক্রিয়ায় ব্রেক কষল সায়ম। কুকুর রক্ষা পেলেও চাকা স্কিড করে আছড়ে পড়ল বাইক। রাস্তার লোক ধরাধরি করে বাইকটাকে তোলে। কনুই সামান্য ছড়ে গিয়েছে। বাইকটারও বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ইন্ডিকেটর ভেঙে ঝুলে পড়েছে। আয়না অনেকখানি বেঁকে গেলেও অক্ষত রয়েছে। সমস্যা বলতে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে চিনচিনে ব্যথা। সেই অবস্থাতেই স্লো স্পিডে চালিয়ে বাড়ি পৌঁছয় সায়ম। বাইক স্ট্যান্ড করে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে ডাইনিং ঘরে আসে। বেশিক্ষণ সুস্থির থাকতে পারে না সায়ম। পা ফেলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। পায়ের পাতা ভারী লাগছে। বাধ্য হয়ে ফ্রিজ খুলে বরফের ট্রে বের করল। গোপন রাখা গেল না।

নিচু হয়ে বরফ ঘষতে শুরু করে সায়ম। অদিতি শুনে বলে, "নিশ্চয়ই আবোলতাবোল ভাবছিলে চালাতে-চালাতে?"

"না।"

"বললে হবে। তোমার মন যে কোথায় থাকে! দিনদশেক আগে আর একটু হলে রিকশার পিছনে ধাক্কা মারছিলে। একচুলের জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। পিছনে আমি বসেছিলাম। গোড়ালিটা ফুলে গিয়েছে দেখছি। মনে হচ্ছে গিয়েছে, ফ্র্যাকচার হয়েছে।"

বেজার মুখে সায়ন বলে, "ফ্র্যাকচার অত সহজে হয় না।"

"হতেই পারে।"

"আমার দোষ ছিল না। কুকুরটা বেমক্কা সামনে এসে পড়ল।"

অদিতির নিরুত্তাপ গলা, "রোহন বলছিল, তুমি নাকি বাইক চালানোর সময় মেয়েদের দিকে আড়চোখে তাকাও আর ইস উস শব্দ করো।

তুমি টিনএজার নও। বয়সটা বাড়ছে। ছেলের বয়স এগারো পেরিয়েছে। এযুগের বাচ্চারা অনেক ম্যাচিওরড। ওরা বুঝতে পারে। তোমার ছেলে দু'দিন পর গার্লফ্রেন্ডকে লুকিয়ে-লুকিয়ে ফোন করবে। পাশ দিয়ে কোনও সুন্দরী মহিলা গেলে তোমার ঘাড় ষাট ডিগ্রি বেঁকে যায়। কোমর ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকলে তারা ফুলের তোড়া এনে তোমার কপালে চুমু খাবে? সব আমাকেই করতে হবে।"

সায়ম ক্ষুব্ধস্বরে বলে, "করতে হবে না। সাতসকালে বাজার চত্বরে কোনও তন্বী তরুণী ঘুরতে যায় না। মনগড়া কথা বললেই হল?

প্রিয়নাথ বাড়িতে নেই। অদিতি ফোনে ধরল তাঁকে, "বাবা, একটা রিকশা ডেকে আনুন। আপনার ছেলে হালকা অ্যাকসিডেন্ট করেছে।"

প্রায় জোর করে অদিতি সায়মকে রিকশায় বসায়। ডাক্তারের কাছে যেতে সায়মের ঘোর আপত্তি। প্রথমে এক্স-রে সেন্টারে নিয়ে গেল অদিতি। ফোটো না দেখে কোনও ডাক্তারই ফাইনাল কিছু বলবেন না। আপাতত আধঘন্টার মধ্যে প্লেটটা পেলেই কাজ চলে যাবে। রিপোর্ট পেতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। প্রিয়নাথ ফোন করে নাম লিখিয়ে দিয়েছেন।

চেম্বারে থিকথিক ভিড়। সায়মের সিরিয়াল নম্বর পনেরো। চেয়ারে বসে হাই তুলে, পেপার পড়ে সময় কাটে না।

ভোটের পর ইতিউতি বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলছে। এই প্রাণঘাতী গরমে মারপিট, ভাঙচুর করার এনার্জিই যে কোথা থেকে পায়! মুশকিল হল দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই। অপ্রশস্ত একফালি রুম। প্লাস্টার-ঝোলানো রোগীও দরজার পাশে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে ভাঙা, মচকানো, চিড় ধরার ছবি। পৃথিবী ধ্বংসের ষাট সেকেন্ড আগেও দু'শ্রেণির ডাক্তারের চেম্বার ফাঁকা থাকবে না। গাইনি এবং অর্থো। গড়া আর ভাঙা। এক্স-রে টেকনিশিয়ান অভয় দিয়েছেন। পা ভাঙেনি, সূক্ষ্ম চিড় ধরেছে। সায়মের মনে তাই টেনশন উধাও। দেখানোর পর পুরোপুরি আশ্বস্ত হল সায়ম। ডক্টর সিনহা প্লেট দেখে জানালেন, "চিড়টা মামুলি। প্লাস্টারের দরকার নেই। লিগামেন্টে চোট। ক্রেপ ব্যান্ডেজ জড়িয়ে ঘরে বিশ্রাম নিতে হবে। হাঁটাচলা পারতপক্ষে চলবে না।"

রিকশায় উঠে অদিতি বলে, "শুনলে তো? কমপ্লিট বেড রেস্ট।"

"ডাক্তারমাত্রই ওরকম বলেন। কিছু হলেই বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দেন। কমন ফরমুলা।"

"তার মানে তুমি ছুটে বেড়াবে?"

"দেখা যাক," সায়ম নিমতিতে মুখে জবাব দেয়। ঘরে শুয়ে বসে থাকাটা তার কাছে চরম শাস্তি। কিছু লোক আছে যারা বাজার করে, অফিস যায়, ফিরে এসে বউবাচ্চার মুখ চেয়ে দিব্যি ঘরটিতে বসে কাটিয়ে দেয়। ত্রিভুজের মধ্যে থেকেই তারা সন্তুষ্ট। সায়ম অমন থাকতেই পারবে না। সে এই শহরের চলমান জীবন আর গতিশীল ছন্দে একাত্ম হয়েই বৃত্তের বাইরে বেরনোর আনন্দ পায়।

নাকেমুখে গুঁজে অদিতি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। পার্ট টু পরীক্ষা চলছে কলেজে। যেতেই হবে। অদিতি বেরনোর পরই পাশবালিশ জড়িয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিল সায়ম। নির্জন দোতলা। আজ দুপুরে এই দোতলার সে অধীশ্বর। পেনকিলার গিলে ফেলার পর ব্যথার রেশ কমেছে। চিনচিনে অস্বস্তিটাকে গুরুত্ব না দিলেই হল। টিভি খুলে আধঘন্টা চ্যানেল সার্ফ করে হাঁপিয়ে ওঠে শেষমেশ। পলিটিকাল নিউজ়। সিরিয়াল। ঘুরেফিরে সেই পাঁচ-ছখানা সিনেমা বিভিন্ন চ্যানেলে চলছে। কম্পিউটার খুলতেও ইচ্ছে হল না।

শরীরে রিমঝিম অনুভূতি অবসন্ন ভাব চুঁইয়ে পড়ছে শিরা, উপশিরায়। বালিশে মাথা রেখে চোখ বোজে সায়ম। ঘুমও বেশিক্ষণ হল না। বিড়ালঘুম সেরে সাবধানে স্নান করল। টেবিলে রাখা ভাত-তরকারি মুখে রুচল না। প্রিয়নাথ ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন, "অর্ধেক যে পড়ে রইল।"

"খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"বেশ। সাবধানে উঠবে। পায়ের স্টেপ গোলমাল হলে বিপদ বাড়বে। ব্যথা কমেছে?"

"হ্যাঁ।"
দোতলায় এসে সায়ম আবার টিভি খোলে। পড়ে পাওয়া অবাধ স্বাধীনতার কোনও মজাই আর নেই। জমে থাকা অক্ষম রাগ ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। গতকাল সন্ধের অভিজ্ঞতা তার উদ্যমকে আংশিক শুষে নিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত গায়ক সুনীতকে ফোন করেছিল সে। সাতমাস পেরিয়ে গিয়েছে। সময় পেলে পড়ে রাখবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। এতদিনে কি আর সময় পাবেন না!
সুনীত ফোন ধরে বললেন, "হ্যালো, আপনি কে বলছেন?"
নিজের নাম বলে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল সায়ম, "আমি আপনাকে কিছু গান পাঠিয়েছিলাম।"
"গান!" সুনীতের গলায় ঘোর বিস্ময়।
হঠাৎ লাইন কেটে গেল। নেটওয়ার্ককে অভিসম্পাত দিয়ে আবার রিং করল সায়ম। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর স্তব্ধ হয়ে গেল ওপ্রান্ত। সাড়াশব্দ পেল না সায়ম। দ্বিতীয়বার ফোনে চেষ্টা করল সে। কানের পরদায় বিশ্রীভাবে ধাক্কা মারল শব্দটা। সরাসরি শব্দময় প্রত্যাখ্যান। অপমানে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সায়ম।
কাউকে আঘাত দেওয়া তার স্বভাব নয়। তবে কেউ তাকে অসম্মান করলে তার ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়। মোবাইল ফোনটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল সায়ম। ঘুম পাচ্ছে। সে 'মেসেজ' অপশনে গিয়ে লিখল 'ধন্যবাদ'। সুনীতকে এই একটি শব্দই মেসেজ করে পাঠাল সে। মামুলি একজন অচেনা লোকের রাগ প্রকাশে সুনীতের কোনও ভাবান্তর হবে না। তবু প্রতিবাদ না করে সে শান্তি পাচ্ছিল না। একজন

কেউ তাকে অসম্মান করলে তার ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়। মোবাইল ফোনটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল সায়ম।

সত্যিকারের শিল্পীর প্রথম শর্ত হল, তাঁকে মানুষ হিসেবে ভাল হতে হবে। এই আপ্তবাক্যে যে সায়ম বিশ্বাস করে এসেছে এত দিন!

{৯}

এই ফুরন্ত দুপুরের রোদকে ভীষণ মায়াময় লাগে। পাশের বাড়িতে একফালি বাগান, তিন-চারটি গাছ সবুজের অস্তিত্ব জাগিয়ে রেখেছে। কিছুক্ষণ আগে হলুদ ঠোঁটের এক পাখি পেঁপে ঠুকরে খাচ্ছিল। পাখিটিকে চেনে না সায়ম। পাখি তো অনেক দূরের ব্যাপার, পরিচিত মানুষদেরও আজকাল চিনতে পারা যাচ্ছে না।
কৌস্তভ গুপ্ত যেমন। পাশের পাড়ায় থাকে। চার বছরের সিনিয়ার। একই স্কুলের ছাত্র থাকার সুবাদে মৌখিক সুসম্পর্ক আছে। ছোটবেলা থেকেই গানবাজনার চর্চা করে কৌস্তভ। গিটার বাজালে মনে হয় তার আঙুলে জাদু আছে। কিছুদিন আগে কৌস্তভদা 'চম্পক' নামে একটি বাংলা ব্যান্ড খুলেছে। দেখা হলে ব্যান্ডের উত্থানের গল্প শোনাতে ভালবাসে। দিল্লিতে পুজোর সময় যায়। প্রোগ্রামের অভাব হয় না। নর্থ বেঙ্গল থেকেও ডাক আসে। বীরভূম, বর্ধমান, হুগলিতে প্রোগ্রাম পায় ভাল। বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে এবার।
কৌস্তভদা সিগারেটে টান মেরে বলল, "আগে শুনেছি কবিতা লিখতিস। গানটান নামিয়ে ফেল খানকয়েক। আচ্ছা করে ঝাঁকুনি দে কথায়। ব্যান্ডে লাগিয়ে দেব। অভিষেক বাচ্চা ছেলে, চব্বিশও পেরোয়নি, তার কবিতা থেকে গান কম্পোজ করেছিলাম। ব্যাপক রেসপন্স। অস্ট্রেলিয়া থেকে মেল এসেছে।"
গান সায়ম তার আগেই লেখা শুরু করেছিল। কৌস্তভদার প্রস্তাব অনুঘটকের কাজ করল। দু'মাস ধরে ঘরের দরজা বন্ধ করে কখনও ভোরে, কখনও গভীর রাতে টুকটুক করে সে আরও কিছু গান লিখে ফেলল। পুরনো লিরিক্সদের ঘষামাজা করে নতুন রূপ দিল।
কৌস্তভদাকে ফোন করলে সে পরে যাওয়ার কথা বলে। কখনও বলে, "ভ্যাম টায়ার্ড রে ভাই। ভিডিও অ্যালবামের ফটোশুট ছিল।"
কখনও ফোন ধরে জানায়, "বউ মার্কেটিং করতে গিয়েছে। ছেলেমেয়ে দুটোকে পাহারা দিতে হচ্ছে।" তৃতীয়বার ক্লান্ত স্বরে বলে, "শরীর খারাপ। অফিস আর রিহার্সালের লোড নিতে পারছে না শরীর। সর্দিগর্মি হয়েছে।"
গতকাল সুনীতের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে আবার কৌস্তভদাকে ফোনে ধরেছিল। কোনও জনপ্রিয়, প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সাড়া দেবে না বুঝে গিয়েছে সায়ম।
কৌস্তভদা যেন চিনতেই পারল না।
"কে?"
"সায়ম।"
"ও! বল।"
"তুমি যে গান লেখার কথা বলেছিলে। আগে ব্যস্ত ছিলে বলে সময় দিতে পারোনি। আজ দেখবে একবার? সন্ধেতে ফ্রি আছ?"
কৌস্তভদার গলায় স্পষ্ট অনীহা, "ঝামেলায় আছি রে। সামনের রোববার সিউড়িতে প্রোগ্রাম আছে। এদিকে বাবার শুগারটাও বেড়েছে।"
"আচ্ছা," সায়ম ফোন রেখে রাগে ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছিল অনেকক্ষণ। দেরিতে বুঝল সে। প্রস্তাব কৌস্তভদাই দিয়েছিল। সায়মের মনে লোভ ছিল বলেই, সে হ্যাংলা হয়ে বারবার কৌস্তভদাকে ফোন করত। তবে কৌস্তভ গুপ্তর কাছে সে কৃতজ্ঞ। তার সুপ্ত ইচ্ছেটা ঠাট্টার ছলে জাগিয়ে তুলেছিল বলেই লিরিকগুলোর পুনর্জন্ম সম্ভব হল। মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে এভাবে চারবার তাকে এড়িয়ে যাবার কি কোনও প্রয়োজন ছিল! স্পষ্ট বলে দিতেই পারত।
ফাইল খুলে গানগুলো মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করল সায়ম। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল ধারণায় ভুগছে না তো! মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝে নিতে না পারলে পৃথিবীর চোখে আহাম্মক প্রতিপন্ন হয়। ফাইল বন্ধ করে টেবিলে মাথা রাখে সায়ম। হীন, কাঙাল হওয়ার সর্বনাশা খেলায় ভুল করে সে নেমে পড়েছে। এই ফাইলের লেখা নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে একদিন। আপনমনে বিড়বিড় করে সায়ম, "গান আমার যায় ভেসে যায় অবহেলায়।"
অন্যমনস্ক হয়ে গেল সায়ম। বিয়ের কার্ড, হলুদের মঙ্গলছাপ, সাতপাক ঘোরা, ফুলশয্যা, সম্পূর্ণভাবে একজন নারীকে পাওয়া। সব তার হয়েছিল। দ্বিরাগমনের সময় ছবিটা চুরমার হয়ে গেল। একরাতে ঘুম ভেঙে আবিষ্কার করল, পল্লবী নেই। কোথায় গিয়েছে? সারা শ্বশুরবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে পাওয়া গেল না। পরের সকালে খবর ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে। একটি ছেলেও নিখোঁজ। প্রতিবেশীরাই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল। জোর করে বিয়ে দিলে এমনই হয়! বিয়ের আগেও পালানোর চেষ্টা করেছিল। সাবধানী সতর্ক শ্বশুরমশাইয়ের নজর এড়াতে পারেনি। দ্বিরাগমনে এসে ঢিলেঢালা পরিস্থিতির সুযোগে দু'জনে একসঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। লজ্জায়, অপমানে মাথা হেঁট করে চলে এসেছিল সায়ম। নির্বাক ছিল সারাটা রাস্তা।
বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলতে গেলে সে একটা সময় ছিল নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি। ন'দিনের বউ লজ্জা, সংকোচে আড়ষ্ট ছিল। যৌনতায় অজ্ঞ ছিল বলেই হয়তো, সায়ম জোর করেনি, চূড়ান্ত শারীরিক সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি। শরীর চিনেছিল। উষ্ণতার আস্বাদ নিতে-নিতে ভেবে ছিল জড়তা ভাঙতে সময় বেশি লাগবে না।

বলপ্রয়োগ কেন সে করবে? পরে সব পরিষ্কার হয়েছিল। সায়মের মতো তারও কৌমার্য অক্ষত ছিল গূঢ়তর কারণে।

ডায়েরি টেনে গালে আঙুল রেখে অনেকক্ষণ বসে থাকল সে। দু'লাইন লিখলেই মনে প্রত্যাশা জাগবে, পরের ধাপে প্রত্যাখ্যানের অবসাদ। যশের লোভ এক মারাত্মক অসুখ। এদিকে নিজের অনুভূতি হর্ষ-বিষাদ-অভিমান লিখে রাখতে যে প্রবল ইচ্ছে হয়। ঘণ্টাখানেকের কাটাকুটি করে, তৃপ্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে সায়ম পড়ে। সৃষ্টি, তার দিনযাপনের ভিটামিন। লিগামেন্টের বিরতিহীন যন্ত্রণা ভুলিয়েছে, এইভাবে নয়

একান্ত অন্ধকার আরও কিছু চায়
ঋতুপার্বণের ব্রতকথা সেরে কোন প্রস্তরযুগের ভোরে
পুরুষস্পর্শের পবিত্র কামনা মানত করেছিল
যে-শাশ্বত মানবীটি, তার ঠোঁট থেকে ধার করো
সেই দ্বিধাহীন আকুলতা
আলপথে হেঁটে যাও যদি, কুয়াশা ভোরের শ্যামাসঙ্গীতটি
শিখে নিও
প্রাত্যহিক দহনের এই ক্ষয়বৃত্ত থেকে, চেনা তমসারেখা থেকে
মুখ ফিরিয়ে আমি তো কারও অপেক্ষায় আছি।

দরজায় টোকা পড়তেই ডায়েরি বন্ধ করে ড্রয়ারে রেখে চাবি দিল সায়ম। অসমাপ্ত কবিতা ড্রয়ারের নিভৃত অন্ধকারে অপেক্ষায় থাকুক। অদিতি হেসে বলল, "পেশেন্টের খবর কেমন?"

"মোটামুটি।"

"সবই কপাল। শুয়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছ। আর আমি রোদে তেতেপুড়ে ছুটছি। আমার বেডরেস্ট যে কবে হবে!"

"সেকেন্ড টাইম মা হলেই বেডরেস্ট পাবে," সায়ম লঘুচালে বলে। অদিতি চোয়াল শক্ত করে, "শখ মন্দ নয়। তোমরা পুরুষরা তো বলেই খালাস।"

{১০}

শেখরদা সন্ধের শেষে বাড়িতে এলেন। খুবই কম আসেন। প্রীতিনাথ জ্ঞাতিসম্পর্কের এই ভাইপোকে তেমন পছন্দ করেন না। আত্মীয়স্বজনরাও শেখরদাকে সুনজরে দেখতেন না। শেখরদা একবার গল্পের ছলে জানতে চেয়েছিলেন, "আমার সম্বন্ধে গুজব ফিসফাস শুনিসনি কখনও?"

"না তো।"

মৃদু ধমকে চোখ নাচিয়ে বলেছিলেন শেখরদা, "গুডি বয় সাজিস না। তুই এখন অ্যাডাল্ট। আগে এই বয়সের লোকদের 'প্রৌঢ়' তকমা জুটত। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলছে চল্লিশ পেরোলেই চালসে নয়। জীবনকে আবার নতুন করে শুরু করার তাগিদ আসে অনেকের মধ্যে। এবার ভান না করে বল শুনিসনি কিছু? আমার চরিত্র সলিড সিমেন্ট বলে লোকজন প্রশংসা করে?"

"স্পষ্ট করে কেউ বলেনি। আভাসে বুঝেছি।"

ধ্রুবর অকালবিয়োগের পর প্রিয়নাথ অনেক নমনীয় হয়ে গিয়েছেন। শেখরদা এলে বিরক্ত হন না, কুশল জিজ্ঞাসা করেন, দেশবাড়ির অতীত-বর্তমান আলোচনা চলে।

শেখরদা আবার অদিতির ফাইনাল কনসালটেন্ট। কোথায় টাকা রাখা উচিত, কোন পলিসি লেটেস্ট, কোন বন্ড কিনলে ঝুঁকি কম ইত্যাদি পরামর্শ অদিতি শেখরদার কাছেই নিয়ে থাকে। শেখরদার চরিত্রের ব্যাপারে অদিতির মনোভাব কখনও বোঝা যায় না। অদিতি এমনিতেই বাদামের শক্ত খোসা, ভাঙা যায় না, অন্যের বেলায় তার দৃষ্টিভঙ্গি সে পারতপক্ষে প্রকাশ করতে নারাজ।

হেসে অদিতি বলল, "কোথায় খবর পেলেন? কোন চ্যানেল দেখাল বলুন দেখি? খবর পেয়েই ছুটে এলেন। বিখ্যাত লোকদের খবর দেখছি বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পেশেন্ট দিব্যি পায়ের উপর পা রেখে বাবুস্টাইলে শুয়ে আছে।"

শেখরদা বললেন, "তোমাদের বাড়িতে এসেই শুনলাম। আগে জানলে ফলমূল নিয়ে আসতাম।"

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন শেখরদা। চেয়ারে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। মুখের মানচিত্রে চিন্তার সূক্ষ্ম রেখা। দেওয়ালকে শোনানোর ভঙ্গিতে বলেন, "আমি খুব দোটানায় পড়েছি। কাকে আর বলি? তোকে বলা যায়।"

শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে পেপার-কাটিং বের করে বাড়িয়ে দিলেন, "পড়ে দেখ। তারপর খুলে বলছি।"

সায়ম শিরোনাম দেখে বিস্মিত হল। 'দু'বার সন্তান হারিয়ে ৫৫-য় পৌঁছে এবার মা'।

শেখরদা তাড়া দিলেন, "পুরোটা পড়।"

দ্রুত পড়ার অভ্যেস সায়মের আছে। তার দেরি হল না। 'পঞ্চান্ন বছর বয়সে নতুন করে মা হয়েছেন শ্যামবাজারের বাসিন্দা ইন্দ্রাণী মিত্র। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন করে বাঁচার ইচ্ছেটাও ফিরে এসেছে। দু'বার সন্তান হারানোর পরেও, স্রেফ মনের জোরে ফের সন্তানলাভের ইচ্ছে আসে রুদ্রনাথ-ইন্দ্রাণীর। মাস তিনেক আগে আইভিএফ অর্থাৎ ইন ভিট্রোফার্টিলাইজেশন পদ্ধতিতে ওভাম ডোনেশনের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ইন্দ্রাণী। সাড়ে সাত মাসে জন্মালেও শিশুটি সুস্থ আছে। ডক্টর জানিয়েছেন ওই দম্পতির ইচ্ছাশক্তির জোর তো ছিলই, তার উপর ইন্দ্রাণীদেবী সুস্থ ছিলেন। বেশি বয়সের সন্তানধারণের ঝুঁকি নেওয়ার পিছনে আর্থিক সচ্ছলতাও কাজ করেছে। ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, সন্তানসুখ পেতে চাইলে বয়সের বাধা অতিক্রম করা যায়।'

শেষ করে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সায়ম।

শেখরদা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করেন, "পেপারকাটিংটা নীলার। যত্ন করে রেখেছিল। ডেটটা খেয়াল করেছিস? অগস্টের তিন তারিখ, দু'হাজার তেরো। ক'দিন আগে তোর বউদি কাটিংটা আমাকে দেখাল।

কামাক্ষ্যা তন্ত্রে তৎক্ষণাৎ ফল এক দর্শণেই তীব্র বশীকরণ
শ্রীকৌশিক
গড়িয়াহাট বরানগর ব্যারাকপুর
মেচেদা বর্ধমান কালীঘাট
শিয়ালদহ বহরমপুর কৃষ্ণনগর
বশীকরণ, কালসর্পযোগ, গ্রহণদোষ, মাঙ্গলিক দোষ/ভৌমদোষ, বিবাহ, পড়াশুনায় বাধা, স্বামী/স্ত্রীর অশান্তি ও যে কোনো জটিল সমস্যার সমাধানে না শব্দ নেই
অগ্রিম বুকিং 9163674902 / 9874485354

এই খবরটাই এখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সে মা হতে চায়।"
ছোট শ্বাস নিলেন শেখরদা। মাথা দুলিয়ে স্বগতোক্তির সুরে বলেন, "বাট আই কান্ট ডু ইট। সে মানতে চাইছে না। জেদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। খাওয়াদাওয়া কাল থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। এটা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল নয়? রাজি হওয়া সম্ভব নয়। আমি রক্তমাংসের মানুষ। আমার জীবনের প্রায় সব রং মুছে গিয়েছে। বেশি বয়সের সন্তানকে মানুষ করার মতো শারীরিক, মানসিক জোর আমার নেই। হ্যাঁ, আমি সচ্ছল, পয়সাকড়ির অভাব হবে না। নাও আয়াম ফিফটি-সেভেন প্লাস। একটি শিশুর অন্তত সাবালক হবার মতো বয়স পর্যন্ত যদি বেঁচে না থাকি! সেটা অনেক বড় অপরাধ হয়ে যাবে। নিজেদের সুখের জন্য কেন আর-একজনের জীবন নষ্ট করব?"
"বউদিকে বলেছ তোমার যুক্তি?"
"বলেছি। কারও আবেগ তীব্র হলে যুক্তি মানে না। মানতে চায় না," শেখরদা অসহায় চোখে তাকালেন, "দত্তক নেওয়ার কথা ভেবেছিলাম। লিগালি সম্ভব কিনা খোঁজ নিইনি। বেশি বয়সে দত্তক নেওয়া মানেও বাচ্চাটার জীবন বিড়ম্বিত করা। বলেই দিয়েছি তোর বউদিকে। নীচের তলায় পাঁচটা গরিব স্টুডেন্টকে এনে রাখো। তাদের সন্তানজ্ঞানে মানুষ করো। দায়িত্ব নাও। টাকাকড়ির কোনও অভাব রাখব না। ফিজিক্যালি মা হতে চাইছ কেন? একে খাওয়াদাওয়া বন্ধ, তার উপর সারারাত কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছে। আজ একটি কথাও বলছে না। এরকম চললে ও দেখছি মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে যাবে।"
"কোনও সাইকায়াট্রিস্টের কাছে কাউন্সেলিং করাও," সায়ম বলল।
"কাল জিনিসপত্র ভাঙচুর করেছে। সারা ঘরে ভাঙা কাপ, প্লেট, ডিশ। চেয়ারগুলো দোতলা থেকে ছুড়ে-ছুড়ে ফেলছে। আমি নাকি..." ইতস্তত করলেন শেখরদা। কপালে হাত দিয়ে বিধ্বস্ত গলায় বলেন, "এখনও রিলেশন রেখেছি। তাই আপত্তি করছি।"
"তার মানে!" সায়ম কৌতূহল সংযত করতে পারল না।
"একজন। কোনও একজন। প্লিঙ্ক, বিলিভ মি, তার সঙ্গে আমার কোনও রিলেশন এখন নেই। ধ্রুব চলে যাওয়ার পর থেকে কোনও যোগাযোগ রাখিনি। দু'জনে স্বেচ্ছায় সরে গিয়েছিলাম। সারা পৃথিবী আমাকে ভুল বুঝতে পারে কিন্তু আমি মিথ্যে বলছি না।"
শেখরদা স্বাভাবিক হয়ে বলেন, "চুপ করে আছিস যে!"
কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না সায়ম। মেরুন টিশার্ট আর সাদা ট্রাউজারে শেখরদাকে বহিরঙ্গে সুদর্শন লাগছে। চেহারায় মেদ জমলেও এই বয়সে অসম্ভব পুরুষালি। বুদ্ধিদীপ্ত এমন মানুষ সহজেই মেয়েদের মন জয় করার ক্ষমতা রাখেন। শোকার্ত মানুষের অবয়বে রঙিন আনন্দরেখা ফুটে উঠলে অধিকাংশ মানুষের কপালে ভাঁজ পড়ে। এমন মানসিকতা থেকেই তো আগেকার যুগে বালবিধবাদের শরীর জড়িয়ে দেওয়া হত সাদা থানে।
সায়ম দ্বিধাজড়িত গলায় বলে, "বউদিকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো।"
"পুজোর সময় আন্দামান যাব। সব ঠিক হয়ে আছে। প্লেনের অ্যাডভান্স টিকিট পর্যন্ত রেডি। ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গেই যাচ্ছি।"
"এখন যাও। ইমিডিয়েট বেরিয়ে পড়ো।"
"বলছিস! একটা জায়গা বল।"
"হরিদ্বার।"
শেখরদা ঠোঁট কামড়ে ভাবে একমিনিট, "যাওয়া যায়। তবে ঠাকুরদেবতা অ্যাভয়েড করতে চাইছি। হত্যে, মানত, পুজো দেওয়া...নীলার ম্যানিয়া যদি বেড়ে যায়? ওর মরিয়া প্রার্থনা শুধু একটি সন্তান।"
"তেমন নাও হতে পারে। হয়তো তীর্থস্থান ঘুরলে বউদির মন শান্ত হবে। হরিদ্বার মানেই কি শুধু মন্দির আর আশ্রম! সন্ধের গঙ্গারতি শুনেছি অসাধারণ। আর মুসৌরি, দেরাদুন ঘুরে নিতে পারো। বউদি চাইলে বেনারস, মথুরা, বৃন্দাবন ঘুরে আসবে। তুমি অবিশ্বাসী হয়েছ বলে চাপিয়ে দিও না।"
"দেখি," শেখরদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

"একটা প্রশ্ন করব?"
"করে ফেল। আমি তো এখন বইয়ের খোলা পাতা। দ্বিধা করিস না।"
সায়ম বলে, "বউদি জানত আগে?"
"কী?"
"তোমার রিলেশনের কথা?"
শেখরদা বিভ্রান্ত স্বরে বলে, "কখনও প্রশ্ন করেনি। এভাবে আক্রমণ এই প্রথম। হয়তো জেনেও চুপ ছিল। হয়তো আমার উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। আত্মীয়স্বজনরা কি কানে কখনও তোলেনি? খুব জটিল অঙ্ক।"
"তাহলে হঠাৎ এখন এ প্রসঙ্গ এল কেন?"
"আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, কে ওভাম ডোনেট করবে শুনি! যদিও মডার্ন মেডিকেল সিস্টেমে গোপন রেখেও তা কালেকশন হতে পারে। নীলা বিদ্রুপে চিরে দিল অমনি। 'কেন? সে দিতে পারবে না? ফুর্তি করলেই হল, ত্যাগট্যাগ করবে না!' তুই একবার ভাব সায়ম। মা হতে চাওয়ার প্রবল বাসনা স্বাভাবিক। সেখানে এভাবে কুৎসিত ইঙ্গিত আর ভাবনার অন্ধকার কেন?"
অদিতি প্লেটভর্তি বাদাম, চানাচুর আর মিষ্টি দিয়ে গেল। শেখরদা গোগ্রাসে খেতে শুরু করেন।
মিষ্টি মুখে পুরে ম্লান হাসেন, "খিদে পেয়েছিল খুব। সকাল থেকে পেটে তেমন পড়েনি।"
"কেন?"
"নীলা রান্নাবান্না করেনি আজ। একজন উপবাসে থাকলে কীভাবে আর খেতে পারি! খালি পেটে থাকার অভ্যেস নেই। দুপুরের দিকে দোকানে বাটার-টোস্ট খেয়ে নিয়েছি। ব্যস।"
খাওয়া শেষ করে শেখরদা বলেন, "ভাল গানটান চালা দেখি। কাল থেকে গান-টানার পরিস্থিতি ছিল না। আমার ইন্দ্রিয় সুরের বিচ্ছেদে অবশ হয়ে যায়। পাগল-পাগল লাগে। শ্মশানচুল্লির ধোঁয়া উড়ছিল সামনে আর একটা তোবড়ানো বাইকে বসে ধ্রুব হাসছিল। হঠাৎ অর্ধেক একটা থ্যাঁতলানো মুখ, রক্তে ভেসে যাচ্ছে, আমি চমকে জেগে উঠলাম।"
ঘরে স্তব্ধতা। অনেকক্ষণ পর স্তব্ধতা ভেঙে শেখরদা বলেন, "তোর মোবাইলে গুরুদেবের গান আছে?"
"অনেক। কোনটা চালাব?"
"আজ ওই গানটা শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। 'সে যেন আমার পাশে।'"
"নাও। হেডফোন দেব?"
"না কানে ব্যথা আছে। হেডফোন বাধ্য হয়ে লাগাই। ভলিউম লো রাখবি।"
প্লে লিস্টে গিয়ে খুঁজে বের করল সায়ম।
চোখ বুজে আত্মস্থ হয়ে শোনেন শেখর, 'সে যেন আমরা পাশে আজও বসে আছে/ চলে গিয়েছে দিন তবু আলো রয়ে গিয়েছে/ ভেঙে যাওয়া পাখির বাসার মতন মন/ কিছু নেই তার বুকে আজ তো এখন/ডানা মেলে ফিরে কেন আসা তার কাছে।'
ধ্রুবর জন্যে নয়, অন্য কারও জন্যে শেখরদার বুকের ভিতর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

{১১}

আপ লোকালে উঠে পড়ল রমিত।
দুপুরে মেলায় এসেছিল সে। বেগুনবাড়ি গ্রামে ফি বছর জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যাতে কালীপুজো শুরু হয়। একমাস চলে। ক্ষীরাই নদীর গর্ভে দেবীর মন্দির। পাঁঠাবলি কমে গেলেও সংখ্যাটা প্রতি বছর পাঁচশ পেরিয়ে যায়। ফলহারিণী কালীপুজো উপলক্ষে মেলা বসে। কোনও নদীর বুকে এত বড় আর দীর্ঘ সময় ধরে চলা মেলার উদাহরণ সম্ভবত আর নেই।
ফলহারিণী কালীর মেলায় চোলাই আর বিদেশি মদ দুটোই মেলে।

রমিত সূর্যাস্তের পরই একটা বোতল জোগাড় করেছিল। নেশায় টালমাটাল হবার পর তীব্র টান টের পাচ্ছিল সে।
শিলং থেকে ফিরেই বাড়ির পরিবেশ অন্যরকম লাগছিল তার। ঘরে পা দিয়েই মনে খটকা জেগেছিল। বাড়িটায় কোলাহল নেই, কারও মুখে হাসির আভাস পর্যন্ত নেই, কথা বিশেষ কেউ বলছে না। গুমট, অস্বস্তিকর আবহাওয়া। গিফট দেবার সময় সবাই হেসে অল্প কথা বলল ঠিকই কিন্তু প্রাণের স্পর্শ নেই। কষ্ট করে মুখে হাসি ফোটাচ্ছে। ভাইপো, ভাইঝিরা অবশ্য কাছে ঘেঁষে বেড়ানোর গল্প শুনল। তাদের ঘুরিয়ে জেরা করে আসল কারণ বুঝে নিল রমিত। দুই দাদার মধ্যে বিশ্রী ঝগড়া হয়েছে চারদিন আগে। তার জের এখনও চলছে। ঝগড়ার পর দুই দাদা এবং বউদিদের মধ্যেও মৌখিক আদানপ্রদান কার্যত বন্ধ। বড়বৌদি তার কাছের মানুষ, রমিতকে চিরদিনই স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। সেই বউদিও মুখে কুলুপ এঁটে থাকল। বড়দের ঝগড়ার রেশ ছোটদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। তারাও এক সোফায় বসে টিভি দেখে না, খুনসুটি করে না, পরস্পরকে এড়িয়ে যায়। তিনদিন নীরব দর্শক থাকার পর ধৈর্যে ফাটল ধরে গেল। ডাইনিং রুমে সে চিৎকার করে বলে ফেলল, "এসব হচ্ছেটা কী? মৌনব্রত চলছে কেন পরিবারে? আমি জানতে চাই কেন এই সোপঅপেরা চলবে? বাচ্চাগুলোর মনে এফেক্ট পড়ছে। কেন এমন চলছে তা কেউ বলছে না কেন?"
তার চিৎকার শুনে বড়দা গম্ভীরমুখে বলল, "কারণ জানার দরকার নেই।"
"কেন? কোথায় তোমাদের প্রবলেম খুলে বলো। মনে-মনে গুমরে তো নিজেদেরই ক্ষতি। একসঙ্গে বসলে ঠিক সমাধান হয়ে যাবে।" বড়দা তাচ্ছিল্যে হাসল, "মনে-মনেই এতকাল চলছিল। এখন বিস্ফোরণ হয়েছে। মঙ্গল হয়েছে। একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।"
"কী বলতে চাইছ?"
"আমরা একসঙ্গে থাকতে পারব না। আলাদা হয়ে যাব। আলাদা হাঁড়ি। ঘরও ভাগ হবে।"
"এক ছাদের তলায় থেকে তোমরা আলাদা হবে?" রমিত বিস্ময়ের অভিঘাতে কেঁপে উঠল।
"যা ভবিতব্য তাই হবে। ব্যবসাও ভাগ হবে। দোকান যথেষ্ট বড়। ভেঙে পার্টিশান দেওয়া হবে," বড়দা কঠিনমুখে বলল।
"কারণটা কী?" রমিতের গলা তার অজান্তেই উচ্চগ্রামে পৌঁছে যায়।
"আস্তে," বড়দা ধমকের সুরে বলে, "ফ্যামিলি বিজনেস অংশীদাররা বুঝে নিতেই পারে। তুই অনর্থক সিনক্রিয়েট করিস না। রাগ দেখিয়ে অনিবার্যকে ঠেকানো যায় না।"
রমিত অনুমান করল ঝগড়ার মূল কারণ ব্যবসা। দুই দাদা একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। খুচরো মনোমালিন্য সব সংসারে হয়, যৌথ পরিবারে থাকলে মৃদু ঠোকাঠুকি হতে পারে, সময় তা ঠিক করে দেয়। আগে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি রমিত। বড়দা হিসেব দেখানোর বেলায় গড়িমসি করে। মেজদার রেগুলেটর মেজবউদি তা মানতে রাজি নয়। পরিবারের বড়দার দাপট বেশি। মুখ ফুটে বলার মতো বেপরোয়া মেজদা নয়। সলতেয় আগুন ধরিয়েছে মেজবউদি। দু'পক্ষেরই দোষ। টাকাকড়ির ব্যাপারে স্বচ্ছতা রাখলে ভুল বোঝাবুঝির প্রশ্নই আসে না।
ঘরে রমিতের মন টিকছিল না। শিলং ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত লাগছিল। স্কুলও খুলে যাবে। মাঝখানে ক'টা দিন বিশ্রাম নিতে চেয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধের আবহে বিশ্রাম ব্যারামে বদলে গিয়েছে। ঘরের বাইরে থাকলে মন একটু টেনশনমুক্ত হবে। গনগনে রোদে ট্রেন ধরে ক্ষীরাইয়ের কাছে মেলায় চলে এসেছিল সে।
বোতলের ছিপি শেষমেশ খোলা হল না। নেশায় মাতোয়ারা হবার ইচ্ছে দমিয়ে দিল মেঘার মুখ। মেয়েটাকে একা রেখে এসেছে। এতকাল নিশ্চিন্তে বাকিদের জিম্মায় রেখে এদিক-সেদিক বেরিয়ে পড়ত। ঘরের পরিবেশ এখন প্রতিকূল। মেঘার মধ্যেও ছটফটানি উধাও। তার খাতিরযত্নের অভাব না হলেও প্রচ্ছন্ন দায়সারা ভাব। বড় হচ্ছে। বুঝতে শিখছে।
তড়িঘড়ি মেলা থেকে চলে এসেছে রমিত। ভেবেছিল আজ ফিরবে না। ঘরের গুমট পরিবেশে মেঘাকে একা ফেলে রেখে আসা উচিত হয়নি।
ঘুমিয়ে পড়েছিল রমিত। খড়্গপুর প্ল্যাটফর্মে হকারদের হাঁকডাকে তার ঘুম ভাঙে। বুকপকেট থেকে মোবাইল বের করে সে মেঘাকে ফোন করল।
"হ্যালো পাপা, তুমি কোথায়?"
"এই তো আমি খড়্গপুরে পৌঁছে গিয়েছি। আর-একটু পরেই বাড়ি ঢুকছি সোনা। তুমি কী করছ?"
"কার্টুন দেখছিলাম।"
"কোন কার্টুন?"
"বললে তুমি বুঝবে না। তুমি তো অর্ধেকের নামই জানো না," আদুরে গলায় বলে মেঘা।
"সন্ধে থেকে এই হচ্ছে! চোখের বারোটা বাজবে। বিকেলে কী খেয়েছ?"
"ম্যাগি।"
"কে করে দিল?"
"বড়মা।"
আশ্বস্ত হয় রমিত। বড়বউদি অন্তত মেয়েটার খেয়াল রাখছে। পরিবারে ভাঙন এড়াতে বড়বউদি কতখানি আন্তরিক তা বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো দাদার ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। কাল রাতে একবার প্রসঙ্গ তুলেছিল, "রমু, আমাদের দিকটাও ভেবে দেখতে হবে। ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে। তাদের লেখাপড়ার খরচ আছে।" সায়ম নির্বিকার ছিল। তার এখনও বিশ্বাস আছে। মেঘ কেটে যাবে। অমলতাস রোদে স্নান করবে বাড়িটির অন্দরমহল।
মায়াই নদীর সেতু পার হচ্ছে ট্রেন। জন্মশহর মেদিনীপুরকে দূর থেকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। আলোর মালা পরে রূপসী শহর গভীর মায়ায় তাকে ডাকছে। এই মায়া ছাড়তে পারল না বলেই অন্য চাকরি করা হল না তার। ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়েও সে জয়েন করেনি। তার প্রিয় শহর আঁচলে বেঁধে দিল। পরিবার ছেড়ে বাইরে থাকতে হবে, বদলি হতে হবে এখানে-সেখানে। পরিবারের নিবিড় আশ্রয় যেন তাকে আঁকড়ে ধরল। পরিচিত অনেকে তাকে 'হোমসিক' বলে ঠাট্টা করেছিল তখন।
নদী সম্পর্কে তার সংজ্ঞাহীন মোহ। আজকাল নদীর উৎস, গতিপথ, মিথ খুব টানে তাকে। প্রবাদ আছে কংসাবতী নদী সমুদ্রের কাছে খাদগড়া ছিল। কৃষ্ণ দামোদর নদের ছদ্মবেশে তাকে আলিঙ্গন করতে চাওয়ায়, তড়িঘড়ি সমুদ্র-সঙ্গমে মিলিত হয়েছিল নদী। কংসাবতী আর কেলেঘাইয়ের মিলিত রূপ হলদি নদী। হলদি ভাগীরথীর অঙ্কশায়িনী হয়ে সাগরে মিশে গিয়েছে। উপকথা আকর্ষণীয় গল্পের হাত ধরে সুন্দরভাবে নির্যাস বুঝিয়ে দিয়েছে।
স্টেশনে নেমে রিকশা ধরে রমিত। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। বাতাসে প্রশান্তির স্পর্শ। রমিত আশা ছাড়বে না। কালই সে মানত করবে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে। ভাঙন নয়, অটুট বন্ধনের আর্তি রাখবে সে। তার প্রার্থনা কি তিনি শুনবেন না?

{১২}

ঋতুবদলের ফেরিওয়ালা মেঘের দেখা নেই। ঘরটাও তপ্ত চুল্লি, বিছানা ওভেন মনে হচ্ছে। হ্যাঙারে ঝোলানো জামাপ্যান্টগুলো গরম নিশ্বাস ছাড়ছে, শান্তিতে বসে থাকাটাও কষ্টকর হয়ে উঠছে। অসহ্য গরমে ঘর যেন কারাগার।
স্কুল খুলে গেলেও গরমের জন্য ছেলেকে পাঠায়নি অদিতি। রোহনকে

AMARBOI.COM

সে সময় দিতে পারছে। এমনিতেই অদিতি আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই রোহনকে প্যাকেজে রাখে। সায়মের ইচ্ছে ছিল ছেলে গান শিখবে। নতুন-কেনা হারমোনিয়ামে রোহন উৎসাহে নিয়মিত রেওয়াজ শুরু করেছিল। গানের স্যারও উচ্ছ্বসিত। ছেলেটার গানের গলা সুন্দর, আরও আগে শুরু করা উচিত ছিল। বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই উদ্যমে ভাটা পড়ল। নেহাত বাধ্য হয়ে স্যার আসার আগে আধঘন্টা দায়সারা প্র্যাকটিস করে রোহন। রাগারাগি করেছিল সায়ম। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারল। নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন ছেলের উপর চাপিয়ে দেওয়া ক্ষতিকর। লজ্জিত মুখে গানের স্যারকে আসতে মানা করে দিল সে। তার শৈশবে গান শেখার অত চল ছিল না, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও ছিল না। স্বপ্ন এবং পরিণতির মধ্যে চিরকালই আড়ির সম্পর্ক। অদিতি বলল, "বেশ করেছ। পড়ার চাপ বাড়ছে। উঁচু ক্লাসে উঠলে সময় দিতে পারবে না। ছেলে তো আর নামী গায়ক হবে না।"

গল্পের বইয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। খুঁজে পেতে অনেক বই কিনে আনত সায়ম। ভিডিও গেমস এবং টিভির বিকল্প হতে বই পারল না। রোহনের মধ্যে নিজের ভাললাগা সঞ্চারিত করতে না পেরে দুঃখ পেয়েছিল সায়ম। শেখরদা ইদানীং পরামর্শ দেয় বারবার, "ছেলেটার জন্য সময় রাখিস। কখন দেখবি নিজের অজান্তেই ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে! বাইরে পড়তে চলে গেলে খুব মিস করবি। এই বয়সটায় যেভাবে কাছে পাবি, আর কখনও পাবি না। কাছে টানতে শেখ।"

ছাদে রোহনকে নিয়ে একদিন বিকেলে সে ক্রিকেট খেলল। লিগামেন্টের ব্যথাকে গুরুত্ব না দিয়েই নাগাড়ে বল করে গেল। দুপুরে এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে গল্পের ঝাঁপি খোলে সায়ম। মহাভারতের গল্প শোনায় ছেলেটার বেশ নেশা। আসলে রমিতই নেশাটা ধরিয়ে দিয়েছে। বাচ্চাদের সঙ্গে মেশার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে রমিতের। রোহনের গল্পের ভাঁড়ার বেশ সমৃদ্ধ। সে রানি রাসমণি কীভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তা সবিস্তারে শোনাল।

সায়েন্সের টিচার সাতটার সময় আসবেন। তার আগে পাঁচটা থেকে সুইমিং শেখা শুরু। হেঁটে বা রিকশায় গেলে সময় নষ্ট, রোহনেরও ক্লান্ত লাগে ফেরার সময়, অদিতি তাই একটা স্কুটি কেনার কথা ভাবছে এবার। ব্যাঙ্ক থেকে ফিরতে সায়মের সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়। মাঝের দু'দিন শেখরদার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। রমিতের স্কুল খুলে গিয়েছে। ফোনে কথা বলায় রমিতের এখন কেমন অনীহা। পরিচিত উচ্ছ্বাস তো দূরের কথা, রমিত শ্রুতিপারে যেন কথা হাতড়ে বেড়ায়। শেখরদাকেই ফোন করল সায়ম।

"হ্যালো।"

"কেমন আছ?"

"আছি।"

"অনশন-ধর্মঘট বন্ধ হয়েছে?"

শেখরদা সম্ভবত সহজভাবে নিলেন না। গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন,

"হয়েছে।"

"হরিদ্বার যাচ্ছ?"

"যাব। সময় হলেই যাব।"

সায়মের অপ্রস্তুত লাগছিল। মেপে-মেপে কথা বলছেন শেখরদা। বয়সোচিত দূরত্ব রাখতে চাইছেন। শেখরদা আর এই মুহূর্তে বইয়ের খোলাপাতা নেই। মলাটে ঢেকে দিয়েছেন নিজেকে।

"খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক করছ?"

"করছি।"

"বাড়িতেই?"

"অত খেজুরে কথা বলার সময় নেই। ব্যস্ত আছি। রাখছি।"

সায়মের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। অসম সম্পর্কের পরিণতি বন্ধুত্বে পৌঁছতে পারে না। এক পা এগোলে ইতস্তত করে দু'পা পিছিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্মণরেখা থেকেই যায়।

জানালার ওপাশে অনাবৃষ্টিতে রিক্ত, বিবর্ণ পাতার দল। উচ্ছল পাতাগুলো ফ্যাকাসে হলুদ। দুপুরের তপ্ত পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়েছে বিকেল। শরীরে তার ছায়াতুর ভাষা। প্রগাঢ় শান্তির আলো ছড়িয়ে দেয় চারদিকে। রোদদগ্ধ শূন্যতা আঙুলের স্পর্শে সরিয়ে দিচ্ছে আস্তে-আস্তে। বিকেল যেন ঈশ্বর। তার সৃষ্টিতে সুন্দরের আদিগন্ত মায়া, ইশারায় অফুরান রঙের মোহ। সেই বর্ণময় ক্যানভাসের ভিতর মায়াঘুমে ডুবে যেতে ইচ্ছে হয়। বিকেলের কাছে ঋণী হয়ে সায়ম ঝুঁকে পড়ল ডায়েরির পাতায়,

এমনও দিন আসে জানলায় মেঘ ভাসে
মন ভাসে কাগজের নৌকো হয়ে
হারানো দিন সব ছবি আঁকে ক্যানভাসে
ঘড়ির কাঁটা থেকে মুখ ঘুরিয়ে॥

এমনও দিন আসে কেউ নেই আশেপাশে
ঘুমঘোর ছায়াপথ ডাকে বারবার
হারানো খেলার মাঠ চেনাজানা পথঘাট
জেগে ওঠে সুখভরা রূপকথা নিয়ে॥

সঞ্চারীতে না চাইলেও ভালবাসার আরোগ্য মুখ বাড়িয়ে দিল। গানের কথায় ভালবাসা প্রতীক্ষালিপি হলে তো কোনও ক্ষতি নেই। দ্বিধা সরিয়ে লেখে সায়ম,

সোনালি আলোর রেণু গাল ছুঁয়ে যায়
আছে কেউ খুব কাছে খুঁজি কবিতায়
এমনও রাত আসে চুপচাপ পাশে বসে
ঘুম থাকে সুরভিত স্বপ্ন নিয়ে॥

অদিতি কলেজ থেকে ফিরেছে। নীচে তার পায়ের আওয়াজ। অদিতি বাড়ি ফিরলে তার ইন্দ্রিয় মুহূর্তেই সংকেত পেয়ে যায়। তবে কি

A.P INVESTIGATION & SOLUTIONS (APIS) | A.P SECURITY
প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা নিজের সমস্যার সমাধান করুন
১) বিবাহের আগে/পরে সম্পর্কের বৈধতা যাচাই করুন। ২) প্রেমের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যক্তির সত্যতা/পরিচয়-এর বিবরণ জানুন
৩) জমি সংক্রান্ত ও যে কোনো ক্রিমিনাল/সিভিল/ডিভোর্স কেস-এর সমাধান। ৪) যেকোন ব্যক্তির গতিবিধি সত্যতা যাচাই করুন।
৫) অফিস/গোডাউন/হাউসিং/নার্সিংহোম/মল প্রভৃতি জায়গায় সিকিউরিটি গার্ড; কেয়ারটেকার; হাউস কিপার সরবরাহ করা হয়।
Head Office: DD-122, Narayan Tala, East Aswininagar, (1st Floor), Baguihati, Kolkata-700059
Branch Office: 5J, Bidhannagar Road, Kol-67, Phone: 9836974065, 9674406240, 033-23560317

অদিতির বাড়ি ফেরার প্রতীক্ষা জেগে থাকে মনের গোপনে? হয়তো। দোতলায় এসে ব্যাগটা ডিভানের উপর রেখে আদিতি তাকে ডাকল। "এখানে এসে বলো," সায়ম নিস্পৃহ ভাব দেখায়। কাছে এসে সাবধানী দৃষ্টিতে চারদিকে জরিপ করে অদিতি তার গালে তিনবার গাঢ় চুমুর স্পর্শ দিল। ফিসফিস করে বলল, "নীলাবউদি সুইসাইড করতে গিয়েছিলেন।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। পরশু রাতে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কুড়িটা ঘুমের ট্যাবলেট নিয়েছিলেন। আপাতত আউট অফ ক্রাইসিস। কেউ জানত না। হিন্দোলের বউ হসপিটালের স্টাফনার্স। শেখরদা যে আমাদের লতায়-পাতায় আত্মীয় তা জানে। হিন্দোলই বলল।"

বলেই বাথরুমে ঢুকে পড়ল অদিতি। ফ্রেশ হবে। বিস্তারিত জানার সময় দিল না।

বিমূঢ় সায়ম দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। নীলাবউদি সাংঘাতিক কিছু ঘটাবেন তার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত হয়তো ছিল।

কিন্তু অদিতি এভাবে হঠাৎ করে তাকে উষ্ণ আদরের ছোঁয়া দিল কেন?

{১৩}

এমন মারাত্মক ভুল যে কীভাবে করে বসলেন শেখর নিজেও ভেবে পাচ্ছেন না। শুক্রবার সন্ধে আটটার সময় ছটফট করতে-করতে তিনি সেই বাড়িতে ডোরবেল টিপেছিলেন। রেলশহরের ওই বাড়িটি যে তার একসময়ের নিবিড় ভালবাসার আশ্রয় ছিল। নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল ভুলে তিনি চলে গিয়েছিলেন। অসহ্য একাকীত্বে অস্থির হচ্ছিলেন বলেই গভীর আনন্দের নেশাভরা পুরনো সন্ধেগুলো যেন বারবার ডাকছিল। হঠাৎ ভেসে আসা কোনও করুণ গানের টানে চেনা পথে, চেনা বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি।

সাড়া না পেয়ে দ্বিতীয়বার কলিংবেল টিপেছিলেন শেখর। মণিদীপা আসছে। পরের মুহূর্তেই মণিদীপার অবয়ব আড়ালে চলে গেল। দীর্ঘ, সুঠাম উষ্ণীষ তাঁর সামনে। দেড়বছর দ্যাখেননি। কালো টিশার্ট আর বেরমতায় তাকে দীপ্ত তরুণ মনে হচ্ছে। কত বড় হয়ে গিয়েছে! তাকে প্রায় টেনে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল উষ্ণীষ। সপাটে চড় মারল গালে। মণিদীপা আটকাতে চাইল তাকে। উষ্ণীষের সঙ্গে গায়ের জোরে সে পারবে কেন? আলতো ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল। হিসহিসে গলায় বলল, "প্লিজ মা। একটা কথাও বলবে না। গেটেই পেটাতাম। ওপেনলি করছি না।"

বলেই ঘুসি চালাল উষ্ণীষ। থুতনি কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেল তাঁর। মণিদীপা প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল, "ওকে ছেড়ে দে তুই।"

শ্লেষে ঘাড় ঘুরিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল উষ্ণীষ, "তোমাকেও যেন ও পুরোপুরি ছেড়ে দেয়। দু'জনে বহুত মস্তি করেছ। এবার ফুলস্টপ দাও। ভেবেছ বুঝতে পারিনি? ক্লাস টেন থেকেই আন্দাজ করেছিলাম। লজ্জা করে না তোমার? বাবা জবের জন্য বছরের বেশির ভাগ সময় বাইরে থাকত আর তার সুযোগ নিয়ে তোমরা দু'জন...ছিঃ!"

আরও কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পর শেখরকে ছেড়ে দিল উষ্ণীষ। দরজা খুলে তর্জনী তোলে, "আসুন। গুডবাই। এর পর বেগড়বাঁই করলে বাড়ি থেকে তুলে এনে প্যাঁদাব। ছোটবেলায় অনেক খেলনা, বিস্কুট, কেক-প্যাটিস নিয়ে আসতেন। গিফট দিতেন। আসলে ওগুলো ঘুষ। তাই আপনাকে হালকা আদর করে ছেড়ে দিলাম। ইনজুরিটা ফাস্ট-এডে ঠিক হয়ে যাবে। ওয়ার্নিংটা মনে রাখবেন।"

শেখর প্রথমটায় ভেবেছিলেন ট্রেনেই ফিরে আসবেন। আপ ট্রেনে ভিড় থাকে। কামরাভর্তি লোকের সামনে এই আহত মুখ নিয়ে দাঁড়াবেন! জিবে নোনতা স্বাদ, রক্তের দাগ রুমালে মুছে ফেললেও চিহ্ন লুকনো যাবে না। পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে মুশকিল। কী হয়েছিল? কীভাবে লাগল? লজ্জা আর বাড়াতে চান না। ট্যাক্সি ভাড়া করলেন খড়্গপুর স্টেশনের স্ট্যান্ডে।

আঘাতটা মনেই বেশি লেগেছে। সেদিনের সেই উষ্ণীষ ওরফে রিন্টু তার গায়ে হাত তুলল। বিষাক্ত আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত করে দিল তাঁর অস্তিত্বকে। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

উষ্ণীষের সপাট চড়ে তার সংবিত ফিরেছিল। চূড়ান্ত হঠকারিতা করে ফেলেছিলেন, ফেরার পথ নেই। বোধবুদ্ধি উধাও হয়ে গিয়েছিল কেন তাঁর? কেন তিনি ছুটে এসেছিলেন স্থান-কাল-পাত্র সব কিছু ভুলে? গাড়ির জানলায় মুখ রেখে শেখর বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। চৌরঙ্গি পেরিয়ে দুরন্ত স্পিডে এগোচ্ছে তার গাড়ি। ভোরে দেখা সেই হিমশীতল স্বপ্ন খোলামকুচির টুকরো হয়ে যাচ্ছে। জোড়া লাগিয়ে মনে করার চেষ্টা করলেন শেখর। ক্যানসার হসপিটালের করিডরে হুইলচেয়ারে বসে আছে এক নারী। মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছে, মাথা প্রায় ন্যাড়া তার। মণিকর্ণিকায় অকাল বিপন্নতা। ব্যথায় কাতরে উঠল সেই নারী। হুইলচেয়ারও অন্তর্হিত হয়ে গেল। হন্যে হয়ে ছুটতে-ছুটতে শেখর পৌঁছলেন ওয়ার্ডে। ওয়ার্ডের করিডরে ট্রলিতে শুয়ে আছে কেউ, আশরীর চাদরে মোড়া, চাদর সরিয়ে শেখর দেখলেন মৃত্যুরেখা। মণিদীপা পরম শান্তিতে চোখ বুজে রয়েছে...

মৃত্যুময় ভোরে জেগে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন শেখর। কতদিন দেখেননি মণিদীপাকে, ফোনেও যোগাযোগ নেই, কোনও খবরই রাখেননি। সম্পর্কের বিচ্ছেদ হয়েছিল দেড়বছর আগেই। ধ্রুবর বিয়োগে শেখর তখন বিপর্যস্ত। মণিদীপাও বুঝেছিল সম্পর্ককে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রিন্টুও আর ছোট নেই। তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না আর। তারা সেলিব্রিটি নয়, সমাজ-সংসার তুচ্ছ করে ভেসে যেতে পারবে না।

অবুঝ মন বলছিল নিশ্চয়ই মণিদীপার কিছু হয়েছে। ফোন করেছিল তিনবার। ওপ্রান্ত নিরুত্তর। আশঙ্কা, উদ্বেগে স্থির থাকতে পারছিলেন না শেখর। ধ্রুব হারিয়ে গিয়েছে। কেউ আর থাকবে না। কাচের ঘরে শুয়ে থাকবে আরও একজন। কিছুই নিয়ন্ত্রণে ছিল না তারপর। ট্রেনে পনেরো-কুড়ি মিনিট লাগবে পৌঁছতে।

মেদিনীপুর শহরে ঢুকছিল ট্যাক্সি। সিটে এলিয়ে পড়েছিলেন শেখর। উষ্ণীষের গলায় তীব্র বিদ্বেষ। তার উদ্ধত তর্জনী মণিদীপার দিকে। ধুলোয় যেন মিশে যাচ্ছিল মণিদীপা। মণিদীপাকে নগ্ন, বেআব্রু করে দিলেন তিনি। সবই তার নির্বুদ্ধিতা। ভালবাসা কান্না আর ঘৃণায় শেষ হয়ে গেল। মণিদীপার অসহায় চোখেও ঘৃণা। প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিয়েছেন শেখর। তার নীরব চাহনি যেন বলতে চাইছিল, নিজেকে সম্মান কেন দিল না তার প্রিয়তম মানুষটি! রাতের শহরে নিজেকে ভীষণ নিঃস্ব মনে হচ্ছিল তাঁর। বেঁচে থাকার আলোগুলো নিভে যাচ্ছে একের পর-এক।

বাড়ি ঢুকতেই জেরা শুরু করে দিল নীলা। ঠোঁট কেটে গিয়েছে, কপাল সামান্য ফোলা, থুতনির নীচে আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন। এই ক'দিন প্রয়োজন ছাড়া কোনও শব্দ উচ্চারণ করেনি।

"কী হয়েছিল?"

"কিছু না। পা পিছলে রাস্তায় পড়ে গেছলাম।"

"বৃষ্টি কোথাও হয়নি। শুকনো রাস্তায় পড়ে গেলে? মিথ্যে বলছ তুমি!" নীলার চোখে আগুন। কোনও কথা না বলে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন শেখর। গায়ে হালকা টেম্পারেচার। জ্বর গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আড়ষ্ট, জড়োসড়ো হয়ে শুয়েছিলেন অনেকক্ষণ। নীলার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনে হয় বুঝে ফেলেছে। ঘণ্টাখানেক বাদে নীলা ঘরের পরদা সরিয়ে ঢুকল। মোবাইলটা বিছানায় নামিয়ে শীতল গলায় বলল, "গিয়েছিলে তার কাছে?"

"কে?" দ্বিতীয় ভুল এবং আরও মারাত্মক। কল ডিলিট করা হয়নি। ফোনটা চুপিচুপি কখন নীলা নিয়ে গেল টের পাননি। আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন।

"তিনবার ফোন করেছ তাকে।"

"কাকে?"

"ইউ কে। আননোন লেখা থাকলেই কি চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়!"

"তুমি মিথ্যে সন্দেহ করছ। আমার শরীর খারাপ লাগছে। প্লিজ লিভ মি অ্যালোন।"

"নাটকের ডায়লগ বলে কথা ঘুরিও না। আমি ওই নম্বরে একটু আগে ফোন করেছিলাম। অনেকক্ষণ বেজে চলার পর ফোনটা কেউ একজন ধরেছিল। তুলেই গালাগাল। ভেবেছে শেখর পাঠক আবার তার মাকে ডিসটার্ব করছে। আমি তার স্ত্রী বলতেই চুপ করে গেল। স্ত্রী! কত সম্মানের শব্দ!" নীলার শান্তকণ্ঠের দৃষ্টিতে অসম্ভব চাপা তেজ। সেই রাতেই নীলা ঘুমের বড়ি খেয়েছিল। ভাগ্যিস বাথরুমে যাবার সময় একবার উঁকি দিয়েছিলেন শেখর। অন্যঘরে শুয়েছিল। ভেজানো দরজা প্রায় নিঃশব্দে খুলে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। দ্রুত নবেন্দুকে ফোন করলেন। অসংখ্য অ্যাপার্টমেন্টের নকশা করে দিয়েছেন তিনি। করিৎকর্মা নবেন্দুই পারে এই সর্বনাশ থেকে উদ্ধার করতে। দশমিনিটের মধ্যেই অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড়াল বাড়ির সামনে। হসপিটাল। দৌড়ঝাঁপ। দিশেহারা শেখর শুধু দেখেছেন। বারংবার জেরা আর জেরা। ক্লেফিয়ত। নবেন্দু সাজানো মিথ্যে বলে ঠিক সামলে দিল। ছেলে চলে যাবার পর থেকে উনি প্রচণ্ড ডিপ্রেসড। শোকে-অবসাদে মধ্যেমধ্যে মনের লাগাম হারিয়ে ফেলেন। আগেও দু'-তিনবার চেষ্টা করেছিলেন। প্লিজ, থানা পুলিশ জড়াবেন না এর মধ্যে। নবেন্দু ইতিমধ্যে দু'জায়গায় ফোন করে দিয়েছে। ডক্টরের কাছেও সম্ভবত তাদেরই একজন ফোন করলেন। কথা কী হল বোঝা গেল না। শুধু কল শেষ হলে ধমক দিলেন, "কেন আপনি সাইকায়াট্রিস্ট দেখাননি এত দিন?"

"যেতে চায় না।"

"বুদ্ধি করে বুঝিয়ে নিয়ে যেতে হয়। হিউম্যান গ্রাউন্ডে কেসটা কনসিডার করে দিলাম। পেশেন্ট ডিমনেশিয়ার শিকার, হাক্বব্যান্ড ইনজিওরড ছিলেন বলে খেয়াল করেননি, একটার জায়গায় ভুল করে বেশি ঘুমের ট্যাবলেট নিয়ে ফেলেছিলেন। মিস্টার হাইতের জন্য আমার বদলি রদ হয়েছিল, তার রিকোয়েস্টেই ফল্‌স মেডিকেল রিপোর্ট দিচ্ছি। পাম্প করে দেখতে হবে। লেট্‌স ট্রাই। বাইরে যান। সিস্টেমে পেশেন্ট প্রচণ্ড কষ্ট পাবেন। চোখে দেখতে পারবেন না।"

আজ দুপুরে নীলাকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। বিছানায় নীলাকে শোয়ানোর পর আর ধরে রাখতে পারেননি নিজেকে। বুকে মাথা

রেখে চোখ ভিজিয়ে ফেলেছিলেন। মন্দির, টেরাকোটা শিল্প আর ধ্রুপদী সঙ্গীতের ঐতিহ্যবাহী শহর বিষ্ণুপুরের মেয়ে নীলা। বাবা বিষ্ণুপুর ঘরানার ক্লাসিকাল গায়ক, প্রচারের আলো থেকে দূরে ছিলেন চিরকাল। নীলা তাঁর কাছেই ক্লাসিকালে তালিম নিয়েছে। বাঁকুড়া শহরের এক অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনে উচ্ছ্বসিত শেখর নিজে যেচে আলাপ করেছিলেন। আলাপ থেকে প্রেম। বিয়ে।

ধ্রুব বড় হওয়ার পর গানের চর্চা ছেড়ে দিল নীলা। ছেলেকে মানুষ করতে হবে। ধ্রুব তার প্রাণ, ধ্যানজ্ঞান। তার লেখাপড়া, আদর-আবদার, খাওয়া-দাওয়া। পরোক্ষে সর্বনাশের দরজা খুলে গেল তখনই। শেখরের জন্য কোনও সময় নেই নীলার। নীরস দায়িত্বপালন। যান্ত্রিক জীবন। শারীরিক প্রয়োজনে অন্ধকারে মাঝেসাঝে মিলন। ঘরে বাইরে একা হয়ে গেলেন শেখর। নিঃসঙ্গতার ফাঁসে জীবন আটকে গেল। জড়িয়ে গেলেন শেখর। শূন্যস্থান পূরণ করল মণিদীপা। হাক্কব্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। বছরের অধিকাংশ সময় কাটে জলে। দু'তরফের নিঃসঙ্গতা কাছে টানল একে অপরকে।

কোনও নারীর বুকে মাথা রেখে প্রথম কাঁদলেন শেখর। কান্নার পরের অনুভূতি ভয়। চরম অসম্মানে মণিদীপা যদি কিছু করে বসে! লাভা উদ্‌গীরণ করছিল উষ্ণীষ, ছেলের চোখে সে শেষমেশ নষ্ট নারী হয়ে গিয়েছে। এত হারানোর ভয় নিয়ে কীভাবে থাকবেন তিনি!

নীলার হাত নিজের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখলেন শেখর। 'ওয়াক্ত নে কিয়া কেয়া হাসি সিতম / তুম রহে না তুম হাম রহে না হাম।' গত দু'দিনের ঝড়ঝাপটার পর মাথার মধ্যে গান আসছে। বারবার ধ্বনিত হচ্ছে গীতা দত্তর মরমী গলা, তাঁর অন্তরের মূর্ত বিষাদ। নীলাকে আর কখনও একলা থাকতে দেবেন না তিনি।

{১৪}

অখিলেশ মাইতির সঙ্গে একপ্রস্ত আলোচনা সেরে নিয়েছেন প্রিয়নাথ। জমি-বাড়ির আইনি হস্তান্তর জটিল ব্যাপারে, ঘোড়েল লোকও বেকুব বনে যায়। অখিলেশ মাইতি তাঁর বন্ধুস্থানীয় উকিল। দুঁদে উকিল হিসেবে নামডাক আছে। চেম্বারে মক্কেলদের ভিড় কখনও কমে না। ফাঁক পেলে ন'মাসে-ছ'মাসে একসঙ্গে দু'জনে বসেন, মেপে-মেপে দু'পেগ হুইস্কি পান করেন, ঠাট্টা-মশকরা উপভোগ করেন। প্রিয়নাথের জীবনে বিনোদন বলে কিছু নেই, সংসারের কর্তা তিনি, সমস্ত কিছু তীক্ষ্ণ নজরে রাখার অভ্যেস ছাড়তে পারেন না। সোমলতার মৃত্যুর পর সংসারটাকে আগলে রেখেছেন প্রতিটি মুহূর্তে।

অখিলেশ বলেন, "ছাড়তে শেখো প্রিয়, ছাড়তে শেখো। কর্তৃত্ব ধরে রাখার স্বভাব ছাড়ো।"

প্রিয়নাথ এক চামচ স্যালাড নিয়ে মাথা নাড়েন, "কীভাবে ছাড়ব? বিষয়বুদ্ধি বসেনি। আপন খেয়ালে থাকে। ভরসা পাই না।"

"সায়ম ব্যাঙ্কে কাজ করে। দোকান-বাজার-দৌড়ঝাঁপ বেশ পারে। তোমার ওয়াইফের ট্রিটমেন্ট দায়িত্ব নিয়ে করিয়েছে। চাকরির চাপে তুমি সময় কতটা দিয়েছ? এই বয়সেও ওদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করো কেন?"

"ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছ। আগলে আমি রাখি না। আমি মেন্টরের রোল প্লে করি," প্রিয়নাথ হাসেন, "আমার ভগ্নিপতি আর ও মিলে তো ওই পল্লবীকে দেখেশুনে পছন্দ করেছিল। আমি দেখতে গেলে ভুলটা হত না। চোখমুখ দেখেই ধরে ফেলতাম। ছেলেটা অকারণে দেড়বছর কষ্ট পেল।"

বয়স হয়েছে। এক পেগ পেটে পড়লেই রিমঝিম স্নায়ুতে আমেজ তৈরি হয়ে যায়। দু'জনেই লেগ পুলিং করে মজা পান। অখিলেশ লঘুচালে বলেন, "প্রিয়, বহুকাল তোমার মুখে বাঁকুড়ার ভাষা শুনিনি। হবেক, যাবেক, লারবে। দেশি ফ্লেভার এনজয় করিনি। গরমে বিয়ার নিয়ে বসলেই হত। তুমি হুইস্কির গোঁ ধরলে।"

"তোমার মুখেও অনেক দিন কাঁই যাবি, টকা, আফুয়া ইত্যাদি শুনিনি। কাঁথির লোকের ভাষায় ওড়িশার টান খুব বেশি।"

অখিলেশ বলেন, "এখন চেষ্টা করলেও পারি না, টোনটা আসে না।"

"আমারও তাই। খাবি খাই ডায়ালেক্টটা বলতে। কৃত্রিম শোনায়।"

জড়ানো গলায় বলেন অখিলেশ, "হাসপাতাল, থানা, শ্মশান আর বেশ্যালয়, এই চারটি জায়গায় না গেলে জীবনকে বোঝা যায় না। তুমি কখনও গিয়েছ?"

"কোথায়?"

"বেশ্যালয়?"

কটমট করে তাকালেন প্রিয়নাথ, "আর তোমার সঙ্গে বসব না। এক পেগ চড়িয়েই প্রলাপ বকছ। মাইতির দৌড় কেউ না জানলেও আমি জানি। বাইরে ধুরন্ধর উকিলের ইমেজ। ঘরে বউয়ের ভয়ে কেঁচো।"

ঢুলুঢুলু চোখে অখিলেশ আঙুল ঘুরিয়ে বললেন, "আই অবজেক্ট মিস্টার পাঠক। আমি তাকে ভালবাসি। বউকে ভালবাসলে কেউ স্ত্রৈণ হয় না। ওটা তোমার মতো নীরস পুরুষদের হিংসে। বাট আই ফিল ফর ইউ। প্রায় বারোবছর একা কাটাচ্ছ। একটা বয়সের পর লাইফে সহধর্মিণীর সাহচর্য খুব জরুরি। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম আমরা পুরুষেরা জেনারেলি বুঝি না।"

প্রিয়নাথ দূরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। শান্ত সুন্দর শহরটা আর আগের মতো নেই। অসম্ভব ভিড়। বাইক, টু-হুইলার, বাস, ট্রাকের কানফাটানো হর্ন। দ্বিতীয় পেগে চুমুক দিলেন প্রিয়নাথ,

"অখিল, আমি কোনও ভুল করছি?"

"ভুল?"

"বাড়িটা বেচে দিচ্ছি।"

"এ ব্যাপারে তোমাকে দিশা দিতে পারব না," অখিলেশ ঘাড় দোলান, "বাড়ি বেচা আর ফ্ল্যাটের মালিকানা, টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন তোমাকে গাইড করবে। নিজের হাতে গড়া বাড়ি নয় বলে তোমার সেন্টিমেন্ট কম। আমার বাড়িটাই ধরো। প্রতিটি ইট গাঁথা নিজে দাঁড়িয়ে সুপারভাইজ করেছি। বেঁচে থাকতে বিক্রি করতে পারব না।"

"একটা পয়েন্টে আমার অপূর্ণতা রয়ে গেল।"

"কোন পয়েন্ট?"

"নিজে ঝুঁকি নিতে পারিনি। গ্রাম থেকে শহরে এসে এস্টাব্লিস্‌ড হয়েছিলাম। অলমোস্ট শূন্য থেকে শুরু। ঘরে একটা ফুটফুটে মেয়ে আধগলায় আবদার করবে, ঘুঙুর পরে নাচটাচ শিখবে। খুব শখ ছিল, জানো? ছেলে-বউ একটিতেই ইতি দিল। সেকেন্ডটাইম মেয়ে হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? আমার এখন একটি নাতনির মুখ দেখার জন্য মন ছটফট করে। তুমি আমার দোষ ধরতে ওস্তাদ, কই, আমি অপূর্ণ সাধ ওদের উপর চাপিয়ে দিইনি," প্রিয়নাথ ম্লান হাসলেন।

"আরও একটা নাতি হলে কেস জন্ডিস হয়ে যাবে পিপি। ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা, বিবাদ, হিংসা দেখে চোখ পচে গেল। মিলেমিশে রসেবশে থাকলে এত কেস পেতাম না। টাকাও হত না," জিব টেনে শব্দ করলেন অখিলেশ।

"কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা রোজগার করছ। প্র্যাকটিস তবু চালিয়ে যাচ্ছ। টাকার নেশা তোমার গেল না।"

অখিলেশ আঙুল নাচিয়ে বলেন, "ওটা ইউনিভার্সাল নেশা। তুমি ছাড়তে পেরেছ? বাড়ি বেচে ভাল দাঁও মারবে।"

"টাকা ধ্যানজ্ঞান হলে দেশের জমিজমা ছোটভাইকে লিখে দিতাম না। মাঝেসাঝে দেশে গিয়ে চেনা মাটি, বাতাস, গাছপালার গন্ধ নিতে ইচ্ছে হয়। সংসার ছেড়ে যাওয়াই হয় না," একনিশ্বাসে বলে প্রিয়নাথ থামেন।

প্রিয়নাথ আবেশে চোখ বুজে থাকেন। স্নেহ স্বাভাবিক আবেগ, তার উন্মুক্ত প্রকাশে তাঁর অস্বস্তি লাগে।

{১৫}

ঘরে থমথমে পরিবেশ। কিচেনরুমে দুই বউদি আলাদা রান্না করছে।

রমিতকে বাজারের থলে হাতে বেরতে হচ্ছে না। একজন পটলের ডালনা রাঁধে, আর-একজন থোড়-বেগুনের চচ্চড়ি। এক ওভেনে তেলাপিয়ামাছ ভাজা হয়, অন্য ওভেনে বাটামাছের ঝাল। যৌথ রান্নাঘর আর নেই। রান্নার পদ পৃথক, বড়দা অ্যান্ড কোং-এর রান্না করা খাবার টেবিলের ডানদিকে, বাঁদিকে মেজদের রান্নার পদ। দুই দাদা উকিলের কাছে শলাপরামর্শ নিতে ছুটছে। দুই শিবিরের মাঝখানে পড়ে প্রথমটায় লাভই হচ্ছিল তার। দু'তরফের মেনুই ভাগে পাচ্ছে সে। খাওয়াটা বেশ রসেবশে চলছে।

আজ বিকেলে ছোটোখাট মিটিং হল। গুরুগম্ভীর আলোচনা। কোনও রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ সভা চলছিল যেন। দোকান সমান দু'অংশে ভাগ হবে। স্টকে যা মালপত্র আছে, তা হিসেব করে সমান বাঁটোয়ারা হবে। রমিত নীরব শ্রোতা হয়ে চেয়ারে বসে শুনছিল। এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার রুচি তার ছিল না। পারিবারিক ব্যবসা দ্বিখণ্ডিত করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

রমিত বলে ফেলে, "আমি? আমার ভাগ কোথায়?"

"কীসের ভাগ?"

"ব্যবসার হিস্যা আমিও পাই," চালটা খেলতে বাধ্য হল রমিত। তিন ভাগের প্রশ্নে দুই দাদা চিন্তায় পড়ে যাবে। পৃথক হওয়ার অদম্য ইচ্ছে হোঁচট পাবে।

বড়দা তির্যক চোখে তাকায়, "আইনত ব্যবসায় তোর কোনও অধিকার নেই। লাস্টটাইম ফাইনাল ডিডে তুই সই করেছিলি। কাগজ বলছে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে তুই অধিকার বা দাবি ছেড়ে দিয়েছিস। তা ছাড়া চাকরি করছিস। লিগালি তোর নামে কোনও বিজ্নেস বা পার্টনারশিপ থাকতে পারে না। আইনের প্যাঁচে পড়ে যাবি।"

সম্মতি জানিয়ে মেজদা বলে, "হ্যাঁ। তখন আবার চাকরি নিয়ে টানাটানি। চাকরি করছিস তুই। আমাদের সম্বল ওই ব্যবসা। খবরদার লোভ করবি না।"

রমিত শান্ত গলায় বলে, "বিজ্নেসে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আমি দাবি করছি না। তবে আমার কথাটা একটু ভাবো। লাভের অংশে আমার অধিকার আছে।"

"তোর লম্বা নাকটা বাড়াচ্ছিস কেন বল তো!" কর্কশ হয়ে ওঠে বড়দার গলা।

"না মানে, অনেক টাকা দিয়েছি বিজ্নেসে। তোমরা যখন যা চেয়েছ, বিনা প্রশ্নে দিয়ে দিয়েছি। হাতে সেভিংস তেমন কিছু নেই," বিনম্রভাবে বলে রমিত।

"পার্মানেন্ট চাকরি করিস। মাস পোয়ালে ফিক্সড মাইনে। পেনশন। আমাদের তো সিকিউরিটি বলে কিছু নেই। মার্কেটে কম্পিটিশন বাড়ছে। তোর আবার টাকার চিন্তা!" বড়দা তাচ্ছিল্যে হাত নাড়ে। মেজদা সঙ্গত করে, "জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল এতকাল। তার একজন হিসেবে তোরও দায়িত্ব ছিল। এত বড় সংসার কীভাবে চলে তা জানিস! কোনও আইডিয়া আছে?"

"প্রতি মাসে সংসার খরচ বাবদ দশ হাজার দিতাম," রমিতের রাগ বাড়ছে এবার।

"সবাই দিত। দেওয়াটা তোরও দায়িত্বর মধ্যে পড়ে। পারলে আমাদের ধারটার দিস। আলাদা বিজ্নেস মানে ক্যাপিটাল লাগবে," মেজদা নরম করে হাসে।

"উড়ে বেড়িয়েছিস এতকাল। ঘন-ঘন টুর। হিসেব করে চলতে জানিস না। আমাদের সিচুয়েশনে পড়লে টের পেতি। তোর সেভিংস নেই তো আমরা কী করতে পারি?" ব্যঙ্গের চোখে তাকায় বড়দা।

আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে রমিত। কথার প্যাঁচে সে পেরে উঠবে না। পালটা আক্রমণের রাস্তায় গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল দিকে গড়াবে। দাঁতনখ বের করে ঝাঁপিয়ে পড়বে দুই দাদা। চরম অশান্তি এড়ানোর জন্য চুপ করে গেল রমিত। কষ্ট করে হাসে, "ঠিক বলেছ। খরচার লাগাম টানা উচিত ছিল আমার। একটাই রিকোয়েস্ট। এর পর আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি কোরো না।"

ঘরভাগের পর্ব উত্থাপিত হল। পুবের দুটো রুম বড়দা পাবে। পশ্চিমের দুটো রুম নেবে মেজদা। বিশাল রান্নাঘরের আর প্রয়োজন নেই। কাঠের পার্টিশান বসবে মাঝখানে। কমন দরজা। আরও একটা আলাদা দরজা দরকার। মিস্ত্রি ডেকে করিয়ে নেওয়া যাবে। দু'জনের ফিফটি-ফিফটি খরচা। ডাইনিং ঘরে স্পেস অনেকটাই। মাঝখানে পরদা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। বড়দা উদারতা দেখিয়ে মেজকে প্রস্তাব দিল, "তোর একটা ডাইনিং টেবিল দরকার। ওটা আমি কিনে দেব।"

দোতলার একটি রুম আর ব্যালকনি রমিতের জন্য বরাদ্দ হল। বড়দা হেসে বলল, "তুই লাভবান হলি। ফুরফুরে হাওয়া পাবি। ছাদ কিন্তু সব মেম্বারদের জন্য। ওপেন টু অল। জামাকাপড় শোকানো, রোদ পোহানো, গরমে মাদুর পেতে শোওয়া এগুলো সবারই দরকার। কোনও আপত্তি আছে?"

"আর কোনও কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম আছে?" রমিত হাসল।

"ইভনিংলই বাচাল রয়ে গেলি। পরে দোষারোপ শুনব না। কোনও আপত্তি থাকলে এখনই বলে ফেল। তখন ভুল বোঝাবুঝি না যেন হয়," বড়দা আঙুল মটকায়। মুখটা বুনো ওলের মতো লাগছে।

"সব ঠিক আছে," মেজদা হাসে, "শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেরাই মীমাংসা করে নিতে পারলাম। খাতায়-কলমে একজন ল-ইয়ার দেখে নেবেন। ব্যস।"

নির্বোধের হাসি। রাগে গা গুলিয়ে ওঠে রমিতের। টুকরো-টুকরো হওয়াটা নাকি মীমাংসা!

'ভাগের মা' খুব প্রচলিত প্রবাদ। রমিত সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠে। নীচের একটা রুম তার ছিল। উপরে থাকাটা শাপে বর হল। নীচের গন্ডগোল, ঠান্ডা লড়াই, হিংসের রেশ থেকে দূরে থাকা যাবে। কিন্তু সে যে 'ভাগের ভাই' হয়ে গেল! কোন টেবিলে সে খেতে বসবে, কার করা রান্না সে খেতে পাবে? কোনও উচ্চবাচ্য কেউ করল না। পালা করে দুই দাদার কাছে অন্নগ্রহণ করতে হবে। তেমন বন্দোবস্তই হয়তো করা হবে। কোন টেবিল, কোন মেনু মেঘার কপালে জুটবে? শার্ট গলিয়ে নীচে নেমে আসে রমিত। বাইক নিয়েই বেরোবে। স্টার্ট

AMARBOI.COM

TOPERS TEACHERS BUREAU
The most competent and efficiant teachers bureau provides best and experienced convent teachers for class KG to PG, any area / subject / board.
TEACHERS FREE ENROLL
Call: 9804712402 / 7890190764
Email: toperstutorial1@gmail.com

দিল, অ্যাকসিলেটরে চাপ দিয়ে দ্রুত টপ গিয়ারে পৌঁছল। সত্তর দেখাচ্ছে কাঁটা। শহর পেরিয়ে ঝড় তুলে দিল রমিত। রেললাইন পেরলেই শালজঙ্গল। বাইক স্ট্যান্ড করে রমিত সিগারেট ধরায়। ঋজু শালগাছের বন। সারা বছরই পাতায় ভরা থাকে। শালবীথির আড়ালে শান্ত-মগ্ন বিকেল। অস্তরাগের সূর্য শালবনের ওপারে। নিচু হয়ে লালচে হলুদ একটি পাতা কুড়িয়ে নিল রমিত, বুদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল শালগাছের নীচে। অসময়ে হলুদ ফুলের মঞ্জরীতে সেজে উঠেছিল গাছ, ফুল ফুটে ঝরে পড়েছিল তথাগতর শরীরের উপর। ডালপালা ঝুঁকে ছায়া দিয়েছিল, প্রশান্তির চাদরে মুড়ে দিয়েছিল নির্বাণকে। আর আজ তার প্রিয় পরিবারের অকালমৃত্যু হল। এই পাতার স্পর্শ তাকে কিছুটা শান্তি দিক।

সে তো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিল না, পরিবার টুকরো হবে কখনও দুঃস্বপ্নে ভাবেনি। পারিবারিক ব্যবসা। তিল-তিল পরিশ্রমে নিজের হাতে ব্যবসার গুডউইল তৈরি করে গিয়েছিলেন বাবা। 'উষা হার্ডওয়ার স্টোর্স'-এর সমৃদ্ধি মানে বাবার আজীবন পরিশ্রমকে সম্মানিত রাখা, পরিবারের মজবুত আর্থিক কাঠামোর নির্মাণ করা। দাদারা যা চেয়েছে বিনা প্রশ্নে দিয়েছেন। ব্যবসায় মূলধন ধ্রুবক নয়, প্রতিনিয়ত তা জোগান দাবি করে। টাকা জোগান দেওয়া নাকি তার দায়িত্ব ছিল। কীভাবে দু'জনেই ফুৎকারে উড়িয়ে দিল তাকে। ফোনটা বেজে ওঠে। বড়বউদির ফোন।

"হ্যালো।"

"তুমি কোথায়?"

"জাহান্নমে।"

ওপ্রান্ত কিছুক্ষণ চুপ। ধীরগলায় বলল বড়বউদি, "মাথা গরম কোরো না।"

"শোনো বউদি, মাথা গরম করলে চূড়ান্ত অশান্তি হত। তুমি মলম লাগাতে এসো না। বড়দার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকো চিরকাল। তুমি শান্তি ফেরানোর কোনও চেষ্টাই করোনি। আগাগোড়া চুপ ছিলে। তোমারও সায় ছিল।"

"আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবতে হয় রমু। সবাই ভাবে।"

"নিরাপত্তার অভাব হঠাৎ করে মাথায় গজিয়ে গেল! আমি ছিলাম না? যে-কোনও প্রয়োজনে টাকা ধরিয়ে দিইনি?" রমিত ঝাঁঝালো গলায় বলে, "বিজনেস ভাগ হলে তোমাদের রাতারাতি উন্নতি হয়ে যাবে? বোঝাতে এসো না। এতকাল বোকামি করেছি। প্লিঙ্ক, ফোনটা রাখো। রাগের মাথায় আজেবাজে বলা হয়ে যাবে। মেঘাকে একটু দেখো। আমার ফিরতে দেরি হবে।"

কান্নারং সন্ধের আভাস ফুটে উঠেছে অরণ্যগানে। শিহরণ জাগানো স্তব্ধতা চারদিকে। রমিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইক স্টার্ট দেয়। শহর হ্যালোজেন আলোয় উদ্ভাসিত, তার চেনা মুখরতায় কিছুকাল সে বিকেলের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে মোড়ের মুখে দাঁড়ায়। মনের উপর চাপ বাড়লেই তার ধূমপান বেড়ে যায়। ধোঁয়ার আশ্রয় বেশিক্ষণ তাকে থিতু হতে দিল না। যৌথ সংসারে সবাইকে স্বার্থত্যাগ করতে হয়, নিজের জমি কিছুটা ছেড়ে বাঁচতে হয়। তার এই ভাবনার কী আশ্চর্য প্রতিদান আজ সে পেল! মানুষ শুধু আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব হয় না, মনও দেউলিয়া হয়ে যায়।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছয় রমিত। চাতাল মার্বেলে মোড়া, পরিষ্কার ছিমছাম, অপরূপ শান্তশ্রী মন্দিরচত্বরে। চারদিন আগে মেঘাকে নিয়ে এসেছিল। পরিবার অটুট রাখার মানত করেছিল। মানতে কোনও ফল মিলল না। তবু আজ সে চুপচাপ বসে থাকে। দেবী তো গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি শেখেননি। মর্ত্যের চতুরালি দেখে হয়তো মনে-মনে হাসেন। সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে গিয়েছে। চোখ বুজে প্রশান্ত এবং সমাহিত হয়ে পড়ে রমিত। মায়ের মুখ ভেসে উঠল ন্যানোসেকেন্ডের জন্য, আবার হারিয়ে গেল। মা ছিলেন শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, পরিবারে তার অদ্ভুত কর্তৃত্ব ছিল, কেউ বেলাইন হওয়ার সাহস পেত না।

পাঁচবছর আগে বাবা চলে যাবার পর দাপটে পরিবারকে মুঠোর মধ্যে রেখেছিলেন মা। গত বৈশাখে তিনিও ওপারে চলে গেলেন। জমানোর অভ্যেস রপ্ত করতে হবে তাকে। মেঘার জন্য ঝাপসা কুয়াশাময় ভবিষ্যৎ রাখাটা যে অপরাধ হয়ে যাবে...

{১৬}

মেঘাকে অদিতির জিম্মায় রেখে রমিত আজ বেরিয়েছে। আজ সে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে যাবে। ফুসফুসে অক্সিজেন দরকার তার। সায়ম যাবে ফুলেশ্বর। আগের ব্রাঞ্চে একজন সিনিয়র সহকর্মীর মেয়ের বিয়ে, নেমন্তন্ন রাখতে সে যাচ্ছে। বাঁকুড়াগামী ট্রেনে উঠে পড়ল রমিত। সায়ম হাত নেড়ে বলল, "আজ দু'জনার দু'টি পথ, দু'টি দিকে গিয়েছে চলে।" রমিত মুখে হাসি ধরে রেখে বলে, "সর্বনাশ, ওই গানের কথা জীবনে সত্যি হলে দুঃখ পাব।"

ডাউন ট্রেন খড়্গপুরের পর স্বাভাবিক গতিতে চলছে। জানলার পাশে বসে নয়ানজুলি, উদার আকাশ, গাছপালা, মেঠোরাস্তা দেখছে সায়ম। প্রকৃতির চলমান সেলুলয়েডে অনেকদিন পর আনন্দের মূর্ছনা। মনের চাপা নিঃসঙ্গতা কেটে যাচ্ছে ক্রমশ। রমিতের মতো হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়া তার পক্ষে অসম্ভব, নিত্যযাত্রী হিসেবে ন'বছর লোকাল ট্রেনে ও বাসে দৌড়ঝাঁপ করেছে। বাইরে বেরতে মন চট করে চায় না। মানসভ্রমণেই তার সুখ।

সায়ম কামরার দেওয়ালে মাথা রেখে ঢুলতে থাকে। মুখোমুখি বসা বয়স্ক মানুষটি সন্তর্পণে তার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। মেচেদার আগের স্টেশনে উঠেছেন। অস্থিরমতি মানুষ, শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারছেন না, পারলে এখনই দাঁড়িয়ে পড়বেন। সায়ম মনোযোগ দিয়ে দেখল। আশ্চর্য ব্যাপার, তার স্মৃতি ঠিকঠাক সার্ভিস দিচ্ছে না। চিনতে পারছে সায়ম। একশো ভাগ নিশ্চিত হতে পারছে না। মুখের মিল খুঁজে পেলেও বিভ্রান্ত হয়ে যায় সে। মুখের আদল প্রায় একরকম হলেও আদপে হয়তো অন্য কেউ।

"চিনতে পারছ?"

চশমার কাচের আড়াল ঠেলে দুটো চোখ সরাসরি তার দিকেই নির্দিষ্ট।

"মনে হয় পারছি। কিন্তু..."

"জগৎপুরে বাড়ি। আমি হলাম তোমার শ্বশুরমশাই। প্রাক্তন।" গলাটা সম্ভবত কেঁপে গেল।

"এবার পারছি। ভাল আছেন?"

"ওই একরকম আছি। প্রেশার, হার্টের অসুখ। শুগারেও ধরেছে।"

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"কলকাতা। মেজ মেয়ে বাগুইআটিতে থাকে। ক'দিন ওখানে থেকে চিকিৎসা করাব। জামাই এয়ারপোর্টে কাজ করে।"

সায়ম কথা হাতড়ে বেড়ায়। সময় ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেয়। রাগ, ক্ষোভ এখন আর নেই। ওঁর দোষ গুরুতর ছিল না। জাতপাতের সংস্কার দেশের মজ্জায়-মজ্জায়, সমাজ-আত্মীয়স্বজনরাও মস্ত বাধা, উত্তরভারতে জাত, গোত্র, বিধিনিষেধ তুচ্ছ করে বিয়ে করার শাস্তি 'অনার কিলিং।' ঘৃণ্য, মধ্যযুগীয় বর্বরতার গালভরা নাম। সৌজন্যের সুরে জিজ্ঞাসা করে সায়ম, "ছোট?"

"কানপুরে বায়োটেকনোলজি পড়ছে।"

কিছুক্ষণ মৌনতা। অস্বস্তিকর লাগছে আশেপাশের কোলাহল। বিব্রত স্বরে বাইরে চোখ রেখে তিনি প্রশ্ন ভাসিয়ে দিলেন, "বিয়ে-থা করেছ?"

"হ্যাঁ।"

হঠাৎই সায়মের দু'হাত ধরে আর্দ্র গলায় বললেন তিনি, "সুখী হয়েছ তো?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তোমার জীবন প্রায় নষ্ট করে দিয়েছিলাম। শুনে সান্ত্বনা

পেলাম।"

কামরায় ছুটির দিনের লোকজন অল্প। অল্প হলেও নাটকীয় দৃশ্যটা তারা হাঁ করে গিলছে। সংযত হল সায়ম। শান্ত, কঠিন গলায় বলে, "আস্তে। লাইফ নষ্টের প্রসঙ্গ কেন আসছে? হয়তো মঙ্গলই হয়েছে।" চশমা খুলে তিনি চোখ মোছেন, "মেজমেয়ে লাভ ম্যারেজ করেছে। দ্বিতীয়বার ভুল করিনি। অন্য কাস্ট। সানন্দে আড়ম্বরে বিয়ে দিয়েছি। শুধু বড়টাই সুখী হতে পারল না। মারধর করে! স্কুল অর্ধশিক্ষিত জামাই। পরিণতি ভাল হবে না জানতাম। ভাবের ঘোরে মেয়েটা ভুলপথে চলে গেল। সবই কপাল।"

সায়ম সিট থেকে উঠে দরজার কাছে দাঁড়ায়। পরের স্টেশনেই নেমে যাবে। তিনিও পিছন-পিছন এলেন, মৃদুস্বরে জানতে চাইলেন, "কোলাঘাটে নামবে?"

"হ্যাঁ।"

কোলাঘাট স্টেশনে নেমে ভারাক্রান্ত মনে দাঁড়িয়ে থাকল সায়ম। পল্লবী সুখী হয়নি জেনে আনন্দ হচ্ছে না। ভালবেসে বিয়ে করে ঠকে গেল মেয়েটা! ভালবাসার অপমৃত্যুতে যে নিদারুণ কষ্ট! কেন তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখতে পারল না সায়ম? তাকে সুখী না রাখতে পারলেও কষ্ট দিত না। অত্যাচার করত না।

রূপনারায়ণের রুপোলি অরূপ দেখার জন্য প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে সিঁড়ির ধাপে পা রেখে সায়ম। প্ল্যাটফর্ম অনেকটা উঁচুতে, নামতে গেলে অসংখ্য সিঁড়ি, এক-একটা সিঁড়ি পেরোতেই সময় লাগছে। ফুলেশ্বর আজ আর সে যেতে পারবে না।

বিকেল পাঁচটায় বাড়ি ফিরে এল সায়ম। কোলাঘাটের হোটেলেই সে দুপুরে খাওয়া সেরে নিয়েছে। ফেরার সময় সারাটা রাস্তা ঘুমিয়েই ছিল। মনে ক্লান্তি আসছিল ঝেঁপে। ট্রেনের তপ্ত কামরা আর গরম বাতাসও তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। অকারণ বিষণ্ণতায় সে হারিয়ে যাচ্ছিল। ইতস্তত ঘুরে কোলাঘাট স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চেই অনেকক্ষণ বসে ছিল সে। এমন শান্ত, নিরিবিলি, ছায়াময় প্ল্যাটফর্ম খুব কমই আছে। কতবার ইচ্ছে হয়েছে একটিবার সেখানে আপনমনে নিবিড় সবুজের ছায়াআদরে বসে থাকবে। আজ অস্বস্তি এড়াতে বাধ্য হয়েই নেমে পড়েছিল। মন তবু স্নিগ্ধ আশ্রয় পেল না। পল্লবী সুখী হয়নি, হয়তো চোখের নীচে কালি, সস্তা ছাপা শাড়ি, পিঠে কালশিটে, চোখের জল মুছে গোয়ালঘর ঝাঁট দিচ্ছে। কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ঘর বেঁধেছিল, হারামি বর, তার মর্যাদা দিলি না! মাথায় গাট্টা মেরে নিজেকে বোঝাচ্ছিল সায়ম, 'কে সে তোমার? কেন তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলছ একা-একা! সে তোমার ছিল না, হয়ওনি, সাত পাকে ঘোরার সংস্কার অবলীলায় মুছে দিয়ে সে চলে গিয়েছে।'

{১৭}

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সায়ম মাইগ্রেনের চিনচিনে ব্যথা টের পেল। বাঁদিকের কপালে। অতটা গুরুত্ব দেয়নি সায়ম। বেলা গড়াতেই মাইগ্রেনের যন্ত্রণা আরও তীব্র হল। শিরা দপদপ করছে, চোখে ঘনায়মান অন্ধকার, কখনও অন্ধকারে আলোর ফুটকি নাচে, বাঁদিকের কপাল জুড়ে অবাধ্য নাচের তাণ্ডব কিছুক্ষণ থামে, তারপর দ্বিগুণ তেজে আক্রমণ শুরু হয়। দুপুর একটার পর সে মাথা তুলতে পারছে না। যন্ত্রণা একবার আরম্ভ হলে পেনকিলারে কোনও কাজ হয় না। দু'নম্বর পেনকিলার গিলে ফেলল সায়ম। তুর্কিনাচনের দাপট আরও বেড়ে গেল। এইসময় সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অল্পেতেই রেগে যায়, রাজ্যের অপচিন্তা মাথায় অনবরত হাতুড়ি পেটাতে থাকে। সকালে খবরের কাগজে পড়া ঘটনাটা মাথায় জট পাকিয়ে ফিরে আসছে। কিছুতেই তাড়াতে পারছে না। ইউ পি'র গ্রামে দুই তুতো বোনকে গণধর্ষণ করে দেহ গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বিবমিষায় সারা শরীর গুলিয়ে উঠল তার। ছুটে বেসিনে গিয়ে বমি করে ফেলে সায়ম। নিস্তেজ সায়মকে ধরাধরি করে বেঞ্চে শুইয়ে রেখে দীপেন ছুটল ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে। অফিসের গাড়িতে তুলে

বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে দীপেন এবং আরও দু'জন।
প্রায় বেঁহুশ অবস্থায় পড়েছিল সায়ম। যন্ত্রণার সময় আলোর বিন্দু ভীষণ অসহ্য লাগে, নিভৃত অন্ধকারে গর্ভগৃহে তলিয়ে যায় সে, চোখের পাতা অসম্ভব ভারী মনে হয়। কতক্ষণ এভাবে ছিল মনে নেই তার। জেগে উঠে বোঝে সন্ধে হয়ে গিয়েছে। জিরো ওয়াটের বালব জ্বেলে যেন চেনা পৃথিবীতে পা রাখল সে। মাথা অবসন্ন, শরীর যেন চলতে চাইছে না, সায়ম তবু কষ্ট করে নীচে নেমে আসে। ব্যথা আপাতত ছুটি নিলেও রেশ রেখে গিয়েছে।
অদিতি বলল, "নেমে এলে কেন?"
"কতক্ষণ আর এভাবে পড়ে থাকব!" সায়নের দুর্বল গলা কাঁপে, "কিছু খেতে দাও।"
শসা-মুড়ি-পেঁয়াজ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সায়ম। "এই খাবার এখন আমার জন্য?"
মাইগ্রেন হলে সায়মের মেজাজ লাগামে থাকে না। শব্দ-ধ্বনি-আলো তাকে তিতিবিরক্ত করে। অভিজ্ঞতায় বুঝেছে অদিতি। সে শান্ত স্বরে বলে, "বমি হয়েছিল। কষ্ট করে এটাই খেতে হবে। রাতে অবস্থা বুঝে মেনু করব।"
মুখ বিকৃত করে সায়ম, "সবই কপাল!"
অদিতি বলে, "খেয়ে নাও। চা বসাচ্ছি।"
শিথিল ইন্দ্রিয় চা-পাতার ঘ্রাণে জেগে উঠল এবার। নাহ্, খালি পেটে চা চলবে না এই অবস্থায়। বাটিভর্তি মুড়িমাখা শেষ করে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি।

সায়ম দপ করে জ্বলে ওঠে। ঘুরেফিরে পৃথিবী গোল! সফল প্রশাসক হিসেবে নিজেকে জাহির করতে না পারলে সম্ভবত বদহজম হয়।

অদিতি হাসে, "রমুদা এসেছিল বিকেলে। তুমি ওই অবস্থায় ছিলে বলে আর ডাকেনি। বাবার ঘরে মিনিটদশেক বসে চলে গেল।"
তার মানে প্রিয়নাথের কাছেই জরুরি দরকার ছিল। রমিতের ফোন আজকাল প্রায়ই বন্ধ থাকে। গত দশদিনে একবারই দেখা হয়েছিল। বাইক থামিয়ে বড়জোর পাঁচমিনিট গল্প করেছিল রমিত। সাতটা বেজে গিয়েছে শুনে সে হন্তদন্ত হয়ে বাইকে স্পিড তুলে নিমেষেই উধাও হয়ে গেল। রমিতের অন্যমনস্কতা, মুখের রেখায় চিন্তার আঁকিবুকি, হাসির আড়ালে চাপা কষ্ট ঠিক পড়ে ফেলল সায়ম। নিজেকে গোপন করার এমন মরিয়া চেষ্টা কেন করে যাচ্ছে রমিত?
শেখরদা মেঘাকে একটিবার চোখে দেখার আন্তরিক ইচ্ছে জানিয়েছেন। শুনেও রমিতের ভাবান্তর দেখা গেল না। কোনও শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘোরায় সায়ম। প্রিয়নাথ শুব্রাকে জুতোজোড়া দেখে একবার আড়চোখে তাকালেন। "ক্যানসারও মডার্ন মেডিকেল ট্রিটমেন্টে সারে। আর মাইগ্রেনের প্রপার ট্রিটমেন্ট মেডিকেল সায়েন্স এখনও খুঁজে পেল না! স্ট্রেঞ্জ। শুনেছি স্ট্রেস আর টেনশনে মাইগ্রেন বাড়ে। বাড়ির কাছে আরামের চাকরি। স্ট্রেস আর টেনশন হওয়ার কথা নয়। ভাগ্যিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লাইনে যাওনি। ইট উড বি কমপ্লিট ফেলিওর," প্রিয়নাথ শার্টের বোতাম খুললেন।
সায়ম দপ করে জ্বলে ওঠে। ঘুরেফিরে পৃথিবী গোল! সফল প্রশাসক হিসেবে নিজেকে জাহির করতে না পারলে সম্ভবত বদহজম হয়। যত ইচ্ছে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করুন। যে, তার কোনও সমস্যা নেই। তাকে অক্ষম এবং দুর্বল বলে হেয় করবেন কেন?
অদিতি প্রায় লাফিয়ে তিন আঙুল দূরত্বে এসে দাঁড়ায়। ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করে 'কিছু বোলো না, চুপ থাকো।' এই সাংকেতিক ভাষা বোঝে সায়ম। প্রিয়নাথ নিজের ঘরে চলে গেলে সায়ম তিরিক্ষি মেজাজে বলে, "তুমি চিরকাল ঢাল হয়েই থাকো।"
"থাকতে হয়। শান্তির অলিখিত নিয়মই তাই বলে।
"তুমিও কি তাই ভাবো?"
"কী ভাবব?" অদিতি আশ্চর্য হল।
"তোমার ফাদার-ইন-ল যা বারেবারে বুঝিয়ে দেন। আমি হলাম ফ্লপমাস্টার জেনারেল। ফেলিওর এবং ফেলিওর।"
"তুমি রাগের মাথায় ভুল ব্যাখ্যা করছ।"
"অদিতি, তুমি খুব চালাক। প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছ। সবাই আমাকে এড়িয়ে যায়। তুমি আমার লাইফ-পার্টনার। বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বানানোর ব্লু-প্রিন্ট জানতে। আগে একবারও আলোচনা করেছ? ডিপ্লোমেসি আমি পছন্দ করি না। তুমি আজকাল সংগঠনে সময় দিচ্ছ। অর্থের পরের ধাপ ক্ষমতা। বিডিওসাহেব সব জানেন। জানি না শুধু আমি। সবার সব কিছুর জন্য, তোমার সময় থাকে। আমার বেলায় তোমার সময়ের অভাব পড়ে যায়। কাজের বাহানা দেখাও। একদিন তুমি বুঝতে পারবে," টলোমলো পায়ে চেয়ার ঠেলে দাঁড়ায় সায়ম। মাথা ঘুরেই পড়ে যাচ্ছিল সে। কে যেন সজোরে আঁকড়ে ধরে। কোনও বলিষ্ঠ বাহু প্রাণপণে তার পতনকে রুখে দিতে চাইছে। আবার কোন চোরাটান, গহন অন্ধকারের স্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মধ্যবর্তী শূন্যতায় তলিয়ে যাবার আগে ক্ষীণ সংলাপ কানে আসে শুধু।
"আপনি ওভাবে না বললেই পারতেন।"
"বুঝতে পারিনি। ইনডিরাল ফর্টিটা ওকে খাইয়ে দাও। হালকা ট্রাংকুলাইজ়ার। মেডিসিনটা রেগুলার নেয় না মনে হচ্ছে! যা হোক, এখন আমার বেডেই থাকুক। উপরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"
প্রিয়নাথ সায়মের মাথায়, কপালে খুব যত্ন করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। চুলেও কিছুক্ষণ আঙুল চালিয়ে কপালে আলতো স্পর্শ রাখলেন সন্তর্পণে। ছেলেটা যেন টের না পায়। বেঘোরে আছে। ছোট থেকেই রোগে ভোগে, স্নেহে-মমতায় সোমলতা আগলে রেখেছিলেন, দৌড়ঝাঁপের চাকরি বলে সময় দিতে পারেননি তিনি। তিনি ছাড়া কে আর আগলে রাখবে এই দুর্বল ছেলেটাকে? সব তো ওর ভাল ভেবেই করেন। নিজে খুব কষ্ট করে বড় হয়েছেন বলেই হয়তো ওর গায়ে আঁচড় পড়তে দিতে চান না। চাকরিজীবনের শুরুতে সচ্ছলতা ছিল না। শহরে আসা প্রথম প্রজন্মকে কষ্ট করতে হয়। ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করে যাওয়ার জন্য তিনি দায়বদ্ধ। কঠিন আবরণে নিজেকে মুড়ে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন এত দিন। ছেলেটা যন্ত্রণায় কাতরালে যে তাঁরও বুক মোচড় দিয়ে ওঠে।
নবেন্দুর সঙ্গে ডিল ফাইনাল করে ফেলেছেন। এখন মনে হচ্ছে এতটা গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজটা না করলেও পারতেন। চুপচাপ কাজ সেরে ফেলা প্রশাসনের মূলমন্ত্র। মজ্জাগত এই বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল। চূড়ান্ত অনাস্থা প্রকাশের নমুনা ভেবে ফেলতে পারে ছেলে। যদিও নিজের জন্য কিছু রাখছেন না তিনি। একটি ফ্ল্যাট পাবে সায়ম। অন্যটির মালিকানা অদিতির। লিকুইড ক্যাশ দু'জনের মধ্যে সমান ভাগ করে দেবেন।
ঘরে বসে সায়মের প্রতিক্রিয়া নিজের কানে শুনেছেন। তাঁর একমুখী চিন্তা বাঁক নিতে শুরু করেছে। আসল জায়গায় তিনি কি ভুল করে ফেলেছেন?
দ্বিতীয়বার বিয়ের ব্যাপারে ছেলের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা তিনি করেননি। ছেলে তাঁর খেয়ালি, কিছুটা আত্মমগ্ন। একজন করিৎকর্মা এবং বাস্তববাদী মেয়ে হলে ভারসাম্য বজায় থাকবে। সংসারের

তুলাযন্ত্র তেমনই দাবি করে। অদিতি তাঁর দূরদর্শিতার সম্মান রেখেছে। দু'জনের মধ্যে খুঁটখুঁট লাগে, অমন হতেই পারে, তাঁর এবং সোমলতার মধ্যেও প্রায়ই হত। অদিতি পরিশ্রমী, সংসারে তার নিখুঁত কাজের প্রশংসা করতেই হয়, আবেগে না ভেসে, মেপে চলতে জানে। দু'জন মানুষের রুচি, জীবনবোধ একরকম না হলেও মানিয়ে নিয়ে চলতে জানলে কোনও সমস্যা হয় না। তবু অদিতির দিকে সায়ম কেন এত অভিযোগের তির ছুড়ছিল? অদিতির সংগঠন করাটা তিনি জানতেন। স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তাঁর রুচিতে বাধে। সায়ম যেন হঠাৎই তা মেনে নিতে পারছে না। তাঁর গলায় সোমলতারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি, "তুমি তো কখনও সময় দিলে না। নিজের জগতে ব্যস্ত হয়ে থাকলে। এখন আর কাছে পেয়েই কী হবে বলো?" দিন ফুরিয়ে আসছিল তখন। সোমলতার জন্য যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর আর্তি জানাতেন ঈশ্বরকে। সত্যিই তো, সময় পেরিয়ে গিয়েছে। অফুরন্ত অবসরেও ফেরার পথটাই যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে চিরতরে।

দাম্পত্য সম্পর্কে কীভাবে উঁকি দেবেন এখন? সারফেস লেভেলে দেখেছেন, গভীরে গিয়ে কীভাবে বুঝবেন? অদিতিতে নিয়ে একবার বসবেন? এতটা খোলামেলা তার পক্ষে হওয়া যে সম্ভব নয়। এখন তো চারদিকে আকছার ডিভোর্স, ছাড়াছাড়ি, সংযমহীন আত্মসুখের সন্ধান। সংসার ভেসে যাবে। প্রথম বিয়ের বিপর্যয়ের পর ছেলেটা মরমে মরে ছিল। আবার পারিবারিক বিপর্যয় নেমে আসে যদি!

প্রিয়নাথ অনেকক্ষণ পায়চারির পর স্থির হয়ে সোফায় বসলেন। তাঁর অনুপস্থিতি ওদের ফাটল মেরামতের সময় আর পরিবেশ নিশ্চয়ই করে দিতে পারে। শুধু ওরা দু'জন এই বাড়িতে আরও কাছে আসুক, ঘনিষ্ঠতায় বুঝে নিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ক'টা দিন সম্পূর্ণ ওরা নিজেদের মতো করে স্বাধীন জীবন কাটাক। তিনি ফিরে যাবেন শিকড়ে।

শিলাবতী নদীর পাড়ে কুসুমডিহা গ্রাম। কর্চিফুল, আমবাগান, মেঠো আলপথ, বাদামি খেজুর আর তালগাছের সারির ক্যানভাসে ঘন নীল আকাশ তাকে ছুটির নিমন্ত্রণে ডাকছে।

সংসার থেকে শুধু কয়েকটি দিন ছুটি দরকার তাঁর...

{১৮}

মেঘার চোখ এখনও ভিজে, সকাল থেকে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে শ্রান্ত। সবাইকে ছেড়ে আসতে কী যে খারাপ লাগছিল, ইচ্ছেই করছিল না চলে আসতে। বাবার কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে গেল কিছুক্ষণ। গত দু'দিন ধরে ভ্যানরিকশা করে মালপত্র বাবা যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। কাল রাতে বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আমরা এখান থেকে চলে যাব সোনা।"

চলে যাওয়ার কারণ স্পষ্ট না হলেও মেঘা কিছু একটা বুঝেছে। সেভেনে পড়ে সে। সরকারি হোমে ছোটবেলা কেটেছে তার। বাবা একদিন হাত ধরে তাকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। বাড়িতে এতজন মানুষের আদর-ভালবাসা পেয়ে সে খুব আনন্দেই ছিল এতকাল। হঠাৎ কী যে হল! জেঠুরা আলাদা হয়ে গেল, বাবা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। এই ভালবাসার আশ্রয়, বড়মার স্নেহ, দাদা-দিদিদের সঙ্গে টিভি দেখা, খুনসুটি, মেলায় যাওয়া, উৎসবের সময় একটেবিলে বসে হইচই, শীতের শেষে সবাই মিলে পিকনিকের মজা, সব তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে?

বাবাকে নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল প্রথমে। বেশ তো উপরের ঘরে সে থাকবে, সামনে খোলা ছাদ, ছাদের পাশে মুখ বাড়িয়ে নারকেলগাছ, আকাশও দেখা যাবে ইচ্ছেমতো। কেন বাবার এত আপত্তি সে বুঝতে পারছিল না। বাবা তো বন্ধুর মতো মেশে। খুলে বলছে না কেন? বাবা শেষে খুলে বলল, "সবটা বোঝার বয়স হয়নি তোর সোনা। একটা ঘরে আমাদের হবে? আর একটা ঘরও দিল না, মালপত্র স্টক করে রেখেছে। ব্যবসার জন্য তোর জেঠুকে অনেক টাকা দিয়েছিলাম। ফেরত পর্যন্ত দিল না। তুই বড় হয়ে বুঝতে পারবি।"

খুব দুঃখ পেয়েই বাবা 'সামন্তভিলা' ছেড়ে দিল। রাগের মাথায় তার

AWARBOI.COM

বাবা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। বড়মা বারবার তাকে বুঝিয়েছিল। মেঘা যেন জেদ ধরে বসে থাকে। সে মুখ গোঁজ করে বসে আছে দেখে বাবার গলা প্রায় বুজে এসেছিল, "সোনা, এখন থেকে পরের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে আমাদের। হাঁড়ি আলাদা হয়ে গিয়েছে। স্পেশালি কে আমাদের জন্য করবে বল?"

"কেন? বড়মা করে দেবে!"

"তোর বড়মার হাতে সব কিছু নেই। আমি এই সংসারে আর একটি টাকাও দেব না। একটা মিনিটও আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

তার ঘুম আসেনি। বাবাও জেগে ছিল সারারাত। ক'দিন বাবা বোধহয় চোখের পাতা এক করতে পারেনি। ঘুম ভেঙে প্রায়ই দেখেছে সে, বাবা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। ছাদে গিয়ে ঘন-ঘন সিগারেট ধরাচ্ছে।

বাবার কষ্ট সে বুঝবে না? সে তাই রাজি হয়ে গেল শেষমেশ। তবে আসার সময় তার বুক খালি হয়ে যাচ্ছিল। আরও একটা জায়গা তাকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। ভীষণ একা লাগবে এবার।

নতুন বাড়িটা খুব সুন্দর। দুটো রুম, সামনে ছোট বারান্দা, রান্নাঘর, বাথরুম, ডাইনিং রুম। সব বাবা তাকে ঘুরে-ঘুরে দেখাল। জিনিসপত্র বেশি ছিল না। একটা আলমারি, একটা ডিভান, বইয়ের র‍্যাক। অনেক কিছু নাকি কিনতে হবে। তিনটে ফাইবারের চেয়ার বাবা অলরেডি কিনে ফেলেছে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সমস্ত কিছু দেখার পর মেঘা বলে, "আমি রান্না করব?"

"না।"

"তবে?"

"হোম সার্ভিস চলবে। পরে ভেবেচিন্তে বন্দোবস্ত করা যাবে। তোমার একটু অসুবিধে হবে সোনা। কষ্ট করে খেয়ে নেবে। জীবনে কষ্টটাকেও চিনতে হয়। আজ স্কুলে যাবে না। ব্যাগে ঠাসা জিনিস ঢেলে খুঁজে-খুঁজে রাখতে হবে। বেডিংও আছে। আমাদের দু'জনের ড্রেস, খাতাবই, বেডশিট, বালিশ, জলের বোতল, আরও কত কিছু। তোমার ঘুম পাচ্ছে?"

"না।"

জিনিসপত্র গোছাতে-গোছাতে মেঘা দুঃখ ভুলে যায়। নতুন ঘর, নিজেদের সাজানো জিনিস। অদ্ভুত উদ্দীপনায় মেতে গেল সে। হোম সার্ভিসের খাবার এলে দু'জন মেঝেতে মাদুর পেতে খেয়ে নিল। শোলার থালা-বাটি বড় প্লাস্টিকে কিনে এনেছে বাবা।

খাওয়া সেরে উঠেই সে অপ্রত্যাশিত আনন্দে মেতে ওঠে। বড়মা এসেছে। রমিত হকচকিয়ে গেল। একগাল হেসে বড়বউদি বলে, "তুমি আমাদের উপর রাগ করেছ। বেশ করেছ। তা বলে আমি কেন রাগ করে থাকব? তোমার এলেম জানি। আমি অন্তত ঘরটা সাজিয়ে-গুছিয়ে যাই। না হলে ঘর এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকবে। ঢুকতে দেবে তো?"

লজ্জা পায় রমিত, "এসো।"

আঁচল কোমরে বেঁধে বড়বউদি সাজানোর কাজে লেগে পড়ে। মেঘা হাই তুলছিল। বেডশিট আর বালিশ পেতে প্রায় ধমক দিয়ে তাকে শুইয়ে দিল। মেঘা ঘুমিয়ে পড়লে বড়বউদি আর্দ্রগলায় বলে, "কেন এমন হঠকারিতা করছ রমু?"

চোয়াল শক্ত করে রমিত, "ওই প্রসঙ্গ না তুললেই নয়? আর আমি পিছনে তাকাতে চাই না।"

"তা বলছি না। মেঘা বড় হচ্ছে। ভাড়াবাড়িতে একা থাকবে। তুমি স্কুলে যাবে। দরকারে বেরতে হবে। একা থাকার জেদ নিয়েছ। ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব। মেয়েটাকে চব্বিশ ঘন্টা আগলে থাকবে কীভাবে? দিনকাল খারাপ। ভেবে দেখেছ?"

রমিত চমকে ওঠে। এদিকটা একবারও সে ভাবেনি। সে তবু আড়াল করে নিজেকে, "নিশ্চয়ই ভেবেছি।"

"বাজে কথা বলবে না। একটা চব্বিশ ঘন্টার লোক রাখো। দূর বাবা, ভুল বলছি আবার। লোক নয়, মেয়ে। পুরুষমানুষরা অনেক ব্যাপারে বোঝেই না। ওর আগের মাস থেকে পিরিয়ডস শুরু হয়েছে। ওর দেখভাল করা, ওকে স্কুলের জন্য তৈরি করা, ওর সমস্যা তুমি সামলাবে?"

"আমি খোঁজ করছি। তুমিও দেখো।"

গোছাতে-গোছাতে একবার মুখ তোলে বড়বউদি, "টুকরো কাগজ আর পেন নিয়ে এসো। বাসনপত্র আর সংসারের দরকারি জিনিসের ফর্দটা লিখে নাও। না হলে

হয়রান হবে। এটা-ওটা কিনতে চারদিক

ছুটে বেড়াবে।"

ফর্দ শেষ হলে বড়বউদি নিশ্বাস ফেলে, "তুমি পুরো ব্যাপারটা জানলে না। তোমার মেজদা স্টাইলে বাবু। শুধু ফাঁকি। ব্যবসায় মন দিয়ে কাজ করবে না। সন্দেহের বেলায় একপায়ে খাড়া। বড়দা মেরে নিচ্ছে। ঠকিয়ে দিচ্ছে। ঘরভাগ, ব্যবসাভাগ একদিন হতই।"

ক্ষুব্ধ রমিত চুপ করে থাকে। তার লভ্যাংশের টাকা তবে ফেরত দেওয়া হল না কেন? বিজ্ঞনেসে টাকা ঢুকে গিয়েছে। কোনও ভাবেই চুলচেরা হিসেব করা যাবে না। এই ছিল দুই দাদার মোদ্দা কথা।

"চুপ করে আছ যে!"

"কী বলব? শুনছি।"

"রাগে বেলা বয়ে যাবে। অনেক হয়েছে। নতুন ঘর পেতেছ। ঘরনী আনো এবার। না হলে হাবুডুবু খাবে। হোম সার্ভিস কতকাল চালাবে?"

"রান্নার লোক রাখব।"

"বউয়ের বিকল্প কোনওটাই নয়," বড়বউদি ঠোঁট কামড়ায়, "মেঘার মুখ চেয়ে জেদ ছাড়ো। তুমি এখন আর সামন্ত পরিবারে নেই। নিজের সংসার তুমি চাও না?"

"না।"

"আমাকে খুব তো দোষারোপ করলে! আমি নাকি যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া রুখতে পারতাম, সামন্ত পরিবারের পুরুষেরা সবাই জেদি আর গোঁয়ার। সেই গোঁ ভাঙার সাধ্য আমার ছিল? তুমি কম একরোখা! এইভাবেই একা মেয়েকে নিয়ে জীবন কাটাবে? এখনও ধনুকভাঙা পণ নিয়ে বসে থাকতে চাইছ," বড়বউদির গলা কাঁপে। রমিত ছোট্ট শ্বাস ফেলে, "আমি সংসারের শেকলে বাঁধা পড়তে চাই না।"

যৌথ পরিবার, সে স্বাধীন গতিশীল জীবন কাটাত, কোনও বাধা ছিল না। বাচ্চাদের সে বরাবরই প্রচণ্ড ভালবাসে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শহরের সরকারি হোম থেকে দত্তক নিয়েছিল একটি মেয়েকে। উজ্জ্বল শ্যামলা, ছিপছিপে, চোখে তার আনন্দ উড়ান।

ঘুমন্ত মেঘার দিকে আঙুল তুলে ম্লান হাসে রমিত, "যাকে বিয়ে করব সে আমার ওই মেয়েটাকে যদি অবহেলা করে তখন কী হবে ভেবে দেখেছ বউদি?"

{১৯}

ব্যাঙিং আওয়ার্সে ফোনের উৎপাতে তিতিবিরক্ত হয়ে যাচ্ছে সায়ম। অচেনা নম্বর থেকে তাকে কেউ বারবার ফোন করছে। বাধ্য হয়েই ধরল সে। ভদ্রলোক নাকি ফ্ল্যাটের ব্যাপারে কথা বলতে চান। সে আদৌ আলোচনায় আগ্রহী নয় বললেও তিনি নাছোড়বান্দা।

রেজিস্ট্রেশন, নাম ট্রান্সফার, মিউটেশন এখনও হয়নি। ফাইনাল ডিল বলে কিছু হয় না। নবেন্দুর তুলনায় তিনি বেটার প্রিভিলেজ দেবেন। সায়ম বলতে বাধ্য হল, "সরি, বাবা পুরোটা ডিল করছেন। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলুন।"

"বলেছিলাম। বুঝতেই পারছেন, বুড়োমানুষ। ভুজুংভাজুং দিয়ে কাজ সেরে ফেলতে চাইছে নবেন্দু। তাই আপনাকেই রিকোয়েস্ট করছি।"

"আমার বাবার ডিসিশনই ফাইনাল," সায়ম নরম গলায় বলে, "প্লিজ,

AMARBOI.COM

ওয়ার্কিং আওয়ারে ডিসটার্ব করবেন না।”
ফোন রাখতেই আবার রিংটোন সুর নিয়ে জাগে। বিরক্ত হয়ে সায়ম স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নম্বরে চোখ রাখে। এটা সেই টোপ ঝোলানো প্রোমোটারের নম্বর নয়। তন্ময়ের আবার তার কাছে কোন প্রয়োজন পড়ল? কলেজজীবনের বন্ধু হলেও তন্ময় দরকার ছাড়া তাকে মনে করে না। কখনও কোনও চেন-মার্কেটিং স্কিমে টাকা রাখার জন্য জোরজার করে, কখনও ব্যাঙ্ক লোনের খুঁটিনাটি জানতে চায়। বউয়ের নামে বিমা কোম্পানির এজেন্সি চালায়। পলিসি করানোর জন্য ঝুলোঝুলি করে। দ্বিতীয়বার সে নিমতিতে মুখে ফোন ধরে, “হ্যালো।”
“সবাই লাইনে আসে। এবার তোর প্রাণের বন্ধু রমিত কী বলবে শুনি? দিনরাত জয়েন্ট ফ্যামিলির ঢাক পেটাত। আমি নাকি স্বার্থপর, তাই বাবা-মাকে ছেড়ে একই শহরে আলাদা বাড়ি নিয়ে থাকি। খুব চটকেছিল। মা আর বউ দিনরাত তু-তু ম্যা-ম্যা করলে শান্তির খোঁজে বেরিয়ে যেতে হয়। ওর তো বউও নেই। থাকতে পারল না কেন?” তন্ময় যেন বিষ ঢালছে ফোনে।
“হয়তো প্রবলেম ছিল,” সায়ম রক্ষণাত্মক।
“সেই প্রবলেম অন্যদের থাকলে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী, সেলফিশ, আরও কত কিছু! থুতু ছুড়লে নিজের গায়েই এসে পড়ে। আমাদের পাড়াতেই উঠেছে। আমাকে দেখেই মুখ নিচু করে না দেখার ভান করে চলে গেল। কতকাল রাখঢাক করবে?”
“ইটস ট্রু মাচ! পারসোনাল অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। রমিত তোর ক্লাসমেট ছিল। সম্পর্কটাকে অন্তত সম্মান দে। ব্যস্ত আছি। রাখছি,” সায়ম কেজো গলায় ফোন কেটে দেয়। কিছু লোক অন্যের দুঃসময়ে ঠোকরাতে পারলে বিজাতীয় আনন্দ পায়। হয়তো এটাও স্যাডিস্টিক প্লেজ়ারের আর এক রূপ। হস্টেলে র‍্যাগিংপর্বে উলঙ্গ করে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া, যুদ্ধবন্দিদের উপর অকথ্য নির্যাতন করা, কিডন্যাপ করে কাউকে বেধড়ক পেটানো, কাজের মেয়েকে গরম খুন্তি খুঁচিয়ে মারধর করা...সব আসলে মর্ষকামের আনন্দ। অন্যের যন্ত্রণায় সভ্য মানুষদের বিকৃত উল্লাস।
রমিতের উপর মনে-মনে সে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। দূরত্ব তৈরি হওয়ার ধূসর আভাসে ভয় ও দুঃখ পেয়েছিল। বহির্মুখী মানুষও কখনও-কখনও একা হয়ে যেতে পারে। পাঁজরের ভিতর শূন্যতা জাগে। রমিত হয়তো নিজের গ্লানি লুকোতে চেয়েছিল।
কেউ আর সংঘবদ্ধ থাকতে চাইছে না। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো হল, গৃহযুদ্ধের দাপটে ভেঙে গেল যুগোশ্লাভিয়া। দেশ ভেঙে আর-এক দেশ। রাজ্য ভেঙে অন্য রাজ্য। খণ্ডিত হওয়া এখন বিশ্বজনীন অসুখ। অশান্তির আগুন, বারুদের গন্ধ, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, রক্তপাত, লাগাতার আন্দোলন, বিস্ফোরণ, গণহত্যা। টুকরো, বিচ্ছিন্ন, পৃথক হবার উন্মত্ত নেশায় পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর এ প্রান্ত ও প্রান্ত।
রমিতের জীবনের একটি দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যাবে। তার ঘোরার নেশায় অঘোষিত কারফিউ জারি হয়ে গেল এবার। সন্ধের সময় একবার যাবে সায়ম।
দিনের শুরু কিন্তু অন্যরকম ছিল। রাশি-রাশি সাদা টগরফুলের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল হাসিতে। মাটিতে খসে পড়া কিছু ফুল যেন অপরূপ আলপনা সাজিয়ে স্বাগত জানাচ্ছিল সকালকে। ফুল মরে গেলেও লাবণ্য মরে না। খোলসের ভিতর জমে থাকা মায়াজল ছুঁতে পেরেছে সে। চিনে ফেলেছে। সম্পূর্ণ বেহুঁশ সে ছিল না, চেতনার সূক্ষ্ম অংশটুকু জেগে ছিল তার, সে বুঝতে পারল প্রিয়নাথ মাথার কাছটিতে বসে আছেন। প্রিয়নাথের আঙুল যেন দক্ষ সেতারি হয়ে স্পর্শ করে যাচ্ছে তার কপাল। বৃষ্টিনূপুর বাজছিল শরীরে। চুলে তাঁর নরম আদর অন্তর্দাহে শুদ্ধ করে দিচ্ছিল সায়মকে। প্রিয়নাথ উঠে গেলে সে অস্ফুটে বলতে চেয়েছিল, বাবা, মুখোশ ঢেকে রেখো না, খুলে দাও। গ্রামে ফিরে যেতে চাই সেই শৈশবের সুন্দর মুহূর্তগুলোয়, পায়ে একটা পেরেক বিঁধলেও তুমি কেমন ছটফট করে উঠতে। দূর্বাঘাস ডেটল দিয়ে ধুইয়ে পড়া বন্ধ আমানোর জন্য শশব্যস্ত তুমি কেন যে ঘুমিয়ে গেল...
বাবা আজ সকালে দেশের বাড়ি রওনা দিয়েছেন। লোকাল বাসে এই বয়সে অতটা রাস্তা যাওয়া উচিত নয়। সায়ম গাড়ির আগাম বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। ভোর ছ'টায় দরজার কাছে গাড়ি দেখে বাবা অবাক হয়েছিলেন। এসবের কোনও দরকার ছিল না, ফালতু খরচ, তিনি এখনও বুড়িয়ে যাননি। অদিতির আবার চোখ ছলোছলো হয়ে গেল। বাবা তো কোথাও যান না, হঠাৎ সকালেই কেন তিনি বেরিয়ে পড়েছেন! বাবা জানিয়েছিলেন, রিলিফ দরকার। শিকড়ের টান। কত কাল যাওয়া হয়নি। তারা যেন নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয়।
অদিতি চমকে উঠেছিল, “কীসের বোঝাপড়া?”
“তোমাদের দু'জন যেন মানিয়ে থাকতে পারো।”
“আমি কি কোনও ভুল করে ফেলেছি বাবা?” অদিতি ঠোঁট চেপেছিল।
“তোমাদের অ্যান্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে কোথাও খামতি থেকে যাচ্ছে। সায়মও ঠিক কী চায় উপলব্ধি করে দেখুক।”
সায়ম কখনও প্রণাম করে না। সে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতেই বাবা মৃদুস্বরে

চিকিৎসা জগতে নতুন আলোড়ন
বিদেশি চিকিৎসা এখন আপনার শহরে স্বল্প খরচে অল্প সময় অত্যাধুনিক উপায়ে
শীঘ্রপতন, সহবাসে অক্ষম সন্তান হীনতা, সিফিলিস, ক্ষুদ্রলিঙ্গ স্বপ্নদোষ, মহিলাদের সাদাস্রাব ও মাসিকের গণ্ডগোল, বাত চর্মরোগ, সিস্ট, শুক্রানু ঘাটতির নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা হয়। শুধু তাই নয় এখন আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি এগিয়ে চলেছে ত্বকের সমস্যার অভিনব সমাধানেও।
লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র ও তেল সহ
১ দিনে কাজ
১ মাসে আরোগ্য
কম্প্যুটারাইজড্ হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র
১০০% গ্যারান্টি সহ
AMERICAN HOMEO LAB
ISO 9001:2008 Certified Company
সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮ টা ছুটির দিন সহ প্রতিদিন খোলা
গোপনে মদ ও যেকোন নেশা ছাড়ানো হয় ১০০% পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত।

Help Line
9836248102
9836247959
ব্যারাকপুর ৩৪ নং ধুনিয়াপাড়া লেন
সোনারপুর কামরাবাদ
গার্লস হাইস্কুলের পাশে ও
হাওড়া ময়দান
Web: americanhomeolab.com

বললেন, "নবেন্দুর সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে। তোমাকে জানানো হয়নি। অন্যভাবে নিও না।"
গাড়ি পেরোচ্ছে ঘন গভীর শালজঙ্গল। অনাদি অনন্ত অন্ধকার। স্তব্ধতা। বাঁকুড়া জেলায় ঢুকে পড়েছে গাড়ি। একটু পরে তিনমাথার মোড় পড়বে। একটা রাস্তা চলে গিয়েছে রাইপুরের দিকে। অন্য দিকে দুর্গাপুর-খাড়গ্রাম রুটের রাস্তা ধরে সোজাসুজি বাঁকুড়া শহরে যাওয়া যায়। সেই রুটে দুই কিলোমিটার এগোলেই সিমলিপাল। সিমলিপাল থানা, হাসপাতাল, স্কুল, দোকান, বাজার, রাজবাড়ি
নিয়ে এখন জমজমাট জনপদ। মনে-মনে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছেন প্রিয়নাথ। শিলাবতী নদী জেগে উঠল সামনে। নিচু সেতু। বেশি বৃষ্টি হলে নদী উপচে সেতু জলে ডুবে যায়। রমিত কত খবর রাখে। শিলাবতীর পারে আশৈশব কেটে গেলেও এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি কখনও। মর্তে শিলাবতীকে পুরন্দর ব্রাহ্মণ ভালবাসতেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শিলাবতীতে স্নান করে কলসিভরা জল নিয়ে যেতেন। একদিন পুরন্দর শিলাবতীকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আহ্বান করলেন। তখনই তাঁর মাথায় কলসি ভেঙে পুরন্দর নদ হয়ে স্বামী রূপে শিলাবতীতে মিলিত হলেন।
ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে হাসে, "ফোনটা বাজছে মেসোমশাই। ধরুন।" আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে ওঠেন প্রিয়নাথ। তিনবার মিস্‌ড কল। সায়ম করেছিল। রিং ব্যাক করলেন।
"পৌঁছে গিয়েছ?"
"প্রায়।"
"এখনও পৌঁছয়নি! এত দেরি?"
"মাঝখানে দু'বার থেমেছিলাম। ডোন্ট ওরি। এই ব্রিজ পেরোচ্ছি। সাত-আট মিনিটের মধ্যেই ঢুকে পড়ব।"
প্রিয়নাথ মুচকি হেসে পকেটে রাখলেন ফোন। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? ছেলেটা কখনও ফোন করে না। দূরত্বও মাঝেমধ্যে দরকার। মলিনতা মুছে দেয়। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন প্রিয়নাথ, "আটচালার বাঁদিকে টার্ন নাও। খানিক গেলেই কুসুমডিহা।"
চেনা পথ, মাটি ও বাতাসের বুকভরা সুগন্ধি শ্বাসে অনেক দিন পর নিজেকে ফিরে পাচ্ছেন তিনি।

{২০}

মেঘার দু'পায়ে ঘুঙুর বাঁধতে গলদঘর্ম হল রমিত। সবার ছায়ায় থেকে মেয়েটা কোনও কাজ নিজে করতে শেখেনি। তিরস্কারের সুরে রমিত বলে, "এবার থেকে ঘুঙুর নিজে বাঁধবে। দিস ইজ ফর দ্য লাস্ট টাইম।"
গ্রিলবারান্দায় চাবি দিতেই ভুলে যাচ্ছিল রমিত।। মেঘা মনে করিয়ে দিল। লেট হয়ে গিয়েছে বলে তাড়াহুড়োয় হাওয়াই চপ্পল গলিয়ে নিল পায়ে। আবার তালা খুলে কোলাপুরি চপ্পল খুঁজতে গেলে সময় নষ্ট হবে। বাইকের পিছনে রমিতকে জড়িয়ে বসে মেঘা, "দিদিমণি ববকে। দু'সপ্তাহ যাইনি। আজ তার উপর লেট।"
দিদিমণির বকুনির ভয়ে মুখ শুকিয়ে আসে তার। একই কথা ঘুরেফিরে বলে যাচ্ছে সারা রাস্তা।
রমিত মৃদু ধমক দিল, "বড্ড ঘ্যানঘ্যানে হয়ে যাচ্ছ। আমার মেয়ে হয়ে তুমি এত নার্ভাস হলে কীভাবে? আমি বলে দেব। এবার থামো। তোমার যেন কোন ইয়ার হল?"
"থার্ড ইয়ার," মেঘা হেসে ফেলে।
"হাসলে কেন?"
"হাসবই তো। কী নাচ শিখি তাও মনে হচ্ছে জানো না।"
রমিত বলে, "দেব এক চাঁটি। বাবা তোমার কিছু খবর রাখে না ভেবেছ? ভরতনাট্যম, রবীন্দ্রনৃত্য, দুটোই শেখো জানি। কোনটার কোন ইয়ার অত ডিটেল্‌স মনে থাকার কথা নয়।"
আগে মাঝেসাঝে নিতে আসত রমিত, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা তার পোষাত না। বাইক থেকে নামতে-নামতে মেঘা পাংশুটে মুখে বলে, "তুমি দিদিমণিকে বলে দেবে কিন্তু।"
"দেব।"
"না। আগে গিয়ে বলো। পারমিশন ছাড়া ঢুকলে আজ ঘর পাঠিয়ে দেবে।"
ভারী মুশকিলে পড়া গেল। ছাত্রীদের মা-রা দিদিমণির চারপাশে বলয় তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে। নারীকেন্দ্রিক পরিমণ্ডলে গোঁত্তা মেরে ঢুকে কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। মেঘা হাত নেড়ে ডাকে।
"আবার কী হল?"
"দিদিমণিকে তুমি বলে বোসো না।"
ফাজিল মেয়ে কোথাকার! তার মুদ্রাদোষ ঠিক মনে রেখেছে। রমিত কোনওমতে কাছাকাছি গিয়ে বলে "ম্যাডাম কাইন্ডলি শুনবে?"
দিদিমণি চোখ গোল করে তাকালেন।
রমিত হেসে বলে, "মেঘা দু'সপ্তাহ আসেনি। ফ্যামিলি প্রবলেম ছিল। তুমি ওকে বকাবকি কোরো না। লেট হয়ে গিয়েছে। আমারই দোষ। তুমি পারমিশন না দিলে ও আসতে পারছে না।"
বলেই জিব কাটে রমিত। দিদিমণি আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওকে নির্ভয়ে আসতে বলুন। আমি বাঘ-ভল্লুক নই। পাংচুয়ালিটি না মানলে ঠিকঠাক শেখানো যাবে না। কড়া হতেই হয়। আপনি কি মেঘার বাবা?"
"হ্যাঁ।"
"দু'-তিনবার দেখেছিলাম। মনে আছে। প্র্যাকটিসটা যেন মন দিয়ে করে। ফাঁকি দিলে ভাল পারফরম্যান্স হয় না।"
চলে আসার মুহূর্তে পিছনে হাসির ছররা শুনতে পায় রমিত। রুমাল বের করে সে কপালের ঘাম মোছে। মুদ্রাদোষটা মাঝেসাঝে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একবার তো স্কুলের সেক্রেটারিকেই মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, "তুমি ভাল আছ? অনেক দিন পর দেখা হল। তোমার নাতনি কিন্তু মন দিয়ে পড়ছে না। ওকে বোঝাবে।"
বাড়তি কথা সেক্রেটারি খেপে গিয়েছিলেন। সোজা হেডস্যারের ঘরে ঢুকে ফেটে পড়েছিলেন রাগে, "আপনার টিচারের সাহস দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। সম্মান দিতে শেখেনি। ফাজিল টিচার। আমি কি ওঁর ইয়ারদোস্ত? শো-কজ লেটার রেডি করুন এক্ষুনি।"
বাকিদের হস্তক্ষেপে সে যাত্রায় জল বেশি দূর গড়ায়নি।

মহিলা আদর করে মেঘার গাল টিপে দিলেন। ওড়নাটা যত্ন করে পরিয়ে দিচ্ছেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেঘাকে চেনেন। শুধু চেনেন না, পছন্দও করেন। মেঘার মুখে উজ্জ্বল হাসির রোদ। কাছে যেতেই মেগা চোখ পাকিয়ে বলে, "ম্যাডামকে নিশ্চয়ই ভুলভাল বলেছ? সবাই মুখ চেপে হাসছিল।"
রমিত গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে, "এতক্ষণ ভয়ে মুখ কালো করে ছিলে। এখন বাবার দোষ ধরার বেলায় লেট হচ্ছে না! তাড়াতাড়ি যাও।"
"ড্রেসটা আগে ঠিক করে নিক। ম্যাডাম না হলে বকুনি লাগাবেন," মহিলা ঘাড় ঘোরালেন।
"আমি শিওর। বাবা ম্যাডামকেও 'তুমি' বলেছে।" মেঘার গলায় অভিযোগ।
মনে-মনে বিড়বিড় করে রমিত, "বোকা মেয়ে! সবার সামনে বাবাকে অপদস্থ করতে হয় এভাবে?"
"নাউ ইউ আর রেডি," মেঘা ছুটে চলে যেতেই মহিলা হাত বাড়িয়ে দিলেন, "হাই। আমি সুলগ্না। মেঘার মুখে আপনার অনেক কথা শুনেছি। খুব ঘুরে বেড়ান। কত গল্প করেন। আলাপ করা হয়নি এত দিন।"
রমিত মৃদু হেসে বলে, "তুমি বলে ফেলাটা আমার মুদ্রাদোষ। এজন্যে মনে হয় ছাড়তে পারব না।"
"আপনার মেয়ে নাচটা ভালই করে। প্যাশন আছে। নিজে নাচ শিখেছিলাম। তাই বুঝতে পারি।"

AMARBOI.COM

রমিত চুপ করে থাকে। মেঘার প্রশংসা শুনে আনন্দ হচ্ছে। তবে তা নিয়ে বিগলিত ভাব প্রকাশ করল না।

"রবীন্দ্রনৃত্য, ভরতনাট্যম সব শিখেছি। স্টেজে পারফর্ম করেছি। অনেকে বয়স হলে ছেড়ে দেয়। আমি ধরে রেখেছিলাম। বিয়ের আগে পর্যন্ত নিয়মিত রিহার্সাল করতাম। স্টেট লেভেলে পুরস্কার পেয়েছি। কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে ফাংশন মানেই সুলগ্না। নাচ আমার রক্তে।"

"ফাইন। তা বিয়ের পর কন্টিনিউ করেননি?" সচেতনভাবে 'তুমি' সম্বোধন বাদ দিল রমিত।

"কিছু দিন ব্রেক পড়েছিল। আমার হাজব্যান্ড সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। আজ বেঙ্গালুরু, কাল দিল্লি। যে কোম্পানি বেটার অফার দিত সেখানেই জয়েন করত। স্টিল হি ওয়াজ় আপসেট। তারপর নিউ জার্সি চলে গেল। ওখানেই সেটল্ড হবার প্ল্যান ছিল।"

"আচ্ছা।"

"আমার শ্বশুরবাড়ি নৈহাটিতে। শ্বশুর, শাশুড়ি দু'জনেই বয়স্ক। হাজব্যান্ড একমাত্র ছেলে। বাবা-মা বলতে অজ্ঞান। নিউ জার্সি ছেড়ে কলকাতাতেই চলে এল। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। পে-রোল খারাপ নয়। পার অ্যানাম তিরিশ লাখ। আমিও বোঝালাম। বিদেশে ওটা একমাসের মাইনে। তবুও নিজের দেশ। বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি সব ব্যালেন্স করা যাবে। টাকাটা জীবনের সব কথা নয়। কোম্পানির কাজেই ফ্রান্সে গিয়েছে। প্রজেক্ট শেষ করে আসবে। আমি তাই বাপের বাড়িতেই আছি।" ঝরনাধারা বয়েই চলেছে। রমিত ভদ্রতার খাতিরে জানতে চাইল, "ম্যাডামের কাছে কে নাচ শেখে?"

"আমার মেয়ে দিয়া। সেকেন্ড ইয়ারে দুটোতেই ফার্স্ট হয়েছিল," হলঘরে চোখ রেখে সুলগ্না বলে, "মেঘার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছেন? ওর বাবার রূপটা পেয়েছে। যদিও অনেকে বলে আমারটাই পেয়েছে। বানিয়ে বলে। আমার বর রিয়েলি হ্যান্ডসাম।" স্বামীপ্রশংসায় পঞ্চমুখ টিপিক্যাল মহিলা। স্টেপকাট চুল, সিঁথির কোণে সিঁদুরের হালকা আভাস, গলায় সরু সোনার নেকলেস, হাতে সোনার বাউটি, কানে ঝুমকোলতা দুল। আগুনরঙা চুড়িদার, সাদা ওড়না। বাঁহাতের মুঠোয় লেটেস্ট মডেলের দামি মোবাইল। উপরে পড়া সচ্ছলতার চিহ্ন সুলগ্নার বেশভূষা, অলঙ্কার আর অভিব্যক্তিতে। থাকারই কথা। বর বিদেশে কাঁড়ি-কাঁড়ি ডলার উপার্জন করেছে। সুলগ্না কপালের অবাধ্য চুল সরিয়ে দেয়, "আমি ওদিকে যাই। আমাদের মায়েদের একটা গ্রুপ আছে, জমাটি আড্ডা হয়। আমি না বসলে ওরা ঠিক স্পিরিট পায় না, আপনি থাকবেন, না পালিয়ে যাবেন? অনেক দিন বাদে আজ আপনার ডিউটি পড়েছে!"

রমিত থমকে বলে, "বউদিরা বাইরে ঘুরতে গিয়েছে। আপাতত নাচের স্কুলের ডিউটি আমার।"

বানানো মিথ্যে কথা বলা কষ্টকর কাজ। সুলগ্নার শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ পাচ্ছে সে। দুইয়ের যোগসাজশে ঘেমে উঠল রমিত। মহিলা অনর্গল বকতে পারেন বটে! পাঁচ মিনিটেই সমস্ত বৃত্তান্ত অবলীলায় শুনিয়ে গেলেন। কী যে হয়েছে তার! কোনও কিছুই মনে দোলা দিতে পারে না। রুক্ষ টিলাপাথর হয়ে গিয়েছে সে। গত পনেরোদিন সে গান শোনেনি, টিভি দেখেনি, মনে সারাক্ষণ বিষণ্ণতা। মেঘা তার জীবনে ছিল বলেই সব ছেড়েছুড়ে বাউন্ডুলে হতে পারল না। মেঘাই তার এই পাথুরে জীবনের নিউক্লিয়াস। দু'নম্বর সিগারেটে লম্বা টান দেবার পর সায়মের মুখ মনে পড়ল। আর গোপন করে কোনও লাভ নেই। জীবনের এই নাটকীয় পরিবর্তনের কথা সায়মকে যে জানাতেই হবে!

"হ্যালো।"

"কোথায়?"

"বাড়িতে। আজ শনিবার। ব্যাঙ্কের হাফ-ডে। ভুলে গেলি?"

"বলছিলাম একটা খবর আছে।"

"কী খবর?"

"আমি সামন্তপরিবার থেকে বেরিয়ে এসেছি," রমিতের গলা অজান্তেই ভারী হয়ে আসে।

"জানি।"

"জানিস?" রমিতের আঙুল ফসকে পড়ে গেল আধপোড়া সিগারেট। "তুই অজাতশত্রু লোক। তোর এক বন্ধুই গায়ে পড়ে ফোনে জানিয়েছে আজ। তন্ময়ের খুশি উপচে পড়ছিল।"

"বুঝেছি। ঢিল ছুড়তাম। পাটকেল খেতেই হবে। অনেকেই ঠোকরাবে। সেই ভয়েই..."

মুখের কথা কেড়ে নিল সায়ম, "কৈফিয়ত তলব আমি করছি না। তবে আমাকে জাস্ট সিগন্যাল দিতে পারতি। পরের মুখে কথা শুনতে হল! বাদ দে। তোর বাড়ি আজ যাব। কখন থাকবি?"

"সারাক্ষণই আছি। মেঘাকে নাচের স্কুলে নিয়ে এসেছি। সাড়ে পাঁচটার পর ফ্রি। ঘরের কারাগারে সারাদিন স্বাধীন। অদিতিকে নিয়ে আসিস। আর তোর পিশু ভোলানাথকেও।"

"সপরিবারে নেমন্তন্ন করছিস যে! বাবা বাকি থাকল কেন?"

রমিত লঘু ভঙ্গিতে বলে, "তিনি এখন কুসুমডিহির বাতাস খাচ্ছেন। আমি। সব ইনফরমেশন এই শর্মা রাখে।

{২১}

মেঘা সুলগ্নাআন্টির গল্প শোনাচ্ছিল। 'কাকিমা' বললেই নাকি ধমকে দেয়। কেমন বুড়ি-বুড়ি শোনায়। 'আন্টি' ঠিক আছে। খুব হইচই করে। তবে তার বন্ধুর মায়েরা আন্টিকে 'গুলবাহার' বলে। মেঘা একদিন শুনে ফেলেছিল। 'গুলবাহার' শব্দের মানে ঠিক সে জানে না।

"তুমি ভুল শুনেছ। শব্দটা আসলে গুলমোহর। কৃষ্ণচূড়া গাছের আর এক নাম গুলমোহর। তোমার আন্টি লাল রং পছন্দ করেন। তাই বলে," রমিত চটজলদি ব্যাখ্যা দিল। বয়ঃসন্ধির সময়ে কারও সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা মনে গেঁথে যাবে। মেঘা মহিলাকে পছন্দ করে। মহিলাকে অনেকে গুলবাহার বলে। নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। অবশ্য গুল দেওয়াটা শৌখিন শিল্প। পদস্থ অফিসার থেকে ইটালিয়ান সেলুনের ক্ষৌরকার এই শিল্পের কারিগররা কোনও শ্রেণি বা বর্ণে

B.TECH | MBBS | BDS
West Bengal | Maharashtra | Karnataka
Educational & Academic Consultant
Direct Admission at Lowest Package
A Jadavpur University Alumnus Initiative
CAREER TOPPERS | 25/A Shakespeare Sarani Kolkata-17
98300 89321 | 98300 23894

আটকে নেই। আচ্ছা, 'গুলবাহার' মানে প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌন্দর্য হতে পারে না? হতেও তো পারে।
ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছে রমিত। ওরা আটটার মধ্যে আসবে বলেছিল। ফোন করে প্রতীক্ষার আনন্দ নষ্ট করতে চায় না সে। হর্নের শব্দ পেতেই সে গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড়াল।
"গুড। কথা রেখেছিস। সপরিবারে এলি শেষ পর্যন্ত," রমিত হাসে। চকলেট কিনে রেখেছিল রমিত। দ্রুত র‍্যাপার খুলতে-খুলতে রোহন বলে, "কাকু, সারা রাস্তা বাবা-মা ঝগড়া করছিল। আমার ভাল লাগে না।"
অপ্রস্তুত অদিতি বলে "কোথায় ঝগড়া করলাম?"
"করছিলে।"
"রমুদা, ও আসার সময় দুটো সিডি কিনে ফেলল। একশো নব্বই টাকা পড়ল। কোনও যুক্তি আছে? এম পি থ্রি কিনতে পারত। গানও বেশি থাকত। অত দাম দিয়ে কেনাটা বিলাসিতা নয়?"
"বিলাসিতা কাকে বলে তুমি জানো? কোনও শখ-আহ্লাদ-বিলাসের পিছনে ছুটি না। দুটো সিডি কেনা নিয়ে তুমি কেন আপত্তি করবে? তোমার মতো মানুষ সংখ্যায় বেশি হলে শিল্পীরা না খেয়ে মরবে।"
"তুমি দায়িত্ব নিয়েছ শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার? মেসেজের পর মেসেজ, অনুরোধ-উপরোধ। 'প্লিজ, আমার লেখা গান পড়ে দেখুন।' একজনও পাত্তা দিয়েছে?"
সায়মের কাঁধ ঝুলে পড়ে। ম্রিয়মাণ সুরে সে বলে, "আমার পাঠানো মেসেজ তুমি কেন পড়েছ? প্রাইভেসিতে নাক গলানো কেন?"
রমিত মাথা নাড়ে, "তোরা দু'জন থামবি? রোহনের উপর আনহেলদি এফেক্ট পড়ছে। তোরা এখানে ঝগড়া করতে এসেছিস? কত দিন পরে একটা সুন্দর সন্ধে কাটাব ভেবেছিলাম। শুরুতেই সব মাটি করে দিলি।"
দু'জনে ঝগড়ায় বিরতি দিল। পরিস্থিতি সহজ করার চেষ্টায় অদিতি কথা ঘোরায়, "ঘরটা ভালই পেয়েছ। খোলামেলা। কত ভাড়া নিচ্ছে?"
"পাঁচহাজার। একমাসের অ্যাডভান্স লেগেছে। বাড়িভাড়ারও দালাল শহরে বাড়ছে। দালালকে তিনহাজার দিতে হল। শহরটার যে কী হল!"
সায়ম বলে, "পপুলেশন বাড়ার সাইডএফেক্ট। ফ্যামিলি ছাড়লি কেন হঠাৎ?"
নিশ্বাস ফেলল রমিত, "পরিবার ভেঙে গেল। ঘর, ব্যবসা, হাঁড়ি সব ভাগ হয়ে গেল। মন টিকল না। গরমে দোতলার রুমটি যেন দয়া করে দিল আমাকে। কারও দয়ার উপরে বেঁচে থাকতে পারব না। মনে লেগেছিল খুব। তাও মেনে নিতাম। বাড়ি ত্যাগ করেছি বলে আঙুল আমার দিকেই উঠবে। ভিতরের রহস্য বাইরের লোক কী জানবে! টাকার ব্যাপারে আমাকে স্রেফ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল। কখনও ক্ষমা করতে পারব না। মেসোমশাইয়ের কাছেই শেষে হাত পাতলাম। ওঁকে সত্যি বলতে পারিনি। আজ ফোনে বললাম। তোদের দেখে ভীষণ রাগ হচ্ছে। সাড়ে তিনজনে দোতলা বাড়িটায় থাকিস।"
"সাড়ে?"
"রোহনকে হাফ ধরছি। সাড়ে তিনজনেও মিলেমিশে থাকতে পারছিস না? মানুষের পৃথিবী আর কত ছোট হবে শুনি? গায়ে পড়ে প্রবলেম ডেকে আনছিস!"
"না, রমুদা, এই যে তোমার হাত খালি, হঠাৎ বিপদে পড়লে। দুঃসময়ের কথা ভাবাটা খারাপ? অভাবের মর্ম আমি বুঝি," অদিতি হাত নেড়ে বোঝায়, "ও ফিল করে না।"
রমিত শান্তগলায় বলে, "তোমার পয়েন্টে তুমি রাইট। তবে সিকিউরিটি নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে কখনও তা শেষ হবে না। তুমি কষ্ট করেছ। সেই জায়গা থেকে সব কিছু জাজ করলে চলবে? সায়ম আর আমি ক্লাস সেভেনে টিনের বাক্স নিয়ে স্কুল যেতাম। মোগলাই, চাউমিন, ঘুগনি বা ফুচকা খেতে পেলেই আনন্দে লাফাতাম। টিফিন ছিল মুড়ি, ছোলাসেদ্ধ। রোহনকে তুমি চাউমিন, পরোটা, স্যান্ডউইচ বানিয়ে দাও না? রেস্টুরেন্টেও নিয়ে যাও। রোহনকে আমাদের ছেলেবেলার অভ্যেস করাতে পারবে? এসি, ভিডিও গেমস, টিভি কেড়ে নেবে?"
অদিতি ঠোঁট কামড়ায়, "তুমি হয়তো ঠিক বলছ। ও আমার সংগঠন করা নিয়ে কেন অবজেকশন তুলবে?"
সায়ম বলে, "বেশ করেছি। রাজনীতির কিছুই বোঝো না তুমি।"
রমিত হাসল, "অদিতির সাবজেক্ট পল সায়েন্স। রাজনীতির প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ থাকবে। তুই কিন্তু আন্ডার-এস্টিমেট করছিস ওকে! বেসিকালি তোরা দুজন কেউই স্পেস রাখায় বিশ্বাস করিস না। দূর ছাই, আমার বাড়িটা কি লোক-আদালত হয়ে গেল! অদিতি, কিচেনে গিয়ে কড়া করে চা বানাও তো। দু'জনে মিলে মাথাটা ধরিয়ে দিলে।"
অদিতি রান্নাঘরে ঢুকতেই রমিত নিচুগলায় সায়মকে বলল, "করছিস কী তোরা? মেসোমশাই বাড়িতে নেই। দু'জনে কোথায় ম্যারাথন ইনিংস খেলবি। তা না, খিটখিটে কাপলদের মতো ঝগড়া করছিস খালি। তোদের দুটোরই দেখছি সেক্সবর্ধক ক্যাপসুল লাগবে।"
সায়ম চোখ ছোট করে, "নিজে তো সেক্সের ব্যাপারে নভিস। জ্ঞান দিতে আসিস না।"
কাঁধে থাপ্পড় মেরে রমিত বলে, "ফুটবল না খেলেও ফুটবল কর্তা হওয়া যায় চাঁদু। গান লেখার বাতিকটা দেখছি ছাড়িসনি। আগেই বলেছিলাম! কেউ রেসপন্স করবে না।"
হতাশায় কাঁধ ঝাঁকাল সায়ম, "ওঁরা সেলিব্রিটি। নিজে থেকে কেন আমার মতো অজানা, অচেনা কাউকে ফোন করবেন? আমিও আশা করি না। ভদ্রতার খাতিরে দুটো লাইন মেসেজ করা যায় না? ফাংশন, লাইভ প্রোগ্রামের বিজি শিডিউল থাকে। রণজিৎদাকে চারবার ইমেল, সাতবার মেসেজ করেছি। বাধ্য হয়ে ফোনে ধরতেই বললেন, 'সুরকারদের কাছে পাঠান। আমার কিছু করার নেই।' এটুকু মেসেজে একটিবার জানাতে পারতেন না? পাঁচ মাস ধরে শুধু ভুল পথে হাঁটলাম।"
"পাঠিয়েছিস সুরকারদের কাছে?"
"একজনকে মেল করেছিলাম। পাঁচ-ছ'বার মেসেজও পাঠিয়েছি। রিয়েলাইজ করলাম যে দেখবেন না। আধঘণ্টা লাগে বড়জোর একবার পড়ে দেখতে। স্রেফ অনীহা।"
রমিত হাসে, "উপরে পৌঁছে গেলে কেউ নীচের দিকে তাকায় না। আমি বললেও শুনবি না। ছেড়ে দে, বেকার নার্ভে চাপ নিচ্ছিস।"
জেদি গলায় বলে সায়ম, "অসম্ভব। আমি শেষ দেখে ছাড়ব। আরও দু'জন মিউজিক ডিরেক্টরের কাছে কুরিয়ারে পাঠিয়েছি।"
"নিশ্চয়ই বলেছেন সময় করে দেখে রাখবেন! তুই সেই আশায় হাঁ করে বসে আছিস।"
"একদম তাই," সায়ম আশ্চর্য হল।
"মিলিয়ে নিবি। মরিয়া হয়ে তুই ফোনও করবি। মন রাখার জন্য সরাসরি 'না' বলবেন না। দেখে রাখব ভাই, ক'দিন বাদে ফোন করবেন। হয়তো বলবেন ভালই হয়েছে, কিন্তু..." রমিতের মিটিমিটে হাসি, "কিন্তু শব্দটাতেই হোঁচট খাবি।"
"তুই এমন নেগেটিভ ছিলি না রমিত।"
"এখনও নেই। ঠেকে ডার্কসাইডটা অল্প-অল্প বুঝতে শিখেছি।"
"গান-কবিতার জগৎ থেকে দূরে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। রমিত, তুই কেন বুঝবি না? অদিতি বোঝার চেষ্টা করে না। ও হচ্ছে বস্তুবাদী টাইপ। তা নিয়ে আমার অভিযোগ নেই। আমি কাউকে ডিসটার্ব না করে সৃষ্টির আনন্দে কিছুটা সময় কাটালে কারও তো ক্ষতি হয় না। কমেন্ট পাশ করবে কেন? তেরোবছর এক ছাদের নীচে কাটিয়েও ও আমার এই প্যাশানের জায়গা বুঝতে পারল না!" সায়ম একটানা বলার পর হাঁপাতে থাকে।
"তুই বোঝানোর চেষ্টা কর। একদিন ঠিক বুঝবে।"
"স্বার্থপরের মতো নিজেদের কথা বলছি। রান্নার লোক, কাজের লোক জোগাড় করেছিস?"

"চেষ্টা চলছে।"
অদিতি ডাইনিং স্পেসে এসে দুকাপ চা বড়িয়ে দিল, "আমি দেখছি। দায়িত্বটা আমার উপর ছেড়ে দাও। বাবা ফোনে বলছিলেন। মেঘাকে দেখভালের জন্য চব্বিশ ঘন্টার কেউ থাকলে বেটার। প্রি ইন ওয়ান। তবে টেম্পোরারি সমাধান। এবার চারহাত হও।"
"তোমাদের দেখে ইচ্ছেটা মরে যাচ্ছে যে!" রমিত সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল।
"ছাইপাঁশ খাওয়াটা বাড়িয়ে দিয়েছ। নেশার দাস হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ," অদিতি চেয়ার টেনে বসল, "ওই দুটো দেখছি ভিডিও গেমসে মেতে গিয়েছে। প্রবলেম হলে মেঘাকে আমাদের ওখানে রেখে আসবে। ও লোনলি ফিল করতে পারে। রোহনেরও একা লাগবে না। জিনিসপত্র সব গোছানো, বাসনপত্রও সব সুন্দরভাবে সাজানো। তুমি বেশ সংসারী হয়েছ দায়ে পড়ে।"
"দুর! বড়বউদি গুছিয়ে কিনেটিনে দিয়ে গিয়েছে। মেঘার উপর বউদির মায়া। না দেখে থাকতে পারে না। আজ সকালেও এসেছিল," রমিত হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।
"রাতে কী অবস্থা হয়েছে আজ?"
"হোম-সার্ভিস জারি আছে।"
অদিতি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "ফোনে না করে দাও। আমারও রান্না করা হয়নি। গিয়ে কিছু বানিয়ে নেব ভাবছিলাম। এক কাজ করলে হয় না? সবাই মিলে রেস্তরাঁয় যাওয়া যাক।"
সায়মের মুখে হাসি ফোটে, "ফাইনাল! সবাই মিলে রেস্তরাঁয় যাব। কোনও কথা হবে না আর। খুদে দুটোকে সুসংবাদটা জানিয়ে দিই।" রোহন এবং মেঘা দুজনেই উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠল।

{২২}

মোহনায় ভেসে যাচ্ছিল সায়ম। অদিতির স্ফুরিত ঠোঁট, অবিন্যস্ত চুল, ঘূর্ণির ভিতর হারিয়ে শরীর ঢেউ হয়ে যায়। দুই বিষম মেরু প্রবল আকর্ষণে আধো-অন্ধকারে আঁকড়ে ধরছিল। উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছিল অদিতির মেরুন গাল, ঘামেভেজা গ্রীবা, থরোথরো কাঁপছিল তার পদ্ম দুটি। আকাঙ্ক্ষার উত্তাপে লাভা হয়ে গেল সায়ম।
সুগন্ধ শরীরে ডুব দেওয়ার পর আবেশে, মিলন রাগের আবহমান আনন্দে জুড়িয়ে যাচ্ছিল সায়ম। দূরে, বহু দূরে অনন্ত নীল জল ভেসে যায়। কতদিন পর অদিতির চোখের মণিতে এইভাবে উষ্ণ অনুরাগ খুঁজে পেল সে। উদ্ভাসিত নগ্নতার আহ্বানে সুড়ঙ্গে আলোর তরঙ্গ জেগে উঠছিল, কোথাও অন্ধকার নেই, বরং অন্ধকার বিদীর্ণ করে কোষে-কোষে নক্ষত্রলোকের রহস্য খুলে যাচ্ছিল।
আলো জ্বালতে অদিতি আর লজ্জা পেল না। তার বোজা চোখ রাতপোশাক টানে। শরীর ঢাকে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে সিগারেট ধরায় সায়ম। অদিতি আজ মানা করবে না। বারান্দায় বসে সায়ম। শ্রান্ত লাগলেও শরীরে এখন উদ্দীপনার আলোড়ন, সেই আলোড়নেই সে ডায়েরি খুলে বসে, অদিতি হঠাৎ এসে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে পিছন থেকে। সায়ম হাসে, "তোমার গ্রাফ যে উপরে উঠছে খুব! হঠাৎ দেখব নেমে গিয়েছে।"
"ডায়েরি খুললে কেন?"
"এমনি।"
অদিতি হালকা চুমু দিল গালে,"তুমি কি আমাকে নিয়ে খুশি নও? হতেই পারে। আমি তোমার দু'নম্বর বউ।"
"হঠাৎ এমন প্রশ্ন?"
"না। পাতায়-পাতায় শুধু ব্যাকুলতা। কেউ যেন তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তুমি একা, তার ছায়ায় নিজেকে ফিরে পেতে চাও। আমি পড়ে দেখছিলাম। ওইসব কবিতা মাথায় ঢোকে না পুরোপুরি। দরজা খুলে কেউ তোমাকে নিয়ে যাবে না। আমি আছি। ভাল না লাগলেও জড়িয়ে থাকতে হবে," অদিতির ঠোঁটে নীল স্ফুলিঙ্গ, "পাগলী মেয়েটা বোকা ছিল। সময় ভালবাসা চুরি করে দিত।"
"কবিতার সঙ্গে মেলাতে যেও না। ঘরোয়া, সংসারী কবির মধ্যে নারীর সংকেতে পুনর্জন্ম খুঁজে পেতে চায়। একটা প্রশ্ন ছিল। উত্তরটা সরাসরি দেবে?"
"শুনি।"
"নীলাবউদির ঘটনাটা বলে হঠাৎ তোমার আবেগ কয়েক সেকেন্ডের জন্য বেড়ে গিয়েছিল। রহস্যটা কী?"
"রহস্যই থাকুক। বলা যাবে না।"
এই নারী কুয়াশাচাদরে কেন যে নিজেকে ঢেকে রাখে! মিলনান্ত নীলও যেন মুহূর্তের উদ্ভাস, খোলা আকাশ আর নক্ষত্রলোকের অনন্ত আলো হতে পারে না। সায়ম অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে বলে, "বুঝলাম।"
"কী বুঝলে?"
"উত্তরটা নিজের মতো করে ভেবে নিতে হবে। তাই তো?"
অদিতি হাত টানে, "শোবে এসো।"
"হ্যাঁ। একা পাশবালিশ জড়িয়ে শোব। ডাক দিচ্ছ কেন তা হলে?"
তার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে অদিতি কিছুক্ষণ থাকে। আলিঙ্গন ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়, "আর নয় সায়মবাবু। রোহন ভরপেট খেয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ জেগে উঠতে পারে। রিস্ক হয়ে যাচ্ছে। চললাম। তুমি লাস্যময়ী কারও স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে

পড়ো। ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, পল্লবী কখনও তোমার স্বপ্নে আসেনি?"

"কোন দুঃখে সে স্বপ্নে আসবে শুনি?"

বিরক্ত সায়ম মুখ ঘুরিয়ে শোয়। ছন্দপতন না করলে চলছিল না? অদিতি আনন্দ ধরে রাখতে দেয় না। পাশবালিশ আঁকড়ে সায়ম নিশ্বাস নিল। অদিতিরানি, ক্ষণিকের প্রেমে কেন ভুলিয়ে রাখো? বিরতিহীন মৃদঙ্গ হয়ে বাজো। দিনের শুরুতে আদরের দাগ রাখো মনে। শরীর আর কতখানি ধরে রাখে?

সুরই তার প্রেমিকা। সেই প্রেমিকার পালকস্পর্শ ঘুমের পাপড়ি মেলে নিয়ে যায় সুদূরে...

{২৩}

অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরনোর অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। আর্কিটেকচার নিয়ে যখন ভর্তি হয়েছিলেন তখন তিনি নিতান্তই সরল এক গ্রাম্য যুবক। বৃহত্তর পৃথিবীতে পা রেখে পদে-পদে ঠোক্কর, হেনস্থা আর উপহাস জোটে। কথ্যভাষায় বাঁকুড়ার টান, সস্তার জামা-প্যান্ট, রুক্ষ চুল, তিনি যেন সবার টার্গেট হয়ে গেলেন। অকথ্য র‍্যাগিং হয়েছিল তাঁর ওপর। সিনিয়াররা গ্রাম্য ভূতটিকে স্মার্ট ও যুগোপযোগী গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব নিয়েছিল যে! সারা হোস্টেল উলঙ্গ করে ঘুরিয়েছিল একরাতে। ক্রমাগত চড়-থাপ্পড় তো ছিল। কারনিস বেয়ে হাঁটানো, টয়লেটে মুখ ঢুকিয়ে ফ্ল্যাশ টেনে দেওয়া, উদোম খিস্তিখেউড় করা। সমস্ত কিছু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছিলেন শেখর। পালিয়ে আসেননি, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেননি। দীনহীন অবস্থা। চার বিঘা জমি বিক্রি করে দিয়েছেন বাবা। ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর খরচা জোগাতে হবে। কোনও মেয়ে বা সহপাঠিনী মুখ তুলেও তাকায়নি। হাসির রোল উঠত তাঁর বাচনভঙ্গি শুনে, চোখে বিদ্রূপ আর করুণা। যেন তিনি পুরোপুরি বেমানান সেখানে, এক আজব প্রাণী ভুল করে অভিজাত প্রতিষ্ঠানে ঢোকার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আসলে ফিউডাল মানসিকতাতে চলে। তখনই বুঝেছিলেন শেখর। বিশ্বাস ছিল মেধার জোরে তিনি প্রতিকূলতা জয় করে নেবেন। অভিযোজনই জীবনের চরম সত্যি। দু'বছরের মধ্যে তিনি হয়ে উঠলেন স্মার্ট, চোস্ত এবং সফিসটিকেটেড। কলকাতায় টিউশনির রেট তখনও ঈর্ষণীয় ছিল। তিনটি বাড়িতে পড়িয়ে হাতে পয়সা মন্দ আসত না। তিন সেট জামাপ্যান্ট কিনে নিজেই ইস্ত্রি করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরতেন। জামার ভাঁজ নিখুঁত, চুল ফুরফুরে, মসৃণ গাল, একদিন অন্তর শেভ করা, চলাফেরায় তুখড়। দু'বছর বাদে শেখর পাঠক হয়ে উঠলেন ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির হার্টথ্রব। হস্টেলের স্বঘোষিত দাদা। নিজের অস্তিত্ব জাহির করতেই যেন নিত্যনতুন বান্ধবীকে নিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘোরেন। স্টুডেন্ট হিসেবেও তিনি অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাঁর মার্কশিট সবাইকে ছাপিয়ে যায়, তাঁকে কাছে পেলে স্বপ্নমেদুর হবে না এমন মেয়ে দুর্লভ। শেখর খেলার ছলে প্রেম করেছেন, ছ'মাস বা একবছরের ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক ভেঙে আবার নতুন মুখ, অনুরাগের বাদামি স্পর্শ, মতুন মদিরা। কোনও সম্পর্ক চিরস্থায়ী বাঁক নেয়নি। বাঁকুড়ার লালমাটিতে তাঁর শিকড়, ঘরে নিরক্ষর বাবা-মা, রুগ্ন দু'টি বোন, ভাইটির দৌড় উচ্চমাধ্যমিকেই ইতি, পরের ধাপ উতরোতে পারছে না। স্রোতে ভেসে যাবেন কেন তিনি? কাঁধে বিস্তর দায়িত্ব। শিক্ষিতা, মেধাবী এবং সচ্ছলতায় বেড়ে ওঠা কোনও মেয়ে এই সম্পূর্ণ বিপরীত পরিমণ্ডলে মানিয়ে নিতে পারবে না। শেখর ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে চাকরি পেয়ে গেলেন। অপমানে, বিদ্রূপে জেরবার হয়ে একসময় নীরব অশ্রুপাত করেছিলেন। ক্যাম্পাস ছাড়লেন দৃপ্ত, গর্বিত জয়ধ্বজা উড়িয়ে। পরিবারকে ভুলে যাননি। দু'বোনের দেখেশুনে ভাল বিয়ে দিলেন, চার বিঘা জমি কিনে দিলেন, মাটির বাড়ি পাকা বাড়িতে রূপান্তরিত হল। রোজগারের বড় অংশই ঢেলে দিচ্ছেন শেখর বাড়িতে। গানের উপর তাঁর আসক্তি চিরকালই প্রবল, স্কুলজীবনে ভাঙা তক্তপোশে শুয়ে রেডিও চালিয়ে গান খুঁজে বেড়াতেন, অঙ্ক করতে গেলেও পাশে মান্ধাতা আমলের রেডিওটি চালু থাকত। বোনের বাড়ি ঘুরতে গিয়ে দেখলেন পাড়ার জলসা, এক তরুণীর গলার সুরের মূর্ছনা তাঁকে মোহিত করে দিল। ধ্রুপদী সঙ্গীত না বুঝলেও সেই মগ্ন তরুণীর গলার কাজ, সুরের ভাঁজ শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকলেন চাঁদোয়ার

নীচে। খোঁজ শুরু করলেন শেখর। বিষ্ণুপুরে বাড়ি, বাঁকুড়া শহরেই মেয়েটির আত্মীয়বাড়ি, প্রতিবেশীর অনুরোধে সে মঞ্চে গান শোনাতে রাজি হয়েছিল। আত্মীয়বাড়ি এই পাড়াতেই! শেখর দেরি করলেন না। মেয়েদের মন জয় করতে তিনি তখন ওস্তাদ। শিল্পের প্রশংসা দিয়ে প্রাথমিক আলাপ শুরু। শিল্পের অনুরাগ শিল্পীর গভীরে ডুব দিল আস্তে-আস্তে, কাছাকাছি এসে দু'জনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মিলে গেল। দীর্ঘ, গাঢ় চুম্বনের বেশি এগোননি শেখর। ভালবাসার ছলে খেলা আর নয়, এবার পবিত্র আবেগের দহন, এ মেয়েকে ছাড়া জীবন ভাবা অসম্ভব। বাড়িতে আপত্তি উঠল। "ছি, তুই আমাদের মুখে চুনকালি দিবি, অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করবি!" উচ্চবর্ণের গুমোর দেখে মন বিষিয়ে গেল। নোংরা, ধুলোময় লাল ধুতি, খড়ের চাল বেয়ে টুপ-টুপ করে জল পড়ত, করলা আর কুমড়ো বাদে কোনও সবজির স্বাদ পাননি কৈশোরে, একটা উৎসব পড়লে সকাল থেকে পেট খালি করে হ্যাংলার মতো অপেক্ষা করতে হত। তিনি কোনও সাহায্য ছাড়াই অটুট মেধা এবং আত্মবিশ্বাসে আজ দাঁড়িয়ে গিয়েছেন, সাত বছর সংসারে দু'হাতে দিয়েছেন, নিজে বিলাসের ছায়া মাড়ানিনি। তিনি শুধু ভালবেসে একজনকে ঘরনী করতে চাইছেন। অন্যায়টা কোথায়? সমাজ নাকি ছি ছি করবে। কোথায় ছিল সমাজ অভাবে-দুঃসময়ে? যুক্তিতে এতটুকু টলাতে পারলেন না শেখর। বিয়ে তিনি করলেন। বাড়ি থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, বংশের মুখ পুড়িয়েছেন। ভিন জাতের মেয়েকে নিয়ে কখনও কুসুমডিহার ভিটেতে যেন না আসে কুলাঙ্গার ছেলে। সত্যিই তো আর প্রয়োজন নেই তাঁর। ভাইকে স্টেশনারি দোকান খুলে দিয়েছেন। দায়িত্ব সম্পূর্ণ। ভাইকেই মাসখরচা বাবদ নিয়মিত টাকা পাঠাতে শুরু করলেন। বুড়োবুড়ির তেজ কম নয়। ছেলের পাঠানো টাকা সরাসরি নিজের হাতে নেবেন না। মর্মাহত শেখর জেদ ছাড়েননি। নীলাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে বরণ না করা পর্যন্ত তিনি গ্রামের বাড়িতে কখনও যাবেন না। ধ্রুব জন্মানোর পর রক্তের টানেই নিমরাজি হয়ে নীলাকে মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা। পুরোটাই আবরণ। কাজে-কর্মে-আচরণে নীলা অস্পৃশ্য, তার ছোঁয়ায় অশুদ্ধ হয়ে যাবে অন্দরমহল। পুত্রবিয়োগের মৃত্যুশোক তাঁকে টলা দু'মাস স্তব্ধ করে দিয়েছিল। আজ শেখর মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করলেন আত্মজ হারানোর শোকের চেয়েও অন্য শোক অনেক কষ্টকর হতে পারে। হসপিটাল থেকে নীলাকে ফিরিয়ে আনার পর একটি দিন শুধু 'ধ্রুপদ'-এ কাটিয়েছিলেন তিনি। চব্বিশ ঘণ্টা কাটতেই নীলাকে বিষ্ণুপুর নিয়ে চলে এসেছেন। বাপের বাড়ি মেয়েদের জীবনে পরম ভালবাসার জায়গা, অনেকের মধ্যে থাকলে স্বাভাবিক হতে পারবে সে, মনের ঝড়-কোলাহল থেমে যাবে। এখানে এসে নীলা বিষাদের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে থাকছে না। বাইরে স্বাভাবিক, সুস্থ সহজ, ভাই আর তার বউয়ের সান্নিধ্যে হাসিখুশি। তার চোখের আলো তবু কান্নাফেরির ইঙ্গিতে নিবে যায়। শেখরের উপস্থিতি অনেক সময় ইচ্ছে করেই খেয়াল করে না। বৈরাগ্যের অসহ্য মৌনতা চলল তিনদিন। কাল রাতে পাশে শুয়ে-শুয়ে মৌনতা ভাঙল নীলা। গল্প শুরু করেছিলেন শেখর। নীলা আগ্রহ দেখাল প্রথমে। কিছুক্ষণ পর সরাসরি কটাক্ষ, "তোমার অবৈধ সন্তানের নাম কী?"

"এসব আবার কী বলছ তুমি?

"ভয় পেও না। তাকে আনো। আমি আদরে মানুষ করব। তোমার সন্তান মানে সে আমারই।"

আহত স্বরে শেখর বলেছিলেন, "লাইফ ইজ় নট ফিল্ম নীলা। প্লিজ়, এরকম আবোলতাবোল ভেবে নিজেকে কষ্ট দিও না। আমি মানছি অরুণিমা ছিল। সি ইজ় পাস্ট। এই নোংরা লাইনে ভাবাটা বন্ধ করো।" বাঁকা সুরে নীলা বলে, "অপ্রিয় কথা কানে নোংরা শোনায়।" অপমানের তীক্ষ্ণ স্রোত বয়ে যাচ্ছিল শরীরে। একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি তারপর। ঘরের অন্ধকার বিপন্নতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। ঘুমোতে পারেননি শেখর। পুণেতে কর্মজীবন শুরু। তারপর মুম্বই, আহমেদাবাদ, দিল্লি। কোম্পানির প্রজেক্টে জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স। চাকরি ছেড়ে এমটেক। অঢেল রোজগার, ভ্রাম্যমাণ জীবন ছেড়ে স্থিতির খোঁজ। ধ্রুব জন্ম নিয়েছে। খড়গপুর আইআইটিতে অধ্যাপনায় থিতু হলেন শেষমেশ। এত বাঁক, এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা পার হয়ে আজ তাঁর সামনে হারের ভ্রূকুটি! আত্মহত্যাকে ঘৃণা করেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস আজও করেন না, কোনও আশ্রমে থাকতে পারবেন না। শিলায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার মিথ্যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বিশ্বাস ছাড়া তা কখনও হয়? কোথায় যাবেন, কীভাবে যাবেন? সাইকায়াট্রিস্টের কথা তুললেই নীলা হিস্টিরিক আচরণ করে। শেখর ষড়যন্ত্র করে তাকে নাকি পাগল বানাতে চান। সবই পথ নিষ্কণ্টক করার চাল। রাসমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন শেখর। নিজে আর্কিটেক্ট বলেই এই রাসমঞ্চের স্থাপত্য তাঁকে চুম্বকটানে দাঁড় করিয়ে রাখে। কতবার দেখেছেন। ল্যাটেরাইট মাটির প্ল্যাটফর্ম। পিরামিডের মুকুট। ঢালু ছাদ। স্থাপত্যশৈলীর এমন নজির ভূভারতেও খুঁজে পাওয়া যায় না। অদ্ভুতভাবে, কয়েকটি পুষ্পিত পদ্মের কারুকাজ বাদে টেরাকোটা শিল্পের কাজ এখানে নেই। রাস উৎসবের সময় বিষ্ণুপুরের অন্যান্য মন্দির থেকে দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে আসা হয় এখানে। দশবছর আগে শেষ নীলার পাশে বসে সেই উৎসব দেখেছিলেন। শহরের প্রাচীনতম ইটের মন্দির, পিরামিড টাওয়ার ঘিরে কুঁড়েঘর আকৃতির সোপান। রিকশা ধরলেন শেখর। স্টেশন যাবেন। কোনও ট্রেনে উঠে চলে যাবেন কোথাও। ১৬০০ সালে তৈরি রাসমঞ্চ সময়ের নাশকতা তাচ্ছিল্য করে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। তাঁদের দাম্পত্য জীবনের স্থাপত্য আঠাশ বছরেই চুরমার হয়ে গেল। কী নিয়ে থাকবেন তিনি? পালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। নীলাকে একা রেখেই চলে যাচ্ছেন। তাঁর উপস্থিতিটাই নীলার কাছে অসহ্য, তিনি কাছে না থাকলে নীলা মানসিক স্বস্তি পাবে, সন্দেহের বিষে বিক্ষত হবে না। কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যেতে পারলে বোঝা হালকা হয়। সায়মের মুখ মনে পড়ল। একমাত্র তাকেই বুঝিয়ে যাবেন।

"হ্যালো।"

"শেখরদা বলছি। শোন আমি চলে যাচ্ছি। তোর বউদি রইল।

Trust **T.I.M.E.,** the national leader in entrance exam training with **236 offices in 118 cities**

Excellent Coaching for

- CAT
- CMAT
- MAT
- GATE
- CLAT
- Bank Exams (PO/Clerical)
- SSC-CGL Exam
- GMAT® Exam
- GRE® Test
- CRT (Campus Recruitment Training)
- IIT-Foundation (7th, 8th, 9th & 10th Std.)

Enrol Today!

T.I.M.E.
Triumphant Institute of Management Education Pvt. Ltd.
• Park Street • Saltlake • Jadavpur
• New Alipore • Sealdah
Tel: 32623764
e-mail: kolkata@time4education.com www.time4education.com

GRE® Test & GMAT® Exam are the registered trademarks of ETS & GMAC® respectively

বিষ্ণুপুরেই আছে। একটু দেখবি। তোর ভরসাতেই রেখে যাচ্ছি,” শেখরের গলা বুজে আসে।
“কীসব বলছ তুমি? কোথায় যাচ্ছ?”
“নো ডেস্টিনেশন। আজ আমার কোনও গন্তব্য নেই।”
“শোনো, শেখরদা প্লিজ। ঠান্ডা মাথায় ভাবো। তুমি এখন কোথায়? কী হয়েছে তোমার?”
ফোন কেটে দিলেন শেখর।
আলাপের পর রাগের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন ধ্রুপদী শিল্পী। রাগ ভৈরবের মধুর অবরোহণে কোমল নিষাদের ছোঁয়া। মেঘছায়ায় আকাশ ঢেকেছে অনেক দিন পর। প্রকৃতির ধ্রুপদী ভাঁড়ার থেকে ঠুংরি-খেয়াল ধ্বনিত হবে আজ।
প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকেন শেখর। আদ্রামুখী সুপারফাস্ট ট্রেনের ঘোষণায় অনুরণিত হল স্টেশনচত্বর।

শেখরদার মোবাইল বন্ধ। এই মুহূর্তে কাউন্টার ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। দু'জন স্টাফ ছুটি নিয়েছেন বলে আজ পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্যাশ কাউন্টারে বসেছে। লম্বা লাইন। ইউরিনাল যাবার নাম করে সে উঠে এসে অদিতিকে ফোন করে।
ফোনে অদিতির গলা বরাবরই নিস্পৃহ এবং কেজো। এই প্রথম হকচকিয়ে যায় অদিতি, “শেখরদা চলে যাচ্ছেন! এরকম হয় নাকি? তুমি ঠিক শুনেছ?”
“কথা শুনে আমি শিওর। তুমি এক কাজ করো। বিষ্ণুপুর চলে যাও।”
“আমি?”
মেজাজে বলে সায়ম, “হোয়াই নট? তুমি ওদিকের মেয়ে। বিষ্ণুপুর তুমি অনেক ভাল চেনো। দেরি করলে কিছু আর করার থাকবে না। কেন যে নীলাবউদির ফোননম্বর রাখিনি! তোমার কাছেও নেই?”
“আছে।”
অদিতির উত্তরে বাক্‌রহিত হয়ে যায় সায়ম। হরপ্পালিপির মতো দুর্বোধ্য এই নারী, তার মনের রহস্য উদ্ধার করতে পারবে না কোনও দিন।
“ইমিডিয়েট ফোনে ধরো,” অসহিষ্ণু হল সায়ম।
“দেখছি।”
“কী হল জানিয়ে ফোন করবে। ফোন না ধরলে বিষ্ণুপুর চলে যাবে। রোহনকে পাশের বাড়িতে বলেকয়ে রাখবে। বাকিটা আমি সামলে নেব,” সায়ম কাউন্টারে ফিরে এলো। খানিকটা রিলিফ পাওয়া গিয়েছে। ভাগ্যিস, ফোননম্বর অদিতি রেখেছিল। কেন রেখেছিল কে জানে! শেখরদা সংবেদনশীল মানুষ বলেই ভয়টা অমূলক ভাবতে পারছে না। সংবেদনের মাত্রা যান্ত্রিকতার তোয়াক্কা করে না কখনও। যন্ত্রসুলভ কাজের ফাঁকে চিন্তা হানা দেয়। কী এমন ঘটল? কোন কারণে শেখরদা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে এমন উদ্‌ভ্রান্ত? দশ মিনিট পর 'তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন' সুর বাজল মোবাইলে। মেসেজ পাঠিয়েছে অদিতি। নীলাবউদি অনড়, সবই নাকি নাটক, সাজানো ঘটনা, একফোঁটা সহানুভূতি পাবার অছিলা। পড়ে বিমর্ষ হয়ে গেল সায়ম। এতখানি বিতৃষ্ণা নীলাবউদির মনে? আজ সে নিজেও যদি কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে যায় অদিতি এভাবেই ঘৃণা করবে তাকে! নির্মম হতে পারবে এরকম? হতেও পারে।
টিফিন-ব্রেকে সে ফোন করল। “হ্যালো। হঠাৎ তোদের ঘন-ঘন ফোন?”
“শেখরদা...”
কথা শেষ করতে দিলেন না নীলা, “নাটক করছে। বৃথা পয়সা আর সময় খরচা করছিস।”
“আচ্ছা, তা না হয় করলাম। কেমন আছ?”
“ভাল। আজ আকাশে মেঘ, বৃষ্টি নামবে। দশটার পর হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছি। গলা সাধছি। অনেকদিন চর্চা ছেড়ে দিয়েছিলাম।”
“শুনে খুশি হলাম। একটা কথা জানিয়ে দিই। শেখরদা তোমার দায়িত্ব আমাকে সঁপে দিয়ে গিয়েছে। তোমার খোঁজখবর নিয়মিত রাখার দায়িত্ব এখন আমার।”
“আমি কোনও বাচ্চা মেয়ে নই, কারও হাতের পুতুলও নই। দায়িত্ব দিয়ে যাবার ও কে? তোকে কেন আনছে আমাদের মধ্যে?” ঝাঁঝিয়ে উঠলেন নীলাবউদি।
সায়ম ফেটে পড়ল, “বাচ্চা মেয়ে নও বলেই সুইসাইড করতে গিয়েছিলে? চিন্তা নেই। শেখরদা গোপন রেখেছিল। খবর কানে এসে গিয়েছে ঠিক। বারবার বলছি! তবু গুরুত্ব দিচ্ছ না? সব ভুলেরই ক্ষমা হয়। তুমি কি পাথর হয়ে গেলে বউদি। হঠাৎ তোমার কী হল? নিষ্ঠুর মানুষদের আমি ঘৃণা করি।”
রাগে ফোন নামিয়ে রাখল সায়ম। হেঁয়ালি উদ্ধার করতে পারা যাচ্ছে না।
নীলাবউদি হঠাৎ করে এতদিন পর আবিষ্কার করলেন শেখরদার অবৈধ সম্পর্ক? শেখরদার 'সুরবাহার' ছিলেন নীলাবউদি। বিষ্ণুপুরের শিকড় আছে মার্গসঙ্গীতে। চারশ বছরের ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রাণ হল ধ্রুপদ।
নীলাবউদিকে ভালবেসে তাই বাড়ির নাম 'ধ্রুপদ' রেখেছিলেন শেখরদা।

{২৪}

প্রিয়নাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী পুরুষ, হয়তো পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস তাঁর শিরাধমনীতে বইছে, হঠাৎ করে নিছক বয়সোচিত কারণে তিনি মার্গ বদল করেননি। সংস্কৃত তাঁর অনুরাগের বিষয় হলেও ইতিহাসে অনার্স করেছিলেন। ইংরেজিতে দখল থাকায় চাকরির পরীক্ষায় উতরে গিয়েছিলেন। সংসার আর কাজের চাপে এতদিন অবকাশ পাননি। প্রতিদিন মন দিয়ে খুঁটিয়ে উপনিষদ পড়ছেন এখন। সংস্কৃতটা ভালভাবে জানেন বলে নিছক অনুবাদে পড়েন না, মূল শ্লোকগুলোর নির্যাস নিতে পারছেন। জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত চিরবিদ্যমান আত্মারই জয়গান করা আছে অধিকাংশ শ্লোকে। আত্মা মরে না। তাঁর গ্রামের আত্মা কিন্তু মরে গিয়েছে। গ্রাম মানেই বোকাসোকা সহজসরল মানুষ, এই প্যাটার্ন অনেক দিনই বদলেছে। বিডিও ছিলেন বলেই বুঝেছেন ঘুণ ধরেছে। শুধু রাজনীতির ছোবলেই তার জন্য দায়ী নয়। মানুষের লোভও বেড়েছে। লোভের হাত ধরে আসে হিংসা, কূটকচালি, বিদ্বেষ।
একটি হলুদ বটফল কুড়িয়ে নিলেন প্রিয়নাথ। এই গাছের এখন বার্ধক্য দশা। বটগাছের মৃত্যু হয় না। মহানির্বাণ হয়। বটগাছটিকে কেটে ফেলার তোড়জোড় চলছে শুনেছেন। এই সবুজ পাতায় ছাওয়া গাছের ঝুরিতে ছোটবেলায় দোল খেয়েছেন কতবার। সুধা নামের হাড় জিরজিরে মাঝবয়সি লোক সারাদুপুর ছায়ায় বসে থাকত। বিয়েপাগল ছিল। গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সুযোগ পেলেই খ্যাপাত। মাঝে-মাঝে সে বিড়বিড় করত, “বড় আগুন হে বাপ। শরীরে আগুন নিভবেক নাই। বিয়াটিয়া কেউ দিল নাই। আর থাকতে লারিব।” সুধার বাবা কুষ্ঠরোগে মরেছিলেন। বংশগত রোগ ভেবে সংস্কার ছিল সে যুগে। কে আর তাকে বিয়ে করবে? আধুনিক মানুষও সংস্কারমুক্ত হতে পারল কোথায়? এডস রোগীকে একঘরে করে রাখা হয়, ওয়ার্ডে ভর্তি নিতে চায় না সহজে, কোনও এক হাসপাতালে ডক্টরেরা চিকিৎসা করতে রাজি হননি। স্পর্শেও তাদের আতঙ্ক!
প্রাণের স্পর্শ কেন যে পাচ্ছেন না তিনি! হাঁটতে-হাঁটতে প্রিয়নাথ নদীর পাড়ে চলে এসেছেন। বালিভাসা নদী বদলায়নি। অভিমুখ বদলেছে শুধু। 'মধুবাতা ঋতয়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব'। বাতাসে মধুক্ষরণ হতে থাকল, ত্রিভুবনেশ্বর বহুরূপে প্রকাশিত হলেন। নদীর শরীরে মধুর ধারা মিশে গেল। আজও বহমান ধারায় শান্তসুন্দর এই নদী। আগুনে আকাশে এই মুহূর্তে তার প্রাণবায়ু বিলীন হয়ে যাক, তুচ্ছ দীন এই দেহ তারপর পুড়ে ছাই হলেও ক্ষতি নেই। স্বগত

প্রার্থনার পরই জিব কাটেন প্রিয়নাথ। এই অমল সকালে নিজের মৃত্যুপ্রার্থনা করাও যে অপরাধ! অনেক কাজ বাকি। ফাইনাল ডিল হয়ে গেলেও আইনি পদ্ধতি শুরু হয়নি। পরিবারকে ভাসিয়ে চলে যাওয়ার চিন্তা এই মুহূর্তে ক্ষমাহীন। রিয়েল এস্টেটের ডিলিং জটিল প্যাঁচের খেলা, অনেক ঘোড়েলও মাথা মুড়িয়ে ফেলে, সায়ম-অদিতি পারবে না।

প্রিয়নাথ ফোন টিপলেন। মায়ার রহস্য স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড জানেন না। দার্শনিক চিন্তা ইটকাঠ দলিলে ঢুকে গেল। সব চিহ্নই মিলিয়ে যায়, পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। ঝাপসা মৃত্যুচিন্তাই জীবনের আসল প্রেরণা। কাজ। কর্মময় সময়। মৃত্যু তাঁর কাজ বিচার করবে।

"হ্যালো।"

"কে? দাদুভাই?"

"হ্যাঁ। তুমি কবে ফিরবে?"

"এই তো, আর কটা দিন।"

"তাড়াতাড়ি এসো। বাড়িটা খালি লাগছে।"

শুনে প্রিয়নাথের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। শিলাবতীর শরীরে বারবার অবগাহন করেও এই প্রশান্তি মিলবে না। নিজেকে ধিক্কার দিলেন তিনি। ছি, নিতান্তই স্বার্থপর হয়ে অবিনশ্বর আত্মার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

"যাব। একটা উত্তর চাই। টপ সিক্রেট। কাউকে বলবে না বলো।"

"প্রমিস।"

গোয়েন্দাগিরির লোভ সামলাতে পারলেন না, "বাবা-মা কেমন আছে?"

"ভাল।"

"ঝগড়া করছে?"

"করছিল। খুউব। আজ মর্নিংয়ে আর করছে না।"

"ভাব হয়ে গিয়েছে তাহলে?"

"আই থিঙ্ক সো।"

"স্কুল আছে তোমার?"

"আজ সানডে। তুমি মেমরি লস করছ গ্র্যান্ডপা।"

"সরি। মনে ছিল না। তুমি স্টাডিতে বসেছ?"

"না, ছোটাভীম দেখছি।"

আশ্বস্ত হলেন প্রিয়নাথ। হিমবাহ গলছে। বরফসময় গলে উষ্ণ আলাপে মগ্ন দু'জন। এই সময় রোহন টিভি দেখলে অদিতি চেঁচিয়ে তোলপাড় করে দিত।

"পাপা কী করছে?"

"ফোঁস-ফোঁস করে প্রাণায়াম করছে ওঘরে। আবার গানও বাজছে।"

"আর মা?"

"মা ট্রেনিং নিচ্ছে। বাবা বলল, প্রাণায়াম করলে মন ঠান্ডা হয়। এনার্জি আসে। মা ইন্টারেস্টেড। স্ট্রেঞ্জ নয় গ্র্যান্ডপা?"

"কোনটা?"

"ভুয়েল প্রাণায়াম দেখে হেসে ফেলেছিলাম। তাই দরজা লাগিয়ে দিয়েছে।"

হাসেন প্রিয়নাথ, "তাই তোমার অবাধ স্বাধীনতা। ডিসকভারি চ্যানেল দেখলে হয় না?"

"নো।"

"বেশ, চালিয়ে যাও। গিয়ে তোমাকে আই স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যাব। রেখে দিচ্ছি।"

এখানে এসে শরীরটা একদমই ভাল নেই। প্রতিদিন রাতে জ্বর আসছে। সিজন-চেঞ্জের সময় এমন উপসর্গ অল্পস্বল্প হয় ভেবে গুরুত্ব দেননি প্রিয়নাথ। জ্বর আসাটা ক্রমশ নিয়মিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মাঝেমাঝে শীত-শীত লাগে, উঠে ফ্যান বন্ধ করে দিলেও শীতভাবটা জাঁকিয়ে বসে। মৃদু কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। ভোরের দিকে ছেড়ে যায়। তবু প্রিয়নাথ আর কয়েকটা দিন থেকে যাবেন। ওদের ভাব গাঢ় হোক। আরও সময় অন্তত দেওয়া দরকার। সম্পর্কে চিড় ধরলে তাঁর ছেলেটা যে আজীবন অসুখী রয়ে যাবে।

NET & SET ও GATE পরীক্ষায় সাফল্যের দুনিয়ায় No.1 Institute
Gurukul Edutech
আমি পেরেছি তোমরাও পারবে

Only NSDA Govt of India approved all Subject NET/SET & GATE Training center in Eastern India
• NET/SET Training all Subjects of UGC & CSIR
• Regular Classroom & Postal Training
• GATE Training on all Streams
Facility
• Mock Test series as per Real Life Exam.
• Best Study Mat
• Best Success Record
• Magical Methods
• Best Faculty
Gurukul Edutech (ISO 9001:2008)
Head Office & Training Centre
Kolkata Ph: 8981611881/8420677100/03365550215
www.gurukuledutech.com

Admission Open

কল্পনায় টানো ইতি আমরা দিচ্ছি
সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি
IAO Approved courses
NSDC National Skill Development Corporation
Transforming the skill landscape
Masters In Social Work(MSW)
Masters In Rural Development
Approved by UGC-AICTE HRD, Govt of India & University
• GNM, ANM & B.Sc. Nursing
• International Diploma in Corporate System Management
• International Certificate & Diploma in Hotel Management
• Indian & International Top Company তে চাকরির সুযোগ
• দেশ ও বিদেশে সর্বত্র গ্রহনযোগ্য Govt. এর Certificate
• Best Infra & Faculty
• Best Placement Record
100% সুনিশ্চিত চাকরির সুযোগ
Gurukul Edutech (ISO 9001:2008)
Admission Helpline
03365551200/9804720425
For Opening New learning Center at your town
Call-9804720425/9051352337

{২৫}

দিদিমণি সব দিন ছাড় দেবেন না। বাইকে ঝড় তুলে রমিত নাচের স্কুলে পৌঁছল। ক্লাস শুরু হতে এখনও পনেরো মিনিট বাকি। হাতেগোনা চার-পাঁচজন ছাত্রী সামনের লনে খোলা জায়গায় খেলা করছে।

"বাহ, আজ পারফেক্টলি ড্রেসড। আমার খুঁত ধরার সুযোগই নেই।" ঘাড় ঘুরিয়ে রমিত সুলগ্নাকে দেখতে পেল। কাজের বালাই নেই, দিব্যি সেজেগুজে ফাঁকা ময়দানে হাজির। একমাত্র অভিভাবিকা প্রতিনিধি। আজ শাড়ি পরেছে। আকাশি শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। অন্তর্বাসের হালকা রেখা ফুটে উঠেছে। কড়াইভাজা গরমেও ঠোঁটে খয়েরি লিপস্টিক, কানে আজ অন্য দুল, সাদা স্লিপার। বড়লোকের গর্বিত বউ। সাজগোজের পিছনে সময় দেওয়া মানিয়ে যায়। চোখ সরিয়ে নিল রমিত। রাশিফলে আজ 'গোলমাল' লেখা আছে। বিশ্বাস করে না, খেলার ছলে মাঝেসাঝে মেলায়। চোখ দুটো নির্লজ্জভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে যে! শেষকালে পরস্ত্রীর সৌন্দর্যে চোখ অবাধ্য হতে চাইছে। সর্বনাশ!

"আজ একেবারে বিফোর টাইমে!" সুলগ্না সানগ্লাস খুলে হাসে।

"তুমিও।"

অদ্ভুত গ্রীবাভঙ্গি করে সুলগ্না, "বিদেশে থেকে পাংচুয়ালিটি হ্যাবিট হয়ে গিয়েছে। আমার বর সময়ের হেরফের একেবারে পছন্দ করে না।

সামন্তভিলার প্রস্ফুটিত হলুদ চাঁপা ডাকছে তাকে। প্রজাপতি চঞ্চল সোনাঝরা দিন। পরিশ্রান্ত, দুর্বল শরীরটাকে টেনে-টেনে সে সদর দরজা পেরোয়।

তাছাড়া ঘরে বোর ফিল করছিলাম। জাস্ট দশ মিনিট পরেই আসর জমে যাবে।"

সুখের ঢেকুর তুলতে ব্যস্ত সুলগ্না। দূর, এমন মহিলার রূপটিই প্লাসপয়েন্ট, কোনও গভীরতা নেই। রূপ আছে, অন্তরের শ্রী নেই। খালি নিজেকে জাহির করার চেষ্টা। রমিত চুপ করে যায়। যে-কোনও সৌন্দর্যই দূর থেকে মোহময়ী, কাছে এলে সুর থাকে না, মুগ্ধতা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

সুলগ্না মুখে একটা হাসি ধরে রাখে, "আপনি একটা কাজ করতে পারবেন?"

"কী কাজ?"

পার্স খুলে একশো টাকার নোট বের করে, "আইসক্রিম কিনে এনে দেবেন কাইন্ডলি?"

কেজো গলায় রমিত বলল, 'আচ্ছা, এনে দিচ্ছি। টাকা দিতে হবে না।"

"সরি। আমি ওদের খাওয়াচ্ছি। নো ফর্ম্যালিটি প্লিঙ্গ। আপনি খাবেন তো?"

"না।"

ঠোঁটে হাসি ভাসল, "বুঝেছি, বাধো-বাধো ঠেকছে। যাকগে, দুটো আনবেন। ভ্যানিলা। আমি আইসক্রিম খাই না। ফ্যাট জমবে। বাচ্চা দুটোর জন্য একটু কষ্ট করুন।"

বাধ্য হয়ে রমিত ছোটে। নির্মেদ রাখার জন্য আইসক্রিমও বাদ। আচ্ছাসে ডায়েটিং করেন হয়তো। ছিপছিপে চেহারা ধরে রাখাটাও সাধনা। কী আর করবেন। মহিলা রূপটানেও নিশ্চয় ভালই সময় দেন। হাইফাই বরের অঢেল টাকা। কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। নির্দেশের সুরে বলেননি। মিষ্টি অনুরোধ রাখতেই হয়।

আইসক্রিম কিনে ফিরে এল রমিত। নাচের স্কুলের খোলা চত্বর সরগরম। মেয়ে দুটো তার অপেক্ষাতেই ছিল। সুলগ্নাকে চোখে পড়ল না। টাকাটা ফেরত দিতে হবে।

"আন্টি কোথায়?"

"দিদিমণির কাছে।"

"টাকাটা দিয়ে এসো।"

বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নাড়ে মেঘা। একছুটে সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। রমিত আর অপেক্ষা করল না। কতক্ষণ আর এই অসহ্য রোদে ইতস্তত ঘুরে বেড়াবে! রোববার বলে একটা চা দোকান অব্দি খোলা নেই। দুপুর সাড়ে-তিনটের সময় তার মতো নেশাখু ছাড়া কে আর চা চাইবে?

তৃষ্ণার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। নাক, কান দিয়ে আগুনের হলকা বেরচ্ছে। দেড়ঘন্টা অনেক সময়। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিলেই মঙ্গল। বাইক চালিয়ে দ্রুত পৌঁছয় রমিত। তালা খোলে। ফুলস্পিডে ফ্যান চালিয়ে দিল। শার্টটা খুলে চেয়ারে রাখে। আবার কে প্যান্ট ছাড়ে!

সামন্তভিলার প্রস্ফুটিত হলুদ চাঁপা ডাকছে তাকে। প্রজাপতি চঞ্চল সোনাঝরা দিন। পরিশ্রান্ত, দুর্বল শরীরটাকে টেনে-টেনে সে সদর দরজা পেরোয়। শান্ত আনন্দের গ্রিলবারান্দায় পা দিলেই সমস্ত ক্লান্তি শেষ। তার পরম আশ্রয় ছেড়ে কেন সে নেশাগ্রস্তের মতো সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছিল।

আশ্চর্য, হলুদ আলোর চাঁপাগাছটির নীচেই মেঘা বসেছিল। মেঘা যেন গাছ হয়ে গেল জাদুকাঠির স্পর্শে। একটি মায়াপোশাক যত্ন করে পরিয়ে দিল মেঘা, তার নিষ্পাপ ব্যথাতুর চোখ শুধু বলে উঠল, কোথায় গিয়েছিলে? আর কখনও যাবে না।' মেঘার চোখের কোণে একফোঁটা জল। হঠাৎ তুমুল শব্দ হয় কানের কাছে।

ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠে রমিত। মোবাইল ফোন মুখরিত হচ্ছে। ধরার আগেই থেমে গেল ফোন। আচ্ছন্ন চোখে দেখে সে। অচেনা নম্বর। চারবার মিস্‌ড কল! কার এত জরুরি দরকার পড়ল তার কাছে? মোবাইল স্ক্রিনে সময় দেখেই সে চমকে ওঠে। সাতটা বত্রিশ বাজে! এতক্ষণ সে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত দৃশ্য মিছিল করে স্বপ্নে আসছিল। ইস, কেন যে অ্যালার্ম দিয়ে রাখেনি! রোববার মেঘার নাচের ক্লাস সাতটায় শেষ হয়ে যায়। শার্ট গলিয়ে নিল রমিত। বাইকের চাবি খুঁজে পেল না। বালিশ উলটে, ড্রয়ার টেনে, জানলার পাশে হাত চালিয়েও চাবি আর পাওয়া যায় না। বাইরে বেরিয়ে আসে। এক খেয়ালে চাবি বাইকেই রয়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস, কেউ নিয়ে চলে যায়নি সুযোগ বুঝে। তাহলে মুশকিলে পড়ে যেত সে। বাইক ঠেলে বেরনোর পর ফোন করল সে।

"হ্যালো!"

"কে বলছেন?"

"সুলগ্না। অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে ওদের। আপনি কোথায়?"

"এখনই যাচ্ছি," কুণ্ঠিতভাবে বলল রমিত।

"হ্যাঁ, আসুন। সাবধানে আসবেন। চিন্তা নেই। মেঘা আমার কাছেই আছে। আপনি না আসা পর্যন্ত ওয়েট করছি।"

সুলগ্না নির্ঘাত তাকে ইরেসপনসিবল্ ভাবছে। ভাবা স্বাভাবিক। নাচের স্কুলে ভিড় থাকে, অনেক মেয়ে শেখে, তবু বিপদ আসতে কতক্ষণ! ধূর্ত শেয়ালদের নজর ঠিক পড়ে যায়। বাইক সে ধীরেসুস্থেই চালাচ্ছিল। ঘুমের রেশ এখনও শরীরে আছে। তাড়াহুড়োয় বিপদ ডেকে আনতে চায় না সে।

মেঘার ডাক শুনতে পায় রমিত, "বাবা, আমি এখানে।"

মেন গেটের ডানদিকে মুখ ঘোরাল রমিত। সুলগ্না পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।
"সরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"
"সরিটরি বলতে হবে না। এই রোদে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাহিল হয়ে পড়েছেন। মেঘাই বলছিল আপনি নাকি কোথাও গিয়েছিলেন। ওর মুখ থেকেই শুনলাম। আরও অনেক কিছু জানলাম," সুলগ্না হাসে। আরও কী বলেছে মেঘা? চিন্তিতমুখে ফেরার সময় রমিত জানতে চাইল।
"কেন বলব?" মেঘার চোখে দুষ্টুমি।
"গাট্টা মারব। আন্টিকে কী বলেছ লুকিয়ে রাখবে? কঠিন বশ করেছে দেখছি।"
"এখন ঘরভাড়া নিয়ে থাকি। তুমি যে আর ওখানে নেই তা জানিয়েছি। এত দেরি করছিলে আসতে। আন্টি একটানা গল্প করেই যাচ্ছিল। আসল কথা বলিনি," মেঘার গলা বেশ ভারিক্কি শোনাল। স্বস্তি পেল রমিত। ক্লোজ-সার্কিটের লোকজন ছাড়া কেউ মেঘার আসল পরিচয় জানে না। সবাই জানে মা-মরা মেয়ে। বাবা দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেনি। গায়ে পড়ে মেঘা তার দত্তক নেওয়া মেয়ে এই সত্যিটা বলার দরকার নেই। মেঘার মনে চাপ পড়বে। একটা বয়সের পর মেঘা নিজেই মুখ ফুটে সদর্পে বলবে।
"আচ্ছা আন্টিকে গুলবাহার বলে কেন?"
"আবার সেই একই প্রশ্ন!"
"না, একজনের মা বলল যে!"
"কী বলল?"
"আন্টির সঙ্গে একজনের ঝগড়া হয়েছিল যে! রেগেমেগে সে বাকিদের বলছিল, ওই গুলবাহারটা কী ভাবে নিজেকে?"
"ওসবে কান দেবে না। আন্টিদের আজ ঝগড়া, কাল ভাব," রমিত বোঝায়। তবে সুলগ্নাকে খারাপ ভাবতে ইচ্ছে করছে না। আর কেউ তো নাচের স্কুলে মেঘাকে এইভাবে আগলে রাখত না! কী দায় পড়েছিল তার?

মেঘার খিদে পেয়েছে। 'মিত্র ভোজনালয়'-এর সামনে থামল রনিত। গুণগত মান তেমন নয়, তবে খাওয়া যায়। মেঘা মোগলাই পরোটা পেলে দারুণ খুশি হয়। দু'খানা মোগলাই পরোটা অর্ডার দিয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। সিগারেট ধরানোর জন্য মন উশখুশ করছিল। বাতাসে উড়ে যাওয়া আত্মঘাতী ধোঁয়া অস্পষ্ট রহস্যের আবরণে ঘুরপাক খাচ্ছে...

{২৬}

টিভিতে সাতসকালেই দেখাচ্ছিল তার আগমনের খবর। বর্ষা আসছে। মৌসুমি বায়ু উদাসীনতা ঝেড়ে ফেলে দক্ষিণবঙ্গে পৌঁছে গিয়েছে। বেলার দিকে আকাশ ঘন হয়ে এসেছিল। মেঘেরা থমকে ছিল অনেকক্ষণ। পুণ্যতোয়া মেঘ কিছুক্ষণ বোধ হয় বিশ্রাম নিয়ে তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর খোঁজ নিল। ধুলোমলিন গাছের পাতায় প্রতীক্ষার মৌন আর্তি, শুকনো বিবর্ণ রাস্তার কান্না দেখে সে বিশ্রামে ক্ষান্তি দিল। প্রথম বৃষ্টির উল্কি ফোঁটা মাটি ভেজাল। লোকজনকে বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার জন্যই বিরতি দিল কিছুক্ষণ। বিকেলের মুখে দিকদিগন্ত মুখর করে বৃষ্টি নামে। আকাশ থেকে নামে অবিরাম আনন্দধারা, স্নান করিয়ে দেয় রিক্ত গাছপালার শরীর, শূন্যতা ভেঙে বৃষ্টিফোঁটায় জাগে শহর। রোহনকে নিয়ে অদিতি সুইমিং ক্লাসে গিয়েছে। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে সে ভেজা জামাকাপড় খুলে রাখল। মাথা মুছে নিল। ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছে দমিয়ে রেখে চিলেকোঠায় চেয়ার পেতে বসল। আজ রোহন সাঁতার কেটে আনন্দে ডগমগ হবে। বৃষ্টিধারায় পুলের জলে হুটোপুটি করার মজাই আলাদা। রমিতটা কী করছে কে জানে! স্কুল ছুটি পড়েছিল গরমের কারণে, বৃষ্টি তার বাড়তি পাওনা। এই বাড়িতে এই শেষ বর্ষা, কোনও ভাড়াবাড়ির প্রকোষ্ঠে হয়তো পরের বর্ষা কাটবে। নতুন ফ্ল্যাট কত দিনে তৈরি হবে ঠিক নেই। জীর্ণ দেওয়াল, খসে পড়া পলেস্তারা, শ্যাওলানীল অন্ধকার।

বাড়িটির কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। প্রথমটায় বিরূপতা জেগেছিল, রাগ হয়েছিল খুব, এই বাড়ির মায়া সে ছাড়তে রাজি ছিল না। নতুন অ্যাপার্টমেন্টের শরীর এই মাটির উপরেই নির্মিত হবে। শিরাধমনীতে একই মাটির গন্ধ থেকে যাবে। স্বপ্নে আবার মা এসেছিল গতকাল ভোরে, মঙ্গলঘটে পঞ্চপল্লব সাজিয়ে দিচ্ছিল, হাতছানি দিয়ে ডাকছিল নতুন বহুতলে। সায়মের মনে তাই আর দোলাচল নেই। কত পরিবার মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে অ্যাপার্টমেন্টে, নতুন মানুষ ও কলরব, সব মিলিয়ে খারাপ লাগবে না।

বৃষ্টিফোঁটায় রক্তের মধ্যে নেশাটা ফিরে এলো। এমন বিরল মুহূর্ত তাকে কাগজের দিকে টানছে। প্রথম বৃষ্টির এই মধুর উৎসব, এই আকাশময় বৃষ্টিধোয়া গাছেদের সৌন্দর্য, এই মৃদঙ্গে মুখরিত আকাশ, তার এলোচুল অন্ধকারের গোপন আলো স্বরলিপি হবে না কেন? চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও বসে পড়ল সায়ম। বৃষ্টি নিয়ে অনেক গান লেখা হয়েছে, সাধারণ কালজয়ী তাদের কথা ও সুর, সে শিক্ষানবিশ, ছাপিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত তার একটি গানও কেউ গ্রহণ করেনি। পাগলামোতে এবার ইতি টানবে সে। ঘরটা বড় ফাঁকা লাগছে। স্তব্ধ নির্জনতা নষ্ট করে দিচ্ছে মন। কারও অনুপস্থিতি আজ ভীষণ টের পেল সায়ম। সে নম্বর টিপল।

কেউ ধরছে না। আবার চেষ্টা করল সায়ম। প্রিয়নাথ ধরেছেন এবার। বৃষ্টির খবর নিলেন। সেখানেও তুমুল বৃষ্টি চলছে। টিনের চালে বৃষ্টির টুংটাং ধারাপাত শুনে তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। বর্ণময় স্মৃতির দু'-তিনটি অনুভূতি বললেন। এই মানুষটিকে আজ অপরিচিত লাগছে। সায়ম বলতে চাইল, বাবা ফিরে এসো। তুমি ছাড়া ঘর কেমন যেন শূন্য।

প্রিয়নাথ বললেন, "ঘরে একা?"

"হ্যাঁ।"

"ওরা কোথায়?"

"সাঁতারে গিয়েছে। তোমার শরীর ভাল আছে?"

"আছে। তোমাদের মিলমিশ হয়েছে?"

আচমকা এমন প্রশ্নে থমকে যায় সায়ম। প্রিয়নাথ উপদেশের সুরে বললেন, "করে নাও। অদিতি অন্যরকম। ওর মানসিক গড়নে কাঠিন্য আছে। স্বাভাবিক। স্ট্রাগল করেছে। স্ট্রাগলারদের বাইরেটা কঠিন হয়। বদলে দিতে পার একমাত্র তুমি। আমি চিরকাল ওকে সাপোর্ট করেছি। ওর ছায়া দরকার ছিল। তুমি সমঝদার জানি। তবে আত্মমগ্ন হয়ে থাকলে তো জীবন চলে না। তোমাদের গরমিল আমাকে কষ্ট দিয়েছে। অদিতি নিজস্ব আইডেন্টিটি চায়। বোঝার চেষ্টা করবে।"

"তুমি কবে আসছ?"

"আর তোমাদের ছেড়ে থাকতে মন চাইছে না।"

"কাল গাড়ি পাঠিয়ে দেব?"

"না। আর দু'দিন থাকি।"

নীচে নেমে দুধ গরম করে কর্নফ্লেকস ভেজাল সায়ম। বৃষ্টি থেমে আসছে। নারকেলের চিরল পাতা বেয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়ে। পাতাবাহার গাছটি রঙিন গর্বে জেগে উঠেছে এখন। কর্নফ্লেকস শেষ করে সায়ম কিছুক্ষণ টেবিলে মোহাচ্ছন্নের মতো বসে থাকল। কাজের ধকল গিয়েছে খুব, কাউন্টারে মুখ তোলার অবকাশ পায়নি, তবু শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রাণোচ্ছ্বাসে স্পন্দিত হচ্ছে। আকাশের কারনিসে মনভোলানো রূপটান। প্রণত আকাশের মাধুরী দেখতে-দেখতে শব্দের দ্যোতনায় ভেসে গেল সে। দশদিন পর আবার ডায়েরি খুলে বসে সায়ম। বেশি ভাবল না। গান নয়, কবিতা লেখার চেষ্টা করল সে-

বৃষ্টিবেলা শেষ
অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে গান
চৌকাঠে স্বপ্নভেজা বিকেল
চুপিচুপি তুলে রাখে হারানো দিনের অন্তরা
মনখারাপ পিয়ানো বাজে, দূরে কাছে, অলিন্দ-নিলয়ে
দূরগামী চিবুকতিল ভুলে
ঘুমের চৌরাস্তায় বাঁক নিল বাঁচার আদর
আচ্ছন্ন বিকেলের ছায়া জন্মান্তর কাহিনির হাত ধরে
নদীর কাছে নিয়ে যায়

জলের কাছে, সুন্দরের কাছে ঋণী আজ হিরণ্ময় নীরবতা
মুহূর্তের অন্তরাগে জাগে ঘুমন্ত গান, রূপরাঙা তার আবাহন...

'গান' শব্দটা হঠাৎ এরোপ্লেনের প্রপেলার হয়ে বেগে ঘুরতে থাকে। কী আশ্চর্য, শেখরদার কথা সে-ই ভুলেই গিয়েছিল। প্রতি ঘন্টায় মানুষের মন নতুন কোনও আশ্রয় চায়। এত উদ্বেগ, এত আশঙ্কা সমস্ত কিছু মন থেকে চলে গিয়েছিল তার! নাগাড়ে চেষ্টা করেও সে শেখরদাকে পেল না। নট রিচেবল। নীলাবউদির ফোন সুইচড অফ। মৌতাতে কেটে গেল সন্ধে। কফি আর পকোড়া বানায় অদিতি। রোহন দুলে-দুলে পড়া মুখস্থ করে। পনেরো-কুড়ি মিনিট বাদে-বাদে পড়া থামিয়ে রাজ্যের গল্প শোনায়। রান্নাঘরে ঢুকে বয়াম খুলে চানাচুরে মুখ দেয়। টিভি চালিয়ে নিউজচ্যানেল দেখে সায়ম। অদিতি তার কলেজের গল্প বলে। গল্পের সুর লাস্যময়। ফুলটাইম অধ্যাপক অন্য কলেজে চলে গিয়েছেন। পরের সপ্তাহ থেকে সিনিয়রিটির বিচারে ডিপার্টমেন্টাল হেড হয়ে যাবে। কী অবস্থা, কলেজগুলো পার্ট-টাইমার দিয়েই চলে যাচ্ছে, নিজেকে হেড অব দা ডিপার্টমেন্ট ভাবতে লজ্জা পাচ্ছে তার। অদিতির কমলা ঠোঁটে, চোখের তারায় লাবণ্যের স্রোত। অবাক কথা, অদিতি যেন ভুলে গিয়েছে। শেখরদার প্রসঙ্গ তুলল না একবারও। বলেই ফেলল সায়ম, "নীলাবউদিকে ফোনটোন করেছিলেন নাকি?"

"না।"

"আমি করেছিলাম। প্রায় ঝগড়া হয়ে গেল বলতে পার।"

অদিতি বলল, "তোমার কম্পাস শেখরদার দিকেই হেলে থাকে। পুরুষমানুষ। নীলাবউদির যন্ত্রণা কীভাবে আর বুঝবে! তবে শেখরদা ফিরে আসবেন।"

"কোন কনফিডেন্সে বলছ?"

"শেখরদা বউদিকে অসম্ভব ভালবাসেন। মেয়েদের সিক্সথ সেন্স বলে একটা কথা আছে। অমন ভালবাসার জোর তোমারও নেই।"

অদিতির বিশ্বাস মিলে গেলে সে খুশি হবে। মিলনান্ত নীল তো সবাই চায়। ধারালো বাক্যবাণ ছোড়ার অভ্যেস অদিতির থেকেই গেল। ধাক্কা খায় সায়ম, সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে দিতে পারে না নিজেকে।

অদিতি কবে যে তার আশ্রয় হতে পারবে...

{২৭}

ঝরানো পাতার মতো অসংখ্য চিঠি স্তূপ হয়ে আছে ব্যাগের অন্ধকারে। হলুদ ছোপ পড়েছে, লেখাগুলো অস্পষ্ট, ধূসর অতীতের প্রত্নলিপি মনে হয়, পড়া যায় না। তাদের সময়ে ভালবাসা নিবেদনের মাধ্যম ছিল অক্ষর। নীল, বেগুনি, লাল অক্ষরের বর্ণমালায় কতজন তার স্তুতি করেছিল, হৃদয় উজাড় করা উচ্ছ্বাসে ঘনিষ্ঠতার আকুতি জানিয়েছিল, সে অবহেলায় পড়ে রেখে দিয়েছে। মনে-মনে করুণা এবং দুঃখ হত বোকা ছেলেগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে। সে হেঁটে গেলে অন্ধকার রাস্তাও রূপে আলোকিত হয়ে যেত। ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড, নাচে চৌকস, লেখাপড়ায় মন্দ নয়, ভাষার উপর তার দখল দুর্দান্ত, সাবলীল ইংরেজি বলতে পারে, বাংলা আবৃত্তিতেও সে শ্রোতাদের মোহিত করে দিত। কোনও ফাঁদে পা দিতে রাজি ছিল না। তাকে নিয়ে বাবা-মা দুজনেরই অশেষ স্বপ্ন, গর্ব এবং উচ্চাশা। যৌবন জলতরঙ্গ বেজে উঠত মাঝেমাঝে। লেবুরঙা বিকেলে কোনও মুগ্ধ সহপাঠীর হাত ধরে হাঁটার ইচ্ছে হয়তো হত। সুলগ্নার চোখে সে তখন পাইনের ছায়াপথ, রডোডেনড্রনের সারি, সবুজ গালিচা! স্বপ্নের মানুষটি বিদেশে তার পাশে বসে লং-ড্রাইভে যাবে। হিমসন্ধ্যায়

তুষারকুচি ঢেকে ফেলবে তার কোট। এমন সুখের স্পর্শ পেতে হলে অবিচল থাকতে হয়। বয়সের ভুল থেকে শতহাত দূরে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সে।

স্বপ্ন মিলেও গেল। সুখী চিত্রনাট্যের মতো জীবন। সুইট্জারল্যান্ডে হনিমুন। সিনেমায় যেমন হয়। প্রথমে আটলান্টা, তারপর নিউজার্সি। ফুটফুটে দিয়া। উইক এন্ডে লং ড্রাইভ! নাচের স্কুলও খুলেছিল। প্রবাসী ভারতীয়রা খুদেদের নাচে তালিম নিতে পাঠাত। সফল, প্রতিষ্ঠিত বর। নিজেও স্বাবলম্বী। জীবনটাকে রিল লাইফের মতোই সত্যি ভেবেছিল। কখনও ভাবেনি সিনেমার চিত্রনাট্যেও মোচড় থাকে। নীলনয়না ক্যাথরিন সব খানখান করে দিল। ক্যাথরিনের দোষ বলা ভুল, সেই মানুষটিরই যে সাজানো বাগানে মন ভরল না। কেঁদেকেটে ঝগড়া করেও নিরস্ত করা গেল না। কঠিন হতে শিখল সুলগ্না। এখনও তার রূপেগুণে কত পুরুষ তৃষিত হয়ে যায় আর সে করুণার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকবে এইভাবে! ডিভোর্সের মামলা করল নিজে। সেই মানুষটি আপত্তি তোলেনি, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ছাড়পত্র পেতে চায় তাড়াতাড়ি। ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকার অঙ্কটা এদেশের বিচারে ঈর্ষণীয়। বাবা-মা ছলোছলো চোখে মেনে নিল। প্রথমটায় আপত্তি করেছিল, 'মানিয়ে নে, ধৈর্য ধর। দু'দিন পরেই মোহভঙ্গ হবে। আবার সুখের কুঞ্জবনে বসে থাকবি। জেদ করতে নেই।' বেশি ঘ্যানঘ্যান করলে এখানেও থাকবে না সে। দিয়াকে নিয়ে আলাদা বাসায় থাকবে। কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনে নেবে। বিদেশে সিঙ্গল মাদারের ভুরি-ভুরি উদাহরণ দেখেছে সে। কারও প্রত্যাশী না হয়ে দিয়াকে বড় করে তোলার মতো মানসিক জোর তার আছে। বাবা-মা দু'জনেরই দীর্ঘশ্বাস, সজল চাহনি বন্ধ হল প্রচ্ছন্ন হুমকির পর। গতকাল লোকটা ফোন করেছিল। দেশে দশদিনের জন্য আসছে। মা অসুস্থ। একটিবার দিয়াকে দেখতে ইচ্ছে করছে। সটান না বলে দিয়েছে সুলগ্না। দিয়ার জীবনে আপাতত মানুষটার ছায়া পড়তে দেবে না সে। আঠারো পেরোলে আইনত বাধা সে দিতে পারবে না। ওই বয়সে জোর খাটাবেই বা কেন?

চিঠিগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছিল কেন এখন বুঝতে পারে। ওগুলো অহঙ্কারের চিহ্ন, গরিমার ক্ষীয়মাণ আভা। অতীত মানেই দুঃস্বপ্ন আর ভস্মাবশেষ, রঙিন সুষমা বলতে তো ওই আবেগের তরঙ্গমালা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝাপসা হলুদ অন্ধকারে অসহায়। ছাদের এককোণে রাখল সুলগ্না, ঠোঁট কামড়ে ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল, কেরোসিন ছিটিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ফেলে দিল। দিয়া বড় হচ্ছে। সাবধানের মার নেই। রেখেই আর কী হবে?

আগুনের তীব্র, ক্ষণস্থায়ী শিখা কাঁপছিল তার মুখে। অহঙ্কারের শেষ আভরণও পুড়িয়ে দিল সে। নির্ভার লাগছে নিজেকে। যেন অগ্নিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে তার শরীর। নাচের মুদ্রায় দুই হাত জড়ো করে দাঁড়ায় সুলগ্না। হাত আলগা করে দিল। ছাদে এই প্রস্ফুটিত নক্ষত্রলোকের নীচে ছন্দের দ্যোতনায়, স্বাধীনতার একমুঠো আকাশ আঙুলের ডগায় রেখে পা ফেলার তীব্র ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রাখল। যে কেউ দেখে ফেলতে পারে।

মোবাইল বেজে উঠল। প্লাস্টিকের চেয়ারে পড়ে থাকা ফোনটির দিকে তাকিয়ে আপনমনে হাসল সুলগ্না। একটি বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সে পড়ায়। দেবায়ন তার কলিগ। প্রায়ই ফোন করে। এখনই শুরু হবে তার স্তুতি, মুগ্ধতার উচ্চারণ। আটত্রিশ বছরের দেবায়ন বউ-বাচ্চা-সংসার নিয়ে দিব্যি খুশি। তবু সে ফোন করবে। ফ্লার্ট করায় ওস্তাদ।

"হ্যালো বলুন।"

"আহা, জলতরঙ্গ বেজে উঠল এইমাত্র। আপনি কী করছিলেন?"

"নাচের স্কুল খুলব যে! তার প্ল্যানিং, হিসেব করছিলাম।"

"আপনার মতো মেয়েরা, সরি নারীরা কেমন কেজো হয়ে যাচ্ছে। এই সুন্দর রাতে ঘুমিয়ে পড়া শহর দেখুন। না পারলে কারও আলিঙ্গনে থেকে গুনগুন করে উঠুন।"

সুলগ্না কঠিন গলায় বলে, "আমি বিবাহিতা। মাইন্ড ইট।"

"ম্যারেড হলে কি রোমান্টিকতায় ১৪৪ ধারা জারি হয়ে যায়?"

"আপনার বউ কী করছে?"

"কেন বলুন তো?" দেবায়ন হোঁচট খায়।

"এই যে পরস্ত্রীর সঙ্গে ফ্লার্ট করছেন, রোমান্টিকতার এ টু জেড শেখাতে চাইছেন, আপনার বউ জানে?"

"ও হো! এর মধ্যে আবার বউ নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? সারাদিনের পর আপনার সঙ্গে দুটো কথা বললে মনটা ঝরঝরে হয়ে যায়। সুন্দরের জয়গান গাওয়া কেন খারাপ হবে ম্যাডাম?"

সুলগ্না মিষ্টি হেসে বলে, "আমি আপনার রিলিফ! বুঝলাম। স্কুলে দেখা হয়, কথাও হয়, তখন ভাল লাগে না। ফোনটা রাখুন। আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"ঘুমোবেন তো একা। শরীরে ফুল ফোটে না? কীভাবে যে ঘুম আসে আপনার! বর বিদেশে। ফুল ফুটবে না, ঝিমিয়ে পড়বে।"

"শাট আপ। আপনি লিমিট ক্রস করছেন।"

"রেগে যাচ্ছেন? তাহলে রেখে দিচ্ছি। গুড নাইট।"

সুলগ্না মনে-মনে বলল, 'নির্লজ্জ! শুধু কথার মালাই সাজাতে পারে। বউকে লুকিয়ে ফোন করছিল।' ফ্লার্ট করতে-করতে লক্ষ্মণরেখা পেরিয়ে যায় অনেক সময়। আগের সপ্তাহে একসঙ্গে সিনেমা যাওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। হলের অন্ধকারে ঘনিষ্ঠ হবে, সুযোগ খুঁজবে। সুলগ্না রিনরিনে হাসিতে বলেছিল, "এইসব শ্যাবি হলে ফিল্ম দেখা পোষাবে না। একটানা সবে থাকার ধৈর্য নেই। ভাল সিনেমা বলছেন যখন বউদিকে নিয়ে যান।"

খরগলায় দেবায়নকে ইচ্ছে করলেই দাবড়ে দিতে পারত। অপ্রিয় ব্যবহার সে করতে চায় না। সহকর্মী, গুণমুগ্ধ পুরুষ, আপদে-বিপদে-দরকারে পাশে থাকে। নাচের স্কুল খোলার জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিল। দেবায়ন দৌড়ঝাঁপ করে তিন-চারটের সন্ধান এনে দিয়েছে। শুভশ্রী অ্যাপার্টমেন্টে কমিউনিটি হল আছে, দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে বেশি নয়, ভাড়া রিজনেবল, ওটাই প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে রেখেছে। যাবতীয় আয়োজন স্বেচ্ছায় দেবায়ন করে দেবে। একটিবার মুখে বললেই হল। সুলগ্না অতীতের পরিচয়টাকে ঢাল হিসেবে রেখে দিয়েছে। খুব কাজে দেয়। ডিভোর্সি মহিলা, বয়স সহজে বোঝা যায় না, সত্যটা জেনে ফেললে হাজার রকম প্রলোভন আর উৎপাতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। বানিয়ে-বানিয়ে সে বলে, গল্পের জাল বোনে, প্যারিসে প্রজেক্টে ব্যস্ত বর, ফোন করে ঘনঘন, দিয়ার জন্য দামি-দামি চকোলেট, তার জন্য দুর্লভ ব্র্যান্ডের পারফিউম, বরটা ভীষণ কষ্ট পায় ছেড়ে থাকতে ইত্যাদি-ইত্যাদি। দিয়ার দুঃখও তো কম নয়, আর পাঁচটা মেয়ের মতো বাবার স্নেহ-ভালবাসা পায় না মেয়েটা, ছোট্ট পরি বরং তার চেয়েও বেশি বঞ্চিত।

মেঘার সঙ্গে তার মেয়ের মিল খুঁজে পেয়েছিল সে। একটি মেয়ের জীবনে মা যে কতখানি অবলম্বন তা বুঝলই না বেচারি। মায়ের কোনও বিকল্প হয় না। মেঘাকে জন্ম দিয়ে নার্সিংহোমেই মারা গিয়েছিল তার মা। এমনটাই সে শুনেছে। পৃথিবীর আলো দেখার পর থেকেই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত মেয়েটা। দেখলেই ভারী মায়া হয়। আস্তে-আস্তে পরম মমতায় সে জড়িয়ে গিয়েছে। মেঘার বাবা ছটফটে মানুষ, সম্ভবত মেঘার কথা ভেবেই আর বিয়ে করেননি, পুরুষমানুষরা সচরাচর এমন হয় না। পাশের বাড়ির ভদ্রলোককে তো দেখল। স্বামী-স্ত্রীতে প্রবল ভাব, একে অপরকে সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকে, আদর্শ দম্পতি ভাবত সুলগ্না। হাইরোডে পিছন থেকে ট্রাক ধাক্কা মারল। বউটিকে দু'দিন আই সি ইউ-তে রেখেও বাঁচানো গেল না। ওমা, বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই ভদ্রলোক আবার বিয়ে করলেন, নতুন বউকে নিয়ে আদিখ্যেতার শেষ নেই, বড় ছেলে মাধ্যমিক দিয়েছে, মেয়েটা দিয়ার ক্লাসে পড়ে। বাচ্চা মানুষ করার অজুহাত বা বাধ্যবাধকতা তো ছিল না। এই সেদিন হাতে হাত জড়িয়ে হাঁটছিলেন ভদ্রলোক। বেহায়াটার মাথায় ফুটন্ত তেলভর্তি ফ্রাইংপ্যান দিয়ে ঘা মারতে পারলে জ্বালা জুড়োত। দু'নম্বর বউকে আদর করবে, অবহেলায় রাখবে না, সেটা

স্বাভাবিক। তা বলে পাবলিকলি ভাবের আতিশয্য দেখাতে হবে! রোববার মেঘা বাবার দেরি দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিল। চোখের কোণে জল, মুখে বিষাদের ছায়া। বাচ্চা মেয়ে, বুকের ভিতর অত কষ্ট ধরে রাখতে পারছিল না। বাবা 'সামন্তভিলা' ছেড়ে দিয়েছে। জেঠুরা পৃথক হয়ে গিয়েছে। বাবাকে একটা রুম দিয়েছিল। রেগেমেগে বাবা বুদ্ধনগরে ঘরভাড়া নিয়েছে। বাবা আর আগের মতো হাসিখুশি নেই, তার একা ভাল লাগে না, দাদা-দিদি-জেঠু-জেঠিমাদের খুব মিস করে। বাবার তো মন খারাপ, কখন কী করবে ঠিক নেই। মানুষ চেনার ক্ষমতা সুলগ্নার আগে ছিল না। বিপর্যয় সম্ভবত তার ফেসরিডিং শক্তিটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে পুরুষমানুষের চোখ এবং দৃষ্টি সম্বন্ধে সে খুব সচেতন। রমিতবাবু অন্যরকম, একই সঙ্গে উদাসীনতা আর রূপমুগ্ধতা কাজ করে তাঁর উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখে, মানুষটিকে বোঝা মুশকিল।

রাত গভীর হয়ে আসছে। আলোর বৃত্ত আস্তে-আস্তে নিভিয়ে দিচ্ছে শহর। নিস্তরঙ্গ রাতকে ঝাঁকুনি দিয়ে ভেসে উঠছে কারও মুখ। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে সুলগ্না। শরীরে কোটাল ডাকে। সবটাই শরীর। ঘুমের ট্যাবলেট নিল সুলগ্না। করুণাঘন ঘুম ভুলিয়ে দেবে সমস্ত টানাপোড়েন।

{২৮}

অদিতির এলেম আছে বলতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা থাকবে, দেখভাল করবে, এমন একজনের খোঁজে হন্যে হয়ে এই ক'দিন ঘুরেছে রমিত। অদিতি জানিয়েছিল দায়িত্বটা তার, সে জোগাড় করে দেবে। শুক্রবার পুতুলকে নিয়ে হাজির হল অদিতি। লাবণ্যহীন দোহারা চেহারা, মাঝারি উচ্চতা, মুখে কথার খই ফুটছে। অল্পসময়েই সে সমস্ত কাজ বুঝে নিল। আগামী কাল থেকে থাকবে। রান্নাবান্নাও করবে। সন্ধে সাতটায় ডিউটি শেষ করে অটোতে করে বাড়ি ফিরবে।

বাড়ি বলতে বাপের বাড়ি, কামারপাড়ার বস্তিতে বাবা-মা-ভাই থাকে। বিয়ের দু'বছর পরেই বর অন্য একজনকে ঘরে এনে তুলেছিল। পুতুলের ঠাঁই আবার বাপের বাড়িতেই হল। গরিব, অসহায় মেয়েরা আইন বোঝে না, আইনি রক্ষাকবচ তাদের জীবনে অধরা। ধন্য এই অসহায় মেয়েদের সংস্কার। বর তাড়িয়ে দিয়ে আবার বিয়ে করেছে। হাতে শাঁখাপলা, কপালে সিঁদুরের টিপ, পতিদেবতার আয়ুরেখা দীর্ঘ করার ব্যাখ্যাহীন সংস্কার। অনর্গল বকে যাচ্ছিল পুতুল। অদিতি থামিয়ে দিল, "কাজকর্ম কী করতে হবে বুঝে নিলে?"

"হ্যাঁ।"

"গড়বড় যেন না হয়।"

"না গো দিদি, কুনো অভিযোগ করার পথ রাখবনি।"

অদিতি বলল, "শুরুতে কাজে ঢোকার সময় অমন কথা সবাই বলে। বাবু একা, মেয়েটাকে চোখে-চোখে রাখবে। রান্না যেন মুখে দেয়া যায়। মাইনে যা চেয়েছ তাই পাবে। কাজে ফাঁকি দিলে কিন্তু তোমার ছুটি হয়ে যাবে। আরও চার-পাঁচজনকে পেয়েছিলাম, এখানে কাজে ঢোকার জন্য মুখিয়ে ছিল, তোমাকে পছন্দ হয়েছে বলে রাখছি।"

জিব কাটে পুতুল, "তুমি পছন্দ করেছ। ফাঁকিটাকি দিতে শিখিনি গো। দেখে নিবে।"

"ওই কথাই রইল। কাল সকাল সাড়ে ছ'টায় চলে আসবে। সাড়ে চারহাজার পাবে। তোমার অটোতে যাওয়া-আসার খরচা ধরেই মাইনে করে দিলাম। দশটা টাকা রাখো, অটোভাড়া লাগবে।"

পুতুল টাকাটা নিয়ে একগাল হাসে, "কাল ঠিক টাইমে চলে আসব।"

পুতুল চলে গেলে রমিত স্বস্তির নিশ্বাস নিল, "থ্যাঙ্কস, মুশকিল আসান করে দিলে। তোমার হাতে আরও চার-পাঁচ জন ছিল?"

"কষ্টেসৃষ্টে ওকেই পেয়েছি। ওরকম বলতে হয়। ও ছাড়া গতি নেই বুঝলে পায়া ভারী হয়ে যাবে।"

রমিত হাসে, "তুমি তো বেশ ট্যাকটিকাল।"

"বলছ?"

"কমপ্লিমেন্টটা শুনে খুশি হচ্ছ না?"

অদিতি বলে, "নিজের সম্পর্কে আমার ঠিকঠাক আইডিয়া আছে। বাবাও ট্যাকটিকাল। বেঁচে থাকতে গেলে খানিকটা ডিপ্লোম্যাটিক হতেই হবে। তোমার বন্ধুটি বোঝে না। নরম মাটি পেলে বেড়ালও আঁচড়ায়। আর মানুষ তো টুপি পরিয়ে দেবে। ওর প্রবলেমটা কোথায় জানো? যেটা ওর স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে তা নিয়ে উচ্চাশা রাখবে না। প্রোমোশনের খবর এলেও কারও আনন্দ হয় না, দেখেছ?"

রমিত খুশিতে বলে ওঠে, "সায়মের প্রোমোশন হয়েছে? আমাকে হতভাগা খবরটা বিলকুল চেপে দিল!"

"কাল অফিসিয়ালি জেনেছে। বাকিরা পারলে সেলিব্রেট করত। উলটে কোন সুরকার বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও গান পড়ে দেখছে না, কোন সুরকার ঘনঘন মেল আর মেসেজ করার পরও নিরুত্তর, ভদ্রতার খাতিরে কেন অন্তত একটিবার মেসেজ করছে না, তা নিয়ে মুখ কালো করে বসে আছে। না বললেও বুঝতে পারি। রাত সাড়ে দশটায় কাউকে ফোন করে না হলে? বাথরুমে যাচ্ছিলাম। রীতিমতো ধমক খেল বুঝতে পারলাম। পাগলামোর লিমিট আছে। নিজেকে ওভারএস্টিমেট করলে ডিপ্রেশন আসবে। তুমি ওকে বোঝাও।"

"বোঝাব। তা পোস্টিং কোথায়?"

"খড়্গপুর ব্রাঞ্চে।"

"এক্সেলেন্ট। পাশের শহরে পোস্টিং উইথ প্রোমোশন। মোট্টুরাম না খাওয়াক তুমি কিন্তু বাইপাস করবে না।"

"কোন রেস্টুরেন্টে, কবে সেলিব্রেট করতে চাও বলো?"

রমিত চোখ নাচিয়ে বলে, "তোমার রেস্টুরেন্টে। বাঁকুড়া স্পেশাল তালের বড়া, পাতপিঠে, তালের সরুচাকলি।"

"হবে। আমারও প্রোমোশন হয়েছে। হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট। যদিও বলতে লজ্জা করছে। কন্ট্রাক্টের ফুলটাইমার, এদিকে হেড। চামচিকের পাখি হবার মতো ব্যাপার," অদিতির চোখ উজ্জ্বল।

"সুসময় চলছে তোমাদের।"

"না, রমুদা ভয় হয়।"

"পেয়ে হারানোর ভয় করলে কখনও আনন্দে থাকতে পারবে না। সায়মও কিন্তু পেয়ে হারিয়েছিল। সামলে নিয়েছে।"

অদিতি ভ্যানিটি ব্যাগ কাঁধে নিল, "তোমার মুখে দার্শনিক বুলি কেমন যেন লাগে! এবার ঝুলে পড়ো। একে টিচার, তায় বিয়েশাদি না করলে কঠিন বিজ্ঞ হয়ে পড়বে। লাইভলি থাকতে পারবে না।"

রমিত আলগাভাবে বলে, "ভাবছি। তবে আমার কেস আলাদা। এই বয়সে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকবে। কেউ জেনেশুনে রাজি হলে আপত্তি নেই।"

"তাহলে তোমার বন্ধুকে বিজ্ঞাপনের ড্রাফট লিখতে বলি?"

"বলো। লাভ হবে না, কেউ রেসপন্স করবে না। করলেও মেঘার কথা জানলেই পিছিয়ে যাবে।"

"দেখা তো যাক!"

বাস্তব প্রয়োজনেই বিয়ের ব্যাপারে একরোখা মনোভাব কিছুটা হলেও ছাড়তে পেরেছে রমিত। একমাস আগেও তা দুরতম কল্পনাতে ছিল না। নিজে থেকে মুখ ফুটে বলতে দ্বিধা হচ্ছিল। দ্বিধা পুরোপুরি চলে যায়নি, মনের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলছে এখনও। একা থাকতে সে পারছে না। নির্জন ঘরে কামনার পতঙ্গ ওড়ে। এতদিন ঘুমিয়ে থাকা শরীর ডম্বরু বাজিয়ে জাগতে চায়। রক্তমাংসের পুরুষ সে, হরমোনের বিচিত্র খেলা তাকে ছাড়বে কেন?

{২৯}

ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় উতরে যাবে আশা করেনি সায়ম। অবশ্য হেডকোয়ার্টাসে তার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল। তিন বছর বাদে-বাদে ট্রান্সফার হতেই হয়। এবার তার গ্রেডেশন এক ধাপ বাড়ল।

খড়্গপুরের কৌশল্যা ব্রাঞ্চে তার নতুন পোস্টিং, আসা-যাওয়া মিলিয়ে দেড়ঘন্টা লাগবে, ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। বাড়ি থেকে দশ মিনিট দূরত্বে পৌঁছে যাওয়ার মধ্যে নিশ্চিন্ত আলস্য ছিল। দায়িত্ব, কাজের চাপ দুটোই বাড়ল। একঘেয়েমি থেকে মুক্তি অন্তত পাওয়া যাবে। বাবাকে গতকাল সন্ধেতেই অদিতি খবরটা জানিয়ে দিয়েছে। ছেলের পদোন্নতিতে প্রিয়নাথ খুশি। সায়মের পে-স্কেল এই বাজারে বেশ ভাল। প্রিয়নাথ যদিও তা নিয়ে তাচ্ছিল্য করে গিয়েছেন এত দিন। রমিত বরাবরের মতো ফাজলামো করল। প্রথমটায় কপট রাগটাগ দেখিয়ে হেসে বলল, "তুই পদোন্নতিতে খুশি হতে পারছিস না মনে হচ্ছে!"

"না, আমার মন বিক্ষিপ্ত আছে।"

"কেন? কেউ আলটিমেটলি তোর পাঠানো লিরিকস দেখছে না? সাকসেস এত মসৃণ হয় না চাঁদু। মাথা ঠান্ডা রেখে লেগে থাক। গাছে উঠেই এক কাঁদির আশা করলে হবে?"

নিঃশ্বাস ফেলল সায়ম, "ওটা একটা কারণ। আসল কারণ অন্য কিছু। অদিতি গভীরে যেতে চায় না। তাহলে ও অন্তত তোকে একবার বলত।"

"হেঁয়ালি না করে বল।"

"আমার কাছে একজন মানুষ গত তিনদিন ধরে নিখোঁজ।"

"কে?"

"শেখরদা।"

"নিখোঁজ মানে?" রমিত আশ্চর্য হল।

"একজন জলজ্যান্ত মানুষ নিখোঁজ হয় না। রমিত, উনি স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন। আমার সঙ্গে তাঁর আত্মার সম্পর্ক। আমার রুচি, গানের ভালবাসা, শিল্পসাহিত্যের অনুরাগ তাঁকে না পেলে তৈরি হত না। আর পাঁচটা কেজো মানুষের মতো ব্যাঙ্কে কাজ করে দিনগত পাপক্ষয় করতাম। বাঁচার অক্সিজেন থাকত না," সায়মের গলা কেঁপে যায়।

"আচ্ছা, ফোনে সব কথা হয় না। আমি শুনব। নিরুদ্দেশ কেন হতে যাবেন উনি? যত দূর শুনেছি তোর মুখে, উনি ঋজু মানুষ, মনের জোর সাংঘাতিক। এখন সন্ধেয় মেঘাকে একা রেখে বেরতে পারব না। অদিতি পুতুলকে জোগাড় করে দিয়েছে। কাল থেকে আসবে। একদিন মুখোমুখি বসে সব শুনব।"

নীলাবউদিকে আজ সকালে ফোন করেছিল সে। ফোনে তাঁর গলা প্রথমটায় নিরুত্তাপ শোনাচ্ছিল।

"ফোন কেন করেছিস?"

"ইচ্ছে হল।"

"তোর যত ফোন সব তো ওই মানুষটাকেই করিস। হঠাৎ আমাকে ফোন করছিস যে ঘনঘন!"

বিব্রত সায়ম বলেছিল, "শেখরদাকে কিছুতেই পাচ্ছি না যে! তুমি অবিচল থাকতে পারছ। আমি পারছি না। খোঁজ পেলে?"

"না"।

"থানায় ডায়েরি করেছ?"

নীলাবউদি কেঁপে উঠল, "কেন? থানায় ডায়েরির কথা আসছে কেন?"

"কোনও মানুষ নিখোঁজ হলে করাটা নিয়ম। ধরে নিচ্ছি স্বেচ্ছায় শেখরদা কোথাও চলে গিয়েছে। কিন্তু..." সায়ম একটু থামে। নীলাবউদির এই নিস্পৃহ, শীতল মনোভাব ভাঙার জন্য দুঃসাহসী তাকে হতেই হবে। সায়ম চিন্তিত সুরে বলে ফেলল, "যদি কোনও অঘটন ঘটে! নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারে। আমি জানি না শেখরদা কোথায় চলে গিয়েছে। যাবার আগে জলসাঘর আমার জন্য রেখে গেল। কেন বলল এমন?" ইচ্ছে করে মিথ্যেটা ভাসিয়ে দিল সায়ম।

"তোকে এরকম বলেছে? আগে বলিসনি কেন আমাকে?"

নীলাবউদির গলায় আর্তনাদ ধ্বনিত হল, "আমি ওকে রাগের মাথায় কিছু বলেছিলাম। তার জন্য চলে যাবে? আমাকে একলা ফেলে চলে যেতে ও পারল? আমি কী নিয়ে থাকব।"

"মাথা ঠান্ডা রাখো। থানায় ডায়েরি এখনই কোরো না। আর দুটো দিন দেখো। রাগ পড়লে ফিরে আসতেও পারে।"

"বলছিস?" নীলাবউদি নিভন্ত গলায় বলেছিল, "ভাই অবশ্য বারবার জানতে চাইছিল। জামাইদা না বলেকয়ে কোথায় গেল? আমি আসল কথা বলিনি। ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।"

"এখনই করো। দেরি কোরো না।"

বিশ্বাসের বাইরে যুক্তির সীমারেখা পেরিয়েও তবু পৃথিবীতে কত কিছু ঘটে যায়।

'যো তুম হাসেগা তো দুনিয়া হাসেগি' তাঁর প্রিয় এই গানের দর্শন শেখরদা কেন নিজেই চুরমার করে দিলেন? মোবাইলে গানটা শুনতে-শুনতে অস্ফুটে বিড়-বিড় করল সায়ম, "ফিরে এসো, সব ভুলে ফিরে এসো। আমরা দু'জন বসে আবার সুরের মূর্ছনায় হারিয়ে যাব। তোমার জলসাঘর যে হানাবাড়ি হয়ে যাবে তোমাকে ছাড়া!"

{৩০}

অন্ধ তমঃ প্রবিশন্তি যেহ বিদ্যাম্নু পাসতে।
ততোভূয় ইব তো তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃং॥

ঈশোপনিষদের এই শ্লোকটি নিয়ে সকাল থেকে মগ্ন আছেন প্রিয়নাথ। কর্মর জ্ঞান না থাকলে অবিদ্যার উপাসনাই হয়, বিদ্যা মানে কাজের আরাধনা। কর্মহীন জীবনে আত্মজ্ঞান থাকে না, অন্ধকার ঘনিয়ে আসে চেতনায়। শ্লোকটি পড়ে সান্ত্বনা পাচ্ছেন তিনি। পড়াশোনার চর্চা একটা সময় ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে কাজ করে গিয়েছেন। চাকরির প্রথম দিকে আপস করেছিলেন, অল্পবিস্তর ঘুষও নিতেন। সংসারে সচ্ছলতা ছিল না। কর্মজীবনের শেষ দশবছর কিন্তু শিরদাঁড়া সোজা করে চলেছেন। সত্যিই পাবলিক সার্ভেন্ট ভাবতেন নিজেকে, গরিবগুর্বোদের জন্য নিজের সীমিত ক্ষমতায় চেষ্টা করেছেন, ফাঁকির প্রশ্ন রাখেননি। কিছু ফেরেব্বাজ লোকের চক্ষুশূল হলেও লোকজন তাকে ভালবাসত। ভাবনায় ছেদ পড়ল।

ফোন বেজে উঠল। উদাসীন ভঙ্গিতে দেখলেন প্রিয়নাথ, রমিত ফোন করেছে।

"হ্যালো, সব কুশল তো?"

"স্কুল খুলে গিয়েছে তিনদিন, তাই ভাল নেই।"

"ফাঁকি দিয়ে স্যালারি পেয়ে যাবে? বাইরে বোলো না, লোকে গাল দেবে। একে তো বাঙালি জাতটার গায়ে নিষ্কর্মা লেবেল সাঁটা হয়ে গিয়েছে।"

রমিত বলল, "দশদিন ছুটি ছিল। কোথাও যাওয়া হল না। মনে এনার্জির অভাব। আমি ফাঁকিবাজ নই। মন দিয়ে পড়াই। কবে ছুটি পড়বে আর বেরোব তা জানি না।"

প্রিয়নাথ হাসেন। "তা হলে মেঘা পায়ে শেকল পরিয়ে দিয়েছিল এবার। হা-হুতাশ করলে হবে? দায়িত্ব নিয়েছ, পালন তো করতেই হবে। আচ্ছা স্কুলে তোমার কোনও নিকনেম নেই?"

"আছে। তাতাইস্যার। আমি প্রচুর 'তা' বলি। তাই এই নাম। ওদের পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছি। নামটা অন্তত খোরাকের রাখেনি। আর ক'দিন থাকবে কুসুমডিহিতে? মনে হচ্ছে তোমার শিকড় গজিয়ে গিয়েছে।"

"আরও ক'দিন থাকব। কেন বলো তো?"

"এমনি।"

প্রিয়নাথ বলেন, "প্রিলুড অনেকক্ষণ হল। এবার আসল কথায় এসো।"

রমিত কপট রাগে বলে, "কেন, বেশিক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বললে প্রবলেম হচ্ছে? আরামে আছ বুঝতেই পারছি। তা ক'খানা হাঁসডিম সাবাড় করলে?"

"আমি কি হাঁসডিম খেতে এসেছি?"
"শুধু হাঁসডিম নয়, আরও আইটেম মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আলুপোস্ত, বিউলিডাল, কুমড়োফুল ভাজা। মাশরুমও খাচ্ছ। তোমাদের ওদিকে অবশ্য 'ছাতু' বলে। কুড়কি ছাতু জঙ্গলে পাওয়া যায়। অদিতি কয়েকবার রেঁধে খাইয়েছিল। তোমরা বাঁকুড়ার লোকরা খুব পোস্ত খাও।"
"বকেই যাচ্ছ তখন থেকে। ফোনের কারণটা জানতে পারি?" প্রিয়নাথ বলে ফেললেন।
"মেসো, তোমার এই এক দোষ। প্রাণ খুলে দুটো সুখদুঃখের গল্প করতে পার না? কী, কেন করেই কথা সারতে চাও। বলছি যে আমি বিয়ে করব ভাবছি।"
"গুড আইডিয়া।"
রমিত গলা গম্ভীর করে, "মনভোলানো কথা বলছ কেন? তোমার সাজেশন চাইছি।"
"হঠাৎ তোমার আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি পড়ল? বিয়ে করবে তুমি, তোমার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত হবে, অন্যের মতামতে চলবে কেন?"
"তোমার অ্যাডভাইস প্র্যাকটিক্যাল লাইনে হাঁটছে না। জ্ঞানগর্ভ বাক্য শোনার জন্য তোমাকে ফোন করেছি? মেঘা আছে। তার দিকটা ভাবতে হবে। যদি মেঘাকে সে অগ্রাহ্য করে? মেঘা যদি তাকে মেনে নিতে না পারে?"
"এত যদি নিয়ে নতুন জীবন শুরু করা অসম্ভব। তোমাদের জেনারেশনে বিয়ে মানে গ্যাম্বল। অদিতিকে বউমা করার বেলায়

শরীরটা ভাল লাগছে না। পরপর দু'রাত জ্বর এসেছিল। জ্বর মাঝরাতে আসছে, হালকা টেম্পারেচার, সকালবেলায় কোনও উপসর্গ নেই।

একরকম জুয়া খেলেছিলাম। অভাবের সঙ্গে ষ্ট্রাগল করেছে, বাস্তব চিনবে, আমার খেয়ালি ছেলেটাকে অগ্রাহ্য করবে না। তার উপর সায়মের ওই ফার্স্ট ম্যারেজের চ্যাপ্টার।"
"তা অদিতি খুব এফিসিয়েন্ট। দেখেশুনে চব্বিশঘণ্টার মেয়ে ঠিক করে দিয়েছে মেঘার জন্য। তবে অদিতি ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট তোমার ছেলের অপোজিট পোল," রমিত হাসল, "তাহলে বলছ ঝুঁকিটা নিয়ে নিই? কমার্শিয়াল ফিল্মে নায়কের বিয়ে হল মেন থিম। অভাব, চাকরি, রোগ, অসুখ ওসব কোনও সমস্যা নয়। নায়ক বিয়ে করবে কিনা, কাকে করবে এই নিয়ে রিলের পর-রিল চলে। কখনও বাবা-মা-ঠাকুমা অনুরোধ করে, 'বেটা একবার শাদিমে রাজি হো যা। হাঁ কর দে।' আমি প্রবলেমে পড়ে ভাবছি। আচ্ছা সিঙ্গল মাদার কনসেপ্টটা কেমন?"
প্রিয়নাথ নাক সিঁটকে বলেন, "জঘন্য, পাশ্চাত্যের অসুখ।"
"তুমি পিউরিটান রয়ে গেলে দেখছি। নৈতিক-নৈতিক করেই তোমরা গেলে। সুস্মিতা সেনের নাম শুনেছ?"
"কে?"
"তা কেন শুনবে? হোললাইফ পাট্টা, রায়তি ডেসিবেল, আমিন, সিলিং নিয়ে থাকলে। শেষ দশ বছর নেতামন্ত্রীদের নাম মুখস্থ করলে। সুস্মিতা সেন মিস ইউনিভার্স হয়েছিলেন। বলিউডের অ্যাকট্রেস।"
অন্য কেউ হলে প্রিয়নাথ ধমকে চুপ করিয়ে দিতেন। এই পাগলটার উপর রাগ করা যায় না। তবু মৃদু রাগে শ্লেষাত্মক গলায় বললেন, "হিন্দি ফিল্মের খবর রাখাটা কোনও জ্ঞানের ব্যাপার? সুস্মিতা সেনের মতো কাউকে খুঁজছ?"
"দূর! আমার মস্তিষ্ক সবল আর সুস্থ আছে। তিনি তিনটি কন্যাকে দত্তক নিয়েছেন। যত্ন করে মানুষ করেছেন। ওঁর উদাহরণ ভেবে মাঝেমধ্যে বিয়ে করব না ভাবছি। যদিও তোমার ছেলে বিজ্ঞাপনের ড্রাফট লিখে ফেলেছে। পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনে বেরবে। সিঙ্গল ফাদার হবার মতো কনফিডেন্স পাচ্ছি না।"
"ব্যতিক্রমী হতে গেলে অনেক কিছু ছাড়তে হয়। বুঝেছ রমিত? মেঘাকে অ্যাডপ্ট করার দুঃসাহস দেখানোর সময় ভাবা উচিত ছিল। কোথাও জয়েন্ট ফ্যামিলি টিকছে না, আর অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে অন্যের ভরসায় তুমি দত্তক নিয়ে নিলে। ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট। এবার ফোনটা ছাড়ো। বেশিক্ষণ ফোনে কথা বললে কান গরম হয়ে যায়," প্রিয়নাথ ধৈর্য হারাচ্ছিলেন।
"তা তুমি কোনও ডিসিশান দিচ্ছ না?"
"তোমার বুদ্ধি কমছে হে," প্রিয়নাথ মোলায়েম হলেন, "জুয়ার উদাহরণটা ক্যাচ করতে পারলে না? এখন সেফ জোনে থাকবে, না রিস্ক নেবে সেটা তোমার ব্যাপার।"
"তুমিই সেফ গেম খেললে মেসো।"
শরীরটা ভাল লাগছে না। পরপর দু'রাত জ্বর এসেছিল। জ্বর মাঝরাতে আসছে, হালকা টেম্পারেচার, সকালবেলায় কোনও উপসর্গ নেই। ম্যালেরিয়া হল না কি? তেমন হলে প্রবল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসত। এমন ভাইটাল টাইমে শরীর বেগড়বাই করলে বিপদ। আটদিন পর রেজিস্ট্রেশন হবে। দলিল এবং যাবতীয় কাগজপত্র রেডি। জমিবাড়ি হস্তান্তরের সময় বিক্রেতার ভূমিকাই মুখ্য, সশরীরে হাজির হয়ে সইসাবুদ করতে হবে, ফোটো স্ক্যান করা হবে। শয্যাশায়ী হয়ে গেলে পিছিয়ে যাবে কাজটা। কাজ সময়ে সেরে ফেলতে হয়। ক্রেতার মর্জি পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।
বেলা দশটা নাগাদ প্রিয়নাথ নীচে নেমে ঘোষণা করলেন, "আজ আমি ফিরে যাব।"
আকস্মিক মত পরিবর্তনে কেউ আশ্চর্য হল না। বলেছিলেন আরও চার-পাঁচদিন থাকবেন। একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে প্রিয়নাথকে টলানো অসম্ভব। আজ নদীতে স্নান করতে গেলেন না প্রিয়নাথ। কুয়ো থেকে জল তুলে দু'বালতি ঢেলে নিলেন শরীরে। গজগজ করতে-করতে ভাইপোকে বললেন, "তোর বাপ সেকেলে লোক। তুই ধুলো উড়িয়ে বাইক চালাচ্ছিস, টিশার্ট, জিনস চড়াচ্ছিস। তোরও দেখছি আক্কেলজ্ঞানের অভাব। একটা বাথরুম বানাতে পারিসনি অ্যাদ্দিনে?"
কেন যে এখানে এসে বারবার রাইয়ের কথা মনে পড়ছিল তাঁর! প্রিয়নাথের নিজেকে অপরাধী মনে হয় আজ। তিনি সেভাবে চেষ্টা করেননি কেন? ভাই না হয় অশিক্ষিত ছিল। কই, তিনি তো রাইকে আধুনিক, উন্নত মানের মেডিকেল সেন্টারে ট্রিটমেন্টের বন্দোবস্ত করার উদ্যোগ নেননি। শিক্ষিত, শহুরে জেঠুও রাইয়ের ভবিতব্য মেনে নিয়েছিল! পাঠকবংশের প্রথম সন্তান, একমাত্র মেয়ে, মেয়ে তো আদরের মণি, তেমন চেষ্টা কোথায় আর করলেন তিনি? সংসারজীবনের শুরুতে তিনি স্বার্থমগ্ন ছিলেন। ছেলের ভাল স্কুল, এডুকেশন, নিজের বাড়ি, ট্রান্সফার-প্রোমোশনের ব্যালান্স রাখা, কত রকম প্রয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন তিনি!
বাস পেরিয়ে যাচ্ছে কালশীর্ণ শিলাবতী নদী। তিনচারদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে বালিভাসা নদীতে সামান্য জল, বর্ষা এলে এই নদী সজলপ্রাণ হয়ে উঠবে। আর আসতে পারবেন কি না জানেন না। ইচ্ছে তো হয় বারবার আসার, মাটি-ধুলো-বালি-স্নিগ্ধ বাতাস মেখে নিতে সাধ হয়, এই সাধ পরজন্মেও মিটবে না। ফোনটা মুঠোয় রেখেছিলেন এতক্ষণ। বুকপকেটে গুঁজে নিলেন। হঠাৎ হাজির হয়ে গিয়ে দাদুভাইকে সারপ্রাইজ় দেবেন।

{৩১}

লেখা গানগুলোর জেরক্স কপি ওলটাতে-ওলটাতে অস্থির হয়ে পড়ল সায়ম। দশ মাস ধরে সে পাঠিয়েই যাচ্ছে। সুনীতকে দিয়ে শুরু। তারপর তিনজন প্রতিষ্ঠিত গায়ক। নবীন সুরকার দীপাঞ্জনকে বারবার মেল এবং মেসেজ করেও সাড়া মেলেনি। হিমাংশু অবশ্য কথা দিয়েছিলেন। দুটো গান পড়ে দেখেছেন, ভালই লেগেছে, পরে পড়ে রাখবেন। সেই ভরসাতে অধীর আগ্রহে দেড়মাস কাটল। ফোন করলে ধরেন, বলেন, "দেখে রাখব, ক'দিন পরে ফোন করবেন।"
পরপর দু'সপ্তাহে নিয়ম করে ফোন করেছে সায়ম, "এখনও হয়নি। অবশ্যই দেখব।"
গতে বাঁধা উত্তর। ওটুকু বলেই ফোন রেখে দেন হিমাংশু। একবার রাতে ফোন করায় ধমকে দিয়েছিলেন। সায়মের সময় খেয়াল ছিল না। এগারোটা বেজে গিয়েছিল। তারপর প্রতিবারই আশ্বস্ত করেন হিমাংশু। আজ দু'মাস পূর্ণ হল। অন্য কোথাও আর পাঠায়নি সে। দ্বিধান্বিত মনে সে ফোনটা কিছুক্ষণ হাতে রাখল। এখন হিমাংশু ভুলে যান, সায়ম তার পরিচয় দিয়ে গান পাঠানোর কথা কুণ্ঠিতভাবে বলে। আজ তাকে বুঝে নিতে হবে।
"হ্যালো। কে বলছেন?"
"সায়ম।"
"কী ব্যাপারে?"
"আমি লিরিক্স পাঠিয়েছিলাম," সায়মের কপালে ভাঁজ পড়ল।
"ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে। না, এখনও দেখা হয়নি। খেয়াল আছে। সময় হলেই দেখে রাখব।"
"ঠিক আছে," গলা বুজে আসছিল তার।
রগ চেপে কিছুক্ষণ বসে থাকে সায়ম। দু'মাসেও দেখার সময় হল না! লিরিক্সগুলো একবার পড়ে দেখতে কতক্ষণ লাগে? গান হওয়া, সুরারোপ ইত্যাদি হাতেগরম ফল সে তো চাইছে না। স্তোকবাক্য শুনে-শুনে কত দিন চলবে এভাবে? সরাসরি বলে দিলেই পারেন,
"না ভাই, ওগুলো গান করা যাবে না। উপযোগী মনে হচ্ছে না। আপনি নতুন করে চেষ্টা করুন। ওভারকাম ইয়োর ফল্টস।"
রাগ করত না সায়ম। "আমার কাছে পাঠিয়েছেন কেন? সরি, আমি আনানোন কাউকে নিয়ে কাজ করব না," এমন বলে দিলেও সায়ম স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিত। আশ্চর্যের ব্যাপার, কখনও 'না' শব্দটি উচ্চারণ করছে না। কারণটা দুর্বোধ্য ঠেকছে তার কাছে। হিমাংশু আদপে খুলেই দেখবেন না। আশায়-আশায় দীর্ঘ দু'মাস নষ্ট হয়ে গেল। মাথা তুলে 'ক্রিয়েট মেসেজ' অপশনে গেল সায়ম। সে কারও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেনি, ফিল্মে কিংবা অ্যালবামে গান গাইবার সুযোগ চায়নি, শুধু তার সৃষ্টির পরিণতি জানতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। তার অবস্থা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো, কন্যা আগে অন্তত একবার কেউ স্বচক্ষে দেখুক, অমনোনীত হলে নিজের সৃষ্টির দুর্বলতা স্বীকার করে নেবে। চোয়াল শক্ত করে সে লিখল, 'আমি ক্লান্ত, হতাশ। দু'মাস কেটে গেল। 'না' বলে দিলে স্পোর্টিংলি নিতাম। পাঠানো লিরিকসের প্রিন্টেড কপি ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন। লিরিকস লেখার ভূত মাথায় কেন যে চেপেছিল!'
হিমাংশু হয়তো মেসেজটা তাচ্ছিল্যে চোখ বুলিয়ে রেখে দেবেন। ফেসবুক খুলে মন শান্ত করার চেষ্টা করল সায়ম। অনেকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটির পর তার চোখ আটকে গেল। এতক্ষণ বেশ ছিল, ফেসবুকে সরস মন্তব্য, কিছু অসাধারণ ছবি, বুদ্ধিদীপ্ত স্ট্যাটাস শেয়ার, ভালই লাগছিল। অভিদীপ্তার নতুন অ্যালবাম বেরোবে, রিহার্সালের ছবি পোস্ট করেছেন। দু'জন সুরকার। একজন নীলাঞ্জন। অন্যজন তার প্রিয় গায়ক শুভদীপ। ছ'মাস আগে শুভদীপকে সে একবার কুরিয়ারে, আর-একবার মেলে লিরিক্স পাঠিয়েছিল। একটিবারের জন্য খুলে পর্যন্ত দেখেননি! লগ আউট করল সায়ম। রাগে গুমগুম করছে সারা শরীর। অবহেলা আর অবজ্ঞা। তাঁর বাবা এত কাল করে এসেছেন। এখন সন্ধিপর্ব চলছে। অদিতি তার সৃষ্টিযন্ত্রণা বুঝতে চায় না। রোহন মা-অন্ত প্রাণ। কেউ তাকে অনুরাগের চোখে দেখেনি, প্রেমের অতৃপ্ত হাহাকার নিয়ে বিয়ে করেছিল, ন'দিনের রোমান্স হয়ে গেল গ্লানিগরল অধ্যায়। কেন তার সঙ্গে এরকম হবে? লিরিকস লেখার নামে সে ছাইপাঁশ লেখেনি। এ কথা চিৎকার করে বলতে পারবে না, সবাই তাকে পাগল ভাববে।
সায়ম পেনস্ট্যান্ড ছুড়ে দিল। অক্ষম রাগে কাঁপতে-কাঁপতে সে জলের বোতল ছুড়ে মারল। বোতল দরজায় ধাক্কা কেয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে বসে থাকল মেঝেতে। রাগে, ক্ষোভে সমস্ত কিছু চুরমার করে দিতে ইচ্ছে করছে তার। বালিশে দুমদাম থাপ্পড় মারল কিছুক্ষণ। ঠোঁটের তিরতির কাঁপুনি বন্ধ করতে চাইল সায়ম। তখনই দরজার ওপাশে প্রিয়নাথের গলা ভাসে,
"দরজা খোলো।"
দরজা বাধ্য হয়ে খুলল সায়ম।
"কী হয়েছে?"
"কিছু না।"
"পেনস্ট্যান্ডের দশা এমন কেন? বোতল ছোড়ার শব্দ পেলাম। আমি গোয়েন্দাগিরি করিনি। এমন হিস্টিরিক আচরণ করছিলে কেন? সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ।"
মুখ গোঁজ করে বসে থাকল সায়ম।
"ডোন্ট বি ওভার এক্সাইটেড। তুমি ধীরস্থির ছিলে চিরকাল, ইদানীং খুব রিঅ্যাক্ট করছ। কারণটা বলবে না জানি। আমাকে শত্রুপক্ষ ভেবে এলে এতকাল। বয়স হয়েছে, ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব আর কবে হবে ঈশ্বরই জানেন। তোমার প্রোমোশন হয়েছে। সুসংবাদ অদিতি ফোনেই জানিয়েছিল। আমি তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই। যা চাইবে। ভেবে বোলো কিন্তু। এখন বাইরে ঘুরে এসো। মাইন্ড ফ্রেশ হবে।"
সায়ম অবাক চোখে দেখছিল। প্রিয়নাথ ধীরপায়ে নেমে যাচ্ছেন, কীভাবে যে এই মানুষটি মুহূর্তের মধ্যে তাকে পড়ে ফেলেন! লজ্জা পাচ্ছিল তার। মনে-মনে বলল সায়ম, অনেক দেরি করে ছেলের কাছে বন্ধু হতে চাইলে বাবা। আর আমার কোনও উপহার প্রয়োজন নেই।
অদিতি নীচের ঘরে রোহনকে পড়ানোয় ব্যস্ত। তার হঠাৎ মেজাজ হারানোর সময় অদিতি ছেলেকে নিয়ে মগ্ন ছিল। মঙ্গল হয়েছে। তবে অদিতি আজকাল শান্ত, ধীরস্থির হয়েছে। ফ্ল্যাট হবে, হাতে লিকুইড ক্যাশ আসবে, তার প্রোমোশন হয়েছে। অদিতির প্রাপ্তিযোগের ঘর একেবারে পূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে অদিতিরও গুরুত্ব বেড়েছে। কাল পনিরের দুর্ধর্ষ একখানা আইটেম বানিয়েছিল। অদিতি মুডে আছে, আনন্দে আছে, তার শরীরের ছন্দে খুশি খেলা করে। শুধু সে আনন্দে নেই। অলীক কোনও কিছুর জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। কেন এমন দুঃখবিলাস! এই ব্রাঞ্চে পেশাদার সম্পর্কের বাইরে কয়েকজনের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।
ট্রান্সফার উইথ প্রোমোশনে সে খুশি হয়নি শুনলে বাকিরা হাসবে। ব্যাঙ্কের যান্ত্রিক কাজ তার পছন্দ নয়, প্রাণচঞ্চল পরিবেশে তিনটে বছর থেকে কাজটার প্রতি ভালবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছে। নতুন ব্রাঞ্চে তেমন পরিবেশ যদি সে না পায়?
চায়ের দোকানে নড়বড়ে বেঞ্চে বসে থাকার পর বশীভূত রাগ অন্যভাবে জেগে উঠল। তার পক্ষে তো মহানগরে এর ওর দরজায় হত্যে দেওয়া অসম্ভব। শিল্প-সংস্কৃতির জগতে 'এক্স' ফ্যাক্টর থাকে। মুখ দেখাতে হবে, বারবার সশরীরে গিয়ে অনুরোধ করতে হবে, অনেক জায়গায় প্রত্যাখ্যাত হতে-হতে চাবি খুলে যেতে পারে একদিন। চাকরি তাকে সেই অবসর দেবে না। মফস্‌সলে বসে শুধু লেখালেখিটাই সম্ভব। কবজির জোর সেখানে আসল শক্তি। গান লেখা তো পারফরমিং আর্ট নয়, সে ভেবেছিল মেল, কুরিয়র, ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে চেষ্টা করা যেতে পারে। অভিদীপ্তা মেসেজ করে

জানিয়েছিল লিরিকসগুলো তাঁর খুব ভাল লেগেছে। সুরকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। আদৌ পড়েছিলেন, না মনভোলানো কথা বলেছিলেন? এই জগৎটিকে তিনি চেনেন, একজন অখ্যাত, অচেনা কারও লিরিক্স পড়ে দেখার মানসিকতা প্রতিষ্ঠিত সুরকারদের কেন থাকবে?

গায়ক শুভদীপকে বেঞ্চে বসেই মেসেজ করল সে, 'দু'বার পাঠালাম। নয় মাসে একবার খুলে পর্যন্ত দেখলেন না? এটা প্রত্যাশিত ছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ফালতু সময় নষ্ট কেউ করে না। এত অনীহা কেন? আপনি অ্যালবামে সুর দিয়েছেন দেখলাম। ভাল থাকবেন।' কোনও উত্তর আসবে না জেনেই পাঠাল সায়ম। এভাবে নিজের রাগ, ক্ষোভ উগরে দিয়ে ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে সে? উর্বর কল্পনাতেও আশার ছোট একটি বিন্দু ভাসছে না। গান লেখার ইচ্ছেটা তার মরে গেল। হয়তো চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেল। কোঁচকানো শিথিল চামড়া হবে একদিন, শুকনো গালে হাসি ফুটিয়ে বুড়োদের আড্ডায় সে হয়তো তখন বলবে, "জানেন মণ্ডলবাবু, চল্লিশে পা দিয়ে আমার ভীমরতি হয়েছিল। মনে হয়েছিল গীতিকার হব। সে প্রতিভা আমার আছে। কেউ পাত্তা দেয়নি, ওই বয়সে রক্তের তেজ থাকে, রেগেমেগে মেসেজ পাঠাতাম। এখন হাসি পায়। বুঝলেন মশাই, আশ্রয় খুঁজছিলাম তখন। পরে বুঝি, আমাদের কোথাও যাবার নেই। নো শেল্টার। ব্যাঙ্ক, ঘরসংসার আর গতানুগতিক কাজই আমাদের ডেস্টিনি। আমি, আপনি, সবাই ত্রিভুজের পরিসীমায় বন্দি হয়ে কাটিয়ে দিলাম। হেঁ হেঁ।"

এই ক'দিন আনন্দস্নাত অদিতিকে দেখে মাথার মধ্যে গান জেগে উঠেছিল। 'স্থায়ী' অংশটি গতকাল সন্ধেয় লিখেছিল সে-

আজ ইচ্ছেভূতের জন্মদিনে বউ আমার ফেয়ারি কুইন
খিটখিটে বস হুকুম ভুলে বাজায় বেসুর ভায়োলিন
ছাপোষা মানুষ গলায় ফানুশ আশা তবু সীমাহীন
ইচ্ছেসুখেই বেঁচে থাকি ভাবি স্বপ্নরঙিন সারাদিন॥

অন্তরা আর লেখা হবে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পয়সা মিটিয়ে শেড-এর বাইরে বেরিয়ে আসতেই চমকে উঠল। রমিতের বাইকের পিছনে রূপসী এক মহিলা, গল্প করতে-করতে স্লো স্পিডে চালাচ্ছে রমিত। হ্যালোজেন আলোয় স্পষ্ট হল মুখ। একে তো চেনে! সুলগ্না। তাদের কৈশোর-যৌবনের হার্টথ্রব। সুলগ্নার হাইফাই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। রমিত কলেজ লাইফ থেকেই বহির্মুখী। বন্ধুবান্ধবের গ্রুপে আড্ডা, ঘুরে বেড়ানো, তুমুল হইচই করে থাকত সে। মেয়েদের ব্যাপারে বিশেষ তার আগ্রহ ছিল না। সুলগ্না পাঁচবছরের জুনিয়র। সায়মের মনে আছে। তিনটি আবেগসিক্ত কবিতা সাজিয়ে একখানা প্রেমপত্র সে সুলগ্নাকে লিখেছিল। এক বন্ধুর মাধ্যমেই পাঠিয়েছিল। হৃদয়ের সেই ব্যাকুলতা কিংবা কবিতার উচ্ছ্বাসে সুলগ্না কোনও সাড়া দেয়নি। এখন ভাবলে কেমন লজ্জা লাগে।

সুলগ্নার সঙ্গে রমিতের যোগাযোগ হল কীভাবে?

{৩২}

সকালে প্রিয়নাথ তাকে ডাকলেন। ঘরে অদিতি বসে আছে। অদিতির মুখ পাণ্ডুর, চোখে স্পষ্ট উৎকণ্ঠা, শরীরের অভিব্যক্তিতে বিধ্বস্তভাব। প্রিয়নাথ শুকনো মুখে বললেন, "একটা খারাপ খবর আছে। অবশ্য তোমার কাছে সেটা সুসংবাদ হতে পারে। সবই আপেক্ষিক।"

"কী খবর?" সায়মের টেনশন হচ্ছিল।

"নবেন্দু ডিল ক্যানসেল করে দিয়েছে।"

"কেন?"

"রিং রোডের ধারে ব্রিটিশ আমলের পুরনো যে লাল বাড়িটা আছে ওটা সে কিনবে। সামনে পাঁচকাঠা ফাঁকা জায়গা। মোট সাড়ে সাতকাঠা জায়গা রোডসাইডে পাচ্ছে। ফ্লারিশিং প্লেস। হার্ট অব দ্য টাউন। ওটাতে নবেন্দু ইন্টারেস্টেড।"

"কিন্তু এভাবে আমাদের গাছে তুলে দিলেন কেন তাহলে? কথা দিয়েও পিছিয়ে যাবেন দুম করে! বাজে লোক। চিটিংবাজ," অদিতি হাত নাড়ে।

শান্তভাবে প্রিয়নাথ বলেন,"বাকসংযম শেখো। নবেন্দুর ওটা বিজনেস। যেখানে প্রফিট, প্রসপেক্ট বেশি পাবে সেখানেই প্রজেক্ট বানাবে। রেজিস্ট্রেশনের পর লিকুইড ক্যাশ বাকি রাখলে, বাজে মালমশলায় বাড়ি বানালে তাকে খারাপ বলা যেত অনায়াসে। ওই জায়গায় কমার্শিয়াল স্ট্রাকচার তুলবে নবেন্দু। ব্যাঙ্ক, অফিস, কমার্শিয়াল আউটলেট, রিটেল শপ, পলিক্লিনিক। ওকে বলতে হবে না। অনেকে নিজে এসে অ্যাডভান্সড বুকিং করে যাবে। স্পষ্টতই সে পাড়ার ভিতর অ্যাপার্টমেন্ট তৈরির জন্য টাকা ঢালবে কেন? এক কোটিতে ডিল হয়েছে। প্লাস মালিকের জন্য দুটো ফ্ল্যাট। ডিল ক্যানসেল করার জন্য সে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে।"

অদিতি উত্তেজিত গলায় বলে, "ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় কখনও? মার্কেটে আরও অনেক প্রোমোটার আছে। আপনি চিন্তা করবেন না। একবার শুধু ডাকুন তাদের।"

প্রিয়নাথ হাসেন, "রাগে বাস্তববুদ্ধি হারাচ্ছ কেন? গায়ে পড়ে ডাকলে ভাববে আমাদেরই গরজ। তখন ডিলিং অন্যরকম হবে। দায়গ্রস্ত বিক্রেতা বুঝে ফেললে দাম কম দেবে। দরাদরির জায়গা থাকবে? উই শুড বি ক্লো অ্যান্ড স্টেডি। এবার তুমি কিছু বলো।"

সায়ম বলল, "আমার কাছে একজন প্রোমোটার অ্যাপ্রোচ করেছিলেন। নবেন্দুর থেকে বেটার প্রিভিলেজ দেবেন বলে সাধাসাধি করছিলেন। তাঁকে একবার ডাকা যেতে পারে। তবে নবেন্দুর পিছিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। আগের প্রোপোজ়ালে পোষাচ্ছিল না বলে ডাকছি। এই অভিনয়টা করতে হবে।"

সপ্রশংস চাহনিতে প্রিয়নাথ তাকালেন, "স্ট্রেঞ্জ! তুমি তো বাড়িটা রাখতে চাইছিলে! অ্যাপার্টমেন্ট হচ্ছে না শুনলে তোমার খুশি হওয়ার কথা। পরিবর্তন প্রশাসনে না এলেও তোমার মধ্যে এসে গেল? কেন তোমার মত বদলে গেল খুলে বলবে? আমার কথায় বিরক্ত হয়ে বলছ না তো? আমি কিন্তু হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।"

অদিতি কৌতূহলে জানতে চায়, "হাত বাড়ানো মানে?"

হালকা হাসি প্রিয়নাথের চিবুকে, "ওটা সিক্রেট। ডিল ক্যানসেলের খবর জানাতেই সিঁড়ি ভেঙে উঠেছিলাম, বুঝেছ? পরিস্থিতি দেখে বলিনি। কাল রাত সাড়ে সাতটায় নবেন্দু ফোন করে জানিয়েছিল। দেখো, তুমি যদি ভাবো বাড়ি অক্ষতই থাকুক, আমি জোর করব না। তোমাদের ব্যাঙ্কের মিস্টার লাহিড়ির সঙ্গে দোকানে দেখা হল। কথায়-কথায় জানলাম যে রিটায়ারমেন্টের সময় চল্লিশ লাখ পেয়েছেন। আই কনফেস, আমার ভুল ধারণা ছিল। তোমার আরও কয়েক ধাপ প্রোমোশন হবে। টাকাকড়ির প্রবলেম হবে না। হঠাৎ আমার মনে হয়েছে মানি ইজ় নট এডরিথিং। শেখরের তো কত টাকা, বিদেশে থাকার সময় উপার্জন করেছে, লুক্রেটিভ স্যালারি পায়। তবু ওর জীবন কেমন শূন্য হয়ে গেল! সন্তান হারানোর দুঃখের কাছে টাকাকড়ি তুচ্ছ ব্যাপার। তুমি হয়তো জানো না যে, আমি অনেকদিন উপনিষদ চর্চা করছি। তা বলে বৈরাগ্য এসে গিয়েছে ভেবে নিও না। তোমার প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি তৈরি হচ্ছে। তোমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা কেন করব আর? তুমি চাইলে বাড়ি বিক্রি, ফ্ল্যাট এসব লাইনে হাঁটায় স্টপ দিয়ে দেব।"

সায়ম বলল, "নতুন দুটো ফ্ল্যাট পাব।"

"তাই তুমি রাজি এখন?"

"না। এত বড় বাড়িতে ফাঁকা লাগে। কেমন যেন স্তব্ধতা। সারা পৃথিবী স্পেস প্রবলেমে ভুগছে। অনেক ফ্ল্যাট, অনেক মানুষ। কোলাহল। অনেক পরিবারের আশ্রয়। বোনাস হিসেবে লিকুইড ক্যাশ। মাটিছাড়া হলে আমি এখনও আপত্তি করব। ক্যাশ কম নিন, নতুন দুটো ফ্ল্যাট কিন্তু মাস্ট। অনেক কমপ্যাক্ট এবং অনেক কাছাকাছি।"

স্বপ্নে মায়ের পঞ্চপল্লব দিয়ে ঘট সাজানোর প্রসঙ্গ বলতে পারল না সায়ম।
প্রিয়নাথের ঠোঁট কাঁপল, "আমি খুশি। অদিতি, তোমারও খুশি হওয়ার কথা। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মুষড়ে পড়েছ। বি স্পোর্টিং। বেশি পাওয়ার আশা হতাশায় পরিণত হয়। তোমরা দু'জন কর্মক্ষেত্রে সফল। দাদুভাইও হবে। তোমারও যে প্রোমোশন হয়েছে, খাওয়াবে না?"
"কী খাবেন বলুন?"
"নতুন কোনও মেনু। খাদ্যাভ্যাসে আমি মান্ধাতা আমলের, হালফিলের খোঁজ রাখি না।"
"ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন?"
"আমার কোনও চয়েস নেই।"
অদিতি বলে, "রাতে বানাব।"
রান্নাঘরের দিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে অদিতি চলে গেলে প্রিয়নাথ ফিসফিস করে বলেন, "কী উপহার নেবে ঠিক করলে?"
সায়ম অপ্রস্তুত হয়, "এখনও ভাবিনি।"
"ভুলে গিয়েছিলে? ওকে। টেক টাইম।"
সায়ম হাসে, "দেশবাড়ির জলহাওয়া তোমাকে দেখছি রিফ্রেশ করে দিয়েছে।"
নিরুত্তর প্রিয়নাথ গম্ভীরভাবে চশমা পরে নিউজপেপারে চোখ রাখলেন। তাঁর মিশন সাকসেসফুল। দু'টিতে বেজায় ভাব হয়েছে, কেরিয়ারেও উন্নতি, ফাটল ধরার কোনও চিহ্ন তাঁর চোখে ধরা পড়ছে না। এটা মুখ ফুটে ছেলেটার কাছে বলা যায়?

তড়িঘড়ি ব্যাঙ্ক যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সায়ম। নবেন্দু শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেল, ফ্ল্যাট এবং মোটাসোটা টাকার পরিকল্পনা আপাতত বন্ধ, এই পরিস্থিতিতে বাবার চোয়াল এঁটে বসে থাকাটাই প্রত্যাশিত ছিল। কোন রসায়নে এমনটা সম্ভব হল? জেটগতির যুগে মানুষের মনও কি দ্রুতগতিতে বদলাচ্ছে? জীর্ণ বাড়িটির মায়া সে ত্যাগ করে ফেলেছে। তবে কি মায়ার চেয়ে প্রাপ্তিযোগই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল তার কাছে?
স্বপ্নভঙ্গের দুঃখে অদিতি বিবর্ণমুখে বসে নেই। সহজ এবং স্বাভাবিক আছে। ব্যাগে টিফিন ভরে অদিতি বলল, "ফ্রায়েড রাইসের মালমশলা, চিকেন, ওগুলো আমিই কিনে আনব।"
"চিকেন বিকেলে কিনে দেব আমি।"
"সময় পাবে না। যাওয়ার সময় ডক্টর সেনগুপ্তর কাছে নামটা লিখিয়ে রাখবে। বিকেলে বসেন। তুমি বাবাকে একবার দেখিয়ে আসবে।"
সায়ম অবাক হয়, "বাবার কি শরীর খারাপ?"
"মনে হচ্ছে। রোহন বলছিল। রাতে বাবার জ্বর এসেছিল। আমাদের মুখ ফুটে বলেননি। ওঁর এমন জ্বর আট-ন'দিন ধরে আসছে। তাই কুসুমডিহি থেকে চলে এসেছেন। দাদু-নাতি মিলে কুসুমডিহির গল্প হচ্ছিল রাত পর্যন্ত।"
কাল রাতে রোহন দাদুর কাছে শোবে বলে আবদার করেছিল। দেশের বাড়ির গল্প শোনায় ছেলেটার বেশ কৌতূহল। ভাগ্যিস বায়না করেছিল। এই উপসর্গের কথা না হলে জানতেই পারত না।
"আট-ন'দিন জ্বর। খুব কাঁপুনি?"
"আমি অত বলতে পারব না। একবার দেখিয়ে নেওয়া দরকার,"
অদিতি ম্লান হাসে, "বয়স হচ্ছে। আগেভাগে সাবধান হতে ক্ষতি কোথায়? রমুদাও খাওয়ানোর জন্য বলছিল। ওকে ফোনে বলে দেব। এটা আমার তরফে। নাম লেখানোর কথাটা ভুলে যেও না আবার। আমি ফোন করে মনে করিয়ে দেব?"
"দরকার নেই। মনে থাকবে।"
"আমি অবশ্য তাড়াতাড়ি ফিরে আসব আজ। ক্লাস একটাই আছে। নতুন সেশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত চাপ কম। তবে তুমি ওই প্রোমোটারকে একবার ফোন করবে।"
অদিতি আশা ছাড়েনি। সায়ম জুতোর ফিতে শক্ত করে বাঁধে,
"দেখছি।"

{৩৩}

মেঘাকে নিয়ে সাতটা নাগাদ পৌঁছে গেল রমিত। ঘরে উৎসবের পরিবেশ। সিডি প্লেয়ারে গান চালিয়ে দিয়েছে সায়ম। জগজিৎ-চিত্রার গজল। রোহনের সঙ্গে ভিডিও গেমসে মেতে আছে মেঘা। অদিতি রান্নাঘরে ব্যস্ত। উঁকি দিয়ে রমিত লঘুচালে বলে, "খুশবু আসছে। প্রিপারেশন তাহলে মন্দ হচ্ছে না। কোথায় তালের পিঠে আর কোথায় ফ্রায়েড রাইস! দেশি মেনু শেষপর্যন্ত হেরে গেল!"
"বাজারে তাল তেমন পাবে এখন? এখনও তালের সিজন আসেনি।"
"তোমার শ্বশুর একগাদা তাল বয়ে আনবে ভেবেছিলাম।"
"অনেক কিছুই গুলিয়ে যাবে এখন। অ্যাডটা পরশু বেরবে। তোমার বন্ধুই বলছিল। তোমার চিরকুমার সাজার শখ পাবলিকালি ক্লোজড হবে। সেই আনন্দে মনে হয় ভুলভাল বকছ।"
"ম্যাডামের সঙ্গে কথায় পেরে উঠব না। সায়ম, একটু ঘুরে আসি চল।"
স্টেশন থেকে ওভারব্রিজের একটি অংশ নেমে গিয়েছে একেবারে বাইরে, টিকিটবিহীন প্যাসেঞ্জাররা এটি খুব পছন্দ করে। তার মাঝের ধাপে বসে রমিত বলল, "তুই কেমন ড্রাফ্ট করেছিস বিজ্ঞাপনটার?"
"মাপা শব্দ, মাপা ফিরিস্তি। সত্য গোপন না করতে বলেছিলি। একটি বারো বছরের দত্তক কন্যা আছে। উদারমনস্কা পাত্রী চাই। তোর নম্বর দিয়েছি। তখন একবার চোখ বুলিয়ে নিতে বলেছিলাম। গুরুত্ব দিলি না। হঠাৎ যে আগ্রহ দেখাচ্ছিস!"
রমিত ঘাড় নাড়ে, "তাহলে ঠিক আছে। নামটা না থাকলেই হল। আমি এখনও কনফিউশনে আছি। পিছিয়ে যেতেও পারি। যদি পজিটিভ রেসপন্স আসে তখন মেঘাকে বুঝিয়ে বলব। আফটার অল, আমার একমাত্র গার্ডিয়ান!"
সায়ম হাসে, "সুলগ্নাকে দেখলাম তোর বাইকের পিছনে।"
"পিছনে নয় চাঁদু, একসঙ্গে। কৌতূহল হচ্ছে?"
"হ্যাঁ।"
"চিনিস মহিলাকে?"
"চিনব না? সুলগ্নার বাড়ি তখন অনেক যুবকের তীর্থস্থান ছিল। তোর তো ওসবের বালাই ছিল না। ওর বাড়িতে কেউ এন্ট্রি পেত না। শুধু একঝলক দেখা বা ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কতজন হা-পিত্যেশ করে ঘুরে বেড়াত।"
রমিত মৃদু হাসে, "এখনও অ্যাট্রাকটিভ। ওর মেয়ের হঠাৎ ডি-হাইড্রেশন হয়েছিল, নার্সিংহোমে ভর্তি ছিল। মেঘার নাচের গ্রুপে নাচ শেখে। মেঘাকে সুলগ্না খুব পছন্দ করে। তাই একবার ফরমাল ভিজিটে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় লিফ্ট দিলাম।"
"গল্প করছিলি খুব?"
রমিত বলে, "ওই বয়সটা পেরিয়ে এসেছি। গল্প করাও বারণ? তুই যে দেখছি টিপিকাল হয়ে যাচ্ছিস! সঙ্গে মহিলা, পুরুষ সওয়ারি কথা বলছে, অমনি অন্য গন্ধ পেতে শুরু করলি। সুলগ্না নাচের স্কুল খোলার তোড়জোড় করছে। মেঘাকে ওখানেই ভর্তি হতে বলছিল, কেজো গল্প সব।"
"শুনেছিলাম ও বিদেশে সেটল্ড।"
"বর এখানেই ফিরেছে। কলকাতায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আছে এখন। প্রজেক্টের কাজে ফ্রান্সে গিয়েছে। ছ'-মাস পর ফিরবে।"
সায়ম তির্যক গলায় বলে, "তার মানে নাচের স্কুলটা টেম্পোরারি। দু'দিন বাদে বন্ধ হয়ে যাবে। মেঘাকে ভর্তি করে লাভ হবে কোনও? টাইমপাস আর মানির জন্য শখের স্কুল চালাবে ক'দিন। মেঘার মধ্যে নাচের প্যাশন আছে। অকারণে ওর ছন্দটা ডিসটার্ব করবি। কাঁচাকাজ হয়ে যাবে।"
রমিত চিন্তিতমুখে বলল, "ঠিক বলেছিস তো! এমন ধরেছে সরাসরি

না বলা যাচ্ছে না। মেঘাও সুলগ্না আন্টি বলতে অজ্ঞান। মুশকিলে পড়লাম। আর-একটা হেঁয়ালি আছে বুঝলি? সুলগ্নাকে অনেক স্টুডেন্টের মায়েরা আড়ালে 'গুলবাহার' বলে। কেন বলে?"
পা ছড়িয়ে দেয় সায়ম, "তোর মাথা ঘামানোর দায় পড়েছে কেন? ভর্তি করবি না। স্ট্রেট না বলে দিবি। তোর মুখে সুলগ্না শব্দটা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। এতকাল ব্রহ্মচারী থেকে দেখিস এই বয়সে পা না হড়কে যায়!"
"তুই ভুলে যাচ্ছিস চাঁদু। ও পরস্ত্রী।"
লোকাল ট্রেন এইমাত্র প্যাসেঞ্জার উগরে দিয়েছে। মুখর কোলাহলের দিকে মুখ রেখে সায়ম বলে, "এখন ওটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়। তুই যে চারদিক ঘুরে বেড়িয়েছিস, জীবন দেখেছিস বলে দাবি করিস, পরকীয়া প্রেম জানিস না? চিরকাল ছিল এবং থাকবে। শেখরদার লাইফ এই অবৈধ সম্পর্কের জন্যই টালমাটাল হয়ে গেল।"
রমিত সিগারেটে অস্থির টান মারে, "হ্যাঁ, তুই শেখরদার কথা বলবি বলেছিলি। নিজেই এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলি। কী হয়েছে বিস্তারিত বল।"
শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ থাকে রমিত। ধীরগলায় জানতে চায়, "নীলাবউদি কেমন আছেন এখন?"
সায়ম উদাস, "ওঁর ভাইকে ফোন করেছিলাম। প্রতিদিন বিকেলে নীলাবউদি স্টেশনে চলে যান। প্ল্যাটফর্মে বসে থাকেন। এক-একটা ট্রেন থামলে কাতরচোখে তাকিয়ে থাকেন। আবার অপেক্ষা। জোর করে স্টেশন থেকে নিয়ে আসতে হয়। সারাদিন চুপচাপ। সকালে হারমোনিয়াম নিয়ে কিছুক্ষণ গলা সাধেন। যত বেলা গড়ায় ততই নিস্তেজ আর স্তব্ধ হয়ে পড়েন। বিকেল হলেই রিকশায় করে স্টেশন চলে যান, একদিনও ব্যতিক্রম হয় না, কাউকে সঙ্গে নিতে ঘোর আপত্তি। রাত আটটার দিকে ওঁর ভাই ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।"
"তোর শেখরদা এতটা ইরেসপনসিবল! একবার ভাবছেন না ওঁর মনের অবস্থা কী হতে পারে? ডিসগাস্টিং।"
মৃদু প্রতিবাদে সায়ম বলল, "মানুষকে মাপা অত সহজ নয়। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছিল। অদিতি যদিও বলেছে শেখরদা ফিরে আসবেন। শিওর! তোর কী মনে হয়?"
"আমি জ্যোতিষী নই। আজকাল কিছুই মেলে না হিসেবে। 'সামন্তভিলা' ছাড়তে হবে কখনও ভেবেছিলাম?" রমিতের গলায় বাষ্প, "একজন কলিগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। দশবছর বিয়ের পরও সন্তান হয়নি। সারা ভারত চষে বেড়িয়েছে। চিকিৎসা এখনও চলছে। আমি শুধু বলেছিলাম, আর কেন, দত্তক নিয়ে নাও। মহৎ কাজ। বাচ্চাগুলো হোমে পড়ে থাকে। অনেক হোমে আবার আদর্শ পরিবেশ নেই। অবহেলা, শোষণ। হোমের পাঁচিল টপকে ওরা এমনি পালিয়ে যায়? সে দপ করে জ্বলে উঠল, 'ইডিওলজির পেটেন্ট নিয়েছি নাকি আমি? কোথাকার কে, রক্তের ঠিক নেই, যাকে তাকে অ্যাডাপ্ট করে নেব।' আমি হতবাক হয়ে স্টাফরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। দত্তক নেওয়ার সংখ্যাটা অদ্ভুতভাবে কমে যাচ্ছে। একটি জার্নালে স্ট্যাটিসটিকস দিয়েছিল। অ্যাডপ্ট করা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা বলে তথাকথিত শিক্ষিত লোকের এমন দৃষ্টিভঙ্গি!"
"কেন বলতে গিয়েছিলি? পারসোনাল ম্যাটারে এন্ট্রি না নিলেই পারতি।"
রমিত গলা চড়ায়, "আমি থামব না। দত্তক নেওয়ার জন্য ক্যানভাসিং চালিয়ে যাবই। অত রিঅ্যাকশন করার কী আছে? রক্তের শুদ্ধতা নিয়েই ইন্ডিয়ান পাবলিক মরল। জাত, কুল, গোত্র। লাখ-লাখ টাকা খরচ করবে, এখানে ওখানে হত্যে দেবে, দত্তক নেওয়ার বেলায় জিনের পবিত্রতা হাজির হয়ে যায়।"
সায়ম মৃদু হাসে, "খুব রেগে আছিস দেখছি।"
"আমার ভীষণ রাগ হয়। ডিপ্লোমেটিক, বাক্যবাগীশ লোকেদের দেখে আজকাল প্রেশার বেড়ে যায়। দেখবি এরাই দিব্যি আছে। নিজেকে সংযত করি। ভাবি রেগে কোন সমাধানটা করতে পারব?"
সন্ধে থেকেই সায়ম চিন্তায় আছে। ডক্টর সেনগুপ্ত অনেকক্ষণ ধরে বাবাকে দেখলেন। সাধারণ জ্বরে এত খুঁটিয়ে দেখার কী আছে? মোটা অঙ্কের ভিজিট নিচ্ছেন বলেই হয়তো পেশেন্টের পিছনে সময় দেওয়ার ভান চলছে। তলপেট বরাবর টিপে দেখে ডক্টরের মুখের অভিব্যক্তি বদলে গেল।
চেয়ারে ফিরে এসে তিনি বললেন, "প্লীহাটা বেড়েছে। অ্যাবনর্মাল সাইজ। আপনি ব্লাড টেস্ট করিয়ে নিন। রুটিন ব্লাড টেস্ট। তবে ডব্লিউ বি সি কাউন্টটা ভাইটাল। শ্বেত রক্তকণিকা বোঝেন?"
মাথা নেড়েছিল সায়ম, "হ্যাঁ।"
"আমার এক্সপিরিয়েন্স বলছে কাউন্ট অ্যাবনর্মাল হতে পারে। রাতে ঘুসঘুসে জ্বর। স্ট্যান্ডার্ড জায়গায় করাবেন। জ্বরটা সাধারণ জ্বর নয়।"
"তাহলে?"
প্রিয়নাথের দিকে আড়চোখে একবার তাকালেন তিনি। মৃদুগলায় বললেন, "আপনি বাইরে গিয়ে বসুন। নেক্সট পেশেন্ট ওয়েট করছে। ছেলে থাকুক। ওকে মেডিসিন আর টেস্টগুলো বুঝিয়ে দিই।"
পরবর্তী রোগী দরজায় উঁকি মারল। ডক্টর সেনগুপ্ত অ্যাটেনডেন্টকে নির্দেশ দিলেন, "এক মিনিট পরে ওঁকে ডাকবে। নাউ লেট মি বি ক্লিয়ার। জ্বরটা রোগের উপসর্গ। জাস্ট সিগন্যাল। ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে কাল সন্ধেয় দেখা করবেন।"
সায়ম উদ্বেগে প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে?"
ডাক্তার সেনগুপ্ত চোয়াল কঠিন করেছিলেন, "আগেভাগে বলাটা এথিক্সের বিরোধী। কাল বাবাকে নিয়ে আসবেন না। রিপোর্ট দেখাবেন। শুধু আপনি এসে অ্যাটেনডেন্টকে পেশেন্টের নামটা ইনফর্ম করবেন। এবার আসুন।"
"আচ্ছা রমিত, প্লীহা সাইজে বাড়লে কী হয়?"
রমিত আবার সিগারেট ধরিয়েছে। সুখটান দিয়ে বলে, "পিলে চমকে যায়।"
"প্রশ্নটা সিরিয়াস।"
রমিত পা দোলায়, "তুই মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছিস?"
"তোকে আর ল্যাম্পপোস্টকে শোনানো একই ব্যাপার। ডক্টর সেনগুপ্ত বলছিলেন বাবার প্লীহা এনলার্জড হয়েছে। ডব্লিউ বি সি কাউন্ট বেড়েছে কিনা টেস্ট করাতে হবে। ওঁর এক্সপ্রেশনে সন্দেহ জাগল। হি সাসপেক্টেড সামথিং। অনেকদিন রাতে ঘুসঘুসে জ্বর আসছে।"
বিব্রতস্বরে রমিত বলে, "সরি। মেসোর সিম্পটম বলছিস বুঝতে পারিনি।"
"কিছু বুঝেছিস?"
"আমি লেম্যান। যদিও বাঙালিরা নিজেরাই স্বঘোষিত ডক্টর। বেঙ্গলে রেজিস্টার্ড ডক্টর থেকে স্বঘোষিত, জ্ঞানী ডক্টর সংখ্যায় বেশি। রিপোর্ট পেলে ডক্টর সেনগুপ্তই বলবেন। তবে..." রমিত কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়।
"থেমে গেলি কেন?"
"মেসোর ব্লাড-রিলেটেড কোনও প্রবলেম হতে পারে।"
"কী হয়েছিল তাঁর?"
"মনে করতে পারছি না," রমিত স্টেশনচত্বরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল।
"বাইপাস করছিস কেন?" আশঙ্কায় কেঁপে যায় সায়মের গলা।
"এবার উঠে পড়ি। অনেকক্ষণ আড্ডা হল। দেরি করলে তোর বউ ফায়ার হয়ে যাবে," রমিত প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে সুকৌশলে। বাঁদিকে গির্জার মাঠে অসংখ্য কবর। রমিতই বাইক চালাচ্ছিল। নির্বাক সায়মকে শান্তভাবে বলল, "তোর লাইফে আবার পরীক্ষা আসছে রে সায়ম। আগেভাগে বলাটা ইললজিকাল। মেসোর সিম্পটম ভাল ঠেকছে না। কঠিন সময়ে নার্ভ অবিচল রাখতে হয়। তুই সেটা পারবি। মানে পারতে হবেই।"

"কী হয়েছে তুই আন্দাজ করে ফেলেছিস?"
"ধর্মসংকটে ফেলছিস আমাকে। আমি কেন যে মুখ ফসকে বলে দিলাম! না বললে তুই টেনশান করবি। সো বি মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড। আমার ছোটমামার লিউকেমিয়া হয়েছিল। ওই যে বললাম, ব্লাড-রিপোর্ট পেলে শিওর হওয়া যাবে। মুখ কালো করে বাড়িতে ঢুকবি না। হাসিমুখে থাকবি। ফ্যামিলি পার্টির আনন্দটা তা হলে নষ্ট হয়ে যাবে।" ব্রেক কষল রমিত। একটা অটোরিকশা সামনে চলে এসেছিল। আলোময় রাতে শহর এখনও কর্মব্যস্ত। বর্ষা আসেনি, আবার তীব্র গরম, তবু কুয়াশাময় ঝাপসা লাগছে এই গির্জা, অশ্বত্থগাছ, ল্যাম্পপোস্ট, পীরের দরগা।

{৩৪}

কাল রাতে ছোটখাট উৎসবের চেহারা নিয়েছিল বাড়িটির অন্দরমহল। রোহন আর মেঘার হুটোপুটি, গজলের হালকা মূর্ছনা, টেবিলে বসে একসঙ্গে খাওয়া, গল্প, হাসিঠাট্টা। প্রিয়নাথ চেটেপুটে খাবাড় সাবাড় করলেন। ভূয়সী প্রশংসায় অদিতি ডগমগ। রমিত ফেসবুকে পোস্ট করা একটি কার্টুন পড়ে শোনাল। ইংলিশ টিচার ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভারত সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত দেশ হবে। কোন টেন্স?"
ছাত্র জবাব দিল, "ফিউচার ইমপসিবল টেন্স।"
কার্টুনে শিক্ষক দাঁত কড়মড় করে ছাত্রের চুলের মুঠি ধরে ফেললেন। প্রিয়নাথ শুনে একচোট হাসলেন, "বাহ। লোকটা রসিক আছে দেখছি।"
উৎসবের শেষে অন্ধকার নামে। বিজয়া দশমীর পর খাঁ-খাঁ মণ্ডপ, মেলা শেষ হবার পর বাঁশের কাঠামো, তক্তা, পেরেক, দীপাবলীর রাত নিভে যায় ঘুমের অন্ধকারে। উৎসবের এক পিঠে আনন্দ, অন্য পিঠে সকরুণ শূন্যতা। সাতসকালে প্যাথোলজিকাল ক্লিনিকে প্রিয়নাথের ব্লাড দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্কে গেল না। অদিতি জিজ্ঞাসা করল, "কেন? শনিবার ছুটি নেবে কেন?" প্রিয়নাথ প্রশ্ন করলেন, "মাইগ্রেনের ব্যথা ফিল করছ বলে ছুটি নেবে?"
সপ্রতিভ হবার চেষ্টায় হাসল সায়ম, "ছুটি নিই একদিন। এই ব্যাঙ্কে আমার আয়ু প্রায় ফুরল। একটা দিন ছুটি নেওয়ার স্বাধীনতা আছে আমার।"
লিগামেন্টে চোটের সময় পাঁচদিন বিশ্রাম নিয়েছিল। আজকে ছুটির নেপথ্যে রয়েছে উদ্বেগ। পাল্‌স রিট বাড়ছে ক্রমশ। রমিত অনুমান করেছে। ডক্টর সেনগুপ্ত ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন। ডায়াগনসিসে ভুলও হতে পারে। ব্লাড রিপোর্ট যে অভ্রান্ত হবে তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? সে অবশ্য বলে এসেছে, "ডক্টর সেনগুপ্ত রেফার করেছেন। স্পেশাল কেয়ার নেবেন কিন্তু। দরকার হলে দু'বার টেস্ট করে রিপোর্ট দেবেন।" ল্যাবটেকনিশিয়ান তার মুখ চেনা। তাদের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে, তিনি মুচকি হেসে আশ্বস্ত করেছেন। নিশ্চয়ই ভাবছেন সায়মবাবু লোকটি বেজায় খুঁতখুঁতে এবং নার্ভাস।
সে আসলে আসন্ন পরিস্থিতির জন্য তৈরি হচ্ছে। ঘন্টাখানেক 'গুগল' সার্চ করে লিউকেমিয়া সম্পর্কিত তথ্য মনোযোগ দিয়ে পড়ে ফেলেছে। নেট ঘেঁটে যদি এ টু জেড সমস্ত জানা যেত তা হলে সবাই নিজেরাই ডাক্তারি করতে পারত। নিখুঁত ডিটেলস পেলেও সে আর কতখানি বুঝবে? তা ছাড়া সিম্পটম সবক্ষেত্রে পুরোপুরি মেলে না। পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারলে শান্তি আসত। মনে অস্বস্তির কাঁটা গেঁথে আছে। শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হওয়াটাই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ডক্টর সেনগুপ্ত ডব্লিউ বি সি কাউন্টের উপর জোর দিয়েছেন। রিপোর্ট খারাপ হলে কীভাবে এগোবে সে? প্রিয়নাথের কাছে প্রথমে গোপন রাখতে হবে। করাতচেরা চোখ, মিথ্যেটা সাজিয়ে-গুছিয়ে সহজভাবে পেশ করতে হবে। অভিব্যক্তিতে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠলে ঠিক ধরে ফেলবেন। অদিতিকে শান্ত, নিরুদ্বেগ থাকতে হবে, বাহ্যিক আচরণে অস্বাভাবিক হওয়া চলবে না। কোথায়, কীভাবে ট্রিটমেন্ট শুরু করবে তার আগাম ও দ্রুত পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। মায়ের বেলায় লক্ষণ প্রকট ছিল, বাবা মানসিকভাবে সামলে দিয়েছিলেন, চিকিৎসা সম্পর্কিত দৌড়ঝাঁপ সে নিজে করলেও বাবা গাইড করতেন। এবার সে সম্পূর্ণ একা, ঘাত-প্রতিঘাত মিলিয়ে পুরো দায়িত্বটাই তার। ভাগ্যে সে বিশ্বাসী ছিল না কাল পর্যন্ত। রাতে অদিতির ডাকে সে সাড়া দেয়নি। মাঝরাত পর্যন্ত জেগে ছিল একা। রাতজাগার ছিল সাক্ষী শুধু উন্নতশির নারকেল গাছটি। অশ্রুতে সে বিড়বিড় করে উঠেছিল, কেন, তাকেই বারবার পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে কেন? মা অকালে কার্সিনোমায় চলে গেলেন। প্রথম বিয়ের অধ্যায় ক্ষতবিক্ষত করার পরও সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, দাম্পত্য জীবনে স্নায়ুযুদ্ধ চলল এতকাল, মনে হচ্ছিল নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে, আলোর সুষমায় উদ্ভাসিত হবে তার মধ্যবয়স। আনন্দরেখা মুছে যায় কেন বারবার? আবার ক্যানসার হসপিটালের ভারী বাতাস ফিরে আসবে, মৃত্যু অসময়ে ইশারায় ডাকবে প্রিয়জনকে?
আজ ক্লান্তি ঝেঁপে এলেও ঘুমোতে ভয় করছিল। ঘুমোলে যদি মৃত্যুর কোলাজ হানা দেয়!
গান শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। সিডি চালিয়ে দিল সায়ম, 'আমারে করো জীবনদান/ প্রেরণ করো অন্তরে তবে আহ্বান/ আসিছে কত যায় কত/ পাই শত হারাই শত / তোমারি পায়ে রাখো অচল মোর প্রাণ...'

গানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গিয়েছে। আজ তার গান কণ্ঠ পাবে, রেকর্ডিং স্টুডিওর সুইংডোর ঠেলে সে ঢুকে পড়ল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এক সুরকার তার লিরিক্‌সে সুর দিয়েছেন, মিউজিক কম্পোজ এবং রিহার্সাল পর্ব শেষ, আজ ফাইনাল রেকর্ডিং। সুইংডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই সে কাউকে দেখতে পেল না। কেউ নেই। একা বিস্ময়বিষ্ঠ দাঁড়িয়ে থাকল সে। সেই সুরকারও অদৃশ্য। স্টুডিওর ভুতুড়ে নীরবতা ছেড়ে এক পা-এক পা করে পিছিয়ে আসছে। সমবেত অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বদ্ধঘরের দেয়ালে। এবার সে দৌড়ে পালাবে। হুমড়ি খেয়ে সে গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। হাঁটুতে চোট লেগেছে সম্ভবত। যন্ত্রণায় অবশ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু। কেউ তাকে ঠেলা দিচ্ছে আড়াল থেকে।
কী আশ্চর্য, বাবা কেন বসে আছে পায়ের কাছটিতে। মহানগরের জনস্রোতে বাবা কীভাবে তাকে খুঁজে পেল। কেন ঝাপসা হয়ে আসছে তাঁর মুখ?
এবারে সে সংকোচে উঠে বসল। বাস্তবিকই প্রিয়নাথ তার পায়ের কাছে বসে আছেন। সে তবে স্বপ্ন দেখছিল? কেন ঝাপসা হয়ে আসছে তাঁর মুখ?
"ঘুম ভাঙল তাহলে। ছটফট করছিলে, হাঁটু দেওয়ালে আলগা ধাক্কা খেল, দরদর করে ঘামছ। খারাপ কোনও স্বপ্ন দেখছিলে?"
"মনে পড়ছে না," সায়ম জড়ানো গলায় বলল। দুপুরে তার বিছানায় প্রিয়নাথ কেন বসে আছেন আজ? কারণ খুঁজছিল সায়ম।
"গান কিন্তু বেজেই চলেছে," প্রিয়নাথ মৃদু হাসেন।
গান চলছিল। "তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ / ও মোর ভালোবাসার ধন / দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন।"
"বন্ধ করে দেব?"
"থাক। শুনতে ভালই লাগছে। ঈশ্বরপ্রেমের গান। তুমি যদিও ঈশ্বরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো না।"
সায়ম কুণ্ঠিতভাবে বলল, "শোনার মুহূর্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি। রবীন্দ্রনাথের গান এই বিশ্বাস ছাড়া অনুভব করা যায় না। শেখরদার কাছ থেকে শিখেছি আমি। উনি নাস্তিক কিন্তু পূজাপর্বের গানগুলো প্রায় মুখস্থ।"
প্রিয়নাথ অদ্ভুতচোখে তাকালেন, "ফিলজফিটা মন্দ নয়। একাত্ম হতে না পারলে ভালবাসা তৈরি হয় না। আমাকে সিডিটা পুরো শোনাবে তো একদিন। আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি। তোমার একটা চিঠি এসেছে। মনে হল ইম্পর্ট্যান্ট। উপরে এসে দেখি গান চলছে। আর তুমি ঘুমের

AMARBOI.COM

মধ্যে ছটফট করছ। মনে তোলপাড় চলছে খুব?"
"না।"
"বেশ," প্রিয়নাথ বুকপকেট থেকে খামটা বের করে হাতে দিলেন "কোনও পত্রিকার চিঠি।"
খামে চোখ রাখতেই হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল তার। কুলীন পত্রিকার পাঠানো খাম। দ্রুত খামের মুখ খুলে সে অপ্রত্যাশিত আনন্দে নির্বাক হয়ে গেল একমুহূর্ত। ঘরে দশখানা আতসবাজি যেন আলোর ফুলঝুরি হয়ে ফেটে পড়ছে। খেলাচ্ছলে শূন্য প্রত্যাশা রেখেই সে পাঠিয়েছিল। একবারও ভাবেনি তার পাঠানো কবিতা প্রথমবারেই মনোনীত হয়ে যাবে। একবছর আগের লেখা পরিমার্জনা করে পাঠিয়েছিল প্রায় তিনমাস আগে।
প্রিয়নাথ সাগ্রহে জানতে চাইলেন, "কী আছে ওতে?"
"আমার কবিতা মনোনীত হয়েছে।"
"কবিতা আজকাল কেউ পড়ে না। বাট সাকসেস ইজ সাকসেস। তোমার সময় ভাল যাচ্ছে। আউট অব ট্র্যাক হয়ে যাবে ভেবে একটা সময় তোমাকে বাধা দিতাম। এখন তুমি বিয়াল্লিশ, ব্যাঙ্কের অফিসার, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তোমার। এই মুহূর্তটাও তোমার। আনন্দ তো ক্ষণস্থায়ী। সো লেটস এনজয় উইথ টি অ্যান্ড স্ন্যাক্স। একটু পরে নীচে নেমে এসো। ততক্ষণে রেডি হয়ে যাবে," প্রিয়নাথের ঠোঁটে শেষ দুপুরের আলো।
আনন্দ সত্যিই মুহূর্তপ্রিয়। প্রাপ্তির উচ্ছ্বাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারল না। কবি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সে অনেকদিনই বিসর্জন দিয়েছে। বঙ্গদেশে হাজার-হাজার কবিতার জন্ম ও মৃত্যু হয়, ছাপার অক্ষরে নিজেকে দেখার মধ্যে আত্মসুখ থাকলেও খ্যাতির কাঙালপনা অজান্তে হানা দেবে। সুরলোকের জগতে ক্রমাগত অবহেলা পেতে-পেতে তার মধ্যে নিস্পৃহভাব এসে গিয়েছে। সময়ের হাতে সব ছেড়ে দিয়েছে সে। নিজেকে নিয়ে ভাবার মতো পরিস্থিতি এখন আর নেই। একঘণ্টা পরে সে ব্লাডটেস্টের রিপোর্ট আনতে যাবে। তার মতো আটপৌরে মানুষের বেলায় জীবনের চেয়ে শিল্প জরুরি হতে পারবে না।
হয়তো এই অপ্রত্যাশিত চিঠিটি কোনও শুভবার্তার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। অকারণ ভয় পাচ্ছে সে। ব্লাডরিপোর্ট নরমাল হবে। অন্ধকারে ফুটে উঠবে তরঙ্গায়িত আলো। বিপর্যয় আসবে না। মন বলছে দিনের অন্তিমলগ্নেও সুসংবাদ আছে।
সায়ম প্রায় ভাসতে-ভাসতে নেমে আসে নীচে। টেবিলে ধূমায়িত চা এবং চানাচুর। প্রিয়নাথ বললেন, "বোসো, তুমি না এলে শুরু করতে পারছিলাম না। অদিতির ফিরতে দেরি হবে। পঞ্চমীর কাছে বাস উলটে গিয়েছে। রাস্তায় জ্যাম, আটকে পড়েছে। তোমার ফোন সুইচ্‌ড অফ ছিল।"
প্রিয়নাথ চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন, "ভাল বানাতে পারিনি। তাড়াহুড়োয় করেছি।"
"খারাপ হয়নি।"
"আমার জিব বলছে খারাপ," প্রিয়নাথ মৃদু বিরক্তির সুরে বলেন, "মন রেখে কথা বলছ কেন? স্পষ্টভাবে বলতে শেখো। যাই হোক, সেলিব্রেশনটাই মুখ্য। স্বাদে কী এসে যায়!"
আশ্চর্য, ব্লাড রিপোর্টের প্রসঙ্গ উচ্চারণও করলেন না একটি বার। হয়তো ভেবেছেন রুটিন টেস্ট, বিচলিত হবার কোনও ব্যাপারই নয়। আশ্বস্ত সায়ম জামাপ্যান্ট গলিয়ে প্রস্তুতি নেয়। পেশেন্ট বুদ্ধিমান এবং সচেতন হলে গোপন রাখার কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়।
পাঁচমিনিটের রাস্তা। তবু সায়মের আঙুল চলছিল না। গিয়ার চেঞ্জ করতে ভুলে যাচ্ছিল।
রিপোর্টে শ্বেত রক্তকণিকা সত্তর হাজার। হিমোগ্লোবিন নরমাল রেঞ্জের নীচে। সায়মের চোখ স্থির হয়ে গেল। ইমপ্রেশনে লেখা আছে 'ক্রনিক মায়েলোইট লিউকেমিয়া'। মানে ব্ল্যাড ক্যানসার! সে পারমিশন নিয়ে পরিচিত সেই ল্যাব টেকনিশিয়ানের ঘরে ঢুকল। "আপনি কনফার্মড?"
"হ্যাঁ। কমন টেস্ট। ভুলের সম্ভাবনা অলমোস্ট জিরো। আপনার রিকোয়েস্টে দু'বার দেখেছি। আপনাকে ফ্যাকাসে লাগছে কেন? টুলটায় শান্ত হয়ে বসুন। আমি জাস্ট টেকনিশিয়ান। ডক্টর নই। এখনই খুব খারাপ ভেবে আপসেট হবেন না। ডক্টর সেনগুপ্তকে রিপোর্ট দেখান। দেখুন, উনি কী সাজেশান দেন?"
দুঃস্বপ্নের সুইংডোর পেরিয়ে জনবহুল রাস্তায় পা রাখল সায়ম। বাড়ি আপাতত সে ফিরবে না। তাকে কোথাও যেতে হবে। জনসমুদ্র, কোলাহল, শব্দের আলোড়ন পেরিয়ে শান্ত নীরবতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে থাকবে কিছুক্ষণ। আজ বিকেলটা ঈশ্বর নয়, অফুরান মায়া নেই তার শরীরে, বড় কৃপণ এবং নির্দয় ব্যাপারী।
শহরপ্রান্তের মোরাম-মাদুরে একা বসে সে দেখল কংসাবতীর বিস্তীর্ণ চর, বিষাদনীল দিগন্ত আর বেলাশেষের ট্রেন। গানের মৃত্যু হলেও মৃত্যুগান ফিরে এসেছে তার কাছে...

{৩৫}

দিদিমণি হঠাৎ রমিতকে ডেকে বলল, "আপনি মেঘাকে এখানে নাচ শেখাবেন তো?"
থতমত রমিত বলে, "কেন শেখাব না?"
"আপনার সঙ্গে দিয়ার মায়ের গুড টার্মস আছে। উনি কাজটা ভাল করছেন না। উনি নাকি নাচের স্কুল খুলবেন! এখানে গার্ডিয়ান লেভেলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। আমার ছাত্রী ভাঙানোর চেষ্টা আমি বরদাস্ত করব না। উনি প্রাইভেট স্কুলে চাকরি করেন। নাচ শেখানো আমার সাইড-বিজনেস নয়। তিলে-তিলে গড়ে তুলেছি। আমার জীবিকা এটা। দু'-তিনজন ছাত্রী চলে গেলে ক্ষতি হয়তো হবে না।

মুশকিল হল ওদের দেখে বাকিরাও যদি একই পথ ধরে!"
রমিত সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ে। দিদিমণির রাগ হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর রুটিরুজির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।
দিদিমণি গম্ভীরমুখে বলেন, "বাবা-মার একমাত্র মেয়ে। ডিভোর্সের সুবাদে প্রচুর টাকা পেয়েছেন। সব খবরই আমি রাখি। নাচ উনি দুর্দান্ত করতেন, পেশাদার হলেও তা আমি স্বীকার করছি। শহরে নতুন নাচের স্কুল খুলে ঠিকঠাক চালানো কঠিন ব্যাপার। বিদেশ নয় এটা। ইনফ্যাক্ট, উনি আমার চেয়ে দু'বছরের সিনিয়র। ডাইরেক্ট অপ্রিয় ব্যবহার করতে খারাপ লাগবে। মেয়ে বলেই একজন ডিভোর্সি মেয়ের যন্ত্রণা আমি বুঝি। আপনি প্লিজ বোঝাবেন। দিয়া এবং মেঘা দু'জনেই আমার ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট। টাকার জন্য নাচ শেখালেও ভাল ছাত্রী তৈরি করার মধ্যে তৃপ্তি আছে। ওরা চলে গেলে দুঃখ পাব খুব।"
স্তম্ভিত রমিত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। গুলবাহার নামের তাৎপর্য এখন তার কাছে পরিষ্কার। নার্সিংহোমে দিয়াকে পরপর দু'দিন দেখতে গিয়েছিল সে। তখনও মিথ্যের ফুলঝুরি উড়িয়েছে সুলগ্না। বর খুব উদ্বিগ্ন, ফ্লাইটে দরকার হলে চলে আসবে, সামান্য ডিহাইড্রেশনের জন্য প্রজেক্ট ফেলে ছুটে আসতে মানা করে দিয়েছে সে। মিথ্যের পর মিথ্যে বুনে আসলে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে সুলগ্না। ছোট শহর, গোপন রাখার চেষ্টা কাজ দেবে না আখেরে, এই সরল সত্যটা বুঝতে পারেনি সে? এভাবে একজন সপ্রতিভ, ছটফটে, বুদ্ধিদীপ্ত মহিলা সবার চোখে হাসি এবং করুণার পাত্রী হয়ে উঠবে কেন? একটা মিথ্যে হাজার মিথ্যের দরজা খুলে দেয়। সুলগ্না যে সত্যিই একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী তা কেউ বিশ্বাস করছে না। সবাই প্রায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখনও পর্যন্ত তিনজনের বেশি ছাত্রী জোগাড় করতে পারেনি সুলগ্না। কেন সত্যিটা বলতে পারল না সুলগ্না?
দিয়া অসুস্থ ছিল বলে বিশ্রাম নেবে আপাতত। সুলগ্না তেমনই বলেছিল। ভাবতে-ভাবতেই ফোন রিংটোন নিয়ে জাগল। মোবাইল স্ক্রিনে সুলগ্না। ভদ্রতার খাতিরেই ধরল রমিত।
"হ্যালো।"
"আপনি নাচের স্কুলে?"
"হ্যাঁ।"
"কী ভাবলেন?"
"মেঘা এখানেই নাচ শিখবে। তোমার হাজ্বব্যান্ড আর ছ'মাস পর ফিরবে। তুমি নৈহাটি চলে যাবে। মাত্র ছ'মাসের জন্য শখের স্কুল খুলছ। কীভাবে মেঘাকে ওখানে ভর্তি করব বলো! এই সহজ কথাটা না ভেবে ভুল করেছ। নিজের টাইমপাসের প্রয়োজনে বাচ্চা মেয়েগুলোর নাচের কেরিয়ার কী হবে ভাবলে না? বুঝতে পারছ না এই পয়েন্টেই সবাই পিছিয়ে যাচ্ছে? তোমার এই বানানো মিথ্যেই এখন সবচেয়ে বড় বাধা। বুঝতে পারছ না তুমি?" অজান্তেই রমিতের গলা উচ্চগ্রামে পৌঁছে যায়।
ওপ্রান্ত কিছুক্ষণ নিরুত্তর।
"আপনি একবার আসবেন?"
"কোথায়?"
"কোনও রেস্তরাঁয়? নাচ শেষ হতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে।"
"কেন?"
"জোর করব না। জানি আপনি মুখ ঘুরিয়ে নেবেন। হয়তো এখানেই সব শেষ। সেল্ফ-কনফেশনের সুযোগ দেবেন না একবার?"
সুলগ্নার আর্তি দুর্বল করে দিল রমিতকে। সে শুধু বলল, "ঠিক আছে, এসো।"
"আমি গ্রিনভিউ রেস্তরাঁয় পৌঁছে যাচ্ছি। প্লিজ, ওয়েট করবেন।"
সুলগ্নার প্রতি তার অপ্রত্যাশিত ক্ষোভ হল কেন? বেশিদিন নয়, মাত্র তিনসপ্তাহের পরিচয়, মেঘাই সূত্র সেখানে। ঘোরার সূত্রে, পেশাগত ক্ষেত্রে এমন কতজনের সঙ্গেই তো তার আলাপ হয়। কাউকে গুরুত্ব দেয়নি। কারও জন্য এমন তাগিদ অনুভব করেনি। আজ তার এমনটা হচ্ছে কেন? সুলগ্নাকে নিজের রাগ উজাড় করে দিল। নিছক রাগের বহিঃপ্রকাশ ছাড়াও সহানুভূতি হয়তো ছিল।
প্রথমে রমিত ভাবল, কেন যাবে? সুলগ্নার আমন্ত্রণে সাড়া দিতেই হবে? কনফেশন শোনার কী প্রয়োজন পড়েছে তার? শ্রোতার ভূমিকায় থেকে কারও ব্যক্তিগত সুখদুঃখের গভীরে ডুব দেওয়ার কোনও মানে হয়?
মনের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করল রমিত। শেষপর্যন্ত সে হেরেই গেল। অবাধ্য দু'খানা পা রেস্তরাঁর দিকে টানছে বারবার। এই অদম্য আকর্ষণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না রমিত। সুলগ্না যেন তার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল। মিষ্টিসুরে হাসে, "ড্যাম লায়ার মহিলাটি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে চলুন।"
মিহি সবুজ আলোয় স্বপ্নিল পরিবেশ। পুরনো দিনের জনপ্রিয় হিন্দি গান বাজছে মিহিসুরে। কমলা কুর্তি আর সাদা জিনসে সুলগ্না অপরূপা। মুখে বিষণ্ণ আঁচড়। চোখে উদাসী সুদূর। মেনুকার্ডে চোখ বুলিয়ে সুলগ্না বলে, "কী নেবেন?"
"তোমার যা চয়েস। পেট ভর্তি আছে। হালকা কিছু বলো।"
"আলুর পরোটা আর চিকেন ভর্তা বলি?"
"হ্যাঁ।"
"এত তাড়াতাড়ি আপনার রাগ পড়ে গেল?" সুলগ্না মুচকি হাসে।
"এসির হাওয়ায় ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে," রমিতের সপ্রতিভ উত্তর।
"আপনার একবারও মনে হচ্ছে না কেন এলেন? চার্চের কনফেশন বক্স কেন হবেন আপনি?"
রমিত মনে-মনে চমকে গেলেও দুর্বোধ্য হাসি ফুটিয়ে তোলে মুখে। সুলগ্না কি থট রিডিং জানে? দশ মিনিট আগে এই টানাপোড়েনেই সে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।
"লিভ ইট। মিথ্যে আশ্রয় প্রতিটি মানুষই নেয়। উদ্দেশ্যটা খারাপ না ভাল সেটাই প্রশ্ন। মেঘাকে আপনি অ্যাডপ্ট করেছেন। বাইরের পৃথিবীতে গল্পটা কিন্তু অন্যরকম। মা-মরা মেয়ে। রমিত সামন্ত আনম্যারেড তা অনেকেই জানে। মেঘাকে পাবলিক অন্য চোখে দেখুক, সিমপ্যাথি দেখাক এটা আপনি চান না। আপনিই বলেছিলেন সেদিন। আমিও ডিফেনসিভ হতে চেয়েছিলাম। কেন বলুন তো?"
সুলগ্নাকে আক্রমণ করবে ভেবে এসেছিল। এখন সে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। রমিত বিরসমুখে বলল, "জানি না।"
"আই মিস ইয়োর উইট। ডিভোর্সি মহিলাকে সোসাইটি খাটো চোখে দেখে। পুরুষজাতটা বেসিকালি লোভী। ডিভোর্সি মহিলা মানে সহজলভ্য কমোডিটি। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গল্পটা তৈরি করেছিলাম। পরে বুঝলাম ভুল করেছি। নিজের তৈরি জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না। স্টিল দ্য স্টোরি সেভড মি সামটাইম। বিবাহিত মহিলা হলে পুরুষরা দুম করে ডেসপারেট হতে পারে না। আপনার কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন," সুলগ্না হাঁপাচ্ছিল। গ্লাসে রাখা জল ঢালল গলায়। অকপট স্বীকারোক্তি। কোনও অকারণ লজ্জা অথবা দুঃখে কুঁকড়ে যায়নি সুলগ্না। সকৌতুক তার চোখের দৃষ্টি। রমিতের অস্বস্তি হচ্ছে। সে নিচু গলায় বলল, "আমার কোনও প্রশ্ন নেই।"
"কেন বিচ্ছেদ হল জানার ইচ্ছে হয় না?"
"প্রাইভেসিকে আমি সম্মান করি," রমিত অল্প হাসল।
"আপনি ঠিকঠাক পুরুষ নন। সামনে একজন ডিভোর্সি মহিলা, স্টিল অ্যাট্রাকটিভ, কনফেশন করতে চাইছে। আপনি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। বন্ধুত্বের খাতিরেও জানতে চাওয়া উচিত ছিল।"
রমিত সাবলীল হতে পারল এবার, "হঠাৎ আমাকেই সমস্ত কিছু বলতে চাইছ কেন?"
ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে সুলগ্না, "আপনি কোনও নারীর সংস্পর্শে কখনও আসেননি। আই গেস। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে এটা জানলে আপনার কাউন্সেলিং করা হত। ডক্টরস উড কনসিডার ইউ অ্যাবনর্ম্যাল। ক্রসিং ফর্টি বাই স্টিল নট ইন্টারেস্টেড! দ্যাটস হোয়াই সামথিং ইজ রং। আপনার চোখ অন্য কথা বলে। জানতে চায়। কতকাল নিজের সঙ্গে

ছলনা করবেন? চোরাচাউনিতে কী দেখছিলেন এতক্ষণ?"
রমিত ঘাবড়ে গিয়ে গলা ভেজায়। কী কুক্ষণে এখানে এসেছিল সে!
"বেশ করছিলেন। আপনি পুরুষ। কখনও কাছাকাছি আসেননি কারও। আপনার চোখ তৃষ্ণার্ত হতেই পারে। আমার কোনও ট্যাবু নেই। পাশ্চাত্যের লোকেরা সেক্স নিয়ে ভণ্ডামি করে না। আমারও ইনহিবিশান কেটে গিয়েছে। সারাজীবন একজনের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিলাম। আমি গ্রিন সিগন্যাল দিলে স্কুললাইফ থেকে চুটিয়ে প্রেম করতে পারতাম। অনেকেই পাঁচটা ছেলের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করে, শয্যাসঙ্গী হয়ে লাইফকে এনজয় করেছে। বিয়ের পর তারা হ্যাপি কনজুগাল লাইফ লিড করছে। কোনও ছাপ পড়েনি। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, ভাইজাগে থাকে। অনেকে বিদেশে। আমার বেলায় এমনটা ঘটল কেন?"
সুলগ্না ঠোঁট চাপে, "আমার প্রাপ্তির ঘর যে শেষপর্যন্ত শূন্য!"
আলুর পরোটা মুখে পুরে চুপ করে থাকে রমিত। সুলগ্নাকে প্রথম আলাপে মাপতে ভুল করেছিল সে। সচ্ছল, অহঙ্কারী। বড়লোকের গর্বিত বউ। সুন্দর মিথ্যে দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছিল সুলগ্না। অন্তরঙ্গে দুঃখী সুলগ্নাকে সে চিনতে পারেনি।
ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছে ম্লানগলায় সুলগ্না বলে, "নাচের স্কুল খোলার প্ল্যান আপাতত বন্ধ। নিজের তৈরি মিথ্যেটাকে ভাঙতে সময় লাগবে।"
রমিত প্রশ্ন করল, "চাকরির চেষ্টা করোনি কেন?"
"যখন দেশে ফিরে এলাম তখন অলরেডি আমার থার্টি-সিক্স। এই বয়সে সরকারি চাকরির সুযোগ অলমোস্ট জিরো। দীর্ঘদিন পড়াশোনার চর্চা নেই। সিটিতে গেলে হয়তো প্রাইভেট সেক্টরে সুযোগ মিলত। ইচ্ছে করেনি। বয়স্ক বাবা-মায়ের কাছেই থাকব। চোখের বাইরে মহানগরের ভিড়ে একা বেঁচে থাকার কষ্ট অনেক! আমার লাইফে কোনও আকাঙ্ক্ষা আর বেঁচে নেই। প্রাইভেট স্কুলে পড়িয়ে হাতে কিছু টাকা আসে, টাইমপাসও হয়। কাজের মধ্যেই আছি,"
সুলগ্নার মুখে আলোছায়ার কথাকলি।
রমিত বলে ফেলল, "তোমাকে দেখলে অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ মনে হয়।"
অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় সুলগ্না, "ডিভোর্সি মহিলা কি দুঃখের ছাপ নিয়ে ঘুরবে সারাক্ষণ?"
"ওরকম ভেবে বলিনি।"
"কমপ্লিমেন্ট?" সুলগ্না চোখ নাচায়।
নিঃশব্দে হাসল রমিত। রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে জানতে চায়, "তোমাকে ড্রপ করে আসব?"
ঘাড় নাড়ে সুলগ্না, "থ্যাঙ্কস। আমার কিছু পার্সোনাল কাজ আছে। আপনি মেঘাকে আনতে যান। দেরি হয়ে যাবে। আপনার ই-মেল অ্যাড্রেসটা মেসেজ করে পাঠিয়ে দেবেন। প্লিজ।"

{৩৬}

জাতীয় সড়কের মসৃণ রাস্তা চিরে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি। কলকাতায় একজন নামী ফিজিসিয়ানকে দেখানো হবে। এমনটাই জানানো হয়েছে প্রিয়নাথকে। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছে রমিত। নাগাড়ে গল্প করে যাচ্ছে। প্রিয়নাথ তার মনোযোগী শ্রোতা। রূপনারায়ণ পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। সকালের রোদে রুপোলি জল আর আদিগন্ত আকাশের বিস্তার নিয়ে এই নদ ভীষণ মোহময়। তার হারানোর দুঃখে কেন যে এই নদ বারবার ওতপ্রোত জড়িয়ে যায়। রোববারের এক দুপুরে পল্লবীর স্মৃতি ফিরে এসেছিল। আজ আরও এক হারানোর ভয়, প্রিয়জনের সঙ্গে চিরন্তন বিচ্ছেদের ভ্রুকুটি। কোলাঘাট ব্রিজ শেষ হবার পর বাঁদিকে একটি দোকানের সামনে গাড়ি থামল।
ড্রাইভার টিফিন করবে। রমিত প্রস্তাব দিল, "সবাই হালকা টিফিন সেরে নিই। দেরি হবে।"
প্রিয়নাথ বললেন, "বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি।"
"বাথরুম সেরে নাও।"
অনিচ্ছুক প্রিয়নাথ শেষপর্যন্ত নামলেন। টয়লেট দেখিয়ে দিল রমিত। প্লাস্টিকের কাপে চা নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে আড়ালে গেল, "এতক্ষণ শ্বেতপরির বিরহে অস্থির লাগছিল। সুখটান দিয়ে আসি। তুই মেসোকে এবার বলে ফেল।"
পাশে বসে ধীরেসুস্থে চা শেষ করেও সায়ম বলতে পারল না। অসম্ভব, সে আসল সত্যিটা উচ্চারণ করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। তিনবারের চেষ্টা বিফলে গেল। জিব জড়িয়ে আসে, গলায় যেন সাড় নেই, ঠোঁট উন্মুক্ত হতে নারাজ।
রমিত ফিরে আসতেই সে মাথা ঝাঁকায়। একটু দূরে গিয়ে নিস্তেজভাবে বলে, "পারব না।"
"বলতে হবে। আগাম আভাস দেওয়া দরকার। হসপিটালের দোরগোড়ায় গাড়ি দাঁড়ালে উনি বুঝতেই পারবেন। তখন ধাক্কাটা বেশি লাগবে। আচ্ছা, অপ্রিয় কথাটা আমাকে দিয়েই বলাবি ঠিক করেছিস! চল, অন্তত পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।"
বিল মিটিয়ে চলে আসছে সায়ম। প্রিয়নাথ গাড়িতে ওঠার মুখে রমিত বলে, "মেসো। একটা ভাইটাল কথা ছিল।"
"বলো।"
"আমরা কোনও ফিজিসিয়ানের কাছে যাচ্ছি না।"
বাকিটা বলতে দিলেন না প্রিয়নাথ। শান্ত হাসি ফুটে উঠল মুখে, "জানি। ড্রাইভারকে একা পেয়ে জেনে নিয়েছি। রোগটা কী তা আগেই আঁচ পেয়েছি। আমি শুধু কোন হসপিটালে যাবার কথা তোমরা বলেছ, তা ওর মুখ থেকে শুনে নিলাম।"
হতচকিত রমিত সামনের সিটে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল। দরজা বন্ধ করে নিঃশব্দে পাশে বসে থাকল সায়ম। প্রিয়নাথ গম্ভীরমুখে বলেন, "নির্বাক সিনেমার রিল চলছে যে হঠাৎ! তোমরা দু'টিতে ওভাবে গোমড়া মুখে বসে থাকলে আমি কিন্তু গাড়ি থামিয়ে নেমে যাব। সামান্য ব্লাড রিপোর্ট লুকিয়ে রাখা যায় না। লেম্যান নিশ্চয়ই নই। খুঁজেপেতে রিপোর্টটা পড়তে এবং বুঝতে পারব না? বুদ্ধিতে মরচে পড়েনি এখনও।"
সায়মের দিকে তাকালেন প্রিয়নাথ, "অদিতি জানে?"
ঘড়ঘড়ে গলায় উত্তর দিল সায়ম, "হ্যাঁ।"
"গোপনীয়তা বজায় রেখে লাভ নেই। অদিতি বুদ্ধিমতী। মুখের এক্সপ্রেশন তাই একদম নরমাল। মানুষকে প্রয়োজনে অভিনয়েরও আশ্রয় নিতে হয়। সো গো অ্যাহেড। পেশেন্ট রেডি অ্যান্ড স্টেডি। তুমি যেভাবে যেখানে ট্রিটমেন্ট করাবে আমি রাজি। আমার দিক থেকে হান্ড্রেড পারসেন্ট কো-অপারেশন পাবে," প্রিয়নাথ মাথা এলিয়ে দিলেন সিটে।
ডক্টর সেনগুপ্ত সুনির্দিষ্ট কোনও পরামর্শ না দিয়ে সায়মের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাংলার বাইরে দক্ষিণ ভারত বা মুম্বইতে যেখানে ইচ্ছে সে নিয়ে যেতে পারে। কোন হসপিটালের উপর আস্থা রাখবে তা সম্পূর্ণ পেশেন্টের নিজস্ব ব্যাপার। রমিতের সঙ্গে আলোচনা করে সে কলকাতায় যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছে। আউটডোরেই দেখাবে। একটি কঠিন সমস্যা প্রিয়নাথ সমাধান করে দিয়েছেন। কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবে, বাবার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তা নিয়ে এতক্ষণ চিন্তিত ছিল সায়ম।
রমিত ঘাড় ঘোরায়, "মেসো, কনসেপশন বদলাচ্ছে। তোমার রোগটার নাম শুনলেই মানুষজন ঘাবড়ে যাবে। আধুনিক ট্রিটমেন্ট বেরিয়েছে। আমার সেই মামা প্রায় ছ'বছর হল সুস্থ আছেন। ব্লাড ট্রান্সফিউশনের দরকার পড়েনি। লিউকেমিয়া মানেই মারণরোগ নয়। অনেক টাইপ আছে।"
নয়নজুলির দিকে চোখ রেখে প্রিয়নাথ শুকনো হাসেন, "আমি এখন একাত্তর। এতকাল প্রায় নীরোগ ছিলাম। বয়সকালের রোগব্যাধি বলতে যা বোঝায় তার কোনওটাই হয়নি। আজীবন রোগমুক্ত থাকব

ভাবাটা হাস্যকর। মানুষ অমর নয়। তবে এর চেয়ে হার্টের রোগ হলে মঙ্গল হত। ভোগান্তি হত না। অনিবার্যকে মানতেই হয়। খরচের দিকটা ভাবাচ্ছে খুব।"

রমিত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "তোমাদের ওল্ড জেনারেশন টাকার দিকটা নিয়ে অতিরিক্ত ভাবিত হয়। প্রচুর খরচা হবে আগেভাগেই ভেবে নিচ্ছ? তোমার কি আরও দুটো বেকার পুত্রসন্তান আছ? ওই ভাবনাটা সেন্সর করো।"

ঘণ্টাখানেক পরে মহানগরের কোলাহল, ট্রাফিক জ্যাম, হুটোপুটি ব্যস্ততার মধ্যে ঢুকে পড়ল গাড়ি। দক্ষিণ কলকাতা রমিত হাতের তালুর মতো চেনে। ড্রাইভারকে সে ডিরেকশন দিচ্ছিল। চৌরাস্তার মোড়ে ভীষণ জ্যাম, রমিত বাঁদিকের গলিতে টার্ন নিতে বলল। সায়মের হৃদস্পন্দন লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়ছিল। রেক্সিস্ট্রেশন করিয়ে আউটডোরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল তারা।

রমিত আশপাশের রোগী এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল। অনর্গল বকেই যাচ্ছে। প্রিয়নাথ বিরক্ত হয়ে জানতে চান, "কী অত বকে যাচ্ছ?"

রমিত বলে, "ইনফরমেশন নিচ্ছি। কথা খরচ না করলে প্রপার ইনফরমেশন পাব না। তথ্যের যুগ পড়েছে মেসো, ঘাটতি থাকলে বেকুব বনে যাবে। এখানে এসে নিজের ছোট-ছোট দুঃখ, রাগ, ক্ষোভ কেমন অর্থহীন লাগছে। মধ্যবিত্ত দুঃখবিলাস মনে হচ্ছে। রোগশোক হল জীবনের চরম সত্য। বাকি সব তার কাছে ঠুনকো।"

প্রিয়নাথ জড়োসড়ো হয়ে বসেন, "আলটিমেটলি আমরা মধ্যবিত্ত। এই সমস্ত রাজা-রোগ কি আমার বাড়িটাকেই গন্তব্য ভেবেছে? নিঃশেষ হয়ে যাব।"

"তুমি হলে অসংশোধনীয়। দার্শনিকতায় কান দিলে না। টাকার পোকা মাথায় নড়তে শুরু করে দিল। যাই, কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার ডাক পড়ল বলে," রমিত নিদিষ্ট ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। ব্লাড টেস্ট করিয়ে নিয়ে সায়ম বলে, "লাঞ্চ সারতে হবে।"

"ক্যানটিন আছে। খোঁজ নিয়েছি," রমিত ব্যাগ কাঁধে নিল।

পুকুরটা ডানদিকে রেখে তিনজনে হাঁটে। পুকুরটা আয়তনে বড়, চারপাশে খেজুর, শিরীষ, অশ্বত্থের সবুজ প্রহরা। দলবেঁধে রাজহাঁস সাঁতার কাটে। পাড়ে কিছু সিমেন্টের বেঞ্চ। অনেকেই একমনে চেয়ে আছে। কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন। সময় এখানে মন্থর। ঘড়ির কাঁটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজস্ব নিয়মে চলে রোগব্যাধির পৃথিবী।

ব্লাড রিপোর্ট পেতে দেরি হবে। সরাসরি রিপোর্ট আজ হাতে পাওয়া যাবে না। ডক্টর ব্লাইড দেখে নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন। ধীরেসুস্থে লাঞ্চ সেরে ল্যাবের খোলা চাতালে ওরা বসল। সায়ম পুরো হসপিটাল চত্বরটা ঘুরে-ঘুরে দেখল। পরিষ্কার, ছিমছাম পরিবেশ। স্নিগ্ধ, সবুজ তার শ্রান্তমনে যেন সাময়িক প্রলেপ লাগিয়ে দিচ্ছিল। বটল ব্রাশ গাছের পাশে রমিত ফোনে একটানা কারও সঙ্গে কথা বলেই চলেছে। অদিতির উৎকণ্ঠিত ফোন এসেছে দু'বার। শ্রান্তি ঝেঁপে আসছিল শরীরে। চেয়ারে বসে চুলতে থাকে সায়ম। সময় যেন থমকে গিয়েছে।

রমিতের ক্লান্তি নেই। ফোনে একটানা বকার পর সে পাশে এসে বসল, "ঘুম পাচ্ছে?"

"এই পরিস্থিতিতে ঘুম আসে না," সায়ম চোখ খোলে, "কার সঙ্গে কথা বলছিলি এতক্ষণ?"

"ওই টুকটাক গল্প করছিলাম," কোনও মতে উত্তর দিয়ে রমিত আবার উধাও হয়ে গেল। বিকেল চারটা নাগাদ ডক্টর গুহ তাঁকে ডাকলেন, "প্রবলেমটা আশা করি বুঝেছেন। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বোনম্যারো টেস্ট করাতে হবে। টেস্টের রিপোর্ট দেখার পরই মেডিসিন দেওয়া হবে। পরশুদিন ডেট দিচ্ছি। টেস্ট দিল্লিতে করা হয়। কমপক্ষে পনেরোদিন লাগবে ওটা পেতে।"

"মেডিসিন?"

"ডোন্ট ওরি। আমার রেফারেন্সে একটি এন জি ও থেকে মেডিসিনটা পাবেন। ফ্রি অফ কস্ট। তবে অফিশিয়াল প্রসিডিওরে টাইম লাগবে। তার আগে দোকান থেকে কিনতে হবে। এখন এন জি ও-র কাছে প্রচুর রোগী মেডিসিন নেয়। সাপ্লাই কম, নতুন এনট্রি আগের মতো সহজ হবে না। ইট উইল টেক টাইম।"

"ঠিক কোন স্টেজে আছে?"

ডক্টর গুহ হাসলেন, "এই লিউকেমিয়ার স্টেজ বলে কিছু নেই। যা আছে তা হল ব্লাস্ট স্টেজ। বোনম্যারো রিপোর্টে বোঝা যাবে। বাট ইট্‌স নট ফেটাল। আমাদের কাছে বারো বছর ট্রিটমেন্টের পরও পেশেন্ট নরমাল আছে। বুঝেছেন?"

ফেরার সময় প্রিয়নাথ বিড়বিড় করেন, "আবার আসতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

"ঝামেলা। ডক্টর কী বললেন? কন্দিন?" প্রিয়নাথের বিপন্ন গলা। রমিত মাথা নাড়ে, "মেসো, আমি কমপক্ষে ছ'জনের সঙ্গে কথা বলেছি। পজিটিভ রেসপন্স পেলাম। মেমারি থেকে আসা একজন ভদ্রমহিলা সাতবছর ট্রিটমেন্টে আছেন। আসানসোলের একজন রোগ ধরা পড়ার দু'বছর পর বিয়ে করেছে। বাচ্চাও হয়েছে। তার বয়স জাস্ট থার্টি। মেডিসিনটাই হল কেমো। একবার স্টার্ট হয়ে গেলে তুমি আগের ফর্মে রাজত্ব করবে। ব্লাড নিতে জেনারেলি হয় না। রেগুলার মেডিসিনে থাকলে ব্লাড-ট্রান্সফিউশানের প্রয়োজন নেই। সেভেন্টি-সিক্সের এক পেশেন্ট আছে দেখলাম। তোমার মতো সি এম এল রোগটাই হয়েছে। ট্রাবলস আছে তবে সুস্থ বলা যায়," রমিত হাসে, "বেশি ভাববে না।"

প্রিয়নাথের ধকল গিয়েছে সারদিন। শরীর দুর্বল, হাঁটতে কষ্ট, পায়ের গোড়ালি ফুলেছে। চোখ বুজে ফেললেন তিনি। মহানগরকে পিছনে ফেলে হাওড়া জেলায় টায়ারের চিহ্ন রাখল গাড়ি।

ঘুমে ঢলে পড়েছেন প্রিয়নাথ। সায়মের কাঁধে তাঁর অবসন্ন মাথা। ঈষৎ ঠোকা খেলেন। যত্ন করে মাথাটা সোজা করে দিল সায়ম।

বোনম্যারো টেস্টের রিপোর্ট যেন খারাপ না হয়। সে তো সাধারণ মানুষ, বিপদে তাকে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনাই সায়ম ঈশ্বরের কাছে করল। দুর্বল নাস্তিক সে। অবিশ্বাস-বিশ্বাসের মধ্যবর্তী সাঁকোতে দাঁড়িয়ে থাকে চিরকাল।

{৩৭}

মন ও শরীরের আত্মীয়তা উপলব্ধি করতে পারছে সায়ম। গত দু'দিন দৌড়ঝাঁপ গিয়েছে, টেনশন ও দুশ্চিন্তা নিংড়ে নিয়েছে শক্তি, তবু আজ এতটা রাস্তা জার্নির পরও তেমন ক্লান্ত লাগছে না। মারণরোগ নয় এই আশ্বাসেই শরীরের যাবতীয় ক্লান্তি নিরুদ্দেশ।

অজানা নম্বর থেকে বারবার ফোন আসছে। বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে বিশ্রাম নিচ্ছিল সায়ম। তৃতীয়বার সে অসন্তুষ্ট স্বরে ধরল, "হ্যালো।"

"আমি শেখরদা বলছি।"

প্রায় লাফিয়ে ওঠে সায়ম, "তুমি কোথায়?"

"বিষ্ণুপুর স্টেশনের ওভারব্রিজে।"

"এতদিন কোথায় আত্মগোপন করেছিলে?"

"আত্মগোপন নয়, নির্বাসন। চেনা জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে অনেকদিন কাটালাম। ধর্মশালা, হোটেল, নাম না জানা জনপদ। বিচিত্র মানুষ। নিচুতলার দীনহীন মানুষের ভিড়ে মিশলাম। অশেষ দুঃখকষ্ট আর যন্ত্রণা সঙ্গী করে কত মানুষ বেঁচে আছে! জীবনের কাছে রোটি, কাপড়া, মকানের বেশি তারা চায় না। মৌলিক চাহিদা মেটাতেই জেরবার অসংখ্য মানুষ। শেষে নিজের মধ্যে গ্লানি হাজির হল। আমি শেখর পাঠক, প্রোফেসর অব আর্কিটেকচার, শেষে পলায়নবাদী হয়ে পড়লাম!" শেখরদার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ যেন শুনতে পেল সায়ম।

"এই রিয়েলাইজেশন তোমার এতদিন পর হল? তখন মনে হয়নি যে

তুমি পালিয়ে যাচ্ছ?"

"যুক্তি কাজ করেনি। মনে হয়েছিল সব শেষ। নাথিং টু অ্যাচিভ। আর কিছু পাওয়ার নেই। এই হোপলেস ফিলিংস হয়তো প্রতিটি মানুষেরই জীবনে একসময় আসে। দরকার ছিল ওটার। মেধা-অর্থ-প্রতিষ্ঠার মুখ দেখে অহঙ্কারী হয়ে পড়েছিলাম। লোককে খোঁচা মেরে নস্যাৎ করে তৃপ্তি পেতাম। আদারস আর সাবস্ট্যান্ডার্ড। আমি নিরুদ্দেশ হবার উদ্দেশ্য নিয়েই চলে গেছলাম। তখনও আমিত্ব প্রবল ছিল, বুঝলি? তিনটি স্টুডেন্ট আমার কাছে রিসার্চ ওয়ার্ক শুরু করেছে। তাদের ভাসিয়ে চলে যাচ্ছিলাম? নীলার উপর রাগ হতেই পারে কিন্তু রাগে অন্ধ হয়ে তাকে একা ফেলে রেখে চলে গেলাম? এটিএমে টাকা শেষ, মাত্র একশোটি টাকা পড়ে ছিল। এতটাই নিঃস্ব যে একবেলা কোনও হোটেলে থাকার সাধ্য নেই। শূন্যে ফিরে গিয়ে চেতনা হল। শূন্য থেকেই যে শুরু করেছিলাম। আবার করব। লক্ষ্য ছাড়াই পুনরাবৃত্তি। কারও ওয়াইফ হিস্টিরিক বা মানসিক রোগী। থুতুর দলা ফেললে বা আঁচড়ে দিলে সেই পুরুষটি সহ্য করে। আমি কেন পারলাম না? সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেললাম।"

সায়ম উত্তেজনায় অধীর হয়, "তুমি ওভারব্রিজে কেন? বউদির কাছে আগে যাও। দেখা করো। পরে কথা বলা যাবে।"

"আমাতে বলতে দে। দিস ইজ় মাই ক্যাথারসিস। নীলা মানসিক রোগী নয়। তার অবদমিত ক্ষোভে জর্জরিত করেছিল শুধু। ট্রেনে উঠে আমার শালাবাবু মানে ওর ভাইকে জানিয়ে দিয়েছি। আমি ফিরছি। নীলা নাকি আবার গানের চর্চা শুরু করেছে। ক্লাসিকালে ওর প্রবল টান। আমাকে মার্গসংগীতে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিল। শুনতে ভালবাসলেও রাগ-রাগিণীর সূক্ষ্ম মোচড় বোঝার মতো কান হয়নি। উলটে কতবার নীলার কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে চেয়েছি। ধ্রুপদ রাগের কয়েকটি বিশেষ গান ছাড়া নীলা আর পরিধি বাড়াল না। 'হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে/ এসো হে আনন্দময়, এসো চিরসুন্দর" কী অসাধারণ গাইত, না শুনলে বুঝবি না। ধ্রুব বড় হতে কেন ও সুরসাধনা ছেড়ে দিল? আমাদের বন্ধনের মূল তারটাই যে ছিঁড়ে গেল। তাহলে এমন পরিস্থিতি কখনও জন্ম নিত না," শেখরদার গলা বাষ্পাচ্ছন্ন।

"তুমি এখন যাবে না?"

"ভয় নেই। পালিয়ে যাব না। আমি প্রতীক্ষা করছি রে সায়ম। মধুর প্রতীক্ষা। নীলাকে নিয়ে ওরা আসছে। ফোনে কথা বলতে-বলতে স্টেশনের বাইরে পৌঁছে গিয়েছি। ফেরার খবর নিজে মুখে নীলাকে বলতে পারলাম না। জড়তা গ্রাস করল। অপরাধবোধ কাজ করছিল কি? এই কোয়েশ্চেনটা হন্ট করছে খালি।"

"অনেক অন্বেষণ হয়েছে। এবার ইতি দাও," সায়ম হাসে।

"জানি। সফোক্লিস বলে গিয়েছেন টু বি ওয়াইজ় ইজ় টু সাফার," শেখরদা শ্বাস নিলেন, "দম্ভ করে ফেলছি ভাবিস না। আমি সম্ভবত যন্ত্রণাদীর্ণ হতে-হতে জ্ঞানে উত্তীর্ণ হয়েছি। ওই ওরা আসছে। বুঝলি ব্যর্থ কবি, এই মুহূর্তটাই আমার জীবনের সেরা প্রাপ্তি," শেখরদার গলায় হঠাৎ উষ্ণতা।

"এখানে কবে আসছ?"

"পরে ঠিক করব। রাখছি।"

ডাইনিং টেবিলে রাতের খাওয়া সারছেন প্রিয়নাথ। চিরদিনই স্বল্পাহারী। রুটি, সবজি এবং এককাপ গরম দুধ। এই তাঁর রাতের মেনু। রুটির টুকরো মুখে নিয়ে প্রিয়নাথ বলেন, "তোমার কাছে ওই প্রোমোটারের নম্বর আছে?"

শাসনের সুরে বলল সায়ম, "আগে খাওয়া শেষ করে নাও।"

"বেশ। ছেলে আমার বড় হয়েছে।"

"বিয়ালিশ বড় হওয়ার বয়স নয়? প্রৌঢ় বলা চলে।"

"তোমাকে প্রৌঢ় ভাবতে কেমন লাগে!" প্রিয়নাথ আর কথা না বলে খাওয়া শেষ করলেন। বেসিনে মুখ ধুয়ে হাত যত্ন করে মুছে নিলেন,

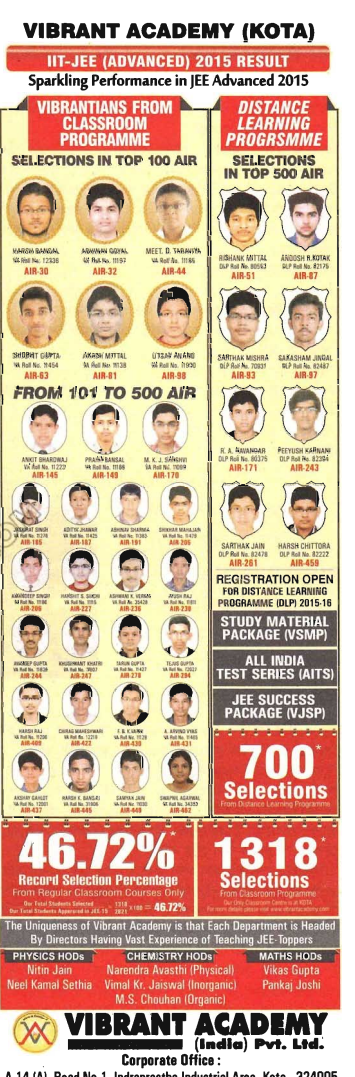

"যাক। রোগটা জেনেটিক নয়। ওই ভয়টাই বিঁধছিল। যা বলছিলাম, ফোন নম্বরটা আমাকে দাও।"
অদিতি হাসে, "আপনি এখন ফোন করবেন?"
"হ্যাঁ।"
"রাত দশটায় ফোন করলে কী ভাববে লোকটা? আপনি চিন্তায় আছেন। বিক্রির জন্য অস্থির।"
প্রিয়নাথ বলেন, "মার্কেটিং, ডিলিং এসবের কোনও ফিক্সড টাইম আছে নাকি? তবে এখন করব না। গুছিয়ে প্রস্তাবটা পাড়তে হবে। টায়ার্ড লাগছে। ধুরন্ধর লোকের কানে আমার দুর্বল গলা পৌঁছে যাবে। কাল সকালেই তাহলে বলব। সবাইকে আমার রোগের কথা বলার দরকার নেই। পাকেচক্রে পড়ে বাড়ি বিক্রি করছি বুঝে ফেললে ওদের পোয়াবারো।"
পা টেনে-টেনে প্রিয়নাথ ঘরে গেলেন।

শেখরদার ফিরে আসার খবর উদ্বেলিত হয়ে শোনাল সায়ম।
"আমি ঠিক প্রমাণিত হলাম," অদিতি বাটির সবজি উপুড় করে, "বাজিতে হেরে গেলে।"
"বাজি আমি কখন ধরলাম?"
"ওই হল। যার ভালবাসার জোর বেশি থাকে তাকেই ফিরে আসতেই হয়।"
"জোর কি একতরফা?"
"কারও কম, কারও বেশি।"

অজানা নম্বর থেকে বারবার ফোন আসছে। বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে বিশ্রাম নিচ্ছিল সায়ম। তৃতীয়বার সে অসন্তুষ্ট স্বরে ধরল, "হ্যালো।"

"তুমি যে কীসে খুশি হবে আজও বুঝলাম না," সায়ম অধৈর্য হল।
"আস্তে। বাবা ওঘরে আছেন। কেমন খরচা হবে ট্রিটমেন্টে?"
"তোমরা দু'জনেই খরচ নিয়ে অনর্থক টেনশন করছ। সুস্থ থাকা আর খরচ কোনটা প্রায়োরিটি পাওয়া উচিত? সবই নির্ভর করছে বোনম্যারো টেস্টের উপর," মৃদু হেসে বলে সায়ম, "ওই প্রসঙ্গ ছাড়ো। আজকের দিনের শেষটা ভালই হল। শেখরদার সঙ্গে যে কবে দেখা হবে! অনেক কথা জমে আছে।"
"শেখরদার জন্য এত কথা জমে থাকতে পারে আর আমার সঙ্গে বেশি কথাই বলো না। স্টক ফুরিয়ে যায়?" অদিতির চোখে অভিমান।
"বস্তুজগৎ ছাড়া তুমি যে আগ্রহ দেখাও না," সায়ম কষ্ট করে হাসে।
"এই বয়সে বদলে ফেলব নিজেকে? চেষ্টা করেও লাভ নেই। বাড়ি, ফ্ল্যাট, দুশ্চিন্তা, লিউকেমিয়া, কোনটা অপার্থিব শুনি? শেখরদা সযত্নে নিজের ডায়েরি লুকিয়ে রাখতে পারেন না? কবে কোথায় মণিদীপার সান্নিধ্যে কাটালেন, তার বর্ণনা, ফিলিংস পাতায়-পাতায় ডিটেলসে লেখা। এতখানি গোপন ব্যক্তিগত ডায়েরি বেখেয়ালে শো-কেসের মধ্যে রেখেছিলেন কেন? নীলাবউদি হঠাৎ আবিষ্কার করে ফোনে জেরা করলেন। তখনই বুঝেছিলাম কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ওঁর ধারণা ছিল তুমি হয়তো জানো এবং তা শেয়ার করেছ আমার সঙ্গে।" সায়ম অবাক হল, "আগে বলতে পারলে না? তাহলে জল এত দূর গড়াত না।"
"অনিবার্য ছিল। শেখরদার শাস্তি পাওনা ছিল। নীলাবউদি জেনে ফেলার পর আটকানো যেত না।"
"শাস্তি?"
"বিশ্বাসভঙ্গ করলে ওটা পেতে হয়," অদিতি হিমশীতল গলায় বলল।
"তুমি কঠিন নীতিবাগীশ!" সায়ম বলে ফেলে।
"তোমাদের পুরুষদের ভাষায় মডার্ন হতে পারলাম না। আমি কোনও রিলেশনে জড়িয়ে পড়লে তুমি মেনে নিতে পারবে?"
তর্কে ইতি টানে সায়ম। আগে এই খুচরো তর্কই বাকবিতণ্ডায় গড়িয়েছে। সে সহজ হতে চাইল, "বাবার মতো তুমিও বেশ অকাট্য যুক্তি সাজাতে পার। শেখরদার সম্পর্কের কথা আমি আগে জানতাম না। ওটা কিন্তু পাস্ট।"
"ওই চ্যাপ্টারে আমি কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছি না।"
ফিসফিস করে সায়ম, "আজও কি একা নিশিযাপন?"
"রোহনের হোমটাস্ক বাকি আছে। রাত জাগবে।"
"হুম," সায়ম নিভে গেল, "নো রিলিফ।"
"রিলিফের খোঁজে শেখরদার মতো কোথাও যাবে নাকি? আমি নীলাবউদি নই। শুরুতেই কাঁটা উপড়ে দেব। স্ট্রেট রোহনকে নিয়ে বেরিয়ে চলে যাব। নিজেরটা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা রাখি," অদিতি ঈষৎ রুক্ষ।
"আবার ক্যাটক্যাটে কথা শুরু হল? ইউ আর নেভার স্টেডি," সায়ম হাত ধুয়ে দ্রুত উপরে উঠে আসে। সংসার কি মেয়েদের রোমান্টিকতা শুষে নেয়?

{৩৮}

লাইব্রেরির বাইরে দাঁড়িয়েছিল রমিত। কারও জন্য, কোনও নারীর জন্য এভাবে সে সন্ধের মুখে মশার দাপট সহ্য করে অপেক্ষা করছে ভাবতেই অবাক লাগছে।
সুলগ্না হাসল, "অনেকক্ষণ ওয়েট করছেন?"
"হ্যাঁ।"
"আপনি কবিতা পড়েন?"
"কবিতা? ও ব্যাপারে আমি গবেট। মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। তুমি প্লিজ কবিতা নিয়ে কথা শুরু করে দিও না। আমি পালিয়ে যাব। গল্প, উপন্যাস, কল্পবিজ্ঞান সুযোগ পেলে পড়ি। লোকসংস্কৃতির বই গোগ্রাসে গিলি।"
সুলগ্না বলে, "আবৃত্তির চর্চা করতাম। অনেক বছর ছেড়ে দিয়েছিলাম। কবিতার প্রতি আমার টান আছে। ভয় পাবেন না। চলুন, একসঙ্গে হাঁটি। আপত্তি আছে?"
"তোমার দু'চাকা নেই? এখন দেখি মহিলারাও তাই নিয়ে অনায়াসে ছুটছে।"
"আছে, খুব দরকার পড়লে নিয়ে বেরোই। হাঁটাই প্রেফার করি। শরীর ফিট থাকে। আপনাকে এই প্রথম হাঁটতে দেখছি। নিউ জার্সিতে থাকার সময় গাড়ি ড্রাইভও করছি। মিথ্যে বলছি ভাবছেন?"
থতমত খেয়ে রমিত বলে, "তা কেন ভাবব?"
সুলগ্না ম্লান হাসে, "একমাত্র ডিভোর্সের অধ্যায়টাই গোপন রেখেছিলাম। শুধু এই মিথ্যের জন্যেই আমার একটা বিশেষণ জুটে গেল। এর পর কোনও কথাই কেউ বিশ্বাস করবে না। 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনে কোনও রেসপন্স পেলেন?"
"নো রেসপন্স।"
"ধরা যাক আমার বাড়ি থেকে এরকম একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। আমারও সম্মতি আছে। অনলাইনে আমার পার্টনার খুঁজলাম। ওয়েবসাইটে দিলাম। রেজাল্ট কেমন হত?" সুলগ্না মুখ টিপে হাসে।
"অনেকেই সাড়া দিত। ফোনে, অনলাইনে লাইন পড়ে যেত। কাকে বাছবে, কার ডাকে সাড়া দেব ঠিক করতে পারতে না, হিমশিম খেতে," প্রগলভ হল রমিত।

স্থির চোখে তাকাল সুলগ্না, "মনে রাখবেন আমার একটি বারো বছরের মেয়ে আছে। আপনি এই ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ। রূপমুগ্ধতা, ফ্লার্ট করা আর ডিভোর্সি মহিলাকে বিয়ে করার মধ্যে পার্থক্য আছে। দিয়ার কথা শুনলে ক'জন এগিয়ে আসবে? বড়লোক, নিঃসঙ্গ কোনও পুরুষ হয়তো এগিয়ে আসবে। দেখা যাবে তার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে।"

"তোমার অনুমান ভুল হতে পারে।"

"বাদ দিন। আমি ওপথ আর মাড়াচ্ছি না। শুধু বলতে চাইলাম আমি এবং আপনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে," সুলগ্না অন্যমনস্ক।

"অসম্ভব। আমি অন্তত তিন পা এগিয়ে আছি। মেপে দেখো,"

রমিত হাসে।

"আপনি কখনও সিরিয়াস হবেন না।"

"অনেকে তাই বাচাল ভাবে আমাকে।"

"সত্যিই কি আপনি এরকম?" জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় সুলগ্না।

"জানি না।"

রমিত হাঁটতে থাকে। এই সন্ধে মৌন, নতমুখ। পথের আলোআঁধারিতে প্রচ্ছন্ন মায়া। চাঁদভাঙা আকাশের ঠোঁটে নীল অদেখা, অপূর্ণ স্বপ্নেরা। রূপকথার শিল্প মেলে ধরেছে সন্ধে।

অনেকক্ষণ পর সুলগ্না জানতে চায়,

"আপনার ঘোরার নেশা এখনও আছে?"

"কেন থাকবে না?"

"সংসারী হলে দায়িত্বের ঘেরাটোপে আটকে পড়বেন। নিজের অনেক ইচ্ছে অবদমিত থেকে যায় তখন। ইচ্ছের টুঁটি চেপে বাঁচার শিক্ষা আমি পেয়েছি। কারও সঙ্গে আপনি ঘর বাঁধলেন। দেখা গেল সে ঘরকুনো। হয়তো বাসে-ট্রেনে চাপলে তার বমি হয়ে যায়। পারবেন তাকে পেলে হুটহাট বেরিয়ে পড়তে?"

"মেঘাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। ওকে ঘোরার নেশা ধরিয়ে দিয়েছি। বাপবেটিতে মিলে তাকে টাটা করে চোখের জল মুছিয়ে ট্রেকিংয়ে যাব," রমিত ঝটপট উত্তর দিল।

"সত্যিই পারবেন?"

"তুমি কিন্তু ভয় ধরিয়ে দিচ্ছ। ওরকম হলে কী করব জানি না।"

"আপনি কোনটা জানেন?" সুলগ্না অন্ধকারে ঘন হয়। চোখে ভরা ঢেউ। এই অন্ধকারেও সেই তরঙ্গায়িত আলো দেখতে পাচ্ছে রমিত। চেনা দূরত্বের মুগ্ধতায় এত দিন দেখেছে। ঘনিষ্ঠ, গাঢ় স্পর্শ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আরও কাছে। হাওয়া বুনে দিল অনুরাগ। সুলগ্নার শরীর, তার গভীর সুগন্ধ কাছে টানছে। বলিষ্ঠ আলিঙ্গনে সুলগ্নার রঙিন ঠোঁটে রমিত তুমুল ভালবাসার চিহ্ন রাখে। রাখতেই থাকে। তৃপ্তি ও অনুরাগের চাপা ধ্বনিতে সুলগ্না চোখ বোজে।

হঠাৎ সুলগ্না ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল তাকে। ফিসফিস করে,

"কেউ আসছে।"

নির্জন গলিতে কারও চিহ্ন দেখতে পেল না রমিত। সুলগ্না মৃদুস্বরে বলল, "হুঁশ হারালে চলবে? এতদিনে আপনি কিছু জানলেন। এই নেশার স্বাদ তো কখনও পাননি। অল্পেই খুশি থাকুন। বেশি লোভে বিপদ আছে।"

সুলগ্নার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। আলোকিত রাস্তায় অটো, ভারী ট্রাক আর বাইকের হর্ন। নিরিবিলি গলিপথে ঘনিষ্ঠতার বিপদ আঁচ করেই কি সুলগ্না তাড়াতাড়ি মেন রাস্তায় পৌঁছে গেল? শব্দের কর্কশ, বিরামহীন নিষ্ঠুরতা রমিতের তীব্র আবেগ দমিয়ে দিল। মুখর হতে আর সে পারল না। শরীরে তাকে বাঁধনহীন হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েই চলেছে। সরু কোমরের উপত্যকা জড়িয়ে ধরতে চাইছে চঞ্চল দুটো হাত। বাধ্য হয়ে হাত দুটো পিছনে রাখল রমিত।

"কথা বলছেন না যে!" সুলগ্না মুখ তোলে।

"এখনও আপনি বলছ আমাকে?"

সুলগ্নার মুখে চাপা দুষ্টুমি, "এত আপন চট করে ভাবব কেন? আপনির নিষেধাজ্ঞাটা থাকুক।"

"নিষেধ তুমিই সরিয়ে দিয়েছিলে।"

"মুহূর্তের দুর্বলতা ভেবে নিন।"

"কেন ভাবব?" রমিত হোঁচট খায়।

কান্নারুদ্ধ গলা সুলগ্নার, "এই যে নেশা যাকে আপনি রোমান্স ভেবেছেন, শেষ পর্যন্ত তা নিছকই শরীর-রক্তমাংসের সম্পর্ক। অভিজ্ঞতায় বুঝেছি আমি। অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছে। মনের মিল আদৌ যদি না হয়? ভেসে যেতে ইচ্ছে হয় কিন্তু পরিণতির প্রশ্ন তাড়িয়ে বেড়ায়। কেন সাধ করে দিশাহীন হব?"

"যদি বলি পরিণতি আছে?"

"ইমপসিব্‌ল। আমি আর সম্পর্কে বিশ্বাস করি না। আপনি হোপফুল থাকুন। পারসোনাল অভিজ্ঞতা বিটার হলে আশাবাদী হওয়া যায়? অনেকে হয়তো পারে। নিজেকে কেন দ্বন্দ্বে জড়াবেন অনর্থক? আপনি ইমপাল্‌সে চলেন। মেঘাকে দত্তক নিয়েছিলেন আবেগে, খেয়ালে। এখন দায়িত্বের বোঝা একা সামলাতে পারবেন না বলে ঝুঁকি নিতে চাইছেন। সাতটা বেজে গিয়েছে। পুতুল ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরে যাবে। অটো ধরে বাড়ি ফিরে যান। ঠান্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করুন," সুলগ্না ঠোঁট চাপে। এতক্ষণ যা ছিল তা আবেগ নয়? শুধুই মুহূর্তের উদ্দীপনা? রমিতের ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল।

সুলগ্না মোড়ে পৌঁছে হাত নাড়ে, "গুড নাইট। এবার আসুন।"

কাছে এসেও কেন দূরে চলে যেতে চাইছে

সুলগ্না। রমিতের সত্তাকে প্রবল দ্বিধার মুখে ফেলে যুক্তির ফলায় বিদ্ধ করে দিল কেন? শনিবার সন্ধে থেকে ফোনে কথা বলা শুরু। আজ বুধবার। এই চুরাশি ঘণ্টায় কতবার তারা কথা বলেছে, সময়ের খেয়াল রাখেনি, মনের কোটরে পুঞ্জীভূত সুখদুঃখ উজাড় করে দিয়েছে পরস্পরকে, হঠাৎ এত বাস্তবতা আঁকড়ে ধরতে চাইল কেন সুলগ্নাকে? একাকিত্বের অসুখ তাকে প্রায়ই আচ্ছন্ন করে। সে ভেবেছিল কেউ তার আশ্রয় হতে চলেছে। একটা বয়সের পর কথা বলার এবং পাশে বসার লোক কম পড়ে যায়। যৌবনের উচ্ছ্বাসে সে ভাবত অন্তত তার জীবনে নিঃসঙ্গতা থাবা বসাতে পারবে না সেভাবে। নতুন কোনও নেশা, তার দীর্ঘস্থায়ী ঘোর, তাকে সারাটা সন্ধে আচ্ছন্ন করে রাখল। আজ মেঘা অপটু হাতে টেবিলে খাবার সাজিয়ে তাকে ডাকল। পুতুল মন দিয়ে রাঁধেনি, বিস্বাদ ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে-মাখতে সে লজ্জিত হয়ে পড়ে। সে মেঘার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কাজ এবং দায়িত্বটা বরং তার। এখনই লাইনচ্যুত হয়ে যাচ্ছে? মেঘার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল সে। মেঘা পরিশ্রান্ত। ঘুমে ঢলে পড়েছে। বিছানা রেডি করে গ্রিলবারান্দায় এসে দাঁড়ায় রমিত। প্রিয়নাথের আজ বোনম্যারো টেস্টের ডেট। রাত সাড়ে দশটায় মনে পড়ল রমিতের। সারাদিন ফোনে একবারও খোঁজ পর্যন্ত নেয়নি। গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট। আড়ষ্টভাবে ফোন করল রমিত।

"হ্যালো।"

"মেসোর টেস্ট হয়ে গিয়েছে?"

"হয়েছে। স্পাইন থেকে ইনজেক্ট করে নিল। ফ্লুইড। যন্ত্রণাদায়ক। বাবা সহজে কাবু হন না। আজ কোমরে ভীষণ যন্ত্রণা। সারাটা রাস্তা কাতরাচ্ছিলেন। হোটেলে থেকে গেলে ভাল হত। গাড়িভাড়া করে গিয়েছি। ফিরতে বাধ্য হলাম।"

"শুয়ে পড়েছিলি?"

সায়ম বলল, "দেরি আছে। ফ্লুইড ওরা দিল্লিতে পাঠাবে। বোনম্যারো টেস্টের সিস্টেম কলকাতার কোনও ল্যাবে নেই। ওয়েট করতে হবে।"

"ডোন্ট ওরি।"

"উদ্বিগ্ন আমি আর হচ্ছি না। চেষ্টা করে যেতে হবে। টেনশন নিয়ে কী করতে পারব? তোর খবর বল।"

"কোন খবর?"

"কোনও খবর নেই?"

রমিত যথাসম্ভব লঘুভঙ্গিতে বলে, "একটি মালগাড়ি অল্পের জন্য লাইনচ্যুত হতে গিয়ে বেঁচে গেল?"

"তুই কি টিভিতে নিউজ় দেখছিস?"

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে রমিত, "মজা করছিলাম। ভাবছি গতের চাকরি ছেড়ে রিপোর্টার হব। নতুন চ্যালেঞ্জ। কেমন হবে?"

"না চাইলেও আমাদের জীবনে নতুন-নতুন চ্যালেঞ্জ আসে।"

"বুঝলাম তাত্ত্বিক কথাবার্তা। রেস্ট নে এখন।"

রমিত আবছা নীল আলোয় ঘরে ফিরে আসে। মিহি স্বপ্ন, গুঁড়ো-গুঁড়ো, গাঢ় হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় দীর্ঘ হয় রাত।

{৩৯}

শেখরদা চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আই আই টি ক্যাম্পাসে মাস তিনেক আগে কোয়ার্টার নিয়েছিলেন। মাঝেসাঝে প্রয়োজনে, বৈচিত্রের খোঁজে সপ্তাহে একদিন করে থাকতেন। এবার থেকে নীলাবউদিকে নিয়ে ওখানেই থাকবেন। এই শহর থেকে মাত্র চল্লিশ মিনিটের পথ, শেখরদা নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে যেতেন, কখনও ড্রাইভার ডাকতেন। নীলাবউদি কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ। অকারণে প্রতিদিন যাওয়া-আসা করতে হবে কেন?

শেখরদা বললেন, "ও নিজে থেকে প্রস্তাবটা দেওয়ায় আমার কাজটা সহজ। ঠাকুরঘরের বন্ধ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। এতবার বুঝিয়েও যা আমি পারিনি। গানের সাধনায় ডুবে যেতে চাইছে। এখানে থাকলে আবার ও আগের মতো হয়ে যায় যদি! ধ্রুবর ঘরটা অবিকল আগের মতো আছে। ওর ব্যবহার করা জিনিস, জামাকাপড় সযত্নে সাজানো থাকে। ধ্রুবর অস্তিত্ব এই বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চিতে জড়ানো। আমি এই শোকসন্তপ্ত পরিমণ্ডল থেকে নীলাকে সরিয়ে নিতে যেতে চাই। এখানে থাকলে ওর বুকের ভিতরে রক্ত ঝরতেই থাকবে। ওর শোকের গভীরতা আমি কতখানি আর বুঝব! কাজের মধ্যে থাকলে ডিপ্রেশন পালিয়ে যায়।"

"আজকেই যাচ্ছ?"

"তড়িঘড়ি ওর পরিবেশটা বদলাতে চাইছি। নীলা হঠাৎ মত বদলে ফেলতে পারে।"

"আসবে না কখনও?"

শেখরদা মৃদু হেসে বলেন, "উইকএন্ডে মাঝেসাঝে আসব। ছুটিতে এসে থাকতে পারি। সবই পরিস্থিতি বুঝে। রিটায়ারমেন্টের পর এখানেই ফিরে আসব। আমাদের শেষ ঠিকানা কিন্তু এই 'ধ্রুপদ'! শান্ত শহরটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম বলে এখানেই থিতু হলাম। শহরটার চরিত্র বদলে গেল। আমাদেরও শান্ত, নিশ্চিন্ত জীবন ঘাত-প্রতিঘাতে বদলে গেল।"

"বাড়িটা ফাঁকাই থাকবে?"

"নীচের তলা ভাড়া দিয়ে দেব ভাবছি। আমরা থাকছি না। ফাঁকা জায়গাটা আগাছার জঙ্গল হয়ে যাবে। তা ছাড়া একটা ফ্যামিলি থাকলে সিকিউরিটি নিয়ে অত চিন্তিত হতে হবে না। এত বড় বাড়ি তালাবন্ধ করে রাখলে পোড়োবাড়ির চেহারা নেবে। তোর চেনাশোনা কেউ থাকলে বলবি।"

শেখরদা মেঝেতে ডাঁই করা বইপত্র, সিডি বেছে ব্যাগে ভরছিল।

"কখন যাবেন?"

"দুপুর তিনটে নাগাদ বেরব। ম্যাটাডরে জিনিসপত্র কিছু পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখানে আমার দু'জন চেনা লোক নামিয়ে নেবে। প্যাকেজিং কোম্পানি চালায়, বিকেলের মধ্যে সুন্দর করে সব সাজিয়ে দেবে। দুটো রুম, ডাইনিং, ব্যালকনি। গাছপালায় ঘেরা। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে নীলা হয়তো ভালই থাকবে। স্থান পরিবর্তনের গুড এফেক্ট ভেবেই যাচ্ছি। এত বই, সিডি, শখের জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? যারা সর্বক্ষণের সঙ্গী তাদেরই নিয়ে যাচ্ছি। বাকিগুলো রইল। মাঝেসাঝে আসব। ধুলো ঝেড়ে সাজিয়ে রাখব। শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। তোর দিন কেমন কাটছে?"

"চলে যাচ্ছে। ট্রান্সফার নেক্সট মান্থে হবে। তোমাদের কাছাকাছিই যাচ্ছি। কৌশল্যা।"

"গ্রেট নিউজ়। চলে আসবি। জমিয়ে আড্ডা দেব," শেখরদা বইয়ের ধুলো ঝাড়ল। "ওইটুকু? ব্যস! আর কোনও সংবাদ?"

প্রিয়নাথের রোগসম্পর্কিত কথা এড়িয়ে গেল সায়ম। গোপন রাখতে চেয়েছেন। অনর্থক কারও সহানুভূতির বা করুণার পাত্র হতে তার ঘোর আপত্তি। খবর পাঁচকান হবে, বাড়ি বিক্রির উদ্দেশ্য ধাক্কা খেতে পারে। সময় হলে ঠিক জানাবে সে। সত্তরোর্ধ্ব মানুষটির প্রাইভেসিকে সম্মান জানানো উচিত।

সায়ম হাসল, "কবিতা লিখছি মাঝেসাঝে।"

"শুধুই ব্যক্তিগত আবেগের উন্মোচন করছিস সেখানে? ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে দেশকাল, সমষ্টির চেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারছিস? অবশ্য তোর মতোই লিখবি। প্রত্যাশা অল্প রাখিস। আমিই আর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলাম কোথায়? হাজার মানুষের দুঃখ, কষ্ট, অপমানের শরিক হবার ক্ষমতা যে আমার নেই। স্কুল বা আশ্রম গড়ে কত লোক, নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য আন্তরিক লড়াই করে, দানধ্যান করে। পুত্রবিয়োগের পরও আমি নিজের ক্ষুদ্রতায় আটকে থাকলাম। গতিশীল জগতে মানুষ সাতদিনেই সব ভুলে যাচ্ছে। তোলপাড় ফেলা মর্মান্তিক ঘটনা ঝেড়ে ফেলে চটজলদি গরম খবরে চোখ রাখে। তোর সুখদুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাবে না কেউ। মানুষ

AMARBOI.COM

আজকাল অন্যের ব্যাপারে নির্বিকার। তুই আজ ব্যাঙ্কে যাবি না?"
"তোমাদের সঙ্গে দেখা করব বলে আগেভাগে রেডি হয়ে বেরিয়েছি," সায়ম উত্তর দিল।
"নীলা তোর সামনে আসতে পারছে না। লজ্জা পাচ্ছে। তোকে ও অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছে। আমিই মাধ্যম হয়ে জানিয়ে দিলাম," শেখরদা সিগারেট ধরাল।
"ধন্যবাদ কেন?"
"কেননা তুই বুদ্ধু। অন্যের ব্যাপারে নির্বিকার হতে শিখিসনি। অসময়ে আমাদের জন্য তো কেউ একজন ভেবেছিল," শেখরদা পরদা সরিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, "মাঝেসাঝে ওখানে যাস। ফোন করিস। ছিমছাম সাজানো ক্যাম্পাস। হইচই পেরিয়ে কোনও মনোরম, শান্ত পটভূমিকায় ঢুকে পড়াটাও দরকার। নীচের একটা রুম কোনও সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে যাব ভাবছি। কথা চলছে। শহরে ক্লাসিকাল ঘরানার ঐতিহ্য ছিল, রিলুপ্ত অবস্থা এখন, ওদের একটা জায়গা দিলে মন্দ হয় না।"
গেটের বাইরে এসে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে যায় সায়ম। কোথাও একটা যাওয়ার জায়গা ছিল, প্যাশন ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে বেঁচে থাকা ছিল, সেটাও হারিয়ে গেল। বিয়াল্লিশ পেরোলে এমনিতেই যাওয়ার কোনও জায়গা থাকে না। ভৌগোলিক দূরত্ব ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। দূরে গেলে শুধু কুশল সংবাদ বিনিময়টাই বেঁচে থাকে। শেখরদা আর অতখানি কাছের মানুষ থাকবেন না। মাঝেসাঝে এলেও হুট করে চলে যেতে পারবে সে? টান সময়ের নিয়মে আলগা হতে বাধ্য। ব্যাঙ্কে কাজ শেষ করে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত শরীরে সে ক্যাম্পাসে যেতে পারবে? বাস ঠেঙিয়ে ঘরে ফেরাটাই গুরুত্ব পাবে তখন। চিকিৎসার জন্য দৌড়ঝাঁপ বাড়বে। একটা দিন ছুটি পেলে শরীর বিশ্রাম চাইবে। উদ্বেগ ও ব্যস্ততার সাঁড়াশিচাপে কবিতা হারিয়ে যাবে। গান মরে যাবে।
দুপুর একটার দিকে সে মেসেজ করল। প্রোমোটারের সঙ্গে সরাসরি ফোনে যোগাযোগ না করে মেসেজ পাঠানোই বুদ্ধিমানের কাজ। বাবকে বুঝিয়েছি নবেন্দু কম দাম দিচ্ছেন, আপনি প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করতে পারেন। অ্যাপ্রোচ করে দেখুন। পরের সপ্তাহে কথা বলতে চেয়েছেন বাবা। কোনও উত্তর এল না। ফোনও নীরব। আশ্চর্য ব্যাপার, তখন ঘনঘন ফোন করে সাধাসাধি করেছিলেন। প্রস্তাব পাওয়ামাত্র লুফে নেওয়ার কথা। কোনও সাড়াশব্দ নেই।
ঘণ্টাখানেক পরে উত্তর এলো মেসেজ মারফত, 'আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ। ইউ আর টু লেট! বিধানপল্লিতে নিউ ভেঞ্চারে নেমেছি। এই মুহূর্তে আপনাদের বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বানানোর পরিকল্পনাতে আগ্রহ নেই। আমি মাঝারিমানের ডেভলপার, একসঙ্গে বেশি জায়গায় ইনভেস্ট করতে অপারগ।'
পরিস্থিতি অসম্ভব দ্রুতগতিতে কীভাবে বদলে গেল! বিক্রেতার ভূমিকায় কিছু দিন আগেও প্রিয়নাথ আপারহ্যান্ড নিচ্ছিলেন। সায়ম নিমরাজি ছিল। সারা শহর জুড়েই রিয়েল এস্টেটের রমরমা, জমির আকাশছোঁয়া দামের সুবাদে মানুষ ফ্ল্যাটের দিকে ঝুঁকছে, নিত্যনতুন ব্র্যান্ডের শোরুম খোলার হিড়িক চলেছে, প্রোমোটাররাও কৃপাপ্রার্থী হতে নারাজ। পুরনো জমি-সহ বাড়ি বিক্রির অসংখ্য অফারও পৌঁছে যাচ্ছে তাদের কাছে। দালালরা মাধ্যম।
শহরটার রূপান্তরিত চালচিত্র বুঝে উঠতে পারছে না সায়ম। জন্মশহরের প্রতি টান দুর্বল হচ্ছে। ঘিঞ্জি, ভিড়ঠাসা শহরটার জন্য মায়াবী অনুভূতি আর ব্যাখ্যাহীন ভাললাগায় চিড় ধরেছে।
শেখরদার মতো নতুন কোনও পরিবেশে সে যদি চলে যেতে পারত...

{৪০}

বাধ্য হয়ে মেঘাকে নাচের স্কুল ছাড়াতে যাচ্ছে রমিত। শনিবারের অপেক্ষায় থাকে মেয়েটা। একটা দিন না গেলে কোনও ক্ষতি নেই, সন্ধেতে সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার খাবে দু'জনে, এত সব বুঝিয়েও মেঘাকে নিরস্ত করা গেল না। স্কুল ছাড়া মেঘার কোনও বাইরের

AMARBOI.COM

জগৎ নেই, বিনোদন নেই। আজ না গেলেই ভাল হত। সুলগ্নার মুখোমুখি হবার বিড়ম্বনা সুকৌশলে এড়াতে চাইছিল রমিত। চোখ মেলে ওই রহস্যময়ীকে দেখবে না সে আর। বুধবার সন্ধেয় খুব কাছাকাছি আসা ও মুহূর্তের ঘনিষ্ঠতায় উদ্বেল হবার আনন্দ নিভে গিয়েছে। পরপর দু'দিন কমপক্ষে পাঁচবার ফোন করেছিল রমিত। সুলগ্না ধরেনি। ক্ষুব্ধ, মর্মাহত রমিত প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে যোগাযোগ করবে না। চঞ্চলমতি মনকে সে স্থির সংকল্পে রেখেছিল। সুলগ্নার কাছাকাছি থাকলে সেই প্রতিজ্ঞা ঠুনকো হয়ে যেতে কতক্ষণ আর লাগবে? ঘড়ি দেখে ইচ্ছে করে মৃদুমন্দ গতিতে যাচ্ছে রমিত। এই রাস্তাটা সচরাচর এড়িয়ে চলে। নাচের স্কুলে ভিড় জমার পর সে পৌঁছতে চায়। আড়চোখে অস্বস্তিকর জায়গাটা একবার দেখল। সামন্ত হার্ডওয়ার্সে মেজদা দার্শনিক ভঙ্গিতে বসে আছে। একটি খদ্দেরও নেই। অল্পবুদ্ধির মানুষ, পাইপয়সা বুঝে নিতে গিয়ে অবস্থা খারাপ করে ফেলল। বড়দার ছত্রছায়ায় বেশ ছিল, নিজে ব্যবসাকে দাঁড় করানোর মতো পরিশ্রম ও বুদ্ধি দুটোরই অভাব। সুযোগ বুঝে বড়দা নিজের দাঁও মেরে নিল। মেজদা বোকাহাঁদা টাইপ, বউদির হাতে চাবিকাঠি, বড়দা উদার হতে পারত।

মেঘা বলল, "জেঠুরা..."

রমিত ধমকে ওঠে, "রাস্তার উপর আবার কী? চিৎকার করলেও শুনতে পাবে ওরা?"

নিয়ন্ত্রণ হারানো মেজাজে সে বাইকে গতি তুলল। নাচের স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে আবার ঘড়ি দেখল রমিত। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌঁছে গিয়েছে। মেঘাকে নামিয়ে দিল।

"তুমি ভিতরে যাবে না?"

"এটুকু একা যেতে শেখো। চার পা নির্ভয়ে হাঁটতে পারবে না? একেবারে দিদিমণির কাছটিতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে?" রমিত রেগেমেগে বলে, "এত ডরপুক হলে আমার সঙ্গে ট্রেকিং করবে কীভাবে?"

ঘরেই ফিরল রমিত। সেবারের মতো ঘুমিয়ে পড়লে মুশকিল। ল্যাপটপ নিয়ে বসল বিছানায়। মেল চেক করা হয়নি এক সপ্তাহ। তার হৃৎপিণ্ড দুলে উঠল হঠাৎ। সুলগ্না মেল পাঠিয়েছে!

'কোনও চিঠি লিখিনি এতদিন। পরীক্ষার খাতায় গতানুগতিক চিঠি ছাড়া কাউকে লিখিনি। চিঠির আমল শেষ, আমাকে পাঠানো অসংখ্য চিঠি আগুনের শিখায় ছাই হয়ে গিয়েছে কিছু দিন আগে। নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে মেলের ছদ্মবেশে চিঠিই আসলে পাঠাচ্ছি। হৃদয়ের ডাকে কখনও সাড়া দিইনি। আঠারোতে পা দিয়ে নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছেছিলাম। ভবিষ্যতের রূপরেখা সাজিয়ে নিয়েছিলাম মনে-মনে। রূপ আছে, বুদ্ধি আছে, তাই চোখ রেখেছিলাম উপরে। নিশ্চিন্ত আরাম ও বিলাসের যে ছবি আমি এঁকেছিলাম, বাস্তবে তা পূর্ণতা পেল একদিন। বিদেশে প্রতিষ্ঠিত স্বামী, অঢেল প্রাচুর্য, ফুটফুটে একটি মেয়ে। মনে হয়েছিল অ্যাম্বিশনে সফল হওয়ার মতো এমন অবিচল ক'জন থাকতে পারে? কমপ্লিটলি সুখী জীবন থেকে হঠাৎ এক ঝটকায় নীচে। মফস্‌সল শহরের গলি, ভাঙাচোরা রাস্তা এবং ধুলো। একাকিত্ব। অস্তিত্ব বিপন্ন হতেই অনুশোচনা হল খুব। প্রথমটায় কষ্ট হচ্ছিল। বিলাস ত্যাগ করে এমন সন্ন্যাসিনীর জীবন কীভাবে কাটাব এবার? অ্যাডজাস্ট করতে কষ্ট হচ্ছিল। খিটখিটে হয়ে পড়লাম ক্রমশ। সরকারি চাকরির বয়স প্রায় শেষ, নতুন করে লেখাপড়ার অভ্যেস তৈরি করে সেখানে ঝাঁপানোর এনার্জি নেই। প্রাইভেট স্কুলে ঢুকে পড়লাম। ফ্লুয়েন্ট ইংরেজি বলাটা কাজে লাগল। আস্তে-আস্তে ক্ষোভ, দুঃখ থিতিয়ে পড়ল। পরিবর্তিত জীবনের পরীক্ষায় সফল মনে হচ্ছিল নিজেকে। আমাদের দেশে অসংখ্য মেয়ের কপাল পোড়ে। অত্যাচার লাঞ্ছনা। ক্রীতদাসীর জীবন। শুধু ডিভোর্স হয়েছে আমার। আমার দুর্ভাগ্য এখনকার রেসপেক্টে খুব কমন। আমার মতো কত মেয়ে মাথা উঁচু করে, হাসিমুখে বেঁচে আছে। একটি ব্যর্থ দাম্পত্যের জের টেনে নিজের ভ্যালুয়েবল অস্তিত্ব তারা দীর্ঘশ্বাসে ভরায় না। সার্থক হবার লড়াই চালিয়ে যায়। আমি এভাবেই ছিলাম।

সাদামাটা, একঘেয়ে দিনগুলো হঠাৎ বর্ণময় হয়ে উঠল। নিছক আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব আসলে মোড়ক। কারও টানে ভেসে গেলাম আমি। ভাসতে-ভাসতে 'রিলেশন' শব্দটায় ধাক্কা খেলাম। এই সম্পর্কের কী নাম হয়? শরীর চাইছে ঘনিষ্ঠ হতে, শুধু স্পর্শ আর কথা বিনিময়ের ঘেরাটোপে বন্দি সে কেন হবে? মুহূর্তের দুর্বলতা শরীরে স্ফুলিঙ্গ জ্বেলে দিল। পরমুহূর্তেই নিষেধাজ্ঞা ছাপিয়ে প্রত্যাশা। এই সম্পর্কের যে কোনও পরিণতি নেই! ক্যামেরার সামনে অর্ধনগ্ন হতে পারা মেয়ে দুঃসাহসী, লিভ ইন করা মেয়ে দুঃসাহসী, পাশ্চাত্যের খোলামেলা পরিবেশ চিনে নেওয়া আমি তেমন ডেসপারেট হতে পারব না। আধুনিক এই ডেফিনেশনে যে আমি বিশ্বাসী হতে চাই না। আমার ইনবর্ন রক্ষণশীলতা বারবার ব্যঙ্গ করতে লাগল আমাকে। আমি তো অভিজ্ঞ নারী। বঞ্চিত স্বাদ ফিরে পেলে জানি বেপরোয়া হয়ে উঠব। দিয়া আছে। আমি একা নই। আপনারও মেঘা আছে। ইচ্ছে অবদমিত রেখে সোজা পথে চলাই শ্রেয়।

নাচের স্কুল আমি খুলবই। নিজের আইডেন্টিটি তৈরি করার জেদ চেপে গিয়েছে। নিজেকে প্রমাণ করার ওটাই সেরা মাধ্যম। দূরেই থাকি। আপনি থাকুন দৃষ্টিপথে। প্লিজ কথা বলার চেষ্টা করবেন না। ফাঁক গলে অবাধ্য দুর্বলতা হাজির হবে। আর মেঘাকে, শুধু আমার বিড়ম্বনা এড়ানোর জন্য, ওই নাচের স্কুল থেকে ছাড়ানোর চিন্তা করবেন না।

তুমি ভাল থেকো, আর হ্যাঁ, বিয়ের মাধ্যমে মুক্তি খুঁজবে না। করুণা বা সহানুভূতির তাগিদে বড় ভুলের দিকে পা বাড়িও না। তেমন কাউকে খুঁজে পেলে আলাদা কথা। একা দায়িত্ব নেবার প্রত্যয় কেন নেই তোমার? আরও লিখতে পারতাম, আঙুল কেঁপে যাচ্ছে।'

শেষ দিকে 'তুমি'র স্নিগ্ধ উচ্চারণ রমিতের মনপ্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছিল। এই উষ্ণ আপন ডাকটাই যে শুনতে চেয়েছিল সে।

নাচের স্কুলে পৌঁছে তার কাতরচোখ বারবার সুলগ্নাকে খুঁজছিল। মেঘা দৌড়ে এসে বাইকে উঠে পড়ল, "চলো।"

"যাচ্ছি।"

"কী দেখছ?"

"সুলগ্না আন্টি কোথায়?" মুখ ফসকে বলে ফেলে রমিত।

"আন্টি আজ আগে চলে গিয়েছে।"

নিশ্বাস ফেলে রমিত বাইকে স্টার্ট দিল। দৃষ্টিপথের বাইরে নিজেকে রাখতে চাইছে সুলগ্না।

"দিয়া নাচ শিখবে তো এখানে?"

"হ্যাঁ"! মেঘা আশ্চর্য হল।

রমিতের মন বলছিল সুলগ্না আশপাশেই আছে। আড়াল থেকে দেখছে তাকে। আপনমনে বলে রমিত, 'আমি পালিয়ে যাব না। তুমি এই প্রমিসটুকু চেয়েছিলে। রাখার চেষ্টা করব। তুমি কেন সংকোচে পালিয়ে যেতে চাও? দূরত্বের মুগ্ধতায় দেখব, তুমি শক্তিদায়িনী হয়ে কাছাকাছি রয়েছ।'

"বিড়বিড় করে কী বলছ বাবা?"

"কিছু না।"

"একটা কথা বলব?"

"বলো।"

"ওই বাড়ি যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। বড়মাকে কত দিন দেখিনি।"

রমিত শান্তভাবে বলল, "এখন যাবে?"

"নিয়ে যাবে তুমি?"

মেঘার আবদারে দ্রবীভূত হয়ে গেল রমিত। হেসে বলল, "অল রাইট সোনা। তোমাকে রেখে আসছি। আটটার দিকে আমি নিতে আসব।"

"তুমিও চলো।"

রমিত নমনীয় হল, "তোমার বায়না মঞ্জুর করলাম। আমি ওখানে পা দেব না ঠিক করেছিলাম। ভিতরে ঢুকে গালগল্প করতে পারব না। একটু থেকে চলে যাব। তুমি যতক্ষণ ইচ্ছে থাকো। বড়মাকে ফোন

করতে বলবে। হাজির হয়ে যাব। তবে রাতটা ওখানে থাকার জেদ কোরো না।"

অনেক দিন পর সামন্তভিলার দরজা পেরিয়ে রমিত আপ্লুত হয়ে গেল।

ছোট্ট বার্তা পাঠাল ইথার তরঙ্গে, 'প্রতি সপ্তাহে শুধু একটি মেসেজ পাঠিও। বুঝব যে আমি একা নই। পাশে আছ। অজস্র ধন্যবাদ।'

{৪১}

বোনম্যারো টেস্টের রিপোর্ট আশাপ্রদ হলেও প্রিয়নাথের ব্লাড কাউন্ট উদ্বেগজনক। ডক্টর দ্বিতীয় দফায় ব্লাড টেস্ট করালেন। অণুচক্রিকা সাত লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা অস্বাভাবিক। ডক্টর গুহ ভরসা দিলেন, "দোকান থেকে মেডিসিন কিনে ইমিডিয়েট শুরু করে দিন। এরকম কেসে পেশেন্ট পনেরো থেকে কুড়ি, এমনকী পঁচিশ বছরেরও বেশি বাঁচতে পারে। আপার লিমিট ফিক্সড নয়। বাট...আপনার বাবার এজ সেভেন্টিওয়ান। ইমিউনিটি কমে যাচ্ছে। সিম্পটম অনেক দেরিতে বোঝা গিয়েছে। অনেকের লক্ষণ বোঝা যায় না। দেখা যায় অলরেডি ক্রাইসিস পিরিয়ডে পৌঁছে গিয়েছে। উই শ্যাল ট্রাই আওয়ার বেস্ট। ব্লাস্ট ফেক্স ঠেকানোর চেষ্টা করতে হবে। হাইডোজ় দিয়ে শুরু করছি। সাইডএফেক্ট আছে। স্কিন প্রবলেম, ইনফেকশন ইত্যাদি হতে পারে। গায়ের রং ফ্যাকাসে লাগবে। ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায়। হাঁটতে-চলতে প্রবলেম ফেস করবেন। ওটা

প্রিয়নাথের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব পছন্দ হত না। বিদ্রোহ করে উঠত মন, নিজের অস্তিত্বের অপমান মেনে নিতে চাইত না।

কিওর হয়ে যাবে। বাট ই শুড লিড রেসট্রিকটেড লাইফ। ফর্মটা ডাউনলোড করেছি। ওটা নিয়ে আপনাকে প্রচুর ছুটতে হবে। পেশেন্টের ভিড় এত বাড়ছে যে মেডিসিন সাপ্লাই করতে পারছে না কোম্পানি। লেগে থাকুন। টাইম লাগবে ওটা পেতে।"

"ইনকাম বাধা হবে?"

"নো, আমি সার্টিফাই করলেই যথেষ্ট। তবে প্রসেসে সময় লাগবে। পরীক্ষিত মেডিসিন। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে পেটেন্ট পায়নি। আইনি লড়াই চলছিল। অনেক কোম্পানি এখন মেডিসিনটা তৈরি করছে। জেনেরিক নাম ইম্যাটিনিব। তিনটে অপশন দিচ্ছি, যে মেডিসিনটা আয়ত্তের মধ্যে মনে করবেন সেটা নেবেন। ঘাবড়াচ্ছেন মনে হচ্ছে?"

"না।"

"জেনেরিক নামটাই আসল। সবার ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন সমান নয়। তাই অপশন দিলাম। আপাতত কিছুদিন খরচা হবে। তাও আপনারা লাকি। ফ্রি অফ কস্টে পেয়ে যেতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে আসা পেশেন্টরা এই সুবিধা পায় না। ওঁদের বছরের পর বছর মেডিসিন গ্যাঁটের কড়ি গুনে কিনতে হয়। ডিটেল্‌সে বুঝিয়ে দিলাম। প্রথমটায় প্রবলেম হয় সবার।"

একমাসের ওষুধে সাড়ে ন'হাজার টাকা লাগল। নেক্সট চেক আপ অগস্টের শেষে। ইচ্ছে করেই প্রিয়নাথকে টাকার অঙ্কটা কমিয়ে বলল সে।

"সাত হাজার লাগল?"

"প্রায়।"

"সর্বনাশ!" প্রিয়নাথকে স্পষ্টতই দিশেহারা দেখাল; "ভিটেমাটি বিক্রি হয়ে যাবে যে!"

"বাবা, তুমি বাড়াবাড়ি করছ। রোগঅসুখে খরচা হবে না? কে হাত গুটিয়ে বসে থাকে শুনি? বলছি তো দু'-তিনমাস পরে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।"

শুরুতে, রোগ ধরা পড়ার পরে প্রিয়নাথ ভেঙে পড়েননি। উদ্বেগ বা অমূলক ভয়ে কখনও তাঁর গলা কাঁপেনি। প্রিয়নাথ বনস্পতির ছায়া হয়ে থাকতে চাইছিলেন। শরীরের ভাঙন অচিরে মনকে গ্রাস করে নিল। উন্নতশির মানুষও শেষমেশ রোগ এবং মৃত্যুর মুখোমুখি অসহায়। একা অন্ধকার ঘরে প্রিয়নাথ বসে থাকেন। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দেয় সায়ম।

অলক্ষ্যে ব্যাটন তার হাতে তুলে দিয়েছেন প্রিয়নাথ। তিনি ক্লান্ত। এবার সায়মের পালা। কম বয়স। অপরিণত, অপরিপক্ব, সাংসারিক বুদ্ধি ইত্যাদি বিশেষণে তাকে এতদিন তিরবিদ্ধ করে এসেছেন। দায়িত্বপালনেই প্রিয়নাথ সতেজ ও বলিষ্ঠ থেকেছেন। ওটিই তাঁর ভাললাগার জায়গা। অধিকার নিরুচ্চারে হস্তান্তর করে প্রিয়নাথ আজকাল উদাসীন। উপনিষদ পড়েন। ক্লাসিকাল সাহিত্যের বই কিনে আনেন। ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের অনুরাগী পাঠক তিনি। সংসারে প্রতিটি বিষয়ে আগের মতো মাথা গলানো ছেড়ে দিয়েছেন। এই বদল একটুও ভাল লাগে না সায়মের। মানুষের মন এক জটিল আধার, অহরহ কিছু পাওয়ার তাড়নায় ছোটে, প্রাপ্তির মুহূর্তে ফেনায়িত উচ্ছ্বাস, মনে হয় সম্পূর্ণ সফল, খুশিতে নেচে উঠেই আবার ক্লান্তি। অলক্ষ্যে অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষার ভ্রূণ জন্ম নেয়।

সায়ম যেন নিরুত্তাপ। প্রিয়নাথের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব পছন্দ হত না। বিদ্রোহ করে উঠত মন, নিজের অস্তিত্বের অপমান মেনে নিতে চাইত না। নিজের মুখোমুখি হওয়ার সময়টাই হারিয়ে গিয়েছে। প্রিয়নাথের খুঁটিনাটি খেয়াল রাখতে হয়। ব্যাঙ্কে বাড়তি দায়িত্ব। অপ্রতুল সময়। পার্শ্বচরিত্র ছিল এতকাল। প্রতিটি ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। শ্রান্তি আসে। কল্পনার বিষণ্ণ আকাশ ক্যানভাসে ফোটে না। পায়ের নীচে মরাঘাস। ঝগড়ায় সুখ নেই। কার উপর অভিমান করবে আর আশ্রয়ের তাগিদে আঁচড় ফোটাবে সাদা পাতায়! অদিতি সংসারে মগ্ন। সায়মের দৌড়ঝাঁপ ও দায়িত্ব বুঝেছে বলেই যথাসম্ভব শান্ত থাকে। হুল ফোটানোর অভ্যেস অনেকটাই ত্যাগ করেছে। রোহন ছাড়া তার আরও এক মনোযোগের জায়গা তৈরি হয়েছে। প্রিয়নাথ। কখনও-কখনও মনে হয় সায়ম গৌণ। প্রিয়নাথই অদিতির আপনজন। ঠাট্টা করে সে প্রসঙ্গ তুলতেই অদিতি তিরস্কারের সুরে বলে, "ছিঃ, তুমি মানুষটা খুব কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছ।"

"নির্ভেজাল ঠাট্টা বুঝতে পারছ না তুমি? কেন তুমি এরকম সিরিয়াস?"

অদিতি সজলচোখে বলে, "তুমি বুঝবে না। সাদামাটা একজন মেয়ে। কেউ পছন্দ করত না। অভাবী পরিবারের মেয়েদের কী পরিণতি হয় জান না তুমি। ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট, হাজার তত্ত্বকথা, এন জি ও, প্রতিবাদী কবিতা, স্লোগান, অবস্থা কতখানি বদলাতে পেরেছে? বিয়ে আমরা করি না। আমাদের বিয়ে দেওয়া হয়। কন্যাদায়। আমার মা সব পুঁজিপাটা উজাড় করে কতটুকু পারত? আজ আমার আইডেন্টিটি হয়েছে। হলামই বা কনট্র্যাক্টের ফুলটাইমার। তবু স্বাধীন, স্বাবলম্বী। ওই মানুষটা আমাকে করুণা করেনি, বিশ্বাস রেখেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন। আমার আত্মবিশ্বাস ফুটো হয়ে যাচ্ছিল। ভেসে যেতাম কোথায় নিজেও জানি না।"

উষ্ণায়ন ঋতুর রকমফের বদলে দিয়েছে। শ্রাবণ মাসেও বৃষ্টি গরহাজির। মাঝেসাঝে গহন অন্ধকার, মেঘের আনাগোনা, বিক্ষিপ্ত কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিই সম্বল। বাড়িতে দালালশ্রেণির কিছু লোকের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। কীভাবে যে গন্ধে-গন্ধে ওরা টের পেয়ে

যায়। মানিক নামের এক দালাল পান চিবোতে-চিবোতে হাতের পাঁচ আঙুল দেখাল, "হ্যাঁ দাদা, হয়ে যাবে, পাঁচ নেব।"
"পাঁচ হাজার?"
প্রিয়নাথের অজ্ঞতায় সে হাসে, "পাঁচ লাখ। আগের সপ্তাহে বাড়ি বিক্রি হল। মালিক চল্লিশ লাখ পেল। আমার কমিশন চার লাখ। ওই রেট চলছে।"
"বাড়িবিক্রির দায় পড়েনি হে। তোমরাই গায়ে পড়ে আসছ। কে রটাল বলো দেখি?"
"কেন বলব? কাজ নিয়ে কথা। শিবুদা ভাল প্লেস খুঁজছে। বিক্রি হলে নিজেরা ভাগাভাগি করে দেবেন। আমার কমিশন পেলেই হল।"
"বুঝলাম," প্রিয়নাথ কষ্ট করে হাসেন, "সিন্ডিকেট আর তোলাবাজির রমরমা শহরটায় কবে হবে বলো তো? বড়-বড় শহরে কবে চালু হয়ে গিয়েছে!"
মাথা চুলকে সে বলে, "কঠিন প্রশ্ন। অত খবর রাখি না।"
"দেখছি ফোকটে কামানোর সুযোগ মন্দ নয়। কামচোর লোক খুব বাড়ছে কিনা! তাই বললাম। তোমার পার্সেন্টেজ না কমালে একটি শব্দও খরচা করতে রাজি নই। মেরেকেটে দুই।"
শিবতোষ বেরা ওরফে শিবুদারই গরজ বেশি। ইটভাটা আছে। রইস লোক। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা শুরু করবেন। বাড়িটি কিনে এই ব্যবসায় অভিষেক ঘটাতে অস্থির। হেঁজিপেঁজিরা কামিয়ে নিচ্ছে। ট্যাঁকের জোর থাকতে তিনি কেন ময়দানে নামবেন না? দালালটিকে আশ্বাসে দাবড়ে দিলেন, "কী রে মানকে, তুই আমার জায়গায় থাবা মারছিস শেষে? থাবড়ে দিলে উড়ে যাবি। পাঁচ লাখ! এদিকে ঘুরঘুর করতে দেখলেই ঠ্যাং ভেঙে ঝুলিয়ে দেব। খবরটা দিয়েছিস। তাই বখশিস হিসেবে এক লাখ দিচ্ছি।"
একান্তে ডেকে প্রিয়নাথ বলেন, "ঘোড়েল লোকদের সঙ্গে বার্গেনিংয়ে এঁটে উঠতে পারবে না। আমি থাকব?"
লজ্জায় মুখ ঘোরায় সায়ম। তার অনুমতি চাইছেন বাবা! অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "ওটা তোমার ডিপার্টমেন্ট।"
"বেশ। আলোচনায় থেকো। সমস্ত প্ল্যানিং, কথাবার্তা তুমিই বলবে। ফাইনাল হলে রেজিস্ট্রির ডেট। তোমাদের জন্যই সব কিছু। দরাদরির ব্যাপারটা শুধু দেখব আমি।"
তিরিশ লাখ ক্যাশ এবং দু'টি ফ্ল্যাট। চূড়ান্ত কথা হয়ে গেল। শিবতোষের কাছে এটা অ্যাডভেঞ্চার। রেজিস্ট্রি হবে দশদিনের মধ্যে। বায়না হিসেবে একটি পয়সাও লাগবে না। ডেট পেরিয়ে গেলে প্রিয়নাথ অন্য খদ্দের দেখবেন। একটি শর্ত রাখলেন। নতুন অ্যাপার্টমেন্টটা শিবতোষ তৈরি করবেন, নাম রাখাটা তাঁর ব্যক্তিগত রুচি, তবে 'সোমলতা' নামটি রাখতে হবে।

"কার নাম?"
"আমার মা," সায়ম জবাব দিল।
প্রিয়নাথ রাতে খাবার টেবিলে বসে স্বগতোক্তির সুরে বললেন, "ব্যস। আমার কাজ প্রায় শেষ। ফাইনাল ডিল। রেজিস্ট্রি। এবার নিশ্চিন্তে ওপারে যেতে পারি।"
অদিতি প্রবলভাবে ঘাড় ঝাঁকাল, "আপনি কোথাও যেতে পারবেন না। অশুভ কথাবার্তা বন্ধ করুন। কাজ এখনও বাকি।"

{৪২}

"তুমি শিওর?"
"একশো পার্সেন্ট," অদিতির চোখের তারা ঝিলমিল।
"কীভাবে হল?" সায়মের বুকের ভিতর হঠাৎ ছলাৎ নদী, "তোমার ক্যালকুলেশনেও তাহলে গোলমাল হয়! অতি হিসেবের গলায় দড়ি প্রবাদ অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি করেই ছাড়লে।"
অদিতি ফুলের মতো ফুটে ওঠে, "গলায় দড়ি বলছ কেন?"
সায়ম নিশ্বাস ফেলল, "তুমি তো চাও না। এখন কী করবে ঠিক করো। অ্যাবরশন করানোর ইচ্ছে থাকলে ভেবে দেখো। শুনেছি ডক্টরের কাছে কনসাল্ট করলে ভাল মেডিসিন ওটা করা যায়। উই আর ইন্টেলেটো।"
ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপ করিয়ে দিল অদিতি, "ঠিকই বলেছ সায়মবাবু। দুর্ঘটনাই যদি ধরি সেটাও সময়েই আসছে। বাবা হওয়ার পক্ষে বিয়াল্লিশ কি বেশি বয়স মনে হচ্ছে?"
নতুন ব্রাঞ্চে এক কোলিগ পরশুদিন পিতৃত্বে প্রোমোশন পেয়েছেন। উনপঞ্চাশে পা রেখেছেন। জিনের কী আশ্চর্য লীলাখেলা! তিনি আনন্দে ডগমগ, বেশি বয়সে বাবা হবার জন্য গর্বিত, তাঁর শরীর জুড়ে আনন্দ-উড়ান দেখতে পেয়েছে সায়ম। মধুরতম আবেশে গলা বুজে এলো তার, "এখনও বুড়িয়ে যাইনি।"
অদিতির স্বরতরঙ্গে লাস্য, "গাইনির কাছে যেতে হবে। সেটা কি আমাকেই মনে করিয়ে দিতে হবে?"

সমস্যা হল সংবাদটা কীভাবে প্রিয়নাথকে জানানো যায়? নিজে বলা তো অসম্ভব, অদিতির পক্ষে বলা আরও অসম্ভব। শেষমেশ রমিতকেই ধরল সায়ম।
"আমি কি রাজসভার দূত? মহারাজ, আপনার জন্য সুদূর জিনলোক থেকে সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। 'মুশকিল আসান করো বাবা সত্যপীর' গাইতে-গাইতে কি আমাকেই মনে পড়ে? তখন অসুখের খবর জানাতে পারিসনি। এটাও আমি বলব?" রমিত কপট রাগ দেখিয়ে হেসে ফেলে, "তোর সৃষ্টি শেষে

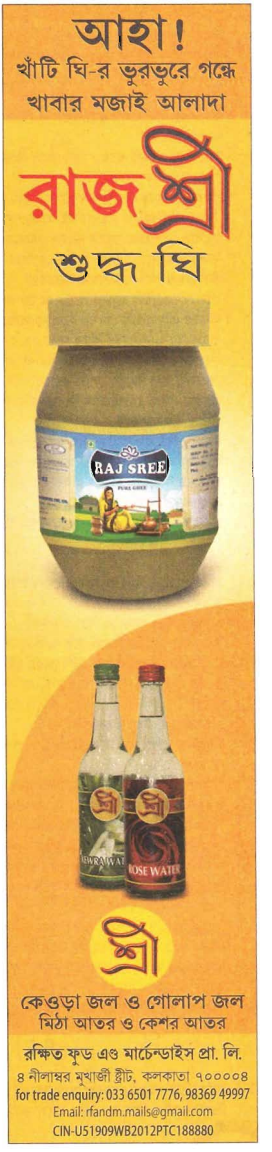

আরও একটি সন্তানে এসে থামল! ভালই হল। বিডিওসাহেব স্বপ্নের মহড়া শুরু করবেন। মানসিক তাগিদ ওঁর আয়ু বাড়িয়ে দেবে। অবিলম্বে যথাস্থানে খবর পৌঁছে যাবে।"

দশ মিনিটের মধ্যেই রমিত হাজির হল।
প্রিয়নাথ অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "সবসময় মজা করার অভ্যেস ছাড়ো, রমিত।"
রমিত চোখ ছোট করে, "কী বললে বিশ্বাস করবে শুনি?"
"তোমাকে কে বলল?"
"স্যাটেলাইটের চোখে ধরা পড়েছে তুমি আবার দাদু হচ্ছ।"
"বলছ?" প্রিয়নাথ গম্ভীরভাবে তাকালেন।
"এবার জেরাটেরা করবে নাকি? তোমার ছেলে ভুল করে ফেলেছে। তাই ঘেমেনেয়ে একসা। চিন্তায় জেরবার। তোমার পা ছুঁয়ে ফিল্মি স্টাইলে শপথ নিলে বিশ্বাস করবে?"
প্রিয়নাথের দুর্বল হাত জাপটে ধরে ফেলে রমিতকে। ভেবেছিলেন কখনও এই একান্ত গোপন ইচ্ছেটুকু সত্যি হবে না। অধরা স্বপ্নই থেকে যাবে। রমিতের কাঁধে মাথা রেখে অবুঝ শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন প্রিয়নাথ। অপরূপ বৃষ্টিমাখা মুখ তুলে কিছুক্ষণ লজ্জা পেলেন। তাঁর দাঁতের সোনা ঝলসে ওঠে, "আসছে, রাই ফিরে আসছে। আমি চেয়েছিলাম সে ফিরে আসুক। কুচিফুলের নাকছাবি পরিয়ে দেব তাকে।"
রমিত হেসে বলল, "ছেলেও হতে পারে!"
প্রিয়নাথ লবণাক্ত চোখ মুছতে-মুছতে ঘাড় দোলান, "স্বাগতম। আর জীবনের কাছে কী চাইব? চাওয়ার কোনও সীমারেখা নেই। শুধু আর কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই।"
রমিত চোখের মণি উল্টে বলল, "প্যানপ্যান করবে না। দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকবে।"

রমিত বলে, "'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটা শুনেছিস সায়ম?"
সায়ম দরজার আড়ালে ছিল এতক্ষণ।
এক প্রগাঢ় শান্তির ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল সে। অচেনা পথে চেনা সুরে সে আসবে। কোনও এক রোববারের ছুটির দুপুরে এসেছিল রাই। স্বপ্নের ছদ্মবেশে, আলো ও ছায়ায়, মাটিপৃথিবীর অনন্ত মায়ায় ভরিয়ে তাকে।
রমিত বলল, "আমি চললাম।"
"এইমাত্র এলি। এত চলে যাওয়ার তাড়া? তোর সময় নেই দুটো কথা বলার!"
"মেঘার পিছনে খাটছি। সামনে ইউনিট টেস্ট। ওর লেখাপড়ার দিকটা কখনও গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি," রমিত মাথা নাড়ে।
"শেষমেশ তুই দায়িত্ববান পিতা হলি। দেখে ভাল লাগছে," সায়ম হাসে, "হঠাৎ গানের প্রসঙ্গ টানলি? বুঝলাম না।"
বিষণ্ণ হাসে রমিত, "আমি বিরহের আনন্দে আছি। নিজে ভাল না থাকলে অন্যের আনন্দে শরিক হতে পারব না যে!"
"আমাকে বলবি না?"
"ওই অধ্যায়টা গোপনই থাক। কখনও যদি ইচ্ছে হয় প্রাণ খুলে সব বলব। কেউ একজন আমাকে নতুনভাবে বাঁচতে শিখিয়েছে। ভালবাসার অপূর্ণ আকাশ শুধু নিজের কাছেই থাকে। কথার মালায় ব্যাখ্যা করা যায় না।"
রমিতের মণিকর্ণিকায় অর্ন্তলোকের শান্ত স্মিত উচ্চারণ।wwCw

{৪৩}

সময় জানে বোধন। আবার সময় মানেই বিসর্জন। গানের পাণ্ডুলিপি, প্রিন্টেড কপি, সিডি সব নদীর জলে ভাসিয়ে আসবে ভেবেছিল। পারল না। মায়া জন্মে গিয়েছে। গানগুলোর প্রতিটি অক্ষরে লেগে আদরের দাগ। সন্তানদের জলে ভাসিয়ে দেওয়ার মতো নিষ্ঠুরতা কেন সে করবে? অনেক বোধ, অনেক ভাবনা, অনেক পবিত্র আবেগ ওদের সর্বাঙ্গে জড়ানো।
দিনপনেরো আগে সুরকার চিরন্তন লাহিড়িকে পাঠিয়েছিল। শেষ প্রয়াস। রাতে ফোন করল সায়ম। চিরন্তন বললেন, "পড়ে দেখছি। বেশ কয়েকটা লিরিক্স ভাল লেগেছে। হাতে তেমন কোনও প্রজেক্ট এলে আপনাকে বলব। ডেকে নেব।"
ডাক আদৌ আসবে কিনা জানে না সায়ম। কারও উপর বিশ্বাস রাখতেই হয়। ভাল লেগেছে। মন থেকে বলা না মিথ্যে স্তোকবাক্য সেই দ্বন্দ্বে গেল না সায়ম। রুগ্ন, শীর্ণ সন্তানদের যে ভালবাসতেই হয়। ন্যাপথলিন দিয়ে যত্ন করে পরম মমতায় বুকশেল্‌ফের স্বচ্ছ কাচের ভিতর রেখে দিল গানগুলি।
রাত জেগে সে অক্ষরের মোহে ফিরে যায়, বোধনের কবিতা লেখে-
দীর্ঘজীবী মহাবট জানে বুঝি অমৃতমন্থন
প্রতিটি বিকেল তার কাছে সকরুণ হাঁটু
মুড়ে বসা
দীর্ঘ করো পরমায়ু, ঘাসবনে জেগে
থাকো আলো
সময় নিভে আসে
নিওন আলোর শহরে কোলাহল ফুরিয়ে
এল ওই
ঈশ্বর, দেয়ালা দেখব বলেই লাঠি ধরে
হাঁটা এখনও
দীর্ঘ করো পরমায়ু, আগত প্রাণের চিবুক
ছুঁয়ে যাই
যদিও এখানে উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধে, বন্দরের
অবুঝ পারাপার
ঘুমের পরিখা ডাকে, ডাকে মহাকাল
তবুও মহাবট, একফোঁটা অমৃত দিও মুখে
দীর্ঘ করো পরমায়ু, পরমায়ু মুখে দিতে চাই...

আশ্চর্য, অজান্তেই তার সমস্ত অনুভূতি বিশ্বস্তভাবে প্রিয়নাথকে নির্মাণ করে ফেলেছে। তাঁকেই উৎসর্গ করল কবিতাখানি,
মনে-মনে, জরাহীন মোহনায়। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে আসে সায়ম। বারবার মন বলছে অলৌকিক কিছু একটা ঘটে যাবে। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। কেউ একজন ঠিক বুঝবে, ছন্দের দ্যোতনায় ফুল ফোটাবে, গানের ভেলায় সার্থক জন্ম হবে তার লিরিক্স। প্রতীক্ষাতেই সুখ। আঙুলের ডগায় টলটলে একফোঁটা সুখ। স্বপ্ন কোরক। একটি দীর্ঘ গৃহকোণ তার অপেক্ষায় আছে। জরায়ুর আশ্রয়ে রয়েছে আর-এক সৃষ্টি। মাথার উপরে লক্ষ তারার ছায়াপথ। প্রণত আকাশ। কিছুই খোওয়া যায়নি। ছোট-ছোট সুখদুঃখের নির্দিষ্ট কয়েকটি বিন্দুই তার গন্তব্য। সাধারণ
মানুষের জীবনে উত্থানপতনের চঞ্চল রেখাচিত্র নেই, কখনও কোনও কাহিনির নায়ক হওয়ার উপাদান নেই, তার ছোট ক্যানভাসটি প্রত্যাশার আঁচড়ে রঙিন হতে চায় মাঝেসাঝে। সীমাবদ্ধ মানুষের বেঁচে থাকাটাও শিল্প। সুন্দরের আকণ্ঠ আকাশ আত্মজনদের জড়িয়েই চিনে নেওয়া যায়।
সায়মের শরীর জুড়ে মায়াপ্রদীপের আলো জ্বলে ওঠে। প্রিয়নাথ, অদিতি, রোহন, রমিত, শেখরদা সবাইকে সেই অনির্বাণ মায়াপ্রদীপের আধার মনে হয় এখন।
রাত ফুরোলে কারনিসে জাগবে অন্য সকাল, আলোর তুলি হাতে স্বাগত জানাবে তাকে। এবার যে অন্যরকম গান হবে তার বেঁচে থাকা...

ছবি: কুনাল বর্মন

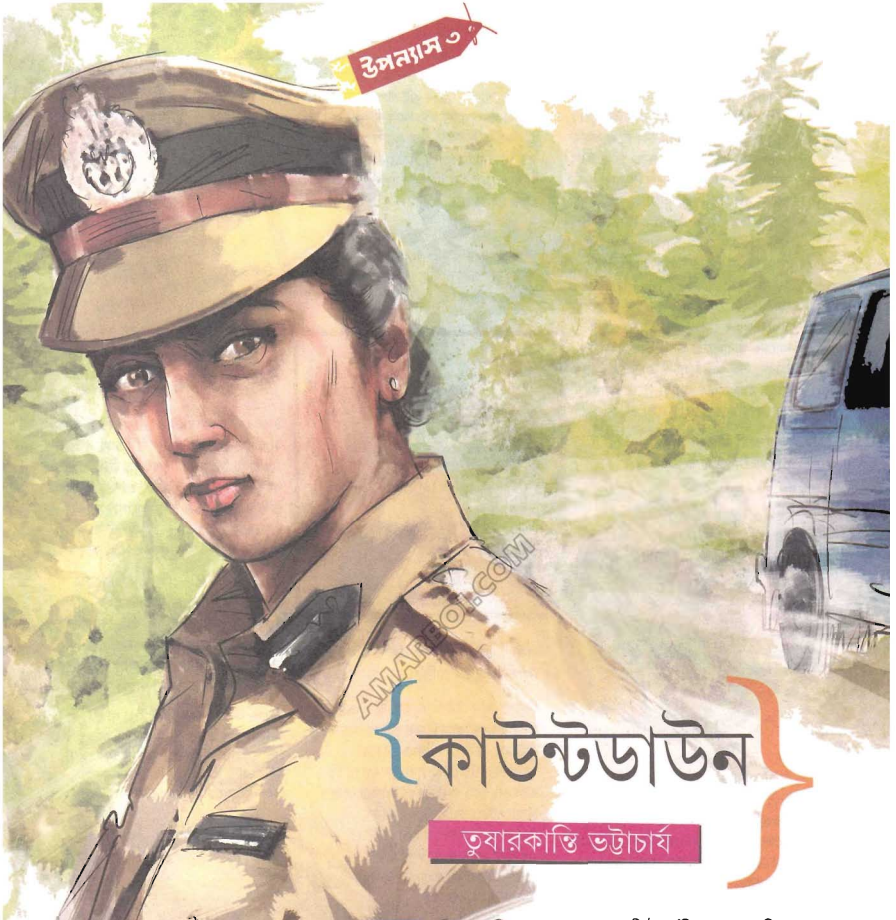

কাউন্টডাউন

তুষারকান্তি ভট্টাচার্য

AMARBOI.COM

সমরজিতের গাড়ি যতক্ষণ দেখা যায়, জয়ন্তী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ক'দিন ধরে লক্ষ করছে, খুব যেন অন্যমনস্ক। অন্য কিছু চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। কাজের চাপ তো সবসময়ই রয়েছে। কিন্তু এতটা বেখেয়াল তো হয়নি কখনও। নাম কা ওয়াস্তে খেতে বসা। যে মোচার ঘণ্ট ওর এত প্রিয়, সেটা ছুঁয়ে দেখল না।

"এ কী, মাছটাও তো খেলে না!"

"ক'টা বাজে খেয়াল আছে? এই তাড়ার সময় এত কিছু গুছিয়ে খাওয়া যায়? এক কাজ কর, সব রেখে দাও, রাতে খাব।"

"রাতে?"

"হ্যাঁ, রাতে।"

"বাহ, এখনই ভুলে গেলে! আজ লেক গার্ডেন্সে যাওয়ার কথা না? তুমি কোর্ট থেকে সোজা চলে যাবে। আমি বিনোদকে নিয়ে দুপুরে গোলপার্কের কাজটা সেরেই ওখানে যাব। রুম্পাও স্কুল ছুটির পর... সব ভুলে গিয়েছ?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক আছে। তবে পৌঁছতে সাতটা বেজে যাবে। কিছু ভেবো না, দেরি হলে ফোন করব।"

"একটা কথা বলো তো।"

টাইয়ের ফাঁস ঠিক করতে-করতে সমরজিৎ বলে, "শুনছি বল।"

"এই বদখত মামলাটা কবে শেষ হবে বলতে পারো? মহেশ বলছিল, সাক্ষ্যদান পর্ব চুকে গিয়েছে।"

"ঠিকই বলেছে। আজ থেকে আরগুমেন্ট শুরু। আরও দিন ২০ লেগে যাবে।"

"তুমি কি খুব চাপের মধ্যে আছ?"

জয়ন্তীকে আশ্বস্ত করতে ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, "আসলে খুব বড় মামলা তো। সাক্ষীও ছিল অনেক। বুঝতেই পারছ, গ্যাং অপারেশনের কেস। একটু চাপ তো..."

খাঁচার ভিতর বদরিগুলো ভীষণ কিচিরমিচির করছে। মেঝেতে বিস্তর কাঁকরিদানা। ডিম ফুটে বেশ ক'টি ছানা হয়েছে আবার। দুটি টার-ব্লু আর তিনটি হলুদ-সবুজ।

সমরজিতের গাড়ি চোখের আড়ালে চলে গেলেও জয়ন্তী দাঁড়িয়েই থাকে। কোনও তাড়া নেই। এখন এই বিশাল ফ্ল্যাটে সে একা। অন্যদিন মঞ্জু থাকে। একাকিত্ব টের পাওয়া যায় না। আজ নেই। কোন সকালে মাসির বাড়ি চাঁপাডাঙা না কোথায় যাবে বলে বেরিয়ে গেল। এই তিনবছরে জয়ন্তী কখনও ওর মুখে মাসির গপ্‌পো শোনেনি। মঞ্জু সত্যি চাঁপাডাঙায় গেল, না অন্য কোথাও! প্রেম-ট্রেম করে বসেনি তো? কে জানে বাড়ন্ত বয়স। দেখতে-শুনতেও মন্দ নয়। উল্টো-পাল্টা কিছু করে বসলে ওর বাবা-মা'র কাছে কী জবাব দেবে? তখন কি আর ওরা ছেড়ে কথা বলবে?

ব্যালকনি থেকে জয়ন্তী সোজা চলে যায় মঞ্জুর ঘরে। সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতেই ভুলটা ভাঙে। সব কিছু যেন সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আটপৌরে শাড়িগুলো পর্যন্ত নেই। পড়ে আছে একটা রংচটা চুড়িদার আর ছেঁড়া চপ্পল। যে বড়সড় ব্যাগটা ওরা কিনে দিয়েছিল গতবছর পুজোর ছুটিতে টুরে বেরনোর সময়, সেটা তো নেই-ই, ওর পুরনো হাতল-ছেঁড়া ব্যাগটাও দেখতে পাচ্ছে না তো। ঝুঁকে খাটের তলায় সেটার অবশ্য হদিশ পেল। টেনে বের করে দেখল, তাতে কয়েকটা ছেঁড়া পোশাকআসাক ছাড়া কিচ্ছু নেই।

মাথাটা বাঁই করে ঘুরে যায়। এত স্নেহ ভালবাসার এই প্রতিদান? অত মারাত্মক ডেঙ্গি থেকে ওকে কীভাবে রাতদিন পরিচর্যা করে সুস্থ করা হয়েছে। রুম্পাটাও পর্যন্ত রাত জেগে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, সেই মঞ্জু তুই পারলি? তোর পেটে-পেটে এত বুদ্ধি! কবে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে চম্পট দেওয়ার মতলবে ছিলি! জয়ন্তী অতশত ভাবেইনি। ভেবেছে, মাসির বাড়ি দু'-চারদিনের জন্য যাচ্ছে যাক। আর এমন

সময় বের হল, যখন সে বাথরুমে। তার মানে তক্কে-তক্কে ছিল কখন জয়ন্তী বাথরুমে ঢোকে। আর কাকু তো ভোলা মহেশ্বর! কে যে কী করছে, কেন করছে, সে সবে কোনও হুঁশ নেই। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এইভাবে মেয়েটা পালাল। ওর তো দু'মাসের মাইনেও বাকি!

রাগে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। বাড়ি যদি চলে যায় তো যাক। কিন্তু যদি বদ পাল্লায় পড়ে কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসে? কেউ যদি দূরে কোথাও ওকে পাচার করে দেয়। এখন তার কী করা উচিত?

বিনোদটাও এখনও ফেরেনি, রুম্পাকে স্কুলে ড্রপ করে মেকানিকের কাছে যাবে বলছিল, গাড়ির হর্নটা গণ্ডগোল করছে।

তা হলে কি সমরজিৎকে এখনই... ঠিক আছে। তার আগে মঞ্জুর বাবাকে ফোন করা দরকার। সার্চ করে প্রফুল্ল সাঁতরার নামটা পেয়ে যায়। রিং হচ্ছে...

"হ্যাঁ হ্যালো প্রফুল্লবাবু? মঞ্জুর বাবা বলছেন? রং নাম্বার?"

আচ্ছা, মঞ্জুর নাম্বারেও তো করা যেতে পারে। ধরবে কি? পাততাড়ি গুটিয়েই যদি চলে যায় সে তো ফোনটা ধরবেই না।

যা ভেবেছে, সুইচড অফ। সময়টা হিসেব করে দেখল, সমরজিৎ এখনও রাস্তাতেই রয়েছে। ওকে অবশ্যই জানিয়ে রাখা দরকার।

"হ্যাঁ বলো।"

"মঞ্জু মনে হয় পালিয়েছে।"

"বলো কী! যখন বেরিয়ে গেল শুধু তো একটা ব্যাগই কাঁধে ছিল।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওতেই সব তল্পিতল্পা বেঁধে নিয়ে গিয়েছে।"

"তাই হবে বোধ হয়। ব্যাগটা মনে হচ্ছিল খুব ভারী।"

"সে যাক। কিন্তু কেউ যদি ওকে কোথাও পাচার করে দেয়। তুমি লালবাজারে একটু জানিয়ে রাখো।"

"এমনটা ভাবছ কেন? ঠিক আছে। ওর বাবাকে ফোন করছি।"

"আমি তো করেছিলাম। পেলাম না। দ্যাখো তো তুমি পাও কি না।"

{২}

বালিগঞ্জ প্লেসের জজবাংলো থেকে খুব ভোর-ভোর বেরিয়ে মঞ্জু অটো ধরে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির স্টপে নামল। এবার কাপড়-জামা ভর্তি ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে গেল বিড়লা মন্দিরের দিকে। কাল রাতেই সে ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছে। সে আর ওই বাড়িতে ফিরবে না। মন্দিরের মূল ফটকের সিঁড়ির সামনের ফুটপাথে ভারী ব্যাগটা রেখে এদিক-ওদিক তাকাল। এত সকালে রাস্তা শুনশান বলা যায়। মঞ্জু কোনও বাস বা অটোতে উঠবে না। লোকটা বলেছিল, সাতটার মধ্যে এখানে এসে দাঁড়াতে। তা সে সাতটার আগেই এখানে এসে গিয়েছে। ভারী ব্যাগটি এখন মাথাব্যথার কারণ। ওতে যে অনেক টাকা!

তিনবছর সে এই জজসাহেবের বাড়িতে রয়েছে। ভালওবাসে সবাই। রুম্পা তো মঞ্জুদি বলতে অজ্ঞান। জয়ন্তীকাকিমাও সব কথাতেই মঞ্জু আর মঞ্জু। এই মধুর বন্ধন কাটিয়ে সে চলে যাবে বহু দূরে। তাকে আর লোকের বাড়িতে কাজ করে খেতে হবে না। তারাপদর সঙ্গে সুখের সংসার পাতবে। অঢেল টাকার মালিক সে এখন। এত টাকার স্বপ্ন সে জীবনে দ্যাখেইনি। এ যেন মেঘ না চাইতেই অঝোর বৃষ্টি। কিন্তু লোকটা তো এখনও এল না। সাতটা বাজতে চলল।

কাঁটায়-কাঁটায় সাতটা বেজেছে কি বাজেনি যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল সে। মঞ্জুর ভড়কে যাওয়ারই কথা। আশেপাশে কাউকেই দেখা যায়নি। এই বাসস্টপের ফুটপাথে সে একাই ছিল তো! তা হলে কি ওই পানগুমটির আড়ালে অপেক্ষা করছিল? ঠিক সাতটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে উদয় হয়েছে।

"মঞ্জু, সব ঠিকঠাক আছে?"

"হ্যাঁ।"

"এখনই একটা সাদা মারুতি ভ্যান আসবে। কাছে এসে দরজা খুললেই উঠে পড়বে। ড্রাইভারকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।"

"আর আপনি?"

"উঠব-উঠব, ওতেই উঠব।"

ওদের কথাবার্তার মাঝে গাড়িটি এল। সাদা রংয়ের মারুতি ভ্যান। দরজাটা কেউ খুলে দিল ভিতর থেকে। পূর্বনির্দেশ মতো মঞ্জু উঠে পড়ল নীরবে। পিছন-পিছন সেও উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ফাঁকা রাস্তায় বেপরোয়া স্পিড তুলে মারুতি ওমনি সোজা গেল খানিক। তারপর বাঁদিক ঘুরে বেকবাগানের রাস্তা ধরল। কিছুটা গিয়ে ফের বাঁকল বাঁয়ে। এইভাবে বারতিনেক ডাইনে-বাঁয়ে মোচড় মেরে একটা গলিতে ঢুকল। এসব রাস্তাঘাট মঞ্জুর মোটেই চেনা নয়!

{৩}

সিটি সেশন জজ সমরজিৎ লাহিড়ি যখন তাঁর এজলাসে প্রবেশ করলেন, তখন কোর্টের দেওয়াল ঘড়িতে সাড়ে দশটা। আদালত কক্ষে তিল ধারণের জায়গা নেই। সবাই প্রথামত উঠে দাঁড়িয়েছে। জজের জন্য নির্দিষ্ট প্রকাণ্ড চেয়ারটিতে তিনি আসীন হতেই উপস্থিত সকলে যে যার আসন গ্রহণ করল। 'সমরজিৎ লাহিড়ি' নামটির সঙ্গে খ্যাতি-অখ্যাতির অঙ্গাঙ্গি সহাবস্থান। চারটি বিশেষ গুণের জন্য বার-এর অধিকাংশ উকিলবাবু ওঁকে সমীহ করে। সমরজিৎ সৎ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং দৃঢ়চেতা। তার উপরে ওঁর সময়জ্ঞান ওঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসানোর একটি অতিরিক্ত উপকরণ। আর অখ্যাতির যারা প্রবক্তা, তারা বলে, জজ সমরজিৎ এমনই কড়াধাতের মানুষ যে, খুনি আসামির বিচার করার সময় উনি নাকি একহাতে কলম আর অন্য হাতে ফাঁসির দড়ি নিয়ে প্রস্তুত থাকেন। সেই কারণে আসামি পক্ষের উকিলবাবুরা ভয়ে-ভয়ে থাকেন, এই বুঝি সব কেঁচে গেল। সাক্ষী যদি সাক্ষ্যদানকালে সাহসে ভর করে ঠিক-ঠিক সাক্ষ্য দেয়, তা হলে সেই আসামির আর রেহাই নেই। জজ সমরজিৎ কারাদণ্ডের অথবা প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেনই। উকিলবাবুরাও বুঝে গিয়েছেন, আসামিকে বাঁচাতে গেলে মূল সাক্ষীদের ভাঙাতে হবে, ভয় দেখিয়ে অথবা অর্থের বিনিময়ে। মূল সাক্ষীরাই যদি ভেঙে যায়, জজের আর কিছু করার থাকে না।

সব দিক থেকে দেখতে গেলে এই যে রতন জৈন হত্যা-মামলা, যার সওয়াল-জবাব শুরু হবে আজ, একেবারে ফুলপ্রুফ কেস। একজন-দু'জন নয়, ৩১ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে। তার মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী প্রায় ন'জন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ আসামি এবং বিত্তবানদের ত্রাস টারজেন সিংহের ভ্রুকুটিকে পরোয়া না করেই, সবাই সাক্ষী দিয়েছে। সাক্ষীরা নির্ভয়ে সাক্ষ্যদান করেছে, তার কারণ ট্রায়াল চলছে জজ সমরজিৎ লাহিড়ির এজলাসে। ঠিকমত সাক্ষী দিলেই টারজেন সিংহের ত্যাম্ভাই-ম্যাম্ভাই সব ঠান্ডা। হয় প্রাণদণ্ড নয়তো আজীবন কারাবাস। টারজেনের দুর্ধর্ষ শাগরেদরা সাক্ষীদের ভয় দেখানোর বা প্রভূত অর্থের লোভ দেখিয়ে বশ মানানোর কম চেষ্টা চালায়নি। ওদের সব প্রচেষ্টাই বিফল হয়েছে। তার কারণ এই হত্যা মামলা নির্বিঘ্নে মনিটর করছে কলকাতা পুলিশ। ডিসি ডিডি কস্তুরী মুখোপাধ্যায়, নিজে একঝাঁক ঝানু পুলিশ অফিসারদের মাথার উপর অবস্থান করে এই জটিল অপহরণ কাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট হত্যা মামলার দীর্ঘ তদন্ত অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। ঘাঘু ও নেকড়ের মতো ধূর্ত টারজেনকে পাকড়াও করেছেন রীতিমত প্রখর বুদ্ধি খাটিয়ে। সরকার পক্ষের আইনজীবী যিনি পদমর্যাদায় চিফ প্রসিকিউটর, সেই শিবনাথ ঘোষাল উঠে দাঁড়িয়ে আরগুমেন্ট পর্বের সূত্রপাত করার মুহূর্তেও আদালতকক্ষে একটা গমগম গুঞ্জন হট্টগোলের আকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল। শিবনাথবাবু যেইমাত্র আদালতকে সম্বোধন করে 'ইয়োর অনার' উচ্চারণ করলেন, সেই গুঞ্জন স্তিমিত হতে-হতে নৈঃশব্দ্যের রূপ নিল। তারপরই পিনড্রপ সাইলেন্স। কেবল ফ্যানগুলোর বনবন শব্দই যেন রাজত্ব করছে।

"ইয়োর অনার, এই রতন জৈন হত্যামামলা অত্যন্ত জটিল এবং ভয়াবহ। কারণ মাল্টিমিলিওনেয়ার রতন জৈন, যিনি ছ'-ছ'টি ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার এবং শুধু কলকাতারই নয়, সারা ভারতে একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি হিসেবে পরিচিত, তাঁকে শুধু অপহরণ-ই করা হয়নি, অপহরণ করার সাতদিন পরে মুক্তিপণ পাওয়া সত্ত্বেও খুন করা হয়েছে। তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে ছয় নভেম্বর মঙ্গলবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চত্বর থেকে। আর খুন করা হয়, ১৩ নভেম্বর কুমারডুবি স্টেশনে রাত ১২টার কিছু আগে। ইয়োর অনার আমরা যদি ছয় নভেম্বর সকালে ফিরে যাই, দেখব, ট্র্যাকসুট পরিহিত রতন জৈন, সঙ্গে সর্বক্ষণের সঙ্গী মেহের আলি, ভিক্টোরিয়ার অদূরে গাড়ি পার্ক করে নামলেন প্রাতঃকালীন জগিং সারবেন বলে। নিত্যদিন একই রুটিন। প্রবল বর্ষা ছাড়া সময়ের হেরফের কখনও ঘটেনি। ৬০ বছর বয়সেও স্বাস্থ্য অটুট। দীর্ঘ সময় জগিংয়েও শরীরে ক্লান্তি নেই। হালকা চালে দৌড়বার সময় কখনও এগিয়ে যায় মেহের আলি, কখনওবা রতন জৈন। খোশগল্পও চলে...

{৪}

"মেহের দেখেছ, এখনও শীতকাল শুরু হল না অথচ কুয়াশার কী দাপট!"

"ঠিকই বলেছেন। তবে কী জানেন, এই কুয়াশার কারণেই শীতটা

চিৎকার করতে যাবেন, তখনই বলিষ্ঠ দুটি হাত ওঁর মুখে তীব্র আঠালো লিউকোপ্লাস্ট সেঁটে দিল বেশ কয়েক প্যাঁচ ঘুরিয়ে।

জাঁকিয়ে পড়ে না। আচ্ছা, জৈনসাব! গাড়িতে যখন আসছিলেন, তখন কে ফোন করেছিল? মেয়ে?"

"হ্যাঁ, প্রিয়ঙ্কা ফোন করেছিল।"

"লেকিন এত ভোরে! খুব জরুরি কথা?"

রতন জৈন হাসতে-হাসতে বলেন, "মেহের তুমি ভুলে গেলে, প্রিয়ঙ্কা আর প্রকাশ এখন আইসল্যান্ডে। ওখানকার রাজধানী রেইকিয়াভিক থেকে ফোন করেছে। যখন ফোন পাই, তখন ওখানে রাত সাড়ে এগারোটা। ভারতীয় সময় থেকে প্রায় ছ'ঘন্টা পিছিয়ে ওদের টাইম। আর মেহের, জরুরি কী কথা যদি জিজ্ঞেস করো তো বলি, দারুণ খবর। প্রকাশ যে ব্যবসাটা শুরু করতে চলেছে তা হল কড লিভার অয়েল সংক্রান্ত। ভারত সরকারের ছাড়পত্র পেয়ে মেয়ে-জামাই ওদেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপর আমন্ত্রণ পেয়ে এই গত ২৭ অক্টোবর বার্লিন হয়ে রেইকিয়াভিকে গিয়েছে। ডিল পাকা হতেই ওরা ফোন করেছে।"

মেহের আলির কাছে ব্যাপারটায় কোথায় যেন একটু হেঁয়ালি থেকে যাচ্ছে। কড লিভার অয়েল তো কলকাতার সব ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়। তার জন্য সাত সমুদ্র পার হয়ে আইসল্যান্ডে যেতে হবে কেন?

জগিংয়ের ফাঁকে মেহের প্রশ্নটি করে বসে। শুনে রতনজি হো-হো করে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন,

"ঠিক কথা। কড লিভার অয়েল সব ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়। ওষুধের জন্যই কড লিভার অয়েল ব্যবহার করা হয়। তবে মজা হল, কড লিভার অয়েল পেতে গেলে দরকার কড ফিশের, যা উত্তর সাগরে পাওয়া যায় প্রভূত পরিমাণে, বলতে পারো টনটন ধরা পড়ে মাঝ সমুদ্রে। তারপর ট্রলারে করে চলে আসে ফ্যাক্টরিতে। সেখানে ওই মাছের লিভার সংরক্ষিত করে পর্যায়ক্রমে তেল করা হয়। সেই তেল পৃথিবীর সব দেশে চালান করে আইসল্যান্ড টাকার উপর বসে আছে। সেই তেল আমদানির চুক্তি করতেই প্রকাশ-প্রিয়ঙ্কা ওখানে গিয়েছে। ওরা গুজরাতের ভেরাবলে যে ওষুধের ফ্যাক্টরি খুলেছে, সেখানে কড লিভার অয়েল থেকে বাত এবং হাড়ের দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ প্রস্তুত করবে। মেহের, এবার বুঝতে পারছ?"

জগিং করতে-করতে ওরা রোনাল্ড রস সরণি এবং প্রণবানন্দ সরণির সংযোগস্থল পেরিয়ে যখন পিজি হাসপাতালের দিকে মুখ করে এগচ্ছে, তখন একটি রংচটা নীল রংয়ের মারুতি ভ্যান খুবই নিঃশব্দে নিষ্পাপ ভঙ্গিতে ওদের থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে রেসকোর্সের ফেন্সিং ঘেষে দাঁড়াল। দাঁড়াল বললে ভুল হবে, যেন ওদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলবে বলে শুধু অপেক্ষায় থাকল। দু'-একজন পথচারী বা ভোরের বায়ুসেবনকারী স্বাস্থ্যকামী মানুষজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও মাঝারি কুয়াশার চাদরে সকলের অস্তিত্ব কেমন রহস্যঘন। এদিকে ওরা আলাপচারিতা বন্ধ করে স্রেফ জগিং করছে। মেহের খানিকটা এগিয়েও যায়। প্রাকশীতের সকালেও দু'জনেই বেশ ঘেমে উঠেছে। সেই রংচটা মারুতি ভ্যানের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। রতন জৈন যেইমাত্র গাড়ির খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছেন, জনা তিনেক রাফ-টাফ যুবক চিতার মতো চুপিচুপি গাড়ি থেকে নেমেই শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, চকচকে অটোমেটিক রাইফেল কব্‌জিতে সেঁটে। ব্যাপারটি এত আচমকা ঘটে গেল যে, তাঁর ডিফেন্স মেকানিজম সেই সঙ্কটকালে কোনও কাজই করল না। কার্যত বোবাই রয়ে গেলেন ৫-১০ সেকেন্ড। ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গিয়েছে। পেশাদার গ্যাংটি নিপুণ দক্ষতায় রতন জৈনকে পাঁজাকোলা করে গাড়ির ভিতরে তুলেছে। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই অপেক্ষা করছিল। কুয়াশার ঘোমটায় চত্বরটি অস্পষ্টতায় মোড়া। এই অপহরণ অপারেশনটি সেভাবে কারও চোখে পড়ল না। ঘটনার বিহ্বলতা কাটিয়ে রতনজি যখন হাঁপাতে-হাঁপাতে চিৎকার করতে যাবেন, তখনই বলিষ্ঠ দুটি হাত ওঁর মুখে তীব্র আঠালো লিউকোপ্লাস্ট সেঁটে দিল বেশ কয়েক প্যাঁচ ঘুরিয়ে। তখন অন্য দুটি শক্ত হাত রতনজির হাত দুটিকে পিছনে মুড়ে কর্ড জড়াতে ব্যস্ত। মারুতি রেসকোর্স ডানহাতে রেখে সন্তর্পণে এগোয়।

মেহের আলি অভ্যেসমতো পিছু ফিরে দেখল, জৈনসাব কতটা পিছনে? দৃষ্টিপথে তাঁর দেখা না পেয়ে ভাবল, হয়তো ওই চলন্ত গাড়িটির পিছনেই রয়েছেন। আড়ালে দেখা যাচ্ছে না। একসময় সেই গাড়িটি অর্থাৎ নীলরংয়ের মারুতি ভ্যান মেহের আলিকে অতিক্রম করে যায়। সে টেরও পেল না, তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন রতন জৈন, এই দু'মিনিট আগেও আইসল্যান্ডের গপ্‌পো শোনাচ্ছিলেন, যাঁর বিজনেস চেন সারা ভারত জুড়ে ছড়ানো, ফ্লাইটে বিজনেস ক্লাস ছাড়া ভ্রমণ করেন না, তাঁর স্থান হয়েছে একটা মারুতি ভ্যানের ফুটবোর্ডে হাতমুখ বাঁধা অবস্থায়।

মেহের আরও দু'কদম পিছিয়ে এসে কুয়াশাভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নজর তল্লাশি চালায়। না, দেখা যাচ্ছে না তো। গেলেন কোথায়। জলজ্যান্ত মানুষটা ভ্যানিশ হয়ে গেল! আচ্ছা, প্রকৃতির ডাকে ওই গাছগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে নেই তো? আশঙ্কার হলকা মেহেরকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে-ছুটতে কুয়াশার আস্তরণ গায়ে মেখে সম্ভাব্য স্থানগুলো খুঁজে চলে। না! কোথাও নেই! রক্তমাংসের মানুষটা গায়েব হয়ে গেল চোখের পলকে।

ভেলকিবাজি? তা হলে... তা হলে কি সাহেবকে কোনও গ্যাং কিডন্যাপ করল? কথাটা ভাবতেই তার সারা শরীর বেয়ে এক ভয়াল

স্রোত বিদ্যুতের মতো খেলে যায়। মাথাটা ঘুরছে বনবন। পা দু'টো যেন গাঁথা হয়ে গিয়েছে কংক্রিটের আস্তরণ ভেদ করে আরও গভীরে। খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে পতনোন্মুখ মানুষ প্রাণভয়ে যেভাবে অদৃশ্য রক্ষাকর্তাকে তীব্র ভয়ার্তস্বরে আহ্বান করে, মেহের আলিও আল্লাকে সাক্ষী রেখে প্রাণপণে চিৎকার করে রতন জৈনের নাম ধরে ডাকে, "জৈন-সা-হা-ব..."

সতীশ খৈতান বয়সে রতন জৈনের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। দু'জনের খুবই সখ্য। সারাদিনে অজস্রবার ফোনে কথা হলেও মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটে এই সময়টাতে, ভিক্টোরিয়া চত্বরে। আজ কুয়াশার জন্য আসতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। সবে গাড়ি পার্ক করে দরজা লক করছেন, চত্বর কাঁপানো চিৎকার কানে এল, "জৈনসাহা..."

থমকে দাঁড়িয়ে শব্দের ঠিকানা হদিশ করতে চাইলেন। মেহেরের গলা মনে হচ্ছে, রতনের কোনও বিপদ হল না তো! জগিং করতে-করতে রাস্তায় পড়ে-টড়ে যায়নি তো! নিশ্চিন্ত হতে পালটা হাঁক দেন, "মেহের কী হল? তোমরা কোথায়?"

ঘোরতর আতঙ্কের মুহূর্তে খৈতানসাহেবের গলা শুনে মেহের কিছুটা ভরসা পায়। ছোটার গতি বৃদ্ধি করে ওঁর দিকে এগিয়ে আসে। সতীশজিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মেহেরের মুখোমুখি হন। গুছিয়ে কথা বলা তো দূরের কথা, দ্রুতলয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ফাঁকে শুধু বলতে পারল, জৈনসাহাবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সতীশ খৈতান দৃশ্যতই বাকরুদ্ধ। সামলে নিয়ে শুধোন, "তোমরা তো একসঙ্গেই ছিলে!"

"জি!"

"তা হলে?"

"দুলকি চালে ছুটতে-ছুটতে আমি ২০-২২ গজ এগিয়ে পড়েছি। সাহেবও তো পিছনেই ছিলেন। কিছুক্ষণ বেখেয়ালে পিছু ফিরে তাকাতে ভুলে গিয়েছি।"

"তারপর... তারপর?"

"তারপর আর কিছু নেই। সব শুনশান," বলেই মেহের এ যাবৎ রুদ্ধ কান্নাকে যেন আগল মুক্ত করল। নিজের পরিচিতজন সতীশজিকে কাছে পেয়ে হাউহাউ করে কান্না জুড়ে দিল।

"আরে এখন কান্নার সময় নয়। চলো-চলো আরও ভাল করে খুঁজি। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হচ্ছে তোমার।"

দু'জনেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলে। লক্ষ্যভ্রষ্ট ডিঙির মাঝি যেমন তালকানা হয়ে বৈঠা টানে, তেমনই এলোমেলো পদক্ষেপে দু'-কদম এগোয় আর রতনজির নাম ধরে উচ্চস্বরে ডেকে যায়। তখনও বুকে আশা, নিশ্চয়ই কাছাকাছি রয়েছে। বেরিয়ে এল বলে। ওদিকে তখন সেই রংচটা নীল ভ্যান রেসকোর্স ডাইনে রেখে এগিয়ে চলেছে খিদিরপুর যাওয়ার রাস্তা ধরে।

অপহরণ কাণ্ডটি মেহের আলির চোখে না পড়লেও ওই কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে একজনের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল নিতান্তই কাকতালীয়ভাবে। সে রহিম বক্স, রতন জৈন হত্যামামলার তিন নম্বর সাক্ষী। একটি রুগ্‌ণ ঘোড়ায় চড়ে রহিম ভিক্টোরিয়ার প্রবেশপথ বাঁ-হাতে রেখে রেসকোর্সের দিকে এগছিল, বেশ দুলকিচালে। বেতো ঘোড়াকে সতেজ রাখতে ঘোড়ার মালিকরা ভোরের শুনশান রাস্তাই বেছে নেয়। রহিমের ঘোড়া বেশ সাবলীল ভঙ্গিতেই কদম ফেলছিল, খটাখট, খটাখট... আর ঘোড়সওয়ার রহিম বক্স তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে নিতে নিজের প্রিয় ঘোড়াটির সঙ্গে স্নেহবিজড়িত বাক্যালাপ জুড়েছিল, "বাহ বেটা! এই তো সেরে উঠেছিস। আজ কাবলি ছোলার জাবনা দেব। আরও সেরে ওঠ। বড়দিন আসছে না! টমটমে জুড়ে দেব সুলতানের সঙ্গে। দুটিতে ছুটবি টগবগ টগবগ! পথচারীরা সমীহের দৃষ্টিতে তাকাবে রহিম বক্সের টমটম রথের দিকে, যেন আকবর বাদশার রথ!"

মৌতাতের বেশ ঘোরের মধ্যেই রহিম ঠুকুস-ঠুকুস এগচ্ছিল ভোরের কুয়াশা আর স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে মেখে প্রিয় ঘোড়া বাদশার পিঠে বসে। সাময়িক অসুস্থ বা বয়সের ভারে কিছুটা কাহিল হয়ে পড়লেও বাদশা একসময় ছিল কলকাতা মাউন্ট পুলিশের অ্যাসেট। ওখানে বাতিল হতেই রহিম নিলামে কিনে নেয় গতবছর জুলাইতে। আর সুলতান আটবছর টানা ছিল রেসের ডার্বি। তা বাদশা বয়সের ভারে কিছুটা জীর্ণ হলেও ওর কদমে ছিল ম্যাজেস্টিক ছন্দ। ক্রমে সেরে উঠছে সে। রহিম এটা লক্ষ করে আশ্বস্তই হচ্ছিল। তা হলে ওর জুড়ি গাড়িটা ফের রেড রোড তল্লাটে দাপিয়ে বেড়াবে! বাদশার উচ্চতাও হেলাফেলার নয়। পিঠে চড়ে বসলেই নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হয় রহিমের।

প্রায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতায় বসে রহিম পিজি হাসপাতালের দিকে এগতে-এগতে রেসকোর্সের ফেন্সিংয়ের ভিতর নজর করছিল। আরে! লোকটা কি ছুটতে-ছুটতে অজ্ঞান হয়ে গেল। চারটে মানুষ চ্যাংদোলা করে গাড়িটায় তুলছে! কিন্তু অজ্ঞানই যদি হবে, হাত-পা ছুঁড়ছে কেন? কেউ যেন মুখটা চেপে ধরেছে মনে হচ্ছে। যাহ বাবা, ছোঁড়াগুলোর হাতে মেশিনও রয়েছে দেখছি!

কুয়াশাভেদী প্রখর দৃষ্টি হেনে রহিম আরও দেখল, লোকটাকে গাড়ির মেঝেতে ফেলে দিতেই গাড়িটা হুট করে যেন লাফ দিল, হয়তো ড্রাইভার তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কিছু ভুল করেছে। মনে হল, ফের স্টার্ট দিচ্ছে। গাড়ির কালো কাচের ভিতর দিয়ে সে আর কিছু দেখতে পেল না। একটা ধস্তাধস্তি যে চলছে, তার ছায়া দূর থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারল।

সাময়িক বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে সে গলা ফাটিয়ে হল্লা জুড়ে দিল, "পাকড়ো-পাকড়ো! আদমি কো জবরদস্তি উঠা লিয়া! উস আদমি কো উঠা লিয়া!"

রহিম বক্সের চেহারাটা সিড়িঙ্গে টাইপের। কিন্তু গলার জোর আছে বলতে হবে। দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে ক'জন প্রাতর্ভ্রমণকারী হাঁটছিল, রহিমের হাঁকডাক কানে যেতেই, সকলে কেউ ছুটে, কেউ লম্বা-লম্বা পা ফেলে রহিমের দিকেই এল। কারণ রহিম চিৎকারের সঙ্গে হাতও নাড়ছিল ঘোড়ার উপর থেকে। 'আদমি কো উঠা লিয়া' কথাটা শুনেই সতীশ খৈতান এবং মেহের আলি যে যেখানে ছিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল রহিমকে লক্ষ করে। ততক্ষণে নীলরংয়ের মারুতি রহিমকে অতিক্রম করছে। রহিম বক্সও হেরে যাওয়ার বান্দা নন। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দু'পায়ের গোড়ালি দিয়ে বাদশার পেটে বার দুই খোঁচা দিল। টেনে ধরল লাগাম। তারপর তা ঢিলে করে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বাদশার উদ্দেশে বলে, "কদম-কদম ছোট, ছোট বাদশা! খানদানি রক্ত তোর গায়ে। দেখিয়ে দে বুড়ো হাড়েও তুই পারিস।" ক্রমাগত রহিমের গোড়ালির গুঁতো খেয়ে বাদশার যেন স্মৃতি ফিরে আসে। তার পিতৃমাতৃপুরুষ যে চোদ্দোপুরুষ যে গতিতে দূরত্বকে শুষে নিয়ে পলকে তেপান্তর ডিঙোত, সেই লুপ্ত গরিমা শিরা-ধমনী বেয়ে বাদশার মস্তিষ্কে প্রবল আলোড়ন তুলল। সে ছুটল চিতার গতিতে।

রহিম, বাদশার পিঠ বরাবর ঝুঁকে শুয়ে পড়ে বাদশাকে উৎসাহ দিচ্ছে। আর উপস্থিত মানুষগুলোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে চলেছে, "উস শুভ্রেকে পাস মেশিন হ্যায়। পুলিশে খবর দিন," মেহের আলিও প্রাণপণে ছুটছে বাদশার পিছু-পিছু। রহিম উত্তেজনায় থরথর করছে আর বাদশাকে উস্কানি দিয়ে চলেছে। সে যেন একটা এসপার-ওসপার করেই ছাড়বে। তার বাদশার পায়ে এত দম! রহিম সত্যিই অবাক। তিরের গতিতে ছুটছে বাদশা। পিচ রাস্তার উপর ওর খুরের খটাখট শব্দের লয় ভীষণ দ্রুত। একসময় সে মারুতি ভ্যানের সমান্তরালে চলে এল। ভ্যানটি এবার পিজি হাসপাতাল বাঁয়ে রেখে সোজা ছুটছে খিদিরপুরের দিকে। ভ্যানের আরোহীরা হয়তো ভাবেছে, কোনও এক পাগল ঘোড়সওয়ার তাদের গাড়ির সঙ্গে খেয়ালবশে রেস দিচ্ছে। কিন্তু যখন ওরা লক্ষ করল, সে হাত নেড়ে চিৎকার করছে, 'পাকড়ো-পাকড়ো, বদমাশ লোগ ভাগতা হ্যায়! আদমি কো উঠা লিয়া,' তখন তাদের হুঁশ এল যে, ব্যাপারটি জানাজানি হয়েছে, কেউ তা হলে

দেখে ফেলেছে।
ওরা ড্রাইভারকে আরও জোরে, আরও-আরও জোর সে ভাগো বলতেই সে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে দুর্দান্ত গতি তুলে একে-একে পুলিশ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, তারপর চিড়িয়াখানা যাওয়ার ক্রসিং পার হয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ফ্লাইওভার ধরে ফেলে। একসময় এমন হল যে, রহিমের ঘোড়া যেন ওদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। তখন একজন ভ্যানের কাচ সরিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে রহিমকে লক্ষ্য করে রিভলভার তোলে। একটু হলেই একটা বিপর্যয় হতে যাচ্ছিল। কারণ ওরা তখন মরিয়া। গুলি যদি সত্যি-সত্যিই বের হত এবং নিশানায় লাগত, তা হলে রহিম অথবা বাদশা ধরাশায়ী হতে পারত। কিন্তু ওদের মধ্যেই ঠান্ডা মাথার কেউ সময়মত ওকে সংযত করে। কারণ গুলি চললে আসল উদ্দেশ্যই যে পণ্ড হবে।
যাই হোক, ফ্লাইওভারে ওঠার মুখেই বাদশা বেদম হয়ে পড়েই যাচ্ছিল। রহিম ঠিক সময়ে লাফ দিয়ে নেমে ওর গলা জড়িয়ে ধরে সামাল দেয়। বাদশা তখন থরথর করে কাঁপছে। ওদিকে দুষ্কৃতীদের ভ্যান বিপুল গতি তুলে ব্রিজের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়।
বিপদ বুঝে সতীশ খৈতান আর মেহের ছুটে ভিক্টোরিয়ার মেন গেটের কাছে গিয়ে তাঁদের গাড়িতে স্টার্ট দেয়। এত সব করে ওরা যখন রহিমের কাছে পৌঁছে শুনল যে, ভ্যানটি সেতুর দিকেই গিয়েছে, তখন ওরা গাড়ি ছুটিয়ে পিছু নেওয়ার চেষ্টা করে। রাস্তার দু'-চারজন ভিড় করে রহিমের কাছে শুনতে চাইল, কী ব্যাপার? সেই সময় চিড়িয়াখানার দিক থেকে একটি লাল-সাদা পুলিশের টহলদারি মোবাইল জিপ ক্রসিংয়ে পৌঁছে, মানুষের জটলা দেখে থামল। রহিমের কাছে দুঃসাহসিক অপহরণ কাণ্ডের বিবরণ শুনেই ওরা গাড়ি ঘুরিয়ে সেতু অভিমুখে ছুটে গেল। তার আগে রহিমের নাম-ধাম যথাস্থানে লিখে নিতে ভুলল না। ওদিকে রহিমও তার বাহনটির পরিচর্যায় মন দেয়।

"ইয়োর অনার, সেই দুর্ধর্ষ অপহরণ কাণ্ডের পান্ডা এই টারজেন সিংহ," টেবিলে রাখা জলের গ্লাসের ঢাকা সরিয়ে চিফ প্রসিকিউটর বেশ খানিকটা জল খেয়ে ফের শুরু করলেন, "একটা-দুটো নয় স্যার। বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বেশ কয়েকটি বাঘা-বাঘা কিডন্যাপিংয়ে এই টারজেন সিংহই কিংপিন। যে গ্যাংটি এইসব অপহরণ কাণ্ড ঘটাত, তার সদস্যরা প্রায় সকলেই ধরা পড়েছে। দু'জন, অবতার সিংহ এবং মোজাম্মেল হক পুলিশের জাল কেটে এখনও ফেরার। অত্যন্ত পেশাদার এদের কর্মকুশলতা। এদের লক্ষ্য সমাজের বিপুল ধনী ব্যক্তিরা। উদ্দেশ্য কোটি-কোটি টাকা মুক্তিপণ আদায়।"
এ পর্যন্ত বলার মাঝে শিবনাথ ঘোষালকে হোঁচট খেতে হল। কারণ ডিফেন্স ল-ইয়ার অর্থাৎ টারজেন সিংহের উকিলবাবু জটাধারী চৌবে উঠে দাঁড়িয়ে, জজ সমরজিতকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হুজুর উনি তো দেখছি, ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করলেন। টারজেন উচ্চশিক্ষিত, এমএ পাশ। ওর সম্পর্কে এইসব কুৎসা..."
জজ সমরজিৎ লাহিড়ি জটাধারীকে মাঝপথে থামিয়ে বললেন, "মি. চৌবে বসুন-বসুন। উনি তো কেসটা ওপেন করছেন। ঘটনার প্রেক্ষাপট বলতে গেলে তো অন্য সংশ্লিষ্ট কেস রেফারেন্স আসবেই। আর কোনও কিডন্যাপারের প্রসঙ্গ বলতে গেলে তার কীর্তিকলাপের বৃত্তান্ত আসবে না? তার বদলে উনি কি কেবল হরিসংকীর্তন আর সমাজসেবা করেন, এইসব প্রশংসাবাক্য বর্ষিত হবে? হ্যাঁ মি. ঘোষাল, বলুন যা বলছিলেন।"
"স্যার যা বলছিলাম, এদের নেটওয়র্ক অসাধারণ। অপহৃত ব্যক্তির বাড়িতে কোনও একটি বিশেষ ফোন থেকে ফোন করে মুক্তিপণ চাওয়া হয় না। বারবার সিম বদল করে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়া হয়, যাতে টাওয়ার লোকেশন গুলিয়ে যায়। জটাধারীবাবু ঠিকই বলছেন, টারজেন সিংহ এমএ পাশ। শুধু তাই নয়, স্যার ওর নিজস্ব একটা লোকদেখানো ফার্ম আছে ধানবাদে। বড় সাইনবোর্ডে লেখা 'নিশা লজিসটিক্স'। টারজেনের স্ত্রীর নামেই এই ধোঁকাবাজি ব্যবসা। তদন্তকারী দল সব কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখে জেনেছে, পুরো ব্যাপারটাই একটা ফাঁদ। মুক্তিপণের বিশাল অঙ্কের টাকা এই ফার্মের ছদ্মনামে রাখা হত। সে সব কথা পরে প্রসঙ্গক্রমে বলা হবে। ২৭ নং সাক্ষী একজন সরকারি অডিটর। তাঁর সাক্ষ্যতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখন স্যার, সেই ৬ নভেম্বর সকালের ঘটনায় ফিরে যাই।

{৫}

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে উঠেই বিচক্ষণ তরুণ পুলিশ অফিসারটি দ্রুত মেসেজ পাঠাল লালবাজারের সিকিউরিটি কন্ট্রোলে, যাতে সব থানাকে অ্যালার্ট করা হয়। সিকিউরিটি কন্ট্রোল মারফত বেঙ্গল পুলিশের হেডকোয়ার্টারেও খবর গেল, কারণ সব হাইওয়ে সিল করে দেওয়া দরকার।
মোবাইল পুলিশ জিপ পিছনে-পিছনে আসছে দেখে, সতীশ খৈতানরা ব্রিজের টোল প্লাজার কাছে অপেক্ষা করল। দ্রুত আলাপপর্ব সারা হতেই পুলিশ অফিসার টোল প্লাজায় ডিউটিরত সিকিউরিটিদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। জানা গেল, হ্যাঁ প্রায় পাঁচ/সাত মিনিট আগে একটি মারুতি ভ্যান... নীল রংয়ের... রংচটা কি না, অত খেয়াল নেই। তবে সেটা বোটানিক্যাল গার্ডেনের রাস্তা ধরে গিয়েছে।
সময় নষ্ট না করে মোবাইল জিপ সতীশ খৈতান ও মেহের আলির গাড়িগুলোকে পিছনে-পিছনে আসতে বলে বোটানিক্যাল গার্ডেন যাওয়ার রাস্তা ধরে দ্রুত এগল। ততক্ষণে লোকাল থানার গাড়ি হেডঅফিসের নির্দেশ পেয়ে লালবাজারের জিপটিকে লোকেট করেছে। জিজ্ঞাসা করতে-করতে বেশ কিছু মূল্যবান সময় পেরিয়ে যায়।
জটলা দেখে এক মোটরবাইক আরোহী জিপের সামনে থমকে দাঁড়ায়। নীল রংয়ের মারুতি ভ্যান কথাটি শুনেই সে বাইক থেকে নেমে, পুলিশ অফিসারকে জানায়, এই আন্দুল রোড থেকে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে যাওয়ার যে লিংক রোড, সেই রাস্তা ধরে সে এখানে আসতে গিয়ে একটা ব্লু মারুতি দেখেছে। তবে গাড়িটা পুরনো। রং উঠে গিয়েছে কিছু-কিছু জায়গায়।
"আপনি কি গাড়িটিকে এগিয়ে যেতে দেখলেন?"
"না স্যার। ওটা তো রাস্তার ধারে একটা ঝোপের পাশে তেরচে দাঁড়িয়ে আছে পুকুরটার পাড় বরাবর।"
নামেই লিংক রোড। ভাঙাচোরা অপ্রশস্ত রাস্তা ধরে ওরা এসে দেখল, একটা ব্লু মারুতি ভ্যান, বেশ কিছু জায়গায় রং চটে গিয়েছে। এটি দুষ্কৃতীদের গাড়ি কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। ওরা কি তবে কর্পূরের মতো উবে গেল নাকি! নাকি পুলিশের চোখে ধুলো দিতে গাড়ি বদল করে এই লঙ্ঝড়ে যানটি বর্জন করে আরও দ্রুতগতি সম্পন্ন কোনও গাড়িতে চড়েই ভেগেছে? নিশ্চিত হতে তরুণ অফিসারটি গাড়ির ভিতর ঢুকেই প্রথমে ইঞ্জিনের উপর হাত রাখে। ছ্যাঁকাই লেগে যাচ্ছিল। অর্থাৎ অন্তত ১০/২০ মিনিট আগে গাড়ির ইঞ্জিন চালু ছিল। এবার আরও নিশ্চিন্ত হতে গভীর অভিনিবেশ সহকারে সব কিছু খুঁটিয়ে দ্যাখে। গাড়ির নম্বর প্লেট খুব অস্পষ্ট, যাতে সহজে কেউ পড়তে না পারে। সতীশ খৈতানের পক্ষে নাম্বার প্লেট দেখার সুযোগই ছিল না। যদি রহিম বক্স দেখে থাকে তো অন্য কথা। পরে তার কাছে জেনে নিলেও চলবে।
মেহের আলিও গাড়ির ভিতর ঢুকে জরিপ করে সব কিছু। তারপর স্থির হয়ে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে ঘ্রাণ নেয়। খুবই উত্তেজিত হয়ে ঘোষণা করে, "স্যার জৈনসাবকে এই গাড়িতেই উঠিয়েছিল, আমি শিয়োর। উনি এই বডি স্প্রে-ই ব্যবহার করেন। বিলিতি স্প্রে।"
কিন্তু ওগুলো কী? বলেই পুলিশ অফিসারটি ঝুঁকে সিটের ফাঁক থেকে কয়েকটি মেয়েদের মাথার সরু ক্লিপ কুড়িয়ে নিলেন। আরও চোখে

পড়ল একটি টিপের পাতা, প্রায় সবক'টি টিপই রয়েছে দু'-তিনটি ছাড়া। বিভ্রান্তি বেড়েই গেল। তবে কি অপরাধীদের দলে মহিলাও ছিল?

এইসময় ওর সেল ফোন বেজে উঠতেই দেখল, লালবাজারের সিকিউরিটি কন্ট্রোলের নাম্বার।

"হ্যাঁ বলুন, সার্জেন্ট দত্ত বলছি।"

"তোমার গাড়ির আরটি সেট কি অফ করেছ? লিঙ্ক করা যাচ্ছে না। শোনো অর্ণব, জয়েন্ট সিপি বলছি। যাঁকে কিডন্যাপ করা হল, তার পরিচয় জানা গিয়েছে?"

"হ্যাঁ স্যার, মি. রতন জৈন।"

"মাই গুডনেস! কী বলছ কী? মানে স্কাইলার্ক গোষ্ঠীর রতন জৈন!"

"তা তো বলতে পারব না স্যার। ওঁর লোকজন সঙ্গেই আছে। দেব স্যার?"

সতীশ খৈতানের কাছে সবটা জেনে ফের অর্ণবকে চাইলেন, "শোনো, যা ভয় পেয়েছি তাই। মিডিয়া খবরটা পেলেই তুলকালাম পড়ে যাবে। সব থানাকে অ্যালার্ট করা হয়েছে, রাস্তা এবং হাইওয়েগুলোতে পুরোদমে চেকিং চলছে। মাছি গলতে পারবে না। নীল মারুতি ভ্যান তো? তুমি সিকিউরিটি কন্ট্রোলে ফোন করে জানিয়েছ, ব্লু মারুতি ভ্যান... কিছু-কিছু জায়গায় রং উঠে গিয়েছে, তাই তো? নম্বরটা কেউ লক্ষ করতে পারেনি, তাই না? আমরা মেসেজে ওই ডিটেলটাই জারি করে দিয়েছি। কিছু বলবে?"

অর্ণব এতক্ষণ কথা বলার ফুরসত পাচ্ছিল না। এবার সুযোগ পেয়েই সব বলল গুছিয়ে। আরও বলল, "স্যার গ্যাংটা খুবই দুর্ধর্ষ। সকলের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য খুব প্ল্যানমাফিক বেরোবার রাস্তা ঠিক করেই রেখেছিল এবং বেশ নির্জন একটা ডোবার ধারে গাড়ি বদল করে উধাও হয়েছে।"

"তা হলে তো আগের আর-টি মেসেজ টেক্সটটা বদলে সব হাই পিকআপ গাড়ি চেকিংয়ের নির্দেশ দিতে হবে। ভাগ্যিস তুমি জানালে! গুড! না হলে একচক্ষু হরিণের মতো... শোনো, তোমার আর চেঞ্জ করার দরকার নেই। ওখানেই ওয়েট করো। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যান্টি রাওডি টিম কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে। ওভার..."

"স্যার-স্যার..."

"আর কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ স্যার, একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথাই বলা হয়নি। গাড়ির ভিতরে মেয়েদের মাথার কিছু ক্লিপ এবং কপালে পরার টিপের পাতা পাওয়া গিয়েছে। মনে হচ্ছে স্যার, গ্যাংটাতে মহিলা সদস্যও রয়েছে।"

"ভেরি গুড! এটা একটা অত্যন্ত জরুরি ইনফরমেশন। ঠিক আছে। ওভার..."

ভিড়ে ঠাসা আদালত কক্ষে অখণ্ড নীরবতা। সবাই অধীর আগ্রহ নিয়ে চিফ প্রসিকিউটরের বক্তব্য শুনছে। কারণ এই টারজেন সিংয়ের ধরা পড়ার দিন থেকে কলকাতাবাসী কেবল দিন গুনছে, কবে এই মহাত্রাসের বিচারপর্ব শেষ হয়ে দীর্ঘমেয়াদের কারাদণ্ডের আদেশ হবে। মাঝপথে শিবনাথবাবুকে থামিয়ে সেশন জজ জানতে চাইলেন, "টারজেন সিংহের দলে যদি মহিলা সদস্যই থাকবে, ওরা গেল কোথায়? কেউ ধরা পড়েনি?"

আর এক ঢোক জল খেয়ে শিবনাথবাবু একটু রসিকতার ঢংয়ে বললেন, "হুজুর, সেই যে পুরনো দিনের একটি বিখ্যাত নাটকে একটা জনপ্রিয় গান ছিল 'সে যে পলকে লুকায়ে চলে যায়, লুকোচুরি ভালবাসে...', ঠিক সে রকমই ব্যাপার। স্যার আপনার টেবিলে কেস ডায়েরির ওরিজিনাল ফাইল দেওয়া আছে। হ্যাঁ স্যার, ওটার কথাই বলছি। ১১ পাতায় আসুন। দু'জন আসামি, মানে মেঘবাহন যাদব এবং পাপ্পু ওরফে শিরোপা সিংহ স্বীকারোক্তি দিয়েছে। ওরাও টারজেন সিংহের সঙ্গে ট্রায়াল ফেস করছে, এটা সবাই জানি। কিন্তু ওই দু'জনের একটি মহৎ গুণ আছে, ওরা খুব দ্রুত ভোল বদলাতে পটু। অর্থাৎ স্যার যখন যেমনটি দরকার, তেমনটি সাজতে পারে। বৃদ্ধ পুরুত থেকে খোঁড়া ভিখিরি... এমন মেকআপ নেবে, পুলিশের সাধ্য কি ট্রেস পায়!

"ওই ৬ নভেম্বর মঙ্গলবার ভোরে রতন জৈনের অপহরণ কাণ্ডটি সেরেই পূর্ব পরিকল্পনা মতো শিরোপা আর মেঘবাহন চলন্ত মারুতি ভ্যানের ভিতর ব্যস্ত হয় ভেক বদলাতে। ওরা একে অপরকে সাহায্য করল নারী সাজতে, যুবতী নারী। সঙ্গে রাখা ছিল পরচুল বিনুনি এবং প্রসাধন সামগ্রী। প্ল্যানটি সত্যিই অনবদ্য। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিল ওরা দু'জন। মেঘবাহনের বিনুনি দরজার গ্লাসের বাইরে প্রয়োজন মতো ঝুলেছে যখনই রাস্তায় পুলিশ দেখা গিয়েছে। আর স্যার, এটা তো রাজসাক্ষী জলপা যাদব, মানে কোয়ালিসের ড্রাইভার, তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, মারুতি ভ্যানের পিছনেই সে ছিল আব্দুল রোড থেকে। তারপর নির্জন রাস্তা দেখেই ভ্যান ছেড়ে ওর কোয়ালিসে সবাই ওঠে এবং রতনবাবুকেও চ্যাংদোলা করে ওঠানো হয়। ওর সাক্ষ্য থেকে আরও জানা যাচ্ছে, দলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড সুনীল সিংহের ফোনে বারবার টারজেন সিংহের নির্দেশ আসছিল। আর সুনীল সিংহ সেইমত জলপাকে বলেছে, দিল্লি রোড বা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে না ধরে সোজা বম্বে রোড ধরে খড়গপুর যাওয়ার রাস্তায় এগতে। কারণ পুলিশ চেকিং ওই রাস্তাতে ঢিলেঢালা। কিডন্যাপিং ঘটলে পুলিশ সচরাচর বিহার-ধানবাদ যাওয়ার রাস্তাতেই কড়া নজরদারি শুরু করে। সেই সন্দেহ পাক্কা খেলুড়ে টারজানের তো ছিলই। আর চোখে ধুলো দিতে সামনের সিটেই বসেছিল দুই তরুণী, মানে যুবতীবেশী দুই পুরুষ।"

কেস ডায়েরির পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে জজসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "সুনীল সিংহ কি এখনও ফেরার? না, পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ স্যার, এখনও ফেরার। আসলে বিহার এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশ সেভাবে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। আর বুঝতেই পারছেন স্যার, কো-অর্ডিনেশন না থাকলে দুষ্কৃতীরা শেল্টার পেয়ে যায়। আসলে স্যার, গোঁসা হয়েছে ওদের।"

"গোঁসা? মানে মান-অভিমানের ব্যাপার? কিন্তু কেন?"

"আসলে স্যার, টারজেন সিংহের কেসটা ধানবাদের সেশন কোর্টেই বিচার হোক, ঝাড়খণ্ড পুলিশ এটাই চেয়েছিল। কারণ রতন জৈন মার্ডার হয়েছে কুমারডুবি স্টেশনের ভিতর, যেটা ধানবাদের জুরিসডিকশন। তখন কলকাতা পুলিশ দাবি করল, রতন জৈনের অপহরণ কাণ্ড ঘটেছে ভিক্টোরিয়া সৌধের চত্বর থেকে, যা কলকাতা পুলিশের এক্তিয়ারে। আপনার কাছে এই মামলা আসার আগে অনেক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে স্যার।"

"তা তো রেকর্ড ঘেঁটেই দেখেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, যেখানে দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়ে বলেছে, এই মামলা কলকাতার সিটি সেশন কোর্টেই হবে, তখন মান-অভিমানের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে! যাইহোক, মোদ্দা কথা আসামি সুনীল সিংহ এখনও বহাল তবিয়তে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা সারা দেশের পুলিশ প্রশাসনের কাছে সত্যি লজ্জার! হ্যাঁ শিবনাথবাবু প্রসিড।"

"হুজুর, সুনীল সিংহের গ্যাং টয়োটা কোয়ালিসে করে রতন জৈনকে নিয়ে বম্বে রোড ধরে পৌঁছে যায় মেদিনীপুর কংসাবতী সেতুতে। সেতু পেরিয়ে বাঁদিকে শহরে না ঢুকে বাইপাস ধরে সোজা এগয় রানিগঞ্জের রাস্তায়। দুপুরে রানিগঞ্জ পৌঁছে আসানসোল ছাড়িয়ে বরাকর নদীর সেতু পেরিয়ে কুমারডুবিতে থামে। সেখানে একটি নির্জন বাংলোতে কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রতনবাবুর ঠাঁই হয়।

{৬}

৬ নভেম্বর সকাল আটটার নিউজ বুলেটিনে খবরটি প্রচারিত হতেই, এক অজানা আতঙ্ক সারা শহরকে গ্রাস করল। রতন জৈনের স্ত্রী জয়শ্রী, সতীশ খৈতানের ফোনে খবরটি শুনেই বারবার মূর্ছা

যাচ্ছিলেন। একমাত্র মেয়ে প্রিয়াঙ্কা ও জামাই প্রকাশ এখন বিদেশে। তাঁদের কাছেও খবর গেল অপহরণের তিনঘণ্টার মধ্যে। ৫ নভেম্বর ওদের সঙ্গে আইসল্যান্ডের চুক্তি সম্পন্ন হল। সেদিন শুতে যাওয়ার আগে ফোন করল, রতন জৈনকে। মেয়ে-জামাইয়ের ফোন পেয়ে রতনজি খুশিতে উচ্ছ্বসিত। প্রকাশের কাছে চুক্তিপত্রের পাকা খবর জেনে আশ্বস্ত হলেন। প্রকাশ এও জানাল যে, ওরা ভায়া লন্ডন হয়ে ভারতে ফিরবে ১০ নভেম্বর।

সারাদিনের ক্লান্তি আর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার আনন্দে ওরা তখন গভীর ঘুমে। ঘুম ভাঙল কলিং বেল এবং ইন্টারকমের যুগপৎ ঝংকারে। ডিউটি অফিসার জানাল, ওভারসিজ় কল ফ্রম ইন্ডিয়া। কলটি ডাইভার্ট করে ওদের রুমে দেওয়া হতেই সতীশ আঙ্কেলের কণ্ঠস্বর, "রতনজি কো কুছ মাফিয়া উঠা লিয়া। পসিবলি কিডন্যাপড ফর র‍্যানসম। জলদি ওয়াপস আ যাও।" তখন রেইকিয়াভিকের ঘড়িতে ভোর প্রায় সাড়ে তিনটে।

{৭}

সাদা মারুতি ভ্যান থেকে নেমে মঞ্জু ওদের পিছু-পিছু চলল খানিক। হাতের ব্যাগটি ওরা কেউ ধরতে চেয়েছিল, মঞ্জুকে সাহায্য করতে। সে বলেছে, "কোনও দরকার নেই। এমন কিছু ভারী নয়।" একটি ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায় এল সকলে। মঞ্জুকে বসতে বলে ওরা বেরিয়ে

গা ছমছমে নির্জনতা মঞ্জুকে গ্রাস করল। সে এখন সম্পূর্ণ একা। ওরা কেউ ওর ক্ষতি করবে না তো! এতটা রিস্ক নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?

গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, একজন দিদি টিফিন দিয়ে যাবে। খেয়ে নিও। তারপর দরজা ভিতর থেকে লক করবে। আমরা একঘণ্টা পর আসছি। তখনই টাকা পেয়ে যাবে।"

"সবটাই তো?"

"হ্যাঁ, যা কথা হয়েছে সেটাই পাবে। বিশ্রাম নাও। নীচে আমাদের লোক পাহারায় আছে। চিন্তা কোরো না। দরকার হলে ডাকবে।"

ওরা চলে যেতেই একটা গা ছমছমে নির্জনতা মঞ্জুকে গ্রাস করল। সে এখন সম্পূর্ণ একা। ওরা কেউ ওর ক্ষতি করবে না তো! এতটা রিস্ক নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? ওরা ওকে মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে বাইরে কোথাও পাচার করে দেবে না তো? তারাপদকে একটা ফোন করবে নাকি? কিন্তু কী বলবে? এটা যে কোন জায়গা তা তো জানে না। আবার ফোনে কথা-টথা বললে, এরা যদি রেগে যায়!

তখনই খেয়াল হল, আরে ফোনটা তো ওরা গাড়িতে ওঠার পরই চেয়ে নিয়েছে। বলেছে, যথাসময়ই ফেরত পাবে। তা হলে কি সে কোনও গভীর ফাঁদে পড়তে চলেছে? কিন্তু এখন তো পিছিয়ে আসার কোনও পথ নেই। ওরা মেরেই ফেলবে তা হলে। এত দিনের আশ্রয়, এত ভালবাসার বন্ধন সব ছেড়ে টাকাটাই ওর কাছে এত বড় হল? না এত সব ভাবার সময় এখন আর নেই। ভাগ্য যে দিকে নিয়ে যেতে চায়, সে দিকেই সে যাবে। কিন্তু কাজটা কী লোকটা কাল খোলসা করে কিছুই বলেনি। শুধু বলেছে, "প্রচুর টাকা কামাতে চাও? একটা কাজ আছে। তুমিই পারবে। তোমার মতো মেয়েকেই দরকার।"

"কিন্তু কাজটা কী?"

"সেসব কথা ঠিক সময়েই বলব। এটা এখন রাখো," বলেই সে একটা সুদৃশ্য ক্যারিব্যাগ এগিয়ে দিয়েছিল।

কাঁপা-কাঁপা হাতে ওটা নিয়ে দেখল, ভিতরে কাপড়ে মোড়া কিছু। হাত ঢুকিয়ে স্পর্শ করে টের পেল টাকার বান্ডিলই হবে। পরদা ঝোলানো কেবিনে কাপড়ে মোড়া বান্ডিলটা বের করার জন্য হাতটা নিশপিশ করছে। সত্যি-সত্যি টাকার বান্ডিল তো!

"খুলে দেখব?" সে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

"নির্ভয়ে দ্যাখো। বয় চা দিয়ে চলে গিয়েছে। আমি না ডাকলে আসবে না। তা ছাড়া পরদা ঢাকা কেবিনে রাধা-কেষ্টরাই তো ঢোকে। ওরা পারতপক্ষে ডিস্টার্ব করে না।"

খুব হুঁশিয়ার হয়ে ব্যাগটির ভিতর হাত চালিয়ে কায়দা করে কাপড়ের প্যাক আলগা করে দেখতেই চোখ ছানাবড়া। দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এত টাকা! স্পর্শ করা তো দূরের কথা চোখেই দ্যাখেনি। জাল নয় তো? ৫০০ টাকার তিনটে বান্ডিল। তার মানে কত? হিসেব করতে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, "এতে কত আছে?"

"দেড় লক্ষ। বুঝতে পেরেছ? আরও এতটাই পাবে কাজ হাসিল হলে," সেও কথাগুলো বলল খুব নতস্বরে।

উত্তেজনায় মঞ্জু ভিতরে-ভিতরে কাঁপছিল থিরথির করে। কিছুটা সামলে লোকটার কানের কাছে মুখ এনে বলছে, "কাজটা কী?"

গম্ভীরভাবে বলল, "কাজটা কালই বলব। কাল সকালেই ওই জজের বাড়ির পাট চুকিয়ে তোমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর ফিরে যাওয়া চলবে না।"

"এতগুলো টাকা যে বিশ্বাস করে দিয়ে দিলেন, যদি না আসি?"

শুকনো হাসি হেসে সে বলেছে, "এটা তুমি করতে পারো না। যারা এত টাকা দিয়ে তোমার সাহায্য চাইছে, তারা কি তোমাকে চেনে না ভেবেছ? গত একমাস ধরে তোমার চালচলন, তোমার এবং তোমার কেষ্টর মানে সেই এসি মেকানিক তারাপদর হাঁড়ির খবর আমাদের নখদর্পণে।

এবার রীতিমত ভয় পেয়ে যায় সে। ভিতু চোখে সরল জিজ্ঞাসা তার, "তারাপদকেও চেনেন তা হলে? কিন্তু কী এমন কাজ, যাতে আমাকেই দরকার? "

"শোনো, কাল সকাল সাতটায় বিড়লা মন্দিরের সামনে দাঁড়াবে। টাকাগুলো সাবধানে রাখবে। আর...আর ওবাড়ির পাট চুকিয়ে..."

কেউ সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসছে। ভারী জুতোর শব্দ শুনে মঞ্জু একটু আড়ষ্ট হয়ে বসে।

সেই লোকটাই। সঙ্গে বেশ সুন্দর দেখতে এক মহিলা। ব্লু জিন্‌সের উপর হলুদ পাঞ্জাবি। পারফিউমের গন্ধে ঘরটা ভরে যায়। লোকটার হাতে খাবারের প্যাকেট।

এই শুনশান ঘরে একজন মেয়েমানুষকে দেখেও মঞ্জু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। বরং উদ্বিগ্ন চোখে ওকে জরিপ করতে থাকে। ২৫/২৬ বছর বয়স হবে বড় জোর। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। কিন্তু কেমন যেন উগ্র-উগ্র। বাঁ হাতে সুদৃশ্য দামি মোবাইল। হাসি-হাসি মুখে মঞ্জুকে আপাদমস্তক দেখছে। মঞ্জুর অস্বস্তি বেড়ে যায়।

"তুম মঞ্জু হো?"

মঞ্জু মাথা দোলায়। খুবই মিষ্টি কণ্ঠস্বর। যথেষ্ট আন্তরিকও। সাহসে ভর করে সে জিজ্ঞেস করে, "আমাকে কী করতে হবে?"

"সবই বলছি। আগে এটা ধরো। খেয়ে নাও," বলেই সেই লোকটি ওর হাতে ক্যারিব্যাগ ধরিয়ে দেয়।

মঞ্জু ইতস্তত করছে দেখে, মেয়েটি বলে, "খা লো মঞ্জু। ইস মে কোই ড্রাগ নহী হ্যায়। ম্যাঁয় ভি তুমহারে সাথ খাউঙ্গি।"

কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করে, "আমার ফোনটা কি দেবেন না?"

"আরে দেব-দেব। কিচ্ছু চিন্তা নেই। আর মিছিমিছি ভয় পেও না। এই দিদি যেমন-যেমনটি বলবে, সেই মতো কাজ করবে। বুঝলে?"
মঞ্জু প্রথমটা চুপ করে থাকলেও বলে, "আচ্ছা।"

{৮}

সেশন জজ সমরজিৎ লাহিড়ি কেস ডায়েরির পাতা ওলটানোর ফাঁকে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন প্রসিকিউটর শিবনাথ ঘোষালের দিকে।
"আচ্ছা মি. ঘোষাল!"
"বলুন স্যার।"
"একটি ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"
"কোনটা স্যার?"
"ওই র‍্যানসম বা মুক্তিপণের ব্যাপারটা। মুক্তিপণের টাকা তো মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল?"
"ইয়োর অনার, দুর্ভাগ্যের কথা কী আর বলব! রতন জৈনের মেয়ে প্রিয়ঙ্কা এবং ওর হাজব্যান্ড প্রকাশ উত্তর ইউরোপের আইসল্যান্ড থেকে কলকাতায় ফিরেই ডিসি-ডিডি কস্তুরী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। উনি পইপই করে নিষেধ করলেন, কোনও মুক্তিপণের বিষয়ে আসামিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে। এও বলা হল, ওরা ফোনে বা অন্য কোনও সূত্রে গোপন যোগাযোগ করলেই যেন লালবাজারে জানানো হয়। ওদিকে টারজেন সিংহও ঘোড়েল শিকারি। তক্কে-তক্কে ছিল কবে মেয়ে-জামাই বিদেশ থেকে ফেরে। কারণ নেগোশিয়েট করার মতো কাউকে পাচ্ছিল না। সতীশ খৈতানের কাছে একবারই মাত্র ফোন এসেছিল আর বাড়ির ফোনে দু'বার। সে ফোনগুলো ছিল পুলিশকে বোকা বানানোর কৌশল। আসলে স্যার, টারজেন কিডন্যাপিংয়ে ওস্তাদ খেলুড়ে। ফোনের টাওয়ার লোকেট করে পুলিশ ওকে আজ পর্যন্ত কোনও কিডন্যাপিং কেসেই ছুঁতে পারেনি।
অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে তাঁর মক্কেলের নিন্দা-মন্দ শুনছিলেন। কিন্তু বারবার ঘোড়েল, ওস্তাদ, অপহরণকারী, এসব বদনামে ভূষিত করা হচ্ছে জেনে, আসামি পক্ষের উকিল জটাধারী চৌবে তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালেন।
"ইয়োর অনার, আগে যতবার ওর জামিনের আবেদন করেছি, ততবারই বলেছি, টারজেন সিংহ নির্দোষ। খুবই অভিজাত বংশের সন্তান সে। পুলিশ শত্রুতাবশত ওঁকে এই মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে। ধানবাদের বিখ্যাত নিশা লজিস্টিকসের কর্ণধার এই টারজেন। আসল কালপ্রিটকে ধরতে না পেরে ওকেই বলির পাঁঠা করা হয়েছে। হুজুর আজ সাতমাস হয়ে গেল টারজেন জুডিশিয়াল কাস্টডিতে রয়েছে। ওর জামিনের দরখাস্ত করেছি। দয়া করে মঞ্জুর করবেন স্যার। কারণ শিবনাথবাবু কেস ওপেন করার নামে যেভাবে ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করেছেন, তাতে তো মনে হচ্ছে, সওয়ালপর্ব শেষ হতে মাসখানেক লেগে যাবে। টারজেন খামোকা কাস্টডিতে থাকবে কেন?"
প্রসিকিউটর শিবনাথ ঘোষাল ফোঁস করতে যাচ্ছিলেন। ওর অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখে জজসাহেব শশব্যস্ত হয়ে নিজেই হাল ধরলেন। অকারণ তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেলে আসল কাজই পণ্ড হবে। তবুও শেষ রক্ষা হল না। জজসাহেব কিছু বলার আগেই শিবনাথবাবু বেশ তির্যকস্বরে কথাগুলো ছুড়ে দিলেন, "চৌবেজি, ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারাটি কি ভুলে জলপড়া খেয়েছেন? যেখানে ৩১জন সাক্ষী পজিটিভ সাক্ষ্য দিয়েছেন, ডিফেন্স-উইটনেস পর্ব চুকেবুকে গিয়েছে আর ক'দিন বাদে আরগুমেন্ট কমপ্লিট হবে। সেখানে জামিনের আবেদন সাবমিট করেন কোন যুক্তিতে? এটা কি মামাবাড়ির আবদার? "
জটাধারীবাবুও কম টেঁটিয়া নন। সারা আদালতকক্ষ কাঁপিয়ে প্রবল হুঙ্কার ছেড়ে জজসাহেবের উদ্দেশে বলেন, "তা হলে কি হুজুর এটা ধরে নেব, নির্দোষ টারজেন সিংহের বিচার আগেভাগেই হয়ে গিয়েছে? আপনি বায়াস হয়ে সরকারি কৌঁসুলির কথামত ওর শাস্তি মঞ্জুর করবেন, ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন? তা হলে বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আর আস্থা থাকবে? মানবাধিকার বলে কি আর কিছুই অবশিষ্ট নেই?"
জজসাহেব গলার স্বর চড়িয়ে ঝি-কে মেরে বউকে শেখানোর কৌশলে শিবনাথবাবুর উদ্দেশে ধমক দিলেন, "মি. ঘোষাল, টারজেন সিংহের জামিনের আবেদনের শুনানি এটা নয়। মূল মামলার আরগুমেন্ট পর্ব চলছে। একটা তুচ্ছ বিষয়ে আপনারা যদি ক্রস ফায়ারিং শুরু করেন...
জটাধারী চৌবে যেন হুমড়ি খেয়ে জজসাহেবের মুখের কথাটি লুফে নিলেন, "কোনটা তুচ্ছ বিষয় হুজুর? টারজেন সিংহের জামিনের আবেদন? জামিন পাওয়া ওর মৌলিক অধিকার। বিচারপর্ব যদি আবহমানকাল ধরে চলে, একটি নির্দোষ মানুষ তত দিন জেলে পচে মরবে?"
এরকম উটকো পরিস্থিতি যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কেসে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমরজিৎ লাহিড়ির এ ধরনের অভিজ্ঞতা কম নেই। জটাধারীবাবুকে এখনই ধড়কে না দিলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। কারণ যে মামলায় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের পেশি অথবা অর্থবলে ভাঙানো যায়নি এবং অপরাধীর সাজা প্রায় নিশ্চিত, সেই সব ক্ষেত্রে উকিলবাবুরা মোটা ফিজ নিয়ে চেষ্টা চালায় বিচারপর্বকে ভণ্ডুল করতে।
"মি. চৌবে, মি. চৌবে, হ্যাঁ আপনাকেই বলছি। এটা আদালত কক্ষ। কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। বারবার মানবাধিকারের অজুহাত তোলা হচ্ছে কেন, বুঝতে পারছি না। আপনার মক্কেল টারজেন সিংহ তো বিনা বিচারে আটকে নেই। বরং বিচারপর্ব শেষ হওয়ার মুখে। একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন, একজন মানুষকে প্রাতর্ভ্রমণকালে অপহরণ করা হল। তিন কোটি টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হল এবং তা মিটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সেই অপহৃত মানুষটিকে গুলি করে মেরে ফেলা হল সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায়।
"মি. চৌবে, বলুন তো কার অধিকার শ্রেষ্ঠতর? মৃত ব্যক্তির, না যে আততায়ী তার। উত্তরটা আমিই দিচ্ছি। খুনির বা অপরাধীর অধিকার কখনওই তারই হাতে নিগৃহীত বা নিহত ব্যক্তির অধিকারকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। যাক গে আজ এই আরগুমেন্ট শুরুর দিনই, কার জন্য জামিনের দরখাস্ত করছেন?"
"স্যার, আসামি টারজেন সিংহের জন্য।"
"অন্য যেসব আসামি রয়েছে, তাদের জন্য নয় কেন?"
"আসলে স্যার, টারজেনের মা খুব অসুস্থ। সেই কারণেই... মেডিক্যাল কাগজপত্র সব দিয়েছি।"
"ঠিক আছে। পুট আপ টুমোরো। কালই শুনব।"
"শিবনাথবাবু আপনি শুরু করুন। আমার প্রশ্ন ছিল, মুক্তিপণের সব টাকা মিটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও রতনজিকে হত্যা করা হল কেন?"
"স্যার, খুব আনফরচুনেট ঘটনা পরম্পরা। রতনবাবুর মেয়ে এবং জামাই প্রকাশবাবু, ডিসি-ডিডির অজান্তে টারজেন সিংহের টোপে আকৃষ্ট হয়ে গোপনে ছুটে গেলেন মাইথন। ওরা রতনবাবুর নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। কারণ তার অপহরণের পর মূল্যবান ছ'টি দিন কেটে গিয়েছে। উদ্বিগ্ন হওয়ারই কথা। এদিকে পুলিশও বহু সোর্স লাগিয়েও রতনবাবুর কোনও খোঁজ পাচ্ছিল না। ফোনের নির্দেশমতো প্রকাশবাবু মাইথনের একটা হোটেলে ওঠেন। রুম নাম্বারটি জানতে চেয়ে একটু পরেই আবার ফোন আসে। প্রকাশবাবু তাও জানান। এর কিছুক্ষণ পর আবার অন্য একটা নাম্বার থেকে ফোন, "সব টাকাটা অর্থাৎ তিন কোটি, ক্যাশে আনা হয়েছে তো?" প্রকাশবাবু ওদের আশ্বস্ত করতেই ওঁকে বলা হল, "একজন পুরুতমশাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁর রুমে যাবে। সে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে। কামানো মাথা। মাথায় বড় টিকি। খবরদার এখন কোথাও ফোন করবেন না বা কোনও কল রিসিভ করবেন না। তা হলে

বাবুজিকে জিন্দা ফেরত পাবেন না।" তখন প্রকাশবাবু বলেন, উনি বাবুজির সঙ্গে কথা বলতে চান। শুধু একটিবার ওঁর কণ্ঠস্বর শুনতে চান। তা মঞ্জুর হয়। ওঁরা রতনবাবুর সঙ্গে কথা বলে, তাঁর কুশল জানে। প্রকাশবাবু ডিসিকে পরে জানিয়েছেন, রতনবাবুর সেই ভয়েস আসলই ছিল। রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর নয়।"

"তারপর?"

"তারপর স্যার, কিছুটা টালবাহানার পর একজন কেউ ওদের দরজায় নক করে। দেখল, একজন দশাসই মহিলা দাঁড়িয়ে। সেই সময় ফোনও বাজল। একই নাম্বার। নির্দেশ এল, ওই মহিলার হাতেই যেন ব্যাগটি দেওয়া হয়। সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশবাবু বলেন, 'কই পুরোহিতমশাই তো এলেন না?'

'বাইরে তাকিয়ে দেখুন।'

প্রকাশবাবু বাইরে দৃষ্টি ফেলে দ্যাখেন, সত্যি-সত্যি এক মুণ্ডিতমস্তক টিকিওয়ালা পুরুত দাঁড়িয়ে। সঙ্গে আরও দু'-তিনজন কিছুটা দূরত্বে। নিশ্চিত হয়ে প্রকাশবাবু জানালেন, 'হ্যাঁ, এসেছেন। কিন্তু ব্যাগ তো একটা নয়। একটা বড় রুকস্যাক। এবং বড়সড় ব্রিফকেস একটা।'

'শুড ওই মুন্নিদিদির হাতে দিয়ে দিন।'

'ঠিক আছে। তা হলে বাবুজিকে কি এই হোটেলে পৌঁছে দেবেন?"

'না।'

'তার মানে?'

'আরে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ওকে কাল ভোরে পাবেন। কথার কোনও খেলাপ হবে না।"

'কিন্তু... কিন্তু পাবটা কোথায়?'

'ট্রেনে। ভাল ট্রেনে এসি কোচেই ওকে টিকিট কেটে তুলে দেওয়া হবে। কোন ট্রেন এবং কোন স্টেশনে পাবেন, সব জানিয়ে দেওয়া হবে।'

প্রকাশজি মহাফাঁপড়ে পড়লেন। ডিসিকে না জানিয়ে আসা এবং ওদের ফাঁদে পা দেওয়া যে মহাভুল হয়েছে, হাড়ে-হাড়ে টের পেলেন। এখন টাকা না দিয়েও উপায় নেই। হায়েনারা ওদের ঘিরে ফেলেছে। টাকা না পেলে বাবুজিকে হয়তো মেরে ফেলবে।

'কী হল? কথা বলছেন না কেন? টাকাটা দেবেন কি না ভাবছেন? দেখুন প্রকাশজি, কলকাতা থেকেই আমার গাড়ি আপনার পিছু-পিছু এসেছে। ইচ্ছে করলে আমার লোক মাঝপথেই রাস্তা শুনশান দেখে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করতে পারত। এমনকী, এই মুহূর্তেও ওটা করা আরও সোজা। এটা আমার এলাকা। মেরে পুঁতে ফেললেও কেউ টের পাবে না। টাকা দিতে না চান দেবেন না, তবে না দিলে রতনজির খতরা আরও বেড়ে যাবে।'

... অগত্যা ওঁরা টাকার ব্যাগ ও ব্রিফকেস ওদের জিম্মায় দিয়ে ১৩ নভেম্বর সকাল এগারোটা থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন, কখন ফোন বা মেসেজ আসে। এবার আর ফোন এল না। একটা মেসেজ এল রাত ১১টা নাগাদ। তাতে ট্রেনের নাম এবং এসি বার্থ নাম্বার, কোচ নাম্বার দেওয়া। বলা হল, আসানসোল স্টেশনে চলে যেতে। সেখানেই ট্রেনে রতনজির দেখা পাবে রাত সাড়ে বারোটার পর।

সেই নির্দেশমত ওরা পড়ি কি মরি অত রাতে আসানসোল স্টেশনে হাজির হয়ে জানল, ট্রেনটি প্রায় ৪০ মিনিট দেরিতে চলছে।

ওদিকে কুমারডুবি স্টেশন চত্বরে তখন অন্য নাটক। মুক্তিপণ হস্তগত হতেই টারজেন সব আটঘাট বেঁধে রতনজিকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। অজ্ঞাতবাস থেকে ওঁকে চোখ বেঁধে গাড়িতে ওঠানো হয়। স্টেশন চত্বরে গাড়ি ঢুকতেই ওঁর হাতে ট্রেনের টিকিট ধরিয়ে বলা হয়, ওঁর মেয়ে-জামাই আসানসোলে স্টেশনে অপেক্ষা করছে। অত রাতে চত্বর তখন শুনশান। চোখের বাঁধন তখন খুলে দেওয়া হল। ঠাওর করার চেষ্টা করলেন, স্থানটির পরিচিতি। যেহেতু প্ল্যাটফর্মের কিছুটা দূরে আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়েছিলেন, স্টেশনটির নাম তখনও জানতে পারেননি।

সেই মুহূর্তে আর একটি গাড়ি এসে থামল, রতনজির সামনে। দরজা খুলে নামলেন টারজেন সিংহ। হুজুর, এই জঘন্যতম অপরাধী টারজেন সিংহ। ওর চ্যালাচামুন্ডারা তটস্থ হয়ে সরে দাঁড়াল।

'রতনজি নমস্তে। আজ আপনার ছুটি। ক'দিন একটু কষ্ট দিলাম।'

রাত তখন প্রায় ১২টা। টারজেনের গলা শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন। গত ছ'-সাতদিন এই স্বর বহুবার শুনেছেন ফোনে। আর যখন ঘরে ঢুকত, ওঁর চোখ মোটা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হত। আজ চোখের বাঁধন খোলা অবস্থায় সেই আলো-আঁধারিতেও মূর্তিমানকে চাক্ষুষ করলেন। এই ক'দিন যে হেনস্থার মধ্যে কাটিয়েছেন, সব মনে পড়ল। কীভাবে অপহরণ করার পরেই মারুতি ওমনির ফুটবোর্ডে ওকে সব্জির বস্তার মতো ঠেসে গুঁজে হাত-মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল, মুক্তিপণের টাকা পেতে দেরি হচ্ছে বলে, ওঁর চোখ বাঁধা অবস্থায় রিভলভারের ঠান্ডা নল চেপে এই শয়তানটা কী অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে। সব মনে পড়ে যাচ্ছে। সে আবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে করমর্দনের জন্য! হ্যান্ডশেক করা তো দূরের কথা, এই নরকের কীটকে এত কাছে পেয়েও কিছুই শিক্ষা দেবেন না! আচমকা টারজেনের তলপেটে মারলেন এক লাথি। শরীরের যাবতীয় ক্রোধ যেন সংক্রামিত হল রতনজির ডানপায়ে। সেই প্রবল কিকের ধাক্কায় টারজেন তিন হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল একটা ভাঙা ড্রেনের কিনারায়। এরকম একটা বেমক্কা আক্রমণের জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে সে তখন কাতরাচ্ছে, কারণ আঘাতটা লেগেছে পুরুষমানুষের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গায়।

রতনজি তখন ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কাঁপছেন। ততক্ষণে টারজেন ওর চ্যালাদের সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় মানুষজন তো দূরের কথা, কুকুর-বেড়ালও আশ্রয় ছেড়ে বেরয়নি। কারণ ওই অঞ্চলে তখন শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। কুখ্যাত মাফিয়া ডন টারজেন কারও লাথি হজম করার বান্দা নয়। হাতে চলে এসেছে .৪৫ ইউএসএ মেড পিস্তল। গর্জে উঠল পরপর দু'বার পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে।

বছরের অধিকাংশ সময় যিনি ভারতের বাইরে সেভেন স্টার হোটেলে কাটান, সেই রতন জৈনের বুলেটবিদ্ধ দেহ পড়ে রইল কুমারডুবি স্টেশন চত্বরে নির্জন রাস্তার উপর। র‍্যানসমের টাকা পাই-টু-পাই মিটিয়েও তাঁকে জীবন দিয়ে...

ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালেন জটাধারী চৌবে। তবে এবার আর রণংদেহি মূর্তি নয়। বেশ চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, "ইয়ার অনার, শিবনাথবাবু বেশ ভাল প্রসিকিউটর, এটা জানতাম। কিন্তু কল্পনার ডানা মেলে যে সাসপেন্স গল্পও বানাতে পারেন, জানা ছিল না।"

উত্তরটা জজ সমরজিৎ লাহিড়িকে দিতে হল না। শিবনাথবাবুই রসিয়ে-রসিয়ে চৌবেজিকে উদ্দেশ করে বললেন, "কেস ডায়েরিটা ভাল করে পড়ুন। ১১ পাতা থেকে ৩৩ পাতা পর্যন্ত আপনার মক্কেলদের মানে আসামিদের স্বীকারোক্তি রয়েছে। সেখানে সব ডিটেলে বলে দিয়েছে ওরা।"

"কিন্তু সে তো পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন ওদের স্টেটমেন্ট। ওগুলো তো আর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তি নয়। পুলিশ ওদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে এসব কথা ওদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে। আইনের চোখে এ সবের কোনও ভিত্তি নেই," চৌবেজির চোখা মন্তব্য।

সঙ্গে-সঙ্গে জজসাহেব কেস ডায়েরির ৪৬ পাতা খুলে চৌবেজিকে প্রশ্ন করলেন, "জটাধারীবাবু, ৪৬ পাতায় আসুন। দেখুন উপশম নার্সিংহোমের অ্যাডমিশন এবং 'ওটি' রেজিস্ট্রারের কপি। আসামিদের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী তদন্তকারী অফিসার এই নার্সিংহোমে যায়। 'ওটি' রেজিস্ট্রারে পাওয়া যাচ্ছে যে, টি সিংহ নামে একজন পেশেন্ট ১৪ নভেম্বর ভর্তি হয় এবং তাঁর টেনটিসে অস্ত্রোপচার করা হয়। এই টি সিংহ কি টারজেন সিংহ নয়? অস্বীকার করতে পারেন? ১৩ নভেম্বর

রাত ১২টা নাগাদ তার অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গায় আচমকা আঘাত পেয়ে টারজেন সিংহ যদি অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়, খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার কি? টি সিংহ আর টারজেন সিংহ অবশ্যই আইডেন্টিক্যাল পার্সন।"

"সব সাজানো ব্যাপার হুজুর। কেউ ওকে তলপেটে আঘাত করেনি, আর ওর অস্ত্রোপচারও হয়নি।"

"খুব ভেবেচিন্তে অস্বীকার করছেন তো? কারণ আমি মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে টারজেনকে পাঠাব তা হলে। অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা ওকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেবেন, ওর একান্ত গোপনস্থানে কোনও অস্ত্রোপচারের চিহ্ন আছে কি না এবং সেই চিহ্নের বয়স কত। খুব পুরনো, নাকি ছ'-সাত মাসের।"

গারদের ভিতরে টারজেন সিংহ একমনে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল জজের দিকে। মেডিক্যাল বোর্ড কথাটা শুনেই তার নির্দিষ্ট স্থানটি শিরশির করে উঠল। মনে পড়ে গেল, সেই ১৩ নভেম্বর রাতের কথা। নিয়মিত জগিং করা রতন জৈনের লাথির ধাক্কাটা সে কোনও দিন ভুলবে না। সে বুঝতে পারছে, এই মামলার ফাঁস ক্রমশ চেপে বসছে তার গলায়। জজ সমরজিৎ লাহিড়িকে মনে-মনে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে-দিতে ভাবল, একটা এসপার-ওসপার না হলে নিস্তার নেই। যে কোনও ভাবে জামিনটা পেতে হবে। আর একবার জামিন পেলে তার টিকির নাগাল পায় কে! সুইটি তো এখনও এল না, ১২টা বাজে প্রায়।

{৯}

স্কুলগেটের অদূরে গাড়িটা থামতেই একটা ২২-২৩ বছরের মেয়ে নেমে গটগট করে সিকিউরিটি রুমে উঁকি দিয়ে স্কুল কম্পাউন্ডে ঢোকার অনুমতি চাইল।

"কী দরকার?"

"হেডমিসের কাছে যাব। খুব জরুরি।"

"দরকারটা কী?"

"রুম্পাকে মানে রুম্পা লাহিড়িকে এখনই বাড়ি যেতে হবে। নিয়ে যেতে এসেছি।"

"এখন তো হবে না। স্পেশ্যাল পারমিশন আছে?"

"না, হেডমিসকে সব বলব। রুম্পার মায়ের শরীরটা হঠাৎ খুবই খারাপ হয়েছে।"

সিকিউরিটি দোটানায় পড়ে যায়। গার্জেনের শরীর হঠাৎ খারাপ হলে তো সত্যিই বিপদ।

"রুম্পা মানে জজসাহেবের মেয়ে তো?"

"হ্যাঁ।"

"কোন ক্লাস?"

"ক্লাস সেভেন, এ সেকশন।"

"কিন্তু এই গাড়ি তো আসে না। জেন তো নিয়ে যায় আসে। সকালেও তো জেনই এসেছিল।"

"ও হো! আসলে বিনোদদা ওটাকে গ্যারেজে নিয়ে গিয়েছে।"

"তোমার নামটা বলো।"

"মঞ্জু, মঞ্জু সাঁতরা।"

ফোন তুলে সিকিউরিটি হেডমিস সুনন্দাম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে, মঞ্জুকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিল।

রাশভারী সুনন্দা বসাক সবটা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "রুম্পা তোমাকে চেনে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওদের বাড়িতেই তো থাকি।"

"কী নাম তোমার?"

"মঞ্জু সাঁতরা।"

"রুম্পার মায়ের চিঠি এনেছ?"

"না তো। আসলে হঠাৎই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন কি না, চিঠি লেখার অবস্থায় নেই।"

"না-না, তা হলে তো ছাড়া যাবে না।"

মঞ্জু মরিয়া, "ম্যাডাম, এই যে রুম্পার বাড়ির ফোন নাম্বার। ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলুন না। অসুস্থ হলেও কথা বলতে পারবেন।"

সুনন্দা বসাক প্রস্তাবটি লুফে নিলেন। কারণ, মুখে না বললেও একটা জুতসই প্রমাণের অপেক্ষায় ছিলেন। ফোন নাম্বার লেখা কাগজের টুকরোটি নিয়ে দেখলেন, দুটো নাম্বার। ল্যান্ডলাইনের পাশে সেলনাম্বারও রয়েছে।

বিছানা থেকে উঠে একজন অসুস্থ মহিলার পক্ষে ল্যান্ডলাইনের কল রিসিভ করা অসুবিধেজনক ভেবে সুনন্দা সেলফোনের নাম্বারে কল করলেন। বার তিনেক রিং বাজার পর একজন অসুস্থ মহিলার ক্লান্ত বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "হ্যালো।"

"কে বলছেন?"

"মিসেস লাহিড়ি বলছি।"

"আপনি কি রুম্পার মা বলছেন?"

"ও হেডমিস বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"মঞ্জু গিয়েছে? যদি রুম্পাকে একটু ছেড়ে..."

"কিন্তু ম্যাডাম, স্কুলের তো একটা ডিসিপ্লিন আছে। তা ছাড়া কোনও চিঠি মেয়েটি আনেনি। বুঝতেই পারছেন, ছাত্রীদের নিরাপত্তার দিকটা আমাদের ভাবতেই হবে।"

"আসলে শরীরটা হঠাৎই...

"ঠিক আছে। পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা ম্যাডাম, রুম্পার বাবার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন?"

কথাটা শুনেই মঞ্জুর বুক ছ্যাঁত করে উঠল। তা হলে তো সবটা ভেস্তে যাবে! হাতে-নাতে ধরাও পড়ে যাবে। পালাবে যে সে পথও বন্ধ। মুখচোখ যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে সে হেডমিসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আন্দাজ করার চেষ্টা করে, ব্যাপার-স্যাপার কোনদিকে গড়াচ্ছে। কারণ সুইটিদিদি তো রুম্পার বাবার ফোন নাম্বারই জানে না। কী বলছে কে জানে।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিও সেটাই ভাবছিলাম। এখন হয়তো উনি এজলাসেই থাকবেন। সুইচ অফ থাকারই কথা। ঠিক আছে, ওকে আর্লি ডিপারচারের পারমিশন দিচ্ছি। মি. লাহিড়িকে খবর দিচ্ছি, আপনি অসুস্থ।"

মিসেস লাহিড়ির যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বর শুনে ফোন রেখে রুম্পাকে ডাকতে বললেন। মালতীকে এ-ও বলে দিলেন, দীপান্বিতাম্যামের ক্লাস চলছে। ওকে বলো, রুম্পাকে ছেড়ে দিতে। ব্যাগ গুছিয়ে যেন চলে আসে।

স্কুলব্যাগ বগলদাবা করে ছুটতে-ছুটতে রুম্পা মঞ্জুর পিছু-পিছু স্কুলগেটের বাইরে এল।

কিন্তু মারুতি জেনটা দেখতে পেল না।

"মঞ্জুদি, বিনোদকাকু আসেনি? গাড়ি কোথায়?"

"বিনোদদা গ্যারেজে গিয়েছে গাড়ি নিয়ে। অন্য গাড়ি এসেছে। ওই তো।"

রুম্পা দেখল, একটা নতুন স্করপিও, কালো।

"নাও ওঠো," মঞ্জুর তর সইছে না।

"এটা কাদের গাড়ি? বাবা পাঠিয়েছে?"

"না-না, ওই গ্যারেজের মালিক জরুরি দেখে কিছুক্ষণের জন্য দিয়েছে। ওঠো-ওঠো।"

"মঞ্জুদি, মা কখন মাথা ঘুরে পড়েছে? মাথায় চোট লাগেনি তো?"

"চটপট ওঠো না। সব বলছি।"

উঠে বসতেই মঞ্জু দরজা বন্ধ করল বেশ শব্দ করে অনভ্যস্ত হাতে। ড্রাইভার সঙ্গে-সঙ্গে স্টার্ট করে স্কুলগেট চত্বর ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠল। ড্রাইভারকে রুম্পা চেনে না। গাড়ির ভিতর জর্দা-পানের গন্ধ। সব কিছু কেমন বেসুরো লাগছে। হঠাৎই মনে হল, মা সত্যি-সত্যি অসুস্থ কি?

AMARBOI.COM

মঞ্জুদি সকালেই ব্যাগ গুছিয়ে মাসির বাড়ি যাবে বলে, বের হল। ওই তো ব্যাগটা সিটের উপর। যদি পরে সে ফিরে ওদের বাড়ি এসে থাকে, ব্যাগ নিয়ে স্কুলে আসবে কেন? বাড়িতেই তো রাখার কথা। আর মঞ্জুদিও কেমন চুপচাপ, সেভাবে কথাই বলছে না।

কী ভেবে বেশ তেরিয়া মেজাজে রুম্পা প্রায় ধমকের সুরে বলে, "মঞ্জুদি গাড়ি থামাও। চলো, এখানে নেমে পড়ি। তোমার ফোনটা দাও। মাকে একবার..."

"ফোন তো আমার কাছে নেই!"

"তা হলে যে কোনও বুথ থেকে... ড্রাইভারকাকু গাড়ি থামাও, থামাও বলছি।"

বেশ কিছুটা এগিয়ে গাড়ি থামল। সঙ্গে-সঙ্গে মঞ্জু তার ব্যাগ শক্ত হাতে ধরে কালো কাচে চোখ রেখে কিছু দেখছে।

"কী হল মঞ্জুদি নামো।"

অদ্ভুত ব্যাপার! সেই মুহূর্তে কেউ যেন বাইরে থেকে দরজার হ্যান্ডেলে মোচড় দিল। দরজা খুলে যেতেই মঞ্জু প্রায় লাফ দিয়ে নামল। সঙ্গে-সঙ্গে সশব্দে বন্ধও হয়ে গেল। মঞ্জুদি যেন কারও সঙ্গে কথা বলছে মনে হচ্ছে। রুম্পা পাগলের মতো চিৎকার করে ডাকল, "মন...জু...দি..."

বন্ধ গাড়ির ভিতর সে ডাক ঘুরপাকই খেল। সেই মুহূর্তে ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে একজন উঠে পড়তেই গাড়ি গড়াল সামনে। তারপর জোরে আরও জোরে।

রুম্পা ভীষণ ভয় পেয়ে গলা ফাটিয়ে বলে, "তোমরা কে? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

ওরা কোনও উত্তর দিচ্ছে না দেখে, সে আরও জোরে তীব্রস্বরে ঝাঁঝিয়ে ওঠে,

"গাড়ি থামাও। আমি নামব... আমাকে নামিয়ে দাও।"

গাড়ি থামার কোনও লক্ষণ নেই দেখে, সে আরও ভয় পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্নার বেগ কিছুটা প্রশমিত হতে, কান্না-মিশ্রিত চিৎকার শুরু করে। দরজার গ্লাস বন্ধ থাকায় তার চিৎকার হয়তো কেউ শুনতেই পেল না। ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিতে-নিতে এ গলি-সে গলি ধরে ব্যস্ত রাস্তা এড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। দরজায় হ্যান্ডেলে চাপ দিয়ে দেখল, ড্রাইভার সেন্ট্রালি লক করে দিয়েছে। জানালা খোলার চেষ্টাও বিফল হল। কারণ, লিভার ঘোরানোই যাচ্ছে না। আক্রোশ আর হতাশায় রুম্পা প্রবল দাপাদাপি শুরু করল, ফুটবোর্ডে জুতো-পরা পা আছড়ে। সেই সঙ্গে চিল-চিৎকার।

ওরা ভেবেছিল, একরত্তি মেয়ে কতক্ষণ আর যুঝবে! কিন্তু একটা ১২-১৩ বছরের গুড়িয়ার তেজ দেখে ওরা থ! দু'জনেই কিছুটা ঘাবড়ে যায়। কারণ এত বাচ্চাকে ওরা আগে কখনও তোলেনি। রইস আদমি আর খুবসুরত মেয়েমানুষকে তুলতে ওরা ওস্তাদ। মেশিনটা দেখালেই সব হম্বিতম্বি ঠান্ডা। এই মেয়েটা যা ভোগাচ্ছে...

হঠাৎই ড্রাইভারের পাশে বসা ছেলেটি অতিষ্ঠ হয়ে গর্জে ওঠে, "একদম চুপ। চুপ মার!" বলেই সে কোমর থেকে মেশিন বের করে ঘাড় ফিরিয়ে রুম্পার দিকে তাকায়, "ইস চিজ় কো জানতা? গুড্ডুম কর দুঙ্গা," বলেই পিস্তলটা বার দুই নাচায়।

ড্রাইভার বিল্লুর মেজাজ জানে। সে সাত-তাড়াতাড়ি ওকে সামলায়, "বিল্লু ইস তরহা নেহি। গুড়িয়া ডরো মত। আমাদের কাম হয়ে গেলেই তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব, কুছু ভয় নাই।"

এইসময় বিল্লুর ফোন বেজে উঠল, দেখল সুইটিবহিন। পিস্তলটি যথাস্থানে চালান করে, কলটা রিসিভ করে। মঞ্জু অবশ্য জানিয়ে গিয়েছে, গুড়িয়ার কাছে সেলফোন নেই।

{১০}

AMARBOI.COM

কেস ডায়েরির ৫১ পাতায় এখন জজসাহেবের দৃষ্টি। ওখানে সংক্ষেপে ক'টা লাইনে যা বলা আছে, তার ব্যাপ্তি ছিল সুদূরপ্রসারী। সেই ছয় নভেম্বরের পর থেকেই বাংলা, বিহার আর ঝাড়খণ্ডের বর্ডার তোলপাড়। কলকাতা পুলিশের বাঘা-বাঘা অফিসার রাঁচি-ধানবাদ অঞ্চল চষে বেড়াচ্ছেন রতন জেনের খোঁজে। সেই সময় ওঁর মৃত্যুর মর্মান্তিক খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই কলকাতার পুলিশটিম ছুটে গেল কুমারডুবি। দেহ শনাক্ত করল ওর মেয়ে-জামাই, আসানসোল স্টেশন থেকে কুমারডুবি ফের ছুটে এসে।

ধানবাদ-গয়া-রাঁচি যাওয়ার সব রাস্তা সিল করে দেওয়া হল। শুরু হল চিরুনি তল্লাশি। সম্ভাব্য সব এরিয়া চষেও যখন টারজেনের দলবলের কোনও হদিশ পাওয়া গেল না, এক মন্দিরের পুরোহিত গোপনে খবর দিল, মন্দির সংলগ্ন জঙ্গলে পোড়া বাংলোয় এক সাধুবাবার আগমন ঘটেছে। সঙ্গে ক'জন চ্যালাও। গতিবিধি সন্দেহজনক। ঘিরে ফেলা হল সারা জঙ্গল। খুবই গোপনে ছ'-সাতজন তুখোড় অফিসার ছেঁড়া গামছা পরে খালি গায়ে আদিবাসী সাজল। চুল উসকো-খুসকো, পুরোপুরি অপরিচ্ছন্ন দেহ। কুড়ুল হাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গাছ কাটতে শুরু করে, সেই পোড়ো বাংলোর আশপাশে। গাছ কাটার শব্দ শুনেই দু'জন সাধুবেশী চ্যালা ছুটে এল। তারা ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝল, এ অঞ্চলের আদিবাসীরা এভাবেই পুলিশ আর বনকর্মীর সঙ্গে রফা করে কাঠ চুরি করে। যখন ওরা কথাবার্তা বলছে, সেই ফাঁকে রেজিমেন্ট জাল গুটিয়ে বাংলোর খুব কাছে চলে আসে। ব্যাপারটি এত দ্রুত ঘটে যায় যে, টারজেন গুলি ছোড়ার সুযোগই পায়নি। যেই মাত্র ওরা পিছু ফিরে ডেরার দিকে ঘুরেছে, চোখের পলকে অপূর্ব কৌশলে ছদ্মবেশী পুলিশ ওদের কব্জা করে স্রেফ হাতের কায়দায়। একটা গুলিও খরচ করতে হয়নি। ওদিকে টারজেন তখন ফোনে শাগরেদ সুনীল সিংহের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত, ফ্লাইটের টিকিটের ব্যাপারে। আর অন্যরা অর্থাৎ পাপ্পু ওরফে শিরোপা সিংহ, মেঘবাহন, তেজেন্দ্র রান্নায় মশগুল। যখন খসখস শব্দ শুনে সজাগ হল, তখন ওদের আর করার কিছুই ছিল না। খুবই উচ্চগ্রামে টারজেন তখন ধমকাচ্ছিল সুনীল সিংহকে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিরাশি সিক্কার রদ্দা পড়ল ঘাড়ে বেমক্কা। ক'দিন আগে উরুসন্ধিতে একটি ছোটখাটো অপারেশন হয়েছে, শরীরে খুব জুতও নেই। রদ্দার ধাক্কায় মাথা ঠুকে গেল দেওয়ালে। ফোন তখনও খোলা। হাতাহাতির শব্দ বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল। সুনীল সিংহও আর দেরি না করে, লাইন কেটে দিয়ে রাঁচি ছেড়ে পালানোর জন্য ব্যস্ত হয়। কারণ পুলিশ এবার টাওয়ার লোকেট করে রাঁচিও পৌঁছে যাবে।

অবতার সিংহ আর মোজম্মেল, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কিছুটা দূরে থাকায় ওদের পাকড়াও করা যায়নি। এখনও ফেরার। সেই থেকে অর্থাৎ যেদিন টারজেন সিংহ ধরা পড়ল, সেই ২২ নভেম্বর থেকেই টারজেন জেলে। আজ ২৮ মে, প্রায় ছ'মাসের উপর ও জেল কাস্টডিতে। এই ছ'মাসে অন্তত ৪০ বার তার জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। উচ্চ আদালতও ওর আবেদনে সাড়া দেয়নি। বিচারপর্ব মোটামুটি শেষ পর্যায় এসে গিয়েছে। আরগুমেন্টপর্ব চুকলেই দিন আট-দশ পর রায়দানের তারিখ পড়বে। তাই সেশনজজ সমরজিৎ লাহিড়ির নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।

প্রসিকিউটর শিবনাথ ঘোষাল সেই সাড়ে দশটা থেকে টানা বকবক করে চলেছেন। চোগা চাপকান অর্থাৎ কোট গাউনে বেশ ঘেমেও উঠেছেন। গরমও চলছে প্রচণ্ড। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে তেষ্টায়। ফের জলের গ্লাস তুলে খেতে যেতেই দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল, একটা দশ বাজে। হাতঘড়িও দেখলেন, ঠিক তাই। অন্য কোর্টে কিছু ছোটখাটো ম্যাটার রয়েছে। দেড়টার আগেই যেতে হবে, জুনিয়র এসে বলে গিয়েছে।

"স্যার, আজ এই পর্যন্ত থাক। একটা দশ-পনেরো হয়ে গেল।"

জজসাহেবও ঘড়ির দিকে তাকালেন, "তাই তো দেখছি। শিবনাথবাবু আপনার আর ক'দিন লাগবে?"

"স্যার আর তিনদিন। কাল এভিডেন্স স্ক্যান। ধরুন আরও একদিন। পরের দিন ল পয়েন্ট সাইটেশন।"

সমরজিৎ লাহিড়ি এবার ডিফেন্স উকিল জটাধারী চৌবের দিকে তাকালেন, "মি. চৌবে আপনার ক'দিন লাগতে পারে?"

"দিন ছ'-সাত তো লাগবেই হুজুর। প্রচুর সাক্ষী হয়েছে তো। এগজিবিটও অনেক। বুঝতেই পারছেন স্যার, আমার মক্কেলের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত।"

"ঠিক আছে। তবে মাথায় রাখবেন, অযথা রিপিটেশন বরদাস্ত করব না।"

"স্যার, কাল তা হলে টারজেনের জামিনের আবেদনটা শুনবেন তো?"

মনে-মনে হাসলেন সমরজিৎ। এমন দুর্ধর্ষ আসামি এরকম টাইট মামলায়, জামিন পাওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে কী করে!

"হ্যাঁ মি. চৌবে, কালই শুনব।"

জটাধারী চৌবেও মনে-মনে হাসলেন, দেখা যাক হুজুর। কাল টারজেনকে জামিন না দিয়ে থাকেন কী করে! আর জামিনে একবার ছাড়া পেলেই সে উড়ে যাবে কোন অজ্ঞাতবাসে। এই রতন জৈন হত্যামামলার তখন দফারফা। খাস আরদালি মহেশ রেডিই ছিল। সমরজিৎ

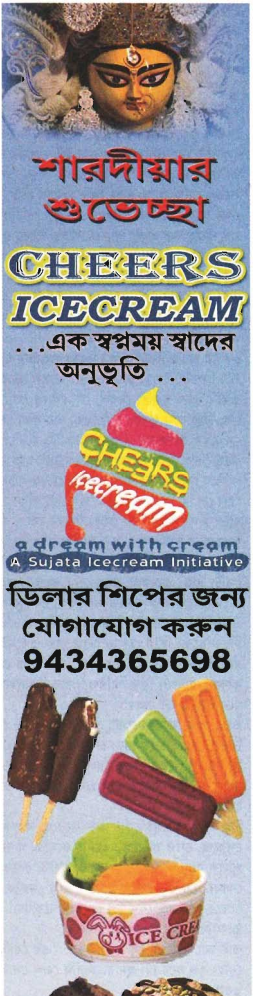

উঠে দাঁড়াতেই সে ভারী চেয়ারটি একটু টেনে ধরে। সঙ্গে-সঙ্গে চেম্বারের পরদা সরিয়ে তিনি ঢুকে যান ভিতরে।

{১১}

কান্নার প্রবল আবেগ চাপতে গিয়ে রুম্পার হেঁচকি শুরু হয়। জল তেষ্টাও পেয়েছে। ওয়াটার বটল খুলে জল খেতে চায়। কিন্তু গাড়ির দুলুনিতে জল চলকে পড়ে স্কুল ইউনিফর্মের উপর। ড্রাইভার মিররে তা লক্ষ করে বলে, "গুড়িয়া এবার খাও। স্পিড কমাচ্ছি।"

কয়েক ঢোক খেয়ে একটু শান্ত হওয়ার চেষ্টা করে। রুম্পা বুঝতে চায়, কেন স্কুলের এত ছাত্রী থাকতে তাকে কিডন্যাপ করা হল। ওই যে ড্রাইভারআঙ্কল একটু আগেই বলল, ওদের কাজ হয়ে গেলেই ওকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে। কথাটা কি সত্যি? তা হলে কাজটা কী? চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করে, রুম্পাকে দিয়ে ওদের কী কাজ হবে! তবে কি বাবার কোর্টে এদের কোনও কেস আছে? এই বদমাইশদের কেউ জেলে আটকে রয়েছে। সিরিয়ালে এমন ঘটনা সে দেখেছে। ওদের দাবি না মিটলে তো তাকে...

রুম্পার শরীর শিউরে ওঠে ভয়ে। গুন্ডাটার হাতে আর্মসও রয়েছে। ওটা নিশ্চয়ই টয় রিভলভার নয়। আসল বুলেটভর্তি রয়েছে। ভয়ে কুঁকড়ে চোখ খুলল। দেখল, সে এখনও ফোনে কথা বলছে হিন্দিতে। কিছু-কিছু কথা বুঝতে পারলেও, ওর কথা শোনার ইচ্ছেই করছে না। সে এখন কী করবে! সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়ালেই যে টুক করে নেমে দৌড় দেবে, তার উপায় নেই। সেন্ট্রাল লক করা। দরজার গ্লাস নামিয়ে যে চিৎকার করে বলবে, বাঁচাও-বাঁচাও, তাও সম্ভব নয়। তা হলে সে কি চুপচাপ শান্ত হয়ে বসেই থাকবে?

বাঁদিকে খুব ধীরে সরে গেল। কালো কাচের উপর চোখ সেঁটে দেখল, দোকানের সাইনবোর্ড পড়া যাচ্ছে। তার নীচে লেখা, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ। আর একটু পরেই চোখ পড়ল, লেখা রয়েছে আইস স্কেটিং রিঙ্ক। জায়গাটা চেনা-চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে, কিছু দিন আগে মায়ের সঙ্গে কিছু কিনতে এসেছিল, ফেয়ার চলছিল তখন।

উত্তাল কান্নার প্রকোপটি এখন প্রশমিত। ভয়ের বিবর্ণতা ধীরে-ধীরে ফিকে হচ্ছে। সিটে হেলান দিয়ে শুয়ে প্রথমেই মনে পড়ল, ওর বদরিপাখিগুলোর কী হবে? এরা যদি ওকে মেরেই ফ্যালে, মা খুব কাঁদবে, বাবাও। কিন্তু পাখিগুলোকে ঠিকসময়ে কাঁকড়িদানা আর ধনেপাতা দেবে তো?

ওদের কথা মনে পড়তেই ফের কান্নার ঢেউ যেন গুমরে-গুমরে বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে যায়। চাপতে চেষ্টা করেও পারল না। চাপা কান্না ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ঘুরপাক খেল, বন্ধ গাড়ির ভিতর। এসি চলছে, তাই রক্ষে। না হলে গরমে এবং প্রবল টেনশনে রুম্পা এতক্ষণে অজ্ঞান হয়ে যেত।

বিল্লু একটু আগেই ফোন অফ করেছে। কলকাতার রাস্তা যতক্ষণ না পেরচ্ছে, সেও আতঙ্কের মধ্যেই রয়েছে, কখন কী হয়! কলকাতা পুলিশ বহুত খতরনাক। শালারা কোথা থেকে যে খবর পেয়ে যায়, কোথায় যে ওঁত পেতে থাকবে, তাই মেজাজ খুব তিরিক্ষি হয়েই রয়েছে। মেয়েটা বেশ চুপ মেরেই গিয়েছিল। ফের চিল্লাবে নাকি? ভাবগতিক তো সেরকমই ঠেকছে।

তাই আগেভাগেই সে তৎপর হয়, "এই খোকি, রো মত! কোই ডর নেহি। কুছু হবে না। হমারা আদমি জেল সে বাহার আনেকে বাদ তুমহারা ছুট্টি।"

চোখ বন্ধ রেখেও রুম্পা ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে। রিভলভার হাতে ধরে সে যেরকম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওকে ভয় দেখিয়েছিল, গুণ্ডুম কর দুঙ্গা। সেই ভয়াল মূর্তিটাই চোখে ভাসছে।

আচ্ছা, ওর মতো ছোট্ট মেয়েও তো...কোনও একটা সিনেমায় সে দেখেছে, বুদ্ধি খাটিয়ে এক ড্রাগ মাফিয়াকে ধরিয়ে দিয়েছে। কত ছোট্ট-ছোট্ট মেয়ে বুদ্ধি আর সাহসে ভর করে ডাকাতদলকে ধরিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে, সে দেখেছে টিভিতে। দীপান্বিতাম্যাম সংস্কৃত ক্লাসে বিষ্ণুশর্মার গল্প পড়ানোর সময় বলেছেন, 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।'

কিন্তু এইরকম একটা বিদঘুটে পরিস্থিতিতে কীরকম বুদ্ধি সে খাটাবে। একটা ফ্ল্যাশ যেন ফ্ল্যাশ করল ওর মগজে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা খাতা বের করল ব্যাগ থেকে। তারপর পাশের চেন খুলে পেন খুঁজছে। হাতে উঠে এল আঠার টিউব। সেলোটেপের রোলটা হাতে ঠেকলেও পেনগুলো গেল কোথায়? তাড়াহুড়োতে কি ভরতে ভুলে গেল? অপাবৃতা নিশ্চয়ই ওগুলো গুছিয়ে রাখবে। ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে তো!

না, পেনগুলো ঠিকই আছে। একটা স্কেচপেন লাল রংয়ের। সেটাও তুলে আনল অন্য পেনের সঙ্গে। তারপর খাতাটি নিয়ে দেখল ওটা সংস্কৃত ক্লাসের খাতা।

যেন হোমওয়র্ক করছে। খুব মনোযোগ দিয়ে লেখা শুরু করল। গাড়ির গতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে খাতার ব্রাউন মলাটের উপর লাল স্কেচ পেনে লিখল, 'কিডন্যাপ্ড' বেশ বড় হরফে। তারপর বুলিয়ে-বুলিয়ে লেখাটাকে বেশ মোটা করল। একইভাবে ভিতরের প্রথম পাতায় ওই একই কথা লিখল। পরের ক'টি হোমওয়র্ক করা পাতা বাদ দিয়ে সাদা পাতা পেয়েই এবার লিখল 'রুম্পা কিডন্যাপ্ড, ব্ল্যাক স্করপিও।'

স্কুল এবং বাড়ির ফোন নম্বর স্টিকারে লেখাই রয়েছে। রোল নম্বর এবং ক্লাসও রয়েছে। এবার ব্যাগ বন্ধ করে সিটের ডানদিকে রাখল আর খাতাটি খুব সন্তর্পণে চেপে বসে বাঁদিকে জানালার কাছে এগোল। কাচের উপর চোখ রেখে দেখল লেখা রয়েছে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। কালো কাচের জন্য স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না। একটু চেষ্টা করে এবার পড়তে পারল, পুলিশ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ইস! পুলিশ যদি জানতে পারত বদমাইশগুলো জজসাহেবের মেয়েকে কিডন্যাপ করে পালাচ্ছে!

লিভারে চাপ দিলেও জানালার কাচ যে খুলবে না, সে জানে। তবুও প্রবৃত্তিবশত সে লিভারটি খুব সাবধানে উল্টোদিকে ঘোরাতে চাইল। একটু যেন ঘুরল মনে হচ্ছে। আরও চাপ দিতে আরও একপ্যাঁচ ঘুরল বটে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর পাক খেল না।

রুম্পা অবাক হয়ে দেখল প্রায় এক ইঞ্চির মতো নেমে এসেছে কাচটা। উত্তেজনায় ওর হাত-পা, সারা শরীর কাঁপছে। ড্রাইভারআঙ্কল ওই রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে দেখেনি তো!

এই সময় গাড়ির স্পিড কমে এল। রুম্পা সামনে তাকিয়ে দেখল সিগন্যালে আটকেছে। দূরে তিন-চারজন পুলিশও দাঁড়িয়ে। একজন পুলিশ মোটরবাইকে বসে। রুম্পা আরও দেখল বদমাইশ লোকটা ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে। খুব চাপাস্বরে ড্রাইভারআঙ্কলকে কিছু বলছে। রুম্পা লক্ষ করল একটা বড় গাড়িকে কোয়ালিসই মনে হচ্ছে, একজন পুলিশ দাঁড় করিয়ে রাস্তার ধারে আসতে বলছে। ওদের গাড়ি সিগন্যালের থেকে কিছুটা দূরে, মাঝে সাত-আটটা গাড়ি, বাস, মিনি ট্রাক। রুম্পা ভাবল এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না। খুব সাবধানে খাতাটা তুলে নিল কাঁপা-কাঁপা হাতে। তারপর দম বন্ধ করে ওদের অন্যমনস্কতা জরিপ করতে-করতে খাতাটা সেই কাচের ফাঁকে রেখে গলিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় একটু-একটু করে ঠেলতে থাকে। যখন ওটির অর্ধেকের বেশি অংশ জানালার বাইরে চলে গিয়েছে, তখনই আঙুলের কৌশলে, খুব জোরেও নয়, অথবা এক্কেবারে মৃদুও নয়, একটা সুন্দর ধাক্কা দিল যেভাবে ক্যারমের স্ট্রাইকারে দেওয়া হয়। সেই একচিলতে ফাঁক দিয়ে খুবই মসৃণভাবে হালকা খাতাটা গ্লাইড করতে-করতে লটকে পড়ল ফুটপাথের উপর। কাচের উপর চোখ রেখে দেখল রাস্তার লোকজন ওটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও কেউ ঝুঁকে তুলে নিল না। চার-পাঁচজন পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

একজন তো ওটা মাড়িয়েও গেল মনে হচ্ছে। মনটা খুব খারাপ লাগছে, গুমরে-গুমরে কান্নাও পাচ্ছে। এই যে এত মানুষজন যাচ্ছে, আসছে, কারও চোখেও কি পড়বে না? রুম্পার এই এত বড় বিপদে

কেউ কি ওর পাশে দাঁড়াবে না। হতাশা আর বিরক্তি সত্ত্বেও রুম্পা একই কৌশলে লিভারে চাপ দিয়ে কাচটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনল। ইতিমধ্যে সিগন্যাল সবুজ হতেই গাড়ি ধীরে-ধীরে গড়াতে শুরু করে। তারপর রাস্তা ফাঁকা পেয়ে প্রচণ্ড স্পিড তুলে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দিকে এগিয়ে চলল। পিছনে পড়ে রইল রুম্পার মা-বাবা, বাড়ি, ওর স্কুল, স্কুলের বন্ধুরা আর একঝাঁক বদরি-মুনিয়া পাখি, রুম্পার প্রাণ।

{১২}

টারজেন সিংহের কেস আজকের মতো মুলতুবি রেখে জজসাহেব নেমে যেতেই চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল আদালত কক্ষে। ভিড়-ভাট্টা একসময় কেটেও গেল। এখন টারজেন সিংহ স্বমহিমায়। রাজ্যজয় করার ভঙ্গিতে গারদের ভিতর লম্করি চালে সুগন্ধী পান চিবোচ্ছে, তার উকিল জটাধারী চৌবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাত নেড়ে কাছে ডাকল। চৌবেজি চেয়ার-বেঞ্চের বেড়া টপকে শশব্যস্তে টারজেনের খাঁচার কাছে হাজির হন। নতস্বরে কথাবার্তা চালাচালি হয়।

টারজেন সিংহ যেহেতু টপরিঙ্ক ফ্যাক্টর এবং ওর এই সেশন ট্রায়াল দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে কলকাতার সেশন কোর্টেই চলছে, কলকাতা পুলিশেরও যথেষ্টই মাথাব্যথার কারণ তাই। নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে আর্মড পুলিশ কর্ডন করে অদূরে অপেক্ষা করছে। জেল ওয়ারেন্টে নিত্যদিনের মতো জজসাহেবের সই হয়ে গেলেই টারজেনের দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসাররা ওকে সটান প্রিজন ভ্যানে তুলবে। এই জেল ওয়ারেন্টের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই ছোট্ট কাগজটি হল জেলে ফেরত পাঠানোর গেটপাস। এতে জজের সই না থাকলে পুলিশের খুবই বিড়ম্বনা। কারণ টারজেন এখন জেল কাস্টডিতে। পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। বলতে গেলে সে এখন ভি ভি আই পি। কড়া নিরাপত্তা বলয়ে তাকে জেল থেকে নিয়ে আসা, নিয়ে যাওয়া হয়। চারবছর আগে পটনার এক আইএএস অফিসারের মেয়ে মাধুরী শর্মাকে রেপ এবং খুনের মামলায় অভিযুক্ত হয়ে পটনার সেন্ট্রাল জেলে ছিল। জেলখানাকে নিজস্ব বৈঠকখানা বানিয়ে বহাল তবিয়তেই তার দিন কাটছিল। জেল থেকেই সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করে। সেই আপিল পেন্ডিং থাকাকালীন উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েই ফের ক্রাইমে জড়িয়ে পড়েছে। এখানে এই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেও সে মাতব্বর। অন্য কয়েদিরা ওর চ্যালা বনে গিয়েছে।

এই মুহূর্তে লোহার মোটা-মোটা রেলিঙের খাঁচায় বন্দি থাকলেও টারজেন খুবই বেপরোয়া। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশে অশ্রাব্য গালাগালি দেওয়া ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কারণ সে ভাল করে জানে এখন কলকাতা পুলিশ শতচেষ্টা করলেও ওর টিকি ছুঁতে পারবে না। সে যে বিচারাধীন আসামি। এখানে সম্পূর্ণভাবেই সে আদালতের এক্তিয়ারে। জেলের ভিতরে জেল ওয়ার্ডেনরা তো পুলিশ নয়। অন্য কয়েদিদের ধমক দিলেও ওর ভয়ে ওয়ার্ডেন এবং সাব জেলাররাও তটস্থ।

কলকাতা পুলিশের উপর টারজেনের রাগের একটা বিশেষ কারণ হল, এদেরই নাছোড় মনোভাবের জন্য ওর বিচার ঝাড়খণ্ডের আদালতে, মানে ধানবাদের জেলা আদালতে না হয়ে এই কলকাতার সিটি সেশন কোর্টে হচ্ছে। নিজের এলাকায় হলে সে শেরের মতোই থাকত। কুছ পরোয়া ছিল না।

পেশকারবাবু অর্ডারশিট লেখার ফাঁকে লক্ষ করলেন, টারজেন আজ বেশ খোশমেজাজে আছে। চৌবেজীর সঙ্গে বেশ মশকরাও করছে দেশওয়ালি ভাষায়। অথচ দু'দিন আগেও মুষড়ে ছিল। আজ কি হম্বি-তম্বি একটু বেড়ে গেল? দাঁড়াও, দাঁড়াও বাছাধন। কেস যেভাবে

গড়াচ্ছে লাহিড়িসাহেবের হাত থেকে আর তোমার রেহাই নেই। ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন তোমার জন্য বরাদ্দ। যত পারো, মস্তানি করে নাও। এই মামলাটি ছাড়াও ওর বিরুদ্ধে আরও তিনটি অপহরণ এবং দুটি খুনের মামলাও ঝুলছে বিহার এবং রাঁচির কোর্টে।

আর্মড পুলিশের কর্ডন বেশ কাছে ঘেঁষে আসছে দেখেই টারজেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। একটা যাচ্ছেতাই ব্ল্যাং ওদের দিকে ছুড়ে সরে যেতে বলল তফাতে। কারণ সে তার ল-ইয়ারের সঙ্গে শলা করছে। তারপরেই কথা নেই, বার্তা নেই, জটাধারী চৌবের কানে-কানে কিছু মন্তব্য গুঁজে দিয়ে সে কী উচ্চগ্রামে হাসি! চাপদাড়িতে জৌলুস বেশ খুলেছে। এমনিতেই বেশ সুপুরুষ। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল। রং ফরসাই। সাদা-কালো চেক বুশ শার্ট আর ক্রিম কালারের ট্রাউজার। স্নিকার শু-জোড়ার দাম হাজার তিনেকের কম তো নয়ই। যেন কোনও র‍্যাপ গায়ক। বছর ৩৭-৩৮ বয়সই হবে হয়তো। ওর উদাত্ত হাসির বহর শুনে বোঝার জো নেই ও এতটা নৃশংস। জটাধারী চৌবের সঙ্গে টারজেন চাপাস্বরে কিছু গোপন পরামর্শ ফের শুরু করে। সেইসময় পারফিউমের খুশবু ছড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে এজলাসে ঢুকল সুইটি। পরনে ব্লু জিন্‌স, হলুদ পাঞ্জাবি। পুলিশ কর্ডন ভেদ করে লকআপের কাছে চলে আসে। বাঁ হাতে গোলাপি কভারে সুদৃশ্য মোবাইল। ওকে দেখেই টারজেন চৌবের সান্নিধ্য থেকে ছিটকে সরে এল একপাশে।

আরে সুইটি তুম! ইতনি দের কিউঁ? বলেই টারজেন রেলিংয়ের ফাঁকে

হাত গলিয়ে সুইটির নিটোল হাত স্পর্শ করে। মুহূর্তে সুইটির হাতবদল হয়ে সকলের অলক্ষ্যে একটি ছোট্ট কাগজের স্লিপ টারজেনের হাতে চালান হয়ে যায়। চোখের পলকে হাতসাফাইয়ের কায়দায় টারজেন নিজের ট্রাউজারের ডান পকেটে সেটি গচ্ছিত করে। তারপর দক্ষ অভিনেতার মতো সুইটির মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে সান্ত্বনা দেয়, "ফিক্‌র মত! শান্‌ত, শান্‌ত। সব কুছ ঠিক হো যায়েগা।"

বলাই বাহুল্য, অপরূপা সুইটি তখন ছলছল চোখে টারজেনের দিকে তাকিয়েই রইল। আর্মড পুলিশের কনস্টেবলরা সুইটির রূপলাবণ্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে গিলে খেলেও সিকিওরিটি ইন চার্জ দেবদাস মান্না অন্য ধাতুতে গড়া। সতর্ক দূরত্বে দাঁড়িয়ে টারজেন সিংহের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছিল। এটাই ওর স্পেসিফিক ডিউটি। কারণ ডিসি-ডিডি ম্যাডাম পই পই করে সতর্ক করে দিয়েছেন 'টারজেন মোস্ট রাউডি এলিমেন্ট অ্যান্ড জাস্ট আ লায়াবিলিটি টু আওয়ার সিকিওরিটি মেজার্স'। ওর কাছে মাছিও যেন ঘেঁষতে না পারে। আদালতে ভিড়ের সুযোগে ওর দলের লোক ফায়ার আর্মসও চালান করে দিতে পারে। তাই দেবদাস নিজেকে অলক্ষ্যে রেখে টারজেনের উপর কড়া নজর রাখে, বিশেষত জজসাহেব এজলাস থেকে নেমে যাওয়ার পর। সে জানে এই মেয়েটি টারজেনের বউ নয়। কোটি-কোটি টাকা র‍্যানসম আদায় করা টারজেনের পাঁচ-সাতটা মেয়েছেলে থাকা বিচিত্র নয়। অপরাধ জগতের এটাই দস্তুর। গত ক'দিন এই সুইটি বলে মেয়েটিকে কোর্টে আসতে দেখেনি। আজ কী মতলবে হাজির হয়েছে বোঝা মুশকিল। একটা ছোট্ট ভাঁজ করা কাগজ যে হাতবদল হয়ে টারজেনের জিম্মায় গিয়েছে, দেবদাসের চোখ এড়ায়নি। ড্রাগের পুরিয়া নয় তো! ওটা পেয়েই টারজেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় ডান পকেটে, হ্যাঁ, ওর ডান পকেটেই তো ভরেছে। লাভ লেটার নিশ্চয়ই নয়। অত ছোট্ট কাগজে... কোনও সংকেত নয় তো?

পুলিশের নাকের ডগায় খুবই নিষ্পাপভাবে কিছু ইম্পর্ট্যান্ট মেসেজ চালাচালি হয়ে গেল নাকি! ব্যাপারটি দেবদাসকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। হাতে তো সময়ও বেশি নেই। একবার প্রিজনভ্যানে তোলা হয়ে গেলেই টারজেন কলকাতা পুলিশের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাবে। কিছুই আর করার থাকবে না।

কী ভেবে দেবদাস দরজার বাইরে সরে এল। দৃষ্টি কিন্তু রইল টারজেন ও সুইটির উপর। ওরা বেশ খোশমেজাজে কথা বলছে। সেলফোনে অর্ককে ধরল, দেবদাসেরই ব্যাচমেট। দু'জনেই ডিসি-ডিডির আন্ডারে অ্যান্টি রাউডি স্কোয়াডে রয়েছে। অর্কর পেটাই চেহারা, ছ'ফুটের উপর হাইট। ওকে উপরে আসতে বলল।

অর্কর ডিউটি প্রিজন ভ্যানের সিকিউরিটির উপর। টারজেন ভিভিআই অ্যাকিউস্‌ড। ওর জন্য আলাদা ভ্যান। ভ্যানের দরজা ছাড়াও লোহার টানা গেট আছে। তাতে গোদরেজের পেল্লাই তালা।

দেবদাসের ফোন পেয়েই অর্ক লম্বা-লম্বা পা ফেলে সিঁড়ি টপকে সটান তিনতলায় এল। দুজনে কিছু জরুরি আলোচনা সেরে নিতেই অর্ক নেমে গেল তার ডিউটির জায়গায়।

{১৩}

এখনও ফোন এল না তো! এতবার বলে দেওয়া হল বাড়ি পৌঁছেই জানাবো। স্কুল থেকে বাড়ি বড় জোর ৪০ মিনিটের পথ। রুম্পা তো খুবই সিনসিয়র মেয়ে। প্রায় দেড়টা বাজতে চলল। এক ঘণ্টার উপর ওরা গিয়েছে। রুম্পার মায়ের বাড়াবাড়ি হল না তো? যতই বাড়াবাড়ি হোক, একটা খবর তো দেবে! এই কারণে স্কুল আওয়ার্সে ছুটি দেওয়ার ঘোর বিরোধী তিনি।

মঞ্জু সাঁতরার দেওয়া নাম্বারটি ডায়াল করলেন। রিং হচ্ছে, হচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে। কেউ ধরছে না কেন? ভুল নাম্বারে করেননি তো? নাম্বার ভাল করে দেখে আবার করলেন। আশ্চর্য! সুইচ অফ বলছে। মাথাটা বাঁই করে ঘুরে যাওয়ার উপক্রম। কোনও মারাত্মক ভুল করে বসেননি তো? নাম্বারটি মঞ্জু নামে মেয়েটি ওঁর হাতে দিতেই ফোনটা করেছিলেন এবং রুম্পার মা-ই তো কথা বললেন।

কিন্তু উনি সত্যি-সত্যি রুম্পার মা তো? হবে না-ই বা কেন? গলার স্বর শুনে তো বেশ অসুস্থই বোধ হল। রুম্পাও মঞ্জুকে চেনে। ওদের বাড়ির সবসময়ের লোক। কথাবার্তার ট্রেন্ড তো বেশ আপন-আপন, ঘনিষ্ঠজনের মতোই।

কিন্তু, কিন্তু, সুনন্দা বসাক খুব ভাল করে মনে করার চেষ্টা করেন। রুম্পা ওঁর চেম্বারে ঢুকেই মঞ্জুকে দেখে বেশ অবাক হয়েই বলেছিল, "মঞ্জুদি তুমি? মাসির না পিসির বাড়ি, কোন একটা হবে, যাওনি?" মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে রুম্পা যেন বেশ অবাক হল, "সে কী! মায়ের তো লেক গার্ডেন্স যাওয়ার কথা।"

তাহলে মঞ্জুর যদি অন্যত্র যাওয়ার কথা, এবং সে যদি চলেই গিয়ে থাকবে, রুম্পাদের বাড়িতে ফিরবে কেন?

কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা! মঞ্জুকেও বেশ টেন্সড লাগছিল যেন! রুম্পার মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে মায়েরই তো?

সুনন্দা বসাকের হাত-পা কাঁপতে শুরু করে। এবার সেই কাগজে লেখা ল্যান্ড লাইনের নাম্বারে ডায়াল করলেন। দিস নাম্বার ডাজ্ নট এগজিস্ট!

শুনেই ওঁর মনে হল রিসিভারটা বুঝি হাত থেকে স্লিপ করে মেঝেতে পড়ে যাবে। তবুও মাথা ঠান্ডা রেখে মালতীকে ডাকলেন।

"ম্যাডাম ডাকছেন?"
"শোনো, রুম্পার ক্লাসে গিয়ে রুম্পার বেস্ট ফ্রেন্ডকে ডেকে নিয়ে এসো।"
অপাবৃতা নামে মেয়েটি আসতেই রুম্পাদের ফোন নাম্বার জানতে চাইলেন। মুখস্থ বলে গেল দু'টো নাম্বারই। মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ভিরমি খাওয়ার উপক্রম। চেয়ারটা যেন বেখাপ্পাভাবে দুলছে! এরকম মারাত্মক ভুল তিনি করে বসলেন কী করে? রুম্পা ক্লাস থেকে আসার পর ক্রস ভেরিফাই করা উচিত ছিল। রুম্পার বাড়িতে ফোন করার আগেই এই বুদ্ধিটুকু হল না কেন? হেডমিসট্রেস হিসেবে এই গাফিলতি বড্ড দৃষ্টিকটু। উফ! ওই মঞ্জু মেয়েটা কী সাংঘাতিক প্ল্যানটাই না বানিয়েছে! ওর একার বুদ্ধি? নাকি প্রখরমস্তিষ্ক সম্পন্ন কোনও গ্যাংও এর পিছনে রয়েছে? কী অসামান্য দক্ষতায় ওর মতো জাঁদরেল হেডমিসকে বুদ্ধু বানিয়ে প্রায় কেপমারি করে নিয়ে গেল ওঁরই সন্তানপ্রতিম এক ছাত্রীকে, যার বাবা আবার কলকাতার সিটি সেশন জজ!
রুম্পার বাবার পরিচিতি মনে পড়তেই একটি ভয়ানক ইঙ্গিত ফ্ল্যাশ করল বিদ্যুৎ ঝলকের মতো। তা হলে কি কোনও আসামির গ্যাং, যাদের বিচার চলছে, তারা জজের মরাল দুমড়ে-মুচড়ে দিতে এই প্রেশার ট্যাকটিক্সকেই বেছে নিল? ভাবতেই শিউরে উঠছেন বারবার। রুম্পা, রুম্পা, কেমন আছে? ওর কোনও ক্ষতি হয়নি তো?
"ম্যাডাম, রুম্পার মা ভাল আছে তো?"
অপাবৃতার ডাকে হুঁশ ফেরে সুনন্দার।
"না রে মা, ওর কোনও ফোন আসেনি। আচ্ছা! তুমি তো রুম্পার বাড়িও গিয়েছ। ওই মঞ্জু নামে মেয়েটিকে তো ওখানে দেখেছ?"
"হ্যাঁ, ম্যাম। কিন্তু রুম্পা বলছিল আজ ও সোজা লেক গার্ডেন্সে যাবে। মঞ্জুদি ওর মাসির বাড়ি চাঁপাডাঙায় গিয়েছে। ছ'-সাতদিন বাদে ফিরবে। ইন ফ্যাক্ট রুম্পাও মঞ্জুকে দেখে বেশ অবাকই হয়েছিল। তার মানে সকালে সে কোনও একটা অছিলায় ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও দুষ্ট চক্রের কথামতো...
খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। যা করার, করতে হবে এখনই। ঠিক আছে, তুমি ক্লাসে যাও।
অপাবৃতা চলে যেতেই ইন্টারকম তুলে নিয়ে গেট সিকিওরিটি চঞ্চলকে ডাকলেন। তুখোড় এবং পোড়খাওয়া সে। ম্যাডামের স্বরে দুশ্চিন্তার সুর আঁচ করে চঞ্চল, এন্ট্রি রেজিস্টার বগলদাবায় নিয়ে হনহনিয়ে ছুটে এল। রুমে ঢুকে দেখল হেডমিস দু'হাতে মাথা চেপে কিছু ভাবছেন।
পায়ের শব্দে নড়েচড়ে বসলেন।
"আচ্ছা চঞ্চল, ওই যে রুম্পা লাহিড়ি নামে মেয়েটি, ও কীসে গেল? বাড়ির গাড়িতে, নাকি ট্যাক্সিতে?"
"না, ম্যাডাম। একটা স্করপিওতে, ব্ল্যাক। এই যে নাম্বারটা লিখে রেখেছি।"
একটা ক্ষীণ আশার সম্ভাবনা। হুমড়ি খেয়ে রেজিস্টারের পিছনে লেখা নাম্বারটি পড়লেন।
গুড। বেশ উচ্চগ্রামেই কথাটা বের হল ওঁর অজান্তে। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, "ইস! চঞ্চল, যদি একটিবার গাড়ির ড্রাইভারকে চ্যালেঞ্জ করতে..."
"কেন ম্যাডাম? ও কি এখনও বাড়ি ফেরেনি?"
"না, পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। মঞ্জু নামে মেয়েটি সম্পূর্ণভাবে ব্লাফ দিয়ে... চঞ্চল ফোন লাগাও। লোকাল থানাকে ধরো।"
"বারবার এনগেজড্ টোন পাচ্ছি।"
"আবার দ্যাখো, দেখে যাও। পেতেই হবে।"
"ম্যাডাম, মনে হচ্ছে রিসিভার নামানো রয়েছে।"
"ও! ডিসগাস্টিং। এদের উপর নিরাপত্তার ভার! ঠিক আছে, লালবাজারে করো। কুইক।"
"রিং হচ্ছে, হচ্ছে ম্যাডাম।"
রিসিভার হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলেন কীভাবে শুরু করবেন। রিং শেষ হতেই এক মহিলা কণ্ঠ। রেকর্ডেড ভয়েস। লালবাজারে স্বাগত। বলেই ভয়েস মেসেজ দেওয়ার সুপরামর্শ জানাল। বারবার সেই একই কণ্ঠস্বর, ওয়েলকাম টু লালবাজার অটো ডায়ালিং। সুনন্দার মনে হল একটা মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প হচ্ছে। চেয়ারটা দুলছে বেসামালভাবে।

{১৪}

জজসাহেবের সই হয়ে যেতেই সিল-ছাপ মেরে পেশকারবাবু কাস্টডি ওয়ারেন্টটি সিকিওরিটি ইন চার্জ দেবদাস মান্নার হাতে ধরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দেবদাসের নির্দেশে আর্মড কনস্টেবল বাহিনী খুব ক্লোজ ব্যারিকেড তৈরি করতেই দেবদাস গারদের চাবি খুলল। সঙ্গে-সঙ্গে টারজেন তার পাঁচ ফুট এগারোর দাপুটে শরীর নিয়ে বেরিয়ে এল। যেন কন্টিনেন্ট টুর সেরে মহামান্যবর কেউকেটা ভিভিআইপি দেশের মাটিতে ল্যান্ড করে দেশকে ধন্য করলেন। গলায় ঝোলানো মোটা সোনার চেন। একটি লকেটও ঝুলজ্বল করছে। সেখানে বৈষ্ণো দেবীর চিত্রমূর্তি। এতগুলো খুন-অপহরণের মামলার আসামিরও তাহলে দেবীর আশ্রয়েরও প্রয়োজন পড়ে!
খুব লস্করি ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল। এটাই বোঝাতে যে, এইসব পুলিশ ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টরদের ও থোড়াই কেয়ার করে। একবার ওর জন্য নির্দিষ্ট প্রিজন ভ্যানে উঠতে পারলেই ও শাহেনশা। কেউ ওর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। অবশ্য এই কোর্ট চত্বরেও পুলিশের সে ক্ষমতা নেই। কারণ সে বিচারাধীন আসামি। সে ইচ্ছে করেই ওর ভাবভঙ্গিতে একটা অদৃশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। ডোন্ট কেয়ার ভাবটা বেশ দৃষ্টিকটু করে তুলে ধরে, নিজের বীরত্ব জাহির করতে।
দেবদাসের চিন্তাটা ওই ছোট্ট চিরকুট বা কাগজের পুরিয়াটাকে কেন্দ্র করে। যদি কেউ পয়জ়ন বা ড্রাগ পাচার করে এবং তা খেয়ে বিচারাধীন আসামি বেহুঁশ হয় বা মৃত্যুর মুখে পড়ে, তা হলে মানবাধিকার কমিশন কলকাতা পুলিশকে ছেড়ে কথা বলবে না। জেলের ভিতরে কিছু হলে সেটা দেবদাসের ঘাড়ে পড়বে না। দেবদাসের একটা বিষয় খুবই গোলমেলে মনে হয়। খুনি, রেপিস্ট, ডাকাত, সন্ত্রাসবাদী, এদের জন্য মানবাধিকার আইন যেন মুখিয়ে আছে। অথচ যে খুন হল, যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে যে-সব নিরীহ মানুষের দেহ বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল, তাদের বা তাদের পরিবারের বেঁচে থাকার অধিকারের চেয়েও খুনি আসামিদের অধিকার শ্রেয়তর এবং গুরুত্বপূর্ণ?
এসব গুরুগম্ভীর ব্যাপার। এখন ওর চিন্তা ওই চিরকুটটি হাতানো যাবে কী করে? পারলে অর্কই পারবে। একসময়ের সফল ওয়েটলিফটার। গায়েও অসুরের বল।
নিত্যদিনের মতো আজও আদালত ভবনের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে টারজেনকে নামানো হল। সঙ্গে-সঙ্গে দেবদাস ওর দু'-হাত একত্র করে হ্যান্ডকাফ লক করল। কারণ হাতকড়া পরিয়ে আসামিকে এজলাসে পাঠানোর রেওয়াজ বেশ কিছুকাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
বীরদর্পেই নামছিল সে। হ্যান্ডকাফ নিয়ে দেবদাস কাছে আসতেই ভোজপুরী ভাষায় একটা অশ্রাব্য স্ল্যাং বর্ষণ করল। তারপর দেবদাসের উদ্দেশে পানের পিক ফেলল সশব্দে প্রিজনভ্যানের গায়ে। এই সীমাহীন ঔদ্ধত্যেও দেবদাস স্পিকটি নট। কারণ একটা জব্বর হুক করে টারজেনের চোয়াল ভেঙে দেওয়ার জন্য হাত নিশপিশ করলেও তা কার্যত সম্ভব নয়। মিডিয়ার লোকজন ঘুরঘুর করছে। রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে গেলেও পুলিশ এখন ঠুঁটো জগন্নাথ। ভেটারেন ক্রিমিনালদের জন্য জামাই আদরের ব্যবস্থা। অত্যাচারীর মৌলিক অধিকার, অত্যাচারিতের অধিকারকে কবেই ছাপিয়ে গিয়েছে!

কনস্টেবল প্রিজ়নভ্যানের পিছনের দরজা খুলে ভিতরের টানা লোহার গেট সরিয়ে দিতেই টারজেন পা-দানিতে উঠে দাঁড়াল। উপস্থিত জনতা যারা নিত্যই টারজেনকে দেখতে ভিড় করে এবং মিডিয়ার লোকজনকে উদ্দেশ্য করে একটা ছোটখাটো জ্বালাময়ী ভাষণ দিল হিন্দিতে। দেহাতি ভাষার মিশ্রণে পুলিশ এবং টোটাল ক্ষয়িষ্ণু সিস্টেমের পিন্ডি চটকাল যৎপরনাস্তি খেউড় আউড়ে। হাতকড়া পরা হাতেই টাঙির মতো ধারালো গোঁফে তা দিল বার দুয়েক। মিডিয়ার ক্যামেরা সচল লক্ষ করে কেতাবি ঢঙে এ-ও বলল, ওর প্রতি ঘোরতর অন্যায় হচ্ছে। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। খুনখারাবি তো দূরের কথা, একটা আরশোলাকেও মারতে তার হাত কাঁপে।

তারপর হিন্দি ছবির জবরদস্ত নায়কের মতো বীরবিক্রমে ঢুকে গেল আলো-আঁধারি প্রিজ়নভ্যানের ভিতরে। প্রথমে কোলাপসিব্‌ল গেট বন্ধ করে তালা লাগিয়ে পিছনের দরজা লক করা হল।

জনবহুল কোর্টচত্বর ছেড়ে প্রিজ়নভ্যান যখন জনবিরল ফোর্ট উইলিয়ম গেটের কাছাকাছি এসেছে, টারজেন লক্ষ করল রোজকার মতো সে একা নয়। আরও একজন আসামি চুপচাপ বসে আছে গায়ে একটা বিছানার চাদর জড়িয়ে। এই মে মাসের গরমে আবার চাদর গায়ে! শালা, নিশ্চয়ই বদ্ধ উন্মাদ! নিজের কৌলিন্য জাহির করতে নবাবি ঢঙে জিজ্ঞেস করে, "তু কউন বে? কিস মামলে মে ফঁসা দিয়া? চোরি? ফ্রড? খাড়া হো যা। সালাম কর! জানতা নহি শালে, তেরা পাশ কউন বইঠে হ্যায়!"

কোনও সাড়া-শব্দ এল না। লোকটা যেন টারজেনকে পাত্তাই দিল না। একইভাবে বসে আছে মাথা অবধি চাদরে ঢেকে।

ড্রাইভারের পাশে বসা দেবদাস আশপাশ বেশ নির্জন দেখে ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করল থামতে।

"তু গুন্ডা? আবে গান্ডু, দশ-বিশ ক্রাইম কিয়া কি নহি," টারজেনের রবাবি বেড়ে যায়।

সেই লোকটা কেবল মাথা নাড়ল।

আসলে অর্ক তখন আশু কর্তব্য স্থির করে নিচ্ছিল। যদি হাত চালাতেই হয় তা করতে হবে খুবই মসৃণভাবে, ওর শরীরে কোনও চিহ্ন না আঁকা হয়। কারণ ওর উকিলবাবু যদি জানতে পারে প্রিজ়নভ্যানে ওকে ধোলাই দেওয়া হয়েছে, তুলকালাম শুরু হয়ে যাবে। ফুসকুড়ি থেকে একেবারে গ্যাংগ্রিন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে ওদের চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে রক্ষে অর্ক ইউনিফর্মে নেই। দু'জন আসামির মধ্যে তো হাতাহাতি হতেই পারে।

"লগতা তু বঙ্গালি! বঙ্গালি বুদ্ধু! ক্যায়সে ফাঁস গিয়ে রে তু? মেরে তরফ দেখ। জৈনসাব কো কিডন্যাপ কিয়া। বাস! ফিলহাল কড়োরপতি বন গিয়া। এক দো নহি, তিন-তিন কড়োর। কউন বনেগা কড়োরপতি দেখা? উসি মুব্দে মে নহি। অ্যায়সে," বলেই হাতের আঙুলের মুদ্রায় ট্রিগার টানল, "মার ডালা, জান সে। মেরে কো লাথ মারা! ইতনি হিম্মত!"

নির্জন রাস্তার বাঁ ধার ঘেঁষে গাড়ি থামতেই প্রিজ়ন ভ্যানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ রেডিয়ো ট্রান্সমিটার অন করে দেবদাস চুপচাপ অপেক্ষা করল। লালবাজার কন্ট্রোলরুমের রুটিন ঘোষণা ভেসে আসছে। দিল ফুল ভলিউম। এটাই সংকেত।

দেবদাসের সংকেত পেয়েই শরীরে জড়ানো চাদর সরিয়ে অর্ক স্বমূর্তি ধারণ করল।

দেশের আইনকে কাঁচকলা দেখানো টারজেন তখনও জ্ঞানগর্ভ ভাষণে আত্মগৌরব জাহির করে চলেছে। "টারজেন সিংহকে লাথ মারা! বাস... খালাস..."

হয়তো 'খালাস কর দিয়া'-ই বলত। সে সুযোগ সে পেল না। বিশালদেহী অর্ক উঠে দাঁড়িয়েছে। সারা শরীরে জমে থাকা ক্রোধ, আক্রোশ হাতের তালুতে সংক্রামিত করে কষাল বিশাল পাঞ্জার এক থাপ্পড় 'কড়োরপতি' টারজেন সিংহের গালে। এমন বেমক্কা আক্রমণের জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তার বাঁ গালে কেউ যেন জ্বলন্ত হিটারের ছ্যাঁকা দিল। হাত বুলানোর জো নেই। দু-হাত হ্যান্ডকাফের কবলে। তবুও চেটো দিয়ে চেষ্টা করল প্রলেপ দিতে। ততক্ষণে অর্ক ওর ঝাঁকড়া চুলের গোছ বিশাল থাবায় ধরে দাঁড় করাল। চকিতে হাতসাফাইয়ের ঢঙে বাঁ হাত চালান করল টারজেনের ট্রাউজারের ডান পকেটে। এত টেনশনেও দেবদাসের বলে দেওয়া ডান পকেটের কথা সে ভোলেনি।

হ্যাঁ, একটুকরো কাগজে হাত ঠেকল যেন! পলকে সেটি বের করে নিজের বুক পকেটে ভরে নিল।

আরও নিশ্চিন্ত হতে বাঁ পকেটও হাতড়ে নিল। পানমশলার কৌটো ছাড়া আর কিছু নেই। রুমালের সঙ্গে লেপটে রয়েছে।

একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিতেই টাল সামলাতে না পেরে টারজেন বেঞ্চে ধাক্কা খেয়ে পড়ল মেঝেতে। এতক্ষণে তার মনে পড়ল সুইটির দেওয়া বার্তাটি তার পড়া হয়নি। অবশ্য সে চুপিচুপি জানিয়েছে কাজ হয়ে গিয়েছে। কাল জামিন জরুর হো যায়েগা। যদি কথা বলার সুযোগ না পায়, তাই লিখেও এনেছিল।

প্রাথমিক ধাক্কা সামলে সে ওই বসা অবস্থাতেই স্নিকার পরা ডান পায়ে তীব্র ছোবল রচনা করে চালিয়ে দিল অর্কর হাঁটু লক্ষ করে। এটা আন্দাজ করে অর্ক অপূর্ব দক্ষতায় গ্লাইড করে সরে আসে সতর্ক দূরত্বে।

গুরু পাপ্পু সিংহ ছাড়া ওর গালে আজ পর্যন্ত কেউ চড় মারেনি। পুলিশ কাস্টডিতে থাকার সময়ও না। আর বিহার-ঝাড়খণ্ডের পুলিশ তো উল্টে ওকেই সেলাম করে।

একটা যাচ্ছেতাই ম্যাং বাতাসে ভাসিয়ে অর্কর চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে বেঞ্চের হাতল ধরল। হ্যান্ডকাফ পরা হাতেই সেই হাতল ধরে দাঁড়াতে চাইল অর্ককে উচিত শিক্ষা দিতে। হাতদু'টো লক করা না থাকলে সে দেখিয়ে দিত, হাওয়া কিস তরহা নিকল সকতা হ্যায়। সে সুযোগ না দিয়ে অর্ক এবার একটা পেল্লাই ঘুসি আছড়ে মারল ওর পেটে। ওজনটি বেশ জুতসই। কোঁৎ করে একটা শব্দ। টারজেনের হাওয়াই বুঝি বের হয়ে গেল ওকে বেদম করে। কালবিলম্ব না করে পরিত্যক্ত চাদরটি টারজেনের মুখে ভালরকম পেঁচিয়ে ছুটে এল দরজার কাছে। কার্যসিদ্ধি হয়ে গিয়েছে। বেশিক্ষণ এখানে থাকা আইনগতভাবে নিরাপদ নয়। কোথা থেকে কী হয়ে যাবে, কে জানে! দেবদাস লক খুলে রেডিই ছিল। ঝটপট দরজা খুলতেই অর্ক লাফ দিয়ে নামল রাস্তায়। অত্যন্ত তৎপরতায় দু'জনে হাত লাগিয়ে গেট এবং দরজা লক করে দিল।

ভ্যানের রেডিয়ো ট্রান্সমিটারের শব্দ ছাপিয়ে টারজেনের মরিয়া চিৎকার শোনা যাচ্ছে, "তু দেখ লে না শালে, কাল কোর্ট মে তেরা অ্যায়সি হাল করুঙ্গা, সাসপেন্ড হো যায়েগা! হিউম্যান রাইট্‌স মে ভি কমপ্লেন করুঙ্গা।"

এই তড়পানি যে শূন্যগর্ভ নয়, এটা ওরা বিলক্ষণ জানে। টারজেন কেন, দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, হাতে-নাতে ধরা পড়া জঘন্য এবং ঘৃণ্য বিচারাধীন আসামির গায়ে হাত তোলাও ঘোরতর আইন বিরুদ্ধ। অনাগত আইনি ঝামেলার আশঙ্কা ওদের ভাবিয়েও তুলল। দেবদাসের কথায় অর্ক একটু কি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে? অর্কর মুষড়ে পড়া ভাব লক্ষ করে দেবদাস, ওকে ভ্যানের সামনের দিকে টেনে আনল। এখান থেকে টারজেন ওদের দেখতে পাচ্ছে না ছোট্ট ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে। ভরসা জোগাতে দেবদাস বলল, "ঘাবড়াচ্ছিস কেন? কোনও প্রমাণ আছে? কেউ কি দেখেছে? প্রিজ়ন ভ্যানের ভিতর কী হচ্ছে, জানবেটা কে?"

"কিন্তু ড্রাইভার, সে তো জানল!"

"ধুস! বলাই? ও তো আমাদের ব্যাটেলিয়নের ড্রাইভার। আমাদের বিরুদ্ধে বলবে? খেপেছিস? চিন্তা করিস না। ফাঁসলে আমিও ফাঁসব। ডিসিকে সব বলছি এখনই। এখানে তো তোর আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নয়। একটা নটোরিয়াস ক্রিমিনাল ভিতরে-ভিতরে কোনও

SAMPLE

মারাত্মক ঘোঁট পাকাচ্ছে কি না সেটা জানতেই তো...”
“কথাটা তা নয়। মনটা খচখচ করছে, অতি উৎসাহী হয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেললাম না তো?”
“ঠিক আছে। আমার উপর একটু ভরসা রাখ। ম্যাডামকে সবই খুলে বলছি এখনই। আগে দ্যাখ তো, ওই স্লিপটা স্রেফ প্রেমপত্র, না কোনও কিছুর সংকেতবার্তা।”
বুকপকেট থেকে চিরকুটটি বের করল অর্ক। হিন্দিতে লেখা দুটো লাইন। বহু কসরত করে পড়তে পারল।
“লড়কি রোয়ে, লড়কি শোয়ে। দুসরি কামমে লাগে।
ফিক্র মত, গুস্‌সা ছোড়, বিচ্ছু জলদি ভাগে।”

বারকয়েক পড়েও মর্ম উদ্ধার করতে পারল না। হয়তো টারজেনের কোনও ছোট্ট মেয়ে আছে। টারজেন আর সুইটির মেয়ে। কোর্টে মোটামুটি নিয়মিতই আসে। নামটাও ওদের জানা। কিন্তু টারজেনের আসল বউ তো নিশা সিংহ। সে যাক গে। কী এমন জরুরি কারণে এই স্লিপটি লিখে আনতে হল? কাছে যাওয়ার সুযোগ যখন ও পায়, এসব ঘরোয়া কথা বলার বাধাটা কোথায়? সাদামাঠা কিছু ইনফরমেশন, মেয়েটা কাঁদল, ঘুমিয়েও পড়ল। পরে অন্য কিছু খেলায় ভুলে থাকল। চিন্তা কোরো না। রাগটাগও কোরো না। কিন্তু এই কথাটির মানে কী? বিচ্ছু জলদি ভাগে?
অর্ক বোঝাতে চাইল, বিচ্ছু হয়তো ওদেরই দুষ্টু ছেলে। কোনও বদমায়েশি করে মায়ের বকুনি এড়াতে কাছাকাছি কোথাও সটকেছে। দেবদাসের মন যেন ভিতর থেকে সায় দিচ্ছে না। নির্দোষ শব্দগুলো হয়তো আদৌ সহজ-সরল নয়। কোনও গূঢ় সংকেত চালাচালি হয়ে গেল কি? টারজেন অবশ্য এখনও ওটা পড়তেই পারেনি। চিন্তা সেখানে নয়। পূর্ব প্ল্যানমাফিক কিছু একটা কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। তা এই টারজেনের নির্দেশ মতোই। সুইটির আসাযাওয়ার সুযোগ থাকায় ওর মাধ্যমেই কিছু নির্দেশ চালান হয়ে গিয়েছে। জেল গেটেও ওর শাগরেদরা দেখা করার সুযোগ পায়। সেখান থেকেও নির্দেশ যেতে পারে। অসম্ভব কিছু নয়। সেখানে তো কলকাতা পুলিশের কোনও খবরদারি চলবে না। না, ম্যাডামকে সবটা এখনই জানানো দরকার। কেঁচো খুঁড়তে কেউটেও বেরতে পারে।
“অর্ক, ম্যাডামকে ধর, জলদি।”
“কী দরকার বল তো ঝামেলা বাড়িয়ে? কাজটা তো আমি ঠিক করিনি। জানাজানি হতে-হতে যদি মিডিয়ার কানে যায়, তো কেলেঙ্কারির একশেষ।”
“অর্ক প্লিজ অবুঝ হোস না। আমার মন কিন্তু অন্য কিছুর গন্ধ পাচ্ছে। ওদের সাক্ষাৎপর্বটি আমি লুকিয়ে থেকে দেখেছি যে।”
অর্ক, ডিডি ডিসি ম্যাডাম কন্তুরী মুখোপাধ্যায়কে ফোনে ধরে দেবদাসের হাতে ফোনটি দেয়।
ম্যাডাম, টারজেন সিংহের সিকিওরিটি ইন চার্জ দেবদাস বলছি। ক্রাইম কনফারেন্সে কন্তুরী তখন খুবই ব্যস্ত। সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু টারজেন সিংহ নামটা ওর কানে ছ্যাঁকা দিল যেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবদাস বলো। এনি প্রবলেম?”
“ম্যাডাম খুবই জরুরি।”
দেবদাসের স্বরে অস্বাভাবিকতার রেশ আন্দাজ করে কন্তুরী ভয়ে সিঁটিয়ে যায়।
“কেন, কেন, পালিয়েছে নাকি? তোমরা তখন কী করছিলে? পুরো ফোর্স থাকা সত্ত্বেও? কী করে ঘটল? কতক্ষণ আগে? কোর্ট থেকে? না রাস্তা থেকে? কন্ট্রোলে জানিয়েছ? রেড অ্যালার্ট জারি...”
প্রচণ্ড উদ্বিগ্নতা ঠাসা এতগুলো পিঠোপিঠি প্রশ্নের ফাঁকে দেবদাস একটু সুযোগ পেতেই ওর উত্তরটা কোনওক্রমে গলিয়ে দিল।
“না, না ম্যাডাম। ওসব কিছু নয়। প্রিজনভ্যান সিকিওর্‌ড।”
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়াল কন্তুরীর। এত সুনামের সঙ্গে কাজ করেও, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের গতিশীলতা মসৃণ রাখা সত্ত্বেও, ওর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। ওর কর্মকুশলতাকে ঘিরে উপরমহলে একটা ষড়যন্ত্র চলছে ভিতরে-ভিতরে। এমন অবস্থা, পান থেকে চুন খসলেই ধপাস! সিএম মুখিয়ে আছেন ওকে কচুকাটা করবে বলে। একটা তুচ্ছ ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি। কেউ সুযোগ বুঝে ওঁর কান ভারী করেছে। অথচ কন্তুরী টু-হানড্রেড পারসেন্ট ক্রিমিনাল প্রসিডিওর বিধির ধারা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়, পুলিশ অ্যাক্টকে গীতার মতো মান্য করে। অপরাধীর গোত্র বা রাজনৈতিক রংয়ের ধার ধারে না। কিন্তু কেরিয়ার গ্রাফের শুদ্ধতা এইসব নিয়মানুবর্তিতার উপর কখনওই নির্ভরশীল নয়। দরকার অ্যালিজেন্‌সের। এক ধরনের আনুগত্যের, যেটা কন্তুরীর ধাতে নেই। কর্মকুশলতার কদরই যেখানে নেই, চন্দনগাছকে কেটে ফেলে শিরীষ গাছ পোঁতাই রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। শুধু ওরই দফতরে নয়, সর্বত্রই, সেখানে ওকে খুব সমঝে পা ফেলতে হয়। যে-কোনও একটি ভুল সিদ্ধান্ত বা নিরপেক্ষ মন্তব্য ওকে উপড়ে ফেলে দুড়ে দিতে পারে কৌলিন্যহীন কোনও দফতরে বা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং সমস্যা সংকুল কোনও এলাকায়।
এই টারজেন সিংহ কন্তুরীর কাছে একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। রতন জৈনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার তো করাই গেল না, অথচ ওর অজান্তে দেওয়া এত বিশাল টাকাও জলে গেল। সেই ব্যর্থতা এখনও কুরে-কুরে খাচ্ছে। তার উপর এই টপ রাউডি যদি জেল ভেঙে পালায়, তো মুখ লুকানোর জায়গা থাকবে না। যাক, প্রিজনভ্যান সিকিওরড আছে তাহলে। মামলাটা মানে-মানে শেষ হতে পারলে বাঁচা যায়।
“তাহলে এত নার্ভাস হয়ে ফোন করছ কেন?”
“আপনাকে এখনই একবার আসতে হবে। ভীষণ জরুরি।”
“ফোনে বলা যায় না?”
“না, ম্যাডাম। বলা যাবে না।”
কন্তুরী দেবদাসকে ভালমতো বোঝে। কিছু একটা গড়বড় না হলে বিরক্ত করে না।
ওরা ঠিক কোথায় রয়েছে লোকেশনটা ভাল করে বুঝে নিয়ে, ক্রাইম কনফারেন্সের দায়িত্ব এসি অ্যাণ্টি রাউডির হাতে দিয়ে বলল,
“ওখানেই থাক, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।”
ম্যাডাম আসছেন জেনেও অর্ক এখনও ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। ওর এই কাজ ম্যাডাম বরদাস্ত করবেন তো!
দু'জনে ভ্যানের রেঞ্জ থেকে কয়েক গজ সরে এসে একটা বড় গাছের ছায়ায় দাঁড়াল। রোদ্দুরের প্রবল দাপট। তবুও এখানে গঙ্গার বাতাস ফুরফুর বইছে। এখান থেকে ভ্যানের উপর লক্ষও যেমন রাখা যাবে, ম্যাডামের জিপসি আসছে কিনা দেখাও যাবে।
ডিসি ডিডি-র জিপসি কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের দৃষ্টিগোচর হল। কাছে আসতেই ওরা হাত দেখাল। একরাশ উদ্বিগ্নতা নিয়ে নামল কন্তুরী।
এই টারজেন সিংহ জাস্ট আ গ্রেট টু দ্য সোসাইটি। এনকাউন্টারে শেষ করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। ওর বেঁচে থাকার কোনও অধিকারই নেই।
আনুপূর্বিক সবটা শুনে চিরকুটটি পড়ল বার দুয়েক। দেবনাগরী অক্ষরে লেখা। তৃতীয়বার পড়তেই রহস্যের পরদা একটু-একটু করে সরে যেতে লাগল। তবে কি দুইয়ে দুইয়ে চার? ওর ট্রায়াল পর্ব শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছে। আরগুমেন্ট চলছে সে খবর কন্তুরী জানে। সেশন জজ সমরজিৎ লাহিড়ির হাতে যে টারজেনের নিস্তার নেই, এটা বেশ চাউর হয়ে গিয়েছে।
সিম্বলজি, ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং হেঁয়ালি ডি-কোড করার ব্যাপারে কন্তুরীর একটা সুনাম আছে। ট্রেনিংও রয়েছে। সদ্য-সদ্য কয়েকদিন আগে বেঙ্গালুরু সিটি পুলিশ ওর সাহায্য চেয়েছিল স্বরাষ্ট্র সচিব মারফত। কলকাতা-বেঙ্গালুরু ইন্ডিয়ান ফ্লাইট এয়ারপোর্ট ছোঁয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই কন্তুরী কেসটাতে ব্রেক-থ্রু করে অসামান্য বুদ্ধিমত্তায়। আর একবার পড়তে গিয়েই, 'লড়কি রোয়ে, লড়কি শোয়ে... বিচ্ছু জলদি ভাগে।'

দেবদাস ঠিকই সন্দেহ করেছে। বাড়ির ছেলেমেয়ের দুষ্টুমির ফিরিস্তি কেউ এত সাবধানতায় হাত বদল করবে না। নিশ্চয়ই কিছু মারাত্মক সংকেতবার্তা টারজেনকে জানানো হচ্ছিল।
বিচ্ছু জলদি ভাগে! 'বিচ্ছু'র ইংরেজি প্রতিশব্দ হাতড়াতে শুরু করে 'স্করপিও' কথাটি সপাট চাবুকের মতো ওর মগজে ফ্ল্যাশ করে। তাই তো 'বিচ্ছু' মানে তো 'স্করপিও'-ই হচ্ছে। যদিও নক্ষত্রপুঞ্জ বোঝাতে স্করপিও শব্দটি ব্যবহার হয়। 'বিচ্ছু'র আসল ইংরেজি প্রতিশব্দ 'স্করপিয়ন' হলেও সাধারণ মানুষ স্করপিওকেও বোঝে। স্করপিও তো কিডন্যাপার গ্যাংয়ের ভীষণ প্রিয় দ্রুতগতির যান। অতএব বিচ্ছু বলতে সুইটি স্করপিওকেই মিন করেছে। আর 'লড়কি রোয়ে' মানে? কস্তুরীর সারা শরীর টানটান। কাকে? কার মেয়েকে কিডন্যাপ করলে টারজেনের লাভ? তবে কি ট্রায়াল জজ সমরজিৎ লাহিড়ির...
অলক্ষুনে চিন্তাটা মাথায় আসতেই, "শোনো, সেই সুইটি নামের মেয়েটিকে যেখান থেকে পারো খুঁজে বের করো। মনে হচ্ছে কোনও সর্বনাশ অলরেডি ঘটে গিয়েছে। ওকে কোর্টচত্বরে এখনও পেয়ে যেতে পারো। গুড! ভেরি গুড, অর্ক। দারুণ অ্যাচিভমেন্ট। ডোন্ট ওরি। দেবদাস, এইজন্যই তোমাকে ওই কাজে ডেপুট করেছি।"
অর্ক, দেবদাস তৃপ্তির হাসি হেসে মুখ চাওয়াচায়ি করল। দেবদাস জানায়, "ম্যাডাম ওকে জেলগেটেও পেতে পারি। কোর্ট থেকে ও প্রায় দিনই সোজা জেল গেটে চলে যায়।"
"যেখান থেকে পারো, সে পাতাল থেকে হোক বা জাহান্নম থেকে,

সুইটি নামের মেয়েটিকে যেখান থেকে পারো খুঁজে বের করো। মনে হচ্ছে কোনও সর্বনাশ অলরেডি ঘটে গিয়েছে।

ওকে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চাই। অ্যারেস্ট করে সোজা আমার দোতলার চেম্বারে নিয়ে আসবে। আমি এখন সিটি সেশন কোর্টে যাচ্ছি। ফোনে যোগাযোগ করবে। খোলা থাকছে।"

{১৫}

দুশ্যত বিধ্বস্ত সুনন্দা বসাক বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন আর অস্থিরতা চাপতে ঢাকনা খুলে জল খাচ্ছেন। চঞ্চল চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। ম্যাডাম এবার মনে হচ্ছে পিবিএক্স ধরেছে।
রিসিভার হাতে নিয়ে প্রচণ্ড বিরক্তিতে অপেক্ষা করছেন কখন হ্যালো বলে ধন্য করবে।
''হ্যাঁ, হ্যালো, সেন্ট হেনরিয়েটা স্কুলের হেড মিস বলছি। আমার স্কুলের একটি ছাত্রী...''
"কাকে চাইছেন? দেবটা কাকে?"
"তা তো বলতে পারব না। মনে হচ্ছে একটি ছাত্রীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।"
"ঠিক আছে। কন্ট্রোল রুমে দিচ্ছি।"
"হ্যাঁ, বলুন। হেডমিস বলছেন? কী ব্যাপার?"
"আমার স্কুলের ছাত্রী... সম্ভবত কিডন্যাপ্‌ড।"
"ওটা আপনার সন্দেহ। আসলে মেয়েটি তার প্রেমিকের সঙ্গে ভেগেছে। এরকম ফালতু অভিযোগ শুনে-শুনে আমার কান পচে গিয়েছে। প্রথম-প্রথম অপহরণের গল্প ফাঁদা হয়। পরে দেখা যায়..."
"কী আজেবাজে বকছেন! ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। বছর বারো বয়স! সে ইলোপ করবে?"
এবার ওদিকের স্বর সপ্তমে চড়ে যায়।
"আজেবাজে বকছি? আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন? লোকাল থানায় ডায়েরি করেছেন? তা না করে সোজা লালবাজারে ঢুঁ মারলেন!"
"লোকাল থানা তো ফোনই তুলছে না।"
"সবটাই ফোনে হয় নাকি! থানায় চলে যান।" লাইন কেটে দেওয়া হল।
সুনন্দার মনে হল আজকের দিনটা ওর নয়। যারা ওকে ঠকিয়ে একটা নিষ্পাপ মেয়েকে অপহরণ করল আর এই যে এইমাত্র একজন পুলিশকর্মী ওকে যাচ্ছেতাই বলল, দিনটা ওদেরই।
অসহ্য বিরক্তি আর হতাশা মূলধন করে অভিযোগ লিখতে শুরু করে। চঞ্চলকে লোকাল থানায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

{১৬}

সিটি সেশন কোর্টের তিনতলায় উঠে প্রথমে সমরজিৎ লাহিড়ির এজলাসে উঁকি দিল। সেকেন্ড হাফের শুনানি চলছে। এজলাস ফাঁকাই বলা যায়। সংশ্লিষ্ট ল-ইয়াররা ছাড়া দু'-চারজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কস্তুরী ইউনিফর্মে। প্রথামাফিক স্যালুট দিতেই বুটের শব্দে সমরজিতের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ঘাড় গুঁজে নথিতে চোখ বোলাচ্ছিলেন। সোজা হয়ে বসেই দেখলেন ডিসি-ডিডি কস্তুরী দাঁড়িয়ে।
"কী ব্যাপার, মিস মুখার্জ্জি?"
"স্যার কি খুব ব্যস্ত আছেন?"
"তেমন কিছু নয়। একটা রিভিশন শুনছি। খুব জরুরি?"
"হ্যাঁ, স্যার। তা একটু..."
উপস্থিত উকিলবাবুরা সমরজিৎকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। ওঁরাই অনুরোধ করলেন আংশিক শোনা সিভিল রিভিশনটি দু'-একদিন বাদেই ফিক্স করতে। পেশকারবাবুকে সেইমতো নির্দেশ দিয়ে নিজের খাস চেম্বারে নেমে গেলেন।
"বলুন মিস মুখার্জ্জি। চা না কফি?"
"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। এখন থাক। পরে একদিন..."
"আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক আছে। বলুন কী ব্যাপার? লুকিং টেন্‌সড!"
"স্যার! কিছু মনে করবেন না। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনাবশ্যক..."
"বলুন না, কী জানার আছে? এতে আবার মনে করার কী হল?"
"স্যার, আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?"
"সবেধন নীলমণি। অবশ্য পুত্র নয়, কন্যা। কেন বলুন তো?"
কীভাবে যে কথাটা পাড়বে, সেটাই ভাবছে। কারণ ওর সন্দেহ সত্যি না-ও হতে পারে, "আসলে স্যার আপনি তো কোনও ফ্যামিলি সিকিওরিটি চাননি। টারজেন সিংহের মামলাটি আমাদের যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ। আমরা প্রস্তাবও দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি..."
"কী হবে বলুন তো? দুজন আর্মড গার্ড কী প্রোটেকশন দেবে! ভাগ্যে থাকলে, বিপদ..."
কস্তুরী এবার সোজাসুজি জানতে চাইল, "স্যার, মেয়ের বয়স কত?"
"এই তো আগামী সেপ্টেম্বরে ১৩তে পড়বে। ১২ চলছে। ক্লাস সেভেন।"
"আজ কি ও স্কুলে গিয়েছে?"
"অবশ্যই। ইন ফ্যাক্ট আমার বেরনোর অনেক আগেই ও তো স্কুলে চলে যায়।"
"কীসে যায়? স্কুলবাসে?"
"না, না, বাড়ির গাড়িতে। কেন বলুন তো?"
"স্যার, প্লিজ একবার স্কুলে ফোন করে খবর নেবেন? বাড়িতেই করে দেখুন না, যদি ফিরে থাকে।"

কস্তুরী হাবভাবে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন উৎকণ্ঠা আঁচ করে সমরজিতের কপালে ভাঁজ পড়ে, "দেখুন, মিস মুখার্জ্জি, আমার বাড়ির ড্রাইভার বিনোদ ওকে নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। যদি নিয়মের ব্যতিক্রম হত, অবশ্যই বাড়ির ফোন আসত। তবে... দাঁড়ান, দাঁড়ান। আজ অবশ্য মিসেস দুপুরে লেক গার্ডেন্সে যাবে। রুম্পা, মানে মেয়েও স্কুল ছুটির পর ওখানেই যাবে। বিনোদই এসে নিয়ে যাবে।"

তবুও কস্তুরী মরিয়া হয়ে বলে, "তাহলেও স্যার স্কুলে একবার ফোন করুন।"

সমরজিৎ ততক্ষণে সেল সার্চ করে স্কুলের ফোন নাম্বার বের করেছে। কল করতেই রিং হচ্ছে।

সুনন্দা বসাক রিটন কমপ্লেন্টে সবে সই করে চঞ্চলের হাতে দিয়েছেন, ল্যান্ডলাইন হঠাৎই সজীব হল। অন্যমনস্ক থাকার কারণে চমকে উঠলেন প্রথমটা।

রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই, "সেন্ট হেনরিয়েটা স্কুল?"

"হ্যাঁ, কাকে চাইছেন?"

"হেডমিসের সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে?"

"বলছি। আমিই হেডমিস, সুনন্দা বসাক।"

"ম্যাডাম, সমরজিৎ লাহিড়ি, মানে আপনার স্কুলের ক্লাস সেভেনের..."

মনে-মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ, অভিমান জমা থাকলেও রুম্পার খবর যে এতটা দেরি হলেও এসে পৌঁছেছে, এতেই শান্তি। কী প্রবল উদ্বেগের মধ্যে যে এই ক'ঘন্টা কাটল। এই নাক-কানমলা। আর কখনও কোনও ছাত্রীকে আর্লি ডিপারচার দেবেন না, কিছুতেই না।

"রুম্পার বাবা বলছেন? ও বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে তো? এত দেরি হচ্ছে দেখে ভীষণ চিন্তায় ছিলাম।"

সমরজিতের মনে হল, এক অগ্নিবলয়ের ভিতর হঠাৎ ঢুকে পড়েছে। প্রচণ্ড উত্তাপ। দাঁড়িয়ে থাকার জো নেই।

"তার মানে! রুম্পা স্কুলে নেই? স্কুল কি ছুটি হয়ে গিয়েছে?"

"না, না, ছুটি হবে কেন? আপনার মিসেসের শরীর হঠাৎ খারাপ হয়েছে। ওই তো, আপনাদের বাড়ির কাজের মেয়ে মঞ্জু না কী যেন নাম... হ্যাঁ, হ্যাঁ, মঞ্জু সাঁতরা। ও-ই এসে ওকে নিয়ে গেল।"

সব কিছু কেমন ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ। তবুও যথাসাধ্য মাথা ঠান্ডা রেখেই বলে...

"কী বলছেন ম্যাডাম! এই আধঘন্টা আগেই তো রুম্পার মায়ের সঙ্গে কথা হল। ও অনেকক্ষণ আগেই লেক গার্ডেন্সে পৌঁছে গিয়েছে। ড্রাইভারকেও ছেড়ে দিয়েছে। রুম্পাকে নিয়ে ড্রাইভার লেক গার্ডেন্সেই যাবে।"

সুনন্দা বসাকের বসার চেয়ারটাকে হঠাৎ মনে হল, এটাই বুঝি ইলেকট্রিক চেয়ার। শক খেয়ে পা, হাত, সারা শরীর কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। রুম্পার বাবার বাকি কথাগুলো কানে যাচ্ছে ঠিকই, অর্থটা যেন কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না।

"আর মঞ্জুর কথা বলছেন, ও তো আজ সকালেই ওর মাসি না পিসির বাড়ি চাঁপাডাঙাতে গেল।"

"কিন্তু ও-ই তো রুম্পাকে নিয়ে গেল। রুম্পারও বেশ ঘনিষ্ঠই মনে হল।"

বাকি কথাগুলো সমরজিতের কানে ঢুকছে না। বাঁই-বাঁই করে মাথা ঘুরছে। তাহলে রুম্পার কিছু বড়সড় বিপদ ঘটে গিয়েছে এতক্ষণে। মঞ্জুর মাসির বাড়ি যাওয়াটা... বাহ! এত স্নেহ, ভালবাসার এই প্রতিদান!

সমরজিতের হাত থেকে রিসিভারটা এবার কস্তুরী চেয়ে নেয়, "ম্যাডাম, বলুন তো ঠিক ক'টার সময় ওরা স্কুল থেকে বেরিয়েছে? ডিসি-ডিডি কস্তুরী মুখোপাধ্যায় বলছি।"

সুনন্দার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। যেটা ভয় পেয়েছিল, সেটাই ঘটল। এই বয়সে এরকম মারাত্মক একটা কাণ্ড ঘটে গেল স্রেফ ওরই গাফিলতিতে।

এত মানসিক টানাপড়েনের মধ্যেও সব কিছুই গুছিয়ে বলতে পারল সে। ব্ল্যাক স্করপিও এবং তার নাম্বারটিও জানাতে ভুলল না। সেইসঙ্গে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিল লোকাল থানা এবং লালবাজারের কর্মসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। সবই শুনলেন কস্তুরী অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আর লিখেও নিল লোকাল থানা এবং লালবাজারে ফোন করার সময় সারণি।

ওর সন্দেহটাই ঠিক হল তা হলে। দেবদাস-অর্ক একটা মিস অ্যাডভেঞ্চার করেছে ঠিকই, কিন্তু তবুও মনে-মনে স্যালুট জানাচ্ছে ওদের সৎসাহসকে, সেটা যতই দুঃসাহসের পর্যায়ে পড়ুক। এখন খুব দ্রুত স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিতে হবে। ওদের গন্তব্য কোথায় হতে পারে। কলকাতার আশপাশে ঘাপটি মেরে বারগেনিং শুরু করাও বিচিত্র নয়। তবে রতন জৈনের ক্ষেত্রে পুলিশ যে ভুল করে বসেছিল, তার পুনরাবৃত্তি কস্তুরী চায় না। ব্যাপারটি আপাতত গোপন রাখতেই হবে। মিডিয়ার স্পর্শ থেকে শত হস্ত দূরে থাকাই এখন শ্রেয়। সুনন্দা বসাককেও সেই পরামর্শ দেওয়া হল, অন্তত আজকের দিনটার জন্য।

"কিন্তু একটা এফআইআর করে না রাখলে পরবর্তী কালে আমার উপরই তো ব্লেম আসবে।"

"ঠিক আছে। কাউকে থানায় পাঠিয়ে দিন। আমি ওসির সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।"

ফোন রেখে কস্তুরী উঠে দাঁড়ায়।

"স্যার, আমার অফিসারের বুদ্ধিমত্তায় এই এত বড় পরিকল্পনাটা জানা গিয়েছে। আমরা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। একটু ধৈর্য ধরতেই হবে। এই মুহূর্তে কারও কাছে কিছু বলবেন না। এমনকী মিসেসকেও ফোন করে নয়া বাড়িতে ফিরে এলে..."

"কিন্তু সে তো ড্রাইভার বিনোদের কাছে খবরটা পাবে," প্রবল কান্নার বেগ চাপতে গিয়ে সমরজিতের স্বর বিকৃত হয়ে যায়।

সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে কস্তুরী বলে, "তার আগেই আপনি ড্রাইভারকে ফোন করে বলে দিন, সে যেন ম্যাডামকে নিয়ে এখনই আপনার রেসিডেন্সে চলে আসে। আর স্যার, আপনার ফোন সবসময় খুলে রাখবেন। ওরা বারগেন করতে অবশ্যই ফোন করবে। আমি নিশ্চিত। ওদের মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ঝুলিয়ে রাখুন। আমি একটু পরেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি। পারলে একটু পরেই বাড়ি চলে যান বা মিসেসকে আনতেই চলে যান।"

স্ক্রিনে ওসি হেস্টিংস। বার দুয়েক রিং হতেই কল রিসিভ করল, "হ্যাঁ মানস, একটু ধরো। স্যার, ওই কথাই রইল। আমার এই নাম্বারটি এবং আর-একটি নাম্বার দিচ্ছি। যে-কোনও মুহূর্তে যোগাযোগ করবেন। এখন আসছি, স্যার।" ওর একটি স্পেশ্যাল কার্ড সমরজিতের হাতে দিয়ে ওসি হেস্টিংসের উদ্দেশে বলে, "মানস, কিছু বলবে?"

"খুব কি ব্যস্ত ম্যাডাম?"

"হ্যাঁ, খুব জরুরি কিছু থাকলে চটপট বলে ফ্যালো।"

"ম্যাডাম, তপন দাস নামে এক ভদ্রলোক একটি স্কুলের খাতা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছেন। উনি পিটিএস ক্রসিং-এর ফুটপাথ দিয়ে চিড়িয়াখানার ক্রসিংয়ে আসছিলেন আন্দুল যাওয়ার বাস ধরবেন বলে।"

কস্তুরী বারবার ঘড়ি দেখতে-দেখতে লিফ্টের দিকে এগোচ্ছিল। ওসি হেস্টিংসের সব কথা সেভাবে শুনতে ইচ্ছেও করছে না। এখন ওর মাথায় একটি শিশুর জীবন ঘুরপাক খাচ্ছে।

"সেইসময় কোনও চলন্ত বাস বা গাড়ি থেকে একটি খাতা কেউ ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। রাস্তায় পড়েই ছিল। বেশ নতুন খাতা। উনি সেটা কুড়িয়ে...

"কেউ মজা করেছে আর কী! তা এই তোমার ইম্পরট্যান্ট ম্যাটার?"

"না, ম্যাডাম। আসলে সেই খাতার মলাটে লেখা রয়েছে 'কিডন্যাপ্ড'।"

"হোয়াট?"

AMARBOI.COM

"ভিতরের কয়েকটি পাতা জুড়েও একইভাবে লেখা, কিডন্যাপ্‌ড," তারপর তপন দাসের ঘটনাটা সবই বলে।

ততক্ষণে লিফ্‌ট এসে গিয়েছে। উঠেই বাকি কথা শেষ করল, "ওই ভদ্রলোককে নিয়ে ১০ মিনিটের মধ্যে আমার চেম্বারে চলে এসো। উইদাউট ফেল।"

জিপসিতে সবে উঠেছে, দেখল দেবদাসের নাম্বার।

"হ্যাঁ, দেবদাস, বলো।"

"আমরা আপনার চেম্বারে এসে গিয়েছি," দেবদাসের কণ্ঠস্বর বেশ সপ্রতিভ। তবে কি সুইটিকে...

"ওকেও পেয়ে গিয়েছি, ম্যাডাম।"

"ভেরি গুড। আসছি, ১০ মিনিট।"

লিফ্‌ট থেকে দোতলায় নেমে ওর চেম্বারে ঢুকতে গিয়ে দেখল, বেশ কিছু ভিজিটার্স গিজগিজ করছে। কস্তুরী প্রমাদ গোনে। এতজনকে তো অ্যাটেন্ড করা সম্ভব হবে না। আবার, কত দূর-দূর থেকে মানুষজন বিপদে পড়েই এখানে এসেছেন, কত হ্যাপা সামলে, ফিরিয়ে দেওয়াটা বড়ই দৃষ্টিকটু।

ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, "আপনারা সকলে কি আমার সঙ্গেই দেখা করতে চান? তাহলে বলব আজ কিছুতেই সম্ভব হবে না। তবে আমাদের এসিরা রয়েছেন, ওঁদের বলে দিচ্ছি। ওঁরা ডেকে নেবেন। চিন্তা নেই, আপনাদের অভিযোগগুলো আমার টেবিলে ঠিক-ঠিক নোটিংসহ চলে আসবে।"

ডিউটি কনস্টেবলদের ওদের সঙ্গে দিয়ে এসিদের দপ্তরে পাঠিয়ে, চেম্বারে ঢুকেই দেখল, অর্ক-দেবদাস দাঁড়িয়ে। কিছুটা দূরে সেই মক্ষিরানি, সম্ভবত সুইটি। টারজেনের চয়েস আছে বলতে হবে। মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে রেগে ফুঁসছে। ফুঁসবেই তো। অত বড় শাহেনশার ডার্লিং, তেজ তো থাকবেই। জেল কাস্টডিতে আটকে থেকেও যার মাথা থেকে লিকপ্রুফ কিডন্যাপিংয়ের ছক বেরয় এবং তুখোড় নেটওয়র্কের মাধ্যমে ছকটা বাস্তবের রূপ নেয়, শুধু তাই-ই নয়, বাঘের ঘরের হাল হকিকত অর্থাৎ জজের ডোমেস্টিক হেল্প মঞ্জুর নাড়িনক্ষত্র নিখুঁতভাবে বের করা এবং মঞ্জুকে ভাল টোপে গেঁথে হেডমিসট্রেসকে ঘোল খাইয়ে খোদ জজের মেয়েকে বগলদাবা করার দুঃসাহস যে দেখাতে পারে, তার রাঙা সখীর মেজাজ তো তেড়িয়া হবেই। তার মজনু যে কোটি-কোটি টাকার বাদশা। দো-কড়ির পুলিশের এত সাহস, সুইটির কেশাগ্র স্পর্শ করে!

চেয়ারে বসেই কস্তুরী অনেকটা জল খেল এক নিঃশ্বাসে। ভিতরে-ভিতরে খুশিই হয় সুইটিকে কবজা করা গিয়েছে দেখে। রুম্পার ব্যাপারে একচিলতে আশার আলো ঝিলিক দেয়। এখন খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। টারজেন সিংহ, তোমার চ্যালা চামুন্ডারা যেভাবে সুনন্দা বসাককে বুদ্ধু বানিয়ে রুম্পাকে হাসিল করেছে, দেখি তোমাদের বুদ্ধিকে টেক্কা দিতে পারি কিনা।

"হ্যাঁ, দেবদাস বলো কী খবর!"

দেবদাস কিছু বলার আগেই সুইটি যেন বাঘিনি। থাবার ভিতর লুকানো নখ বের করে ওদের রক্তাক্ত করে ছাড়বে। হিসহিসিয়ে চাপা হুংকার ছাড়ে, "ম্যাডাম, লগ তো রাহা হ্যায়, আপ এক আইপিএস অপসার হ্যায়। আপকি পুলিশকো থোড়া সহবৎ শিখাইয়ে। দে আর থরোলি আনকালচার্‌ড, ডোন্ট নো হাউ টু বিহেভ উইথ আ উওম্যান। জবরদস্তি মুঝকো গাড়ি মে উঠা লিয়া," এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো উগরে দিয়ে, অর্ক-দেবদাসের দিকে, যেন ভস্ম করে দেবে, এমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল। ফরসা মুখ-চোখ রাগে আপেল রঙা। প্রচন্ড জোরে একটা সপাট চপেটাঘাত করার জন্য হাত নিশপিশ করছে। একটা রাস্টিক ক্রটের কনকিউবান খোদ লালবাজারে দাঁড়িয়ে কালচার শেখাতে এসেছে! একটা খুনে রাক্ষসকে ট্রায়ালের মাঝপথে জামিনে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য যারা একটি ১২ বছরের শিশুকে ছলচাতুরি করে কবজা করে, তারা নারী সম্ভ্রমের দোহাই দেয় কী করে? কোন মুখে? রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র দপদপ করলেও খুব শান্ত থেকে সুইটির চোখে তাকায়, তাকিয়েই থাকে।

সুইটি,কস্তুরীর এই মৌনতা ওর দুর্বলতা ধরে নিয়ে আরও দাপটের সঙ্গে যোগ করে, "আই মাস্ট লজ কমপ্লেইন্ট উইথ দ্য উইমেন কমিশন। দিস গাইজ্‌ হ্যাভ আউটরেজ্‌ড মাই মডেস্টি," বলেই দেবদাসদের দিকে তর্জনী তোলে।

আর কত দূর বাড়তে চায়, বাড়তে দিতে ইচ্ছে করলেও অমূল্য সময় দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে, রুম্পা কোথায় কীভাবে আছে, এসব কথা ভেবে হিমশীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "তোমার নাম?"

'তুমি' সম্বোধনে ঘোরতর আপত্তি সুইটির। কস্তুরীর পদমর্যাদার তোয়াক্কা না করেই বলে, "আয়্যাম নট ইওর ইয়ার দোস্ত। আই এক্সপেক্ট রেসিপ্রোসিটি। পুছিয়ে অ্যায়সে, "আপকা নাম?"

বয়স কত হতে পারে সুইটির? ২৪ বা ২৫-এর বেশি বলে তো মনে হয় না। টারজেন খুব হিসেব করেই এই বুনো বিচুটিকে বেছে নিয়েছে। আইবল বেশ ক্যাটিশ। চেহারার হাবভাব বড়ই উগ্র। একা-একাই অনেক ঝড়ঝাপটা সামলানোর ক্ষমতা রাখে।

এবার কস্তুরীর ধৈর্যে টান পড়ে, "তেরা নাম? জলদি বোল। কুইক, স্পিক আউট, স্পিক আউট।"

"সুইটি, সুইটি সিংহ।"

"ইয়ে তেরা আসলি নাম নহি হ্যায়," কস্তুরী ঢিলটা আন্দাজেই ছোড়ে।

এরকম পিচ্ছিল একটা প্রশ্ন সুইটিকে বেশ ঘাবড়ে দেয়। তা হলে কি ওর ব্যাকড্রপ এই অপসার জানে? কতটা জানে? ভিতরে-ভিতরে কিছুটা ধসে গেলেও স্বর বেশ চড়াই, "দীপিকা, দীপিকা সিং। কিউ?"

"টারজেন কিধর সে তেরে কো উঠা লিয়া? হোর হাউস? লেকিন, পহেলে তো পট্টিমে নহি থা। কিসকা ওয়াইফ থে?" এটাও কস্তুরীর এলোপাথাড়ি ঢিল।

কারণ রাওডিদের মুভমেন্ট তাঁর ভালভাবেই জানা। বিভিন্ন জেলা এবং কলকাতার বিচিত্র সব পোস্টিংয়ে সে দেখেছে, ডাকাত এবং মাফিয়া কিংপিনদের নিজস্ব হিম্মত অনুযায়ী ছোট-বড় হারেম থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। নবাব-বাদশাহদের মতো অন্দরমহলে কেন্দ্রীভূত নয়। রাওডিদের হারেমের অনিবার্য শর্ত হল, মেয়েটিকে যুবতী এবং সুন্দরী হতে হবে। যদি খুব সুন্দরী না-ও হয়, স্বাস্থ্যবতী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইসব রক্ষিতারা কেউ-কেউ নিপীড়িতা গৃহবধূ, অল্পবয়সি বিধবা অথবা নিষিদ্ধপল্লি থেকে ভাগিয়ে আনা। পুলিশের তাড়া খেয়ে এই টপ ক্রিমিনালরা গোপন হারেমে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেয়। আবার একটা বড়সড় কমর্কাণ্ড সেরে বহুদিনের ক্লান্তি ও টেনশন মুক্ত হতে হারেমে ঢোকে, লুঠের টাকায় মস্তিও চলে।

সুইটি আমতা-আমতা করছে দেখে, কস্তুরী দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টায়। ইতিমধ্যে অর্ক তার পকেট থেকে একটি দামি মোবাইল টেবিলে রাখে। কস্তুরী বুঝল, এটি সুইটির। ওকে অ্যারেস্ট করার সঙ্গে-সঙ্গেই হাতিয়ে নিয়েছে। নইলে সুইটি, গ্যাংয়ের কাছে বিপদ সংকেত পাঠিয়ে সমস্যা বাড়িয়ে দেবে।

ইউনিফর্মের পকেট থেকে চিরকুটটি বের করে সুইটিকে দেখিয়ে বলে, "এটার মানে কী? পহেচানতি হো?"

সুইটির ধূসর চোখদুটি বুঝি ঠিকরে বেরবে। মুহূর্তে তার রক্তাভ মুখমণ্ডলের সমস্ত রক্ত কেউ যেন পাম্প করে শুষে নিয়েছে। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "নেহি মালুম।"

এটাই যে বলবে কস্তুরী আন্দাজই করেছিল। বেশ তির্যকস্বরে জানতে চাইল, "হু ইজ্‌ দ্য অথার অফ দিস ননসেন্স? ইয়ে খত কিসনে লিখা?"

যথেষ্ট স্মার্ট বলতে হবে। এই প্রতিকূল পরিবেশে সে ফের সাহস সঞ্চয় করে, উল্টে জানতে চায়, "ইস কাগজ কে সাথ মেরা কেয়া তাল্লুক?"

আর কথা না বাড়িয়ে কস্তুরী তার টেবিলে ফিক্স করা একটি স্পেশ্যাল সুইচ পুশ করল। এই গোপন কলিং বেলের আওয়াজ আশপাশের

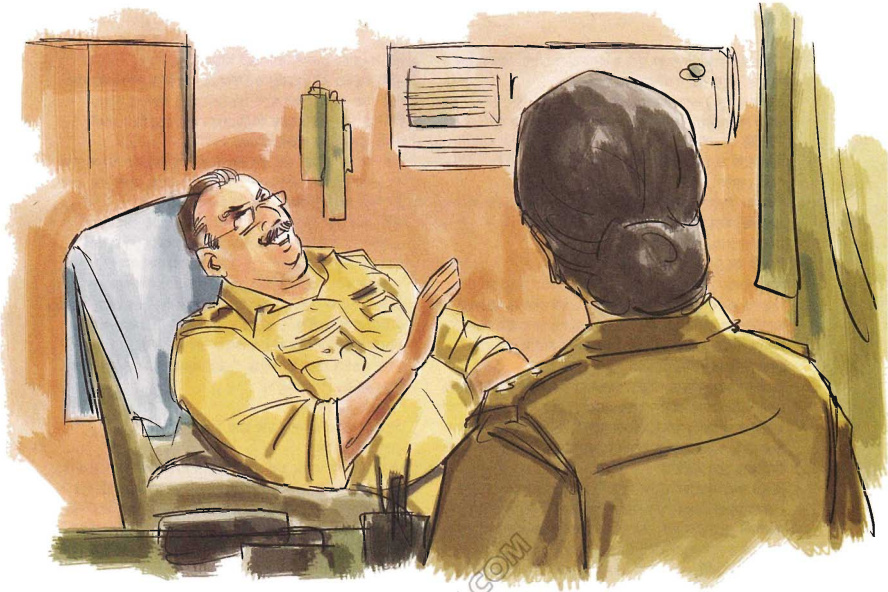

কেউ শুনতে পায় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা পুলিশমহলে ‘লেডি টারজান’ নামে পরিচিত সাব ইন্সপেক্টর বিপাশা রুদ্র শতরূপার চেম্বারে ঢোকে। চোখে-চোখে কথা হয়ে যায়। বিপাশা রুদ্রের নিজস্ব টিম আছে বাছা-বাছা লেডি এএসআই এবং লেডি কনস্টেবল নিয়ে। নিয়মিত জিম করা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। বিপাশার দিদিমা রেমন সার্কাসে বুকে হাতি তুলত দর্শকদের রুদ্ধশ্বাস দৃষ্টির সামনে। বংশগরিমাও যেমন বলার মতো, ত্যাঁদোড় মহিলা অপরাধীদের স্বীকারোক্তি আদায়েও সিদ্ধহস্ত। বিপাশার নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। সবাই ভালওবাসে, প্রয়োজনে পরামর্শও চায়।

কন্তুরীর মৌন নির্দেশে বিপাশা সুইটির কব্‌জি ধরল সাঁড়াশির মতো। সুইটি কিছু বোঝার আগেই তাকে টানতে-টানতে নিয়ে চলল দোতলার করিডর ধরে। চারটে ঘর ছেড়েই ওর স্পেশ্যাল সেল। এই ফাঁকে কন্তুরী, সমরজিৎ লাহিড়িকে ফোনে ধরে। কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

“হ্যাঁ, মিস মুখার্জ্জি, বলুন। রুম্পার কোনও ট্রেস...”

“খুব সম্ভবত একটা পজ়িটিভ ব্রেক থ্রু হতে চলেছে এখনই।” শোকবিজড়িত স্বরে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ে।

“মেয়েটা বেঁচে আছে তো? রুম্পার মুখটা মনে পড়তেই নিজেকে সংবরণ করা মুশকিল হয়ে পড়ছে।”

“আমি সিওর রুম্পা সুস্থই আছে। ওর কোনও ক্ষতি হবে না, যতক্ষণ না বারগেন অর্থাৎ ওর বেইল গ্রান্ট হচ্ছে। কারণ ওদের প্ল্যান খুব নিখুঁত। গোপনে আপনার উপর প্রেশার সৃষ্টি করে কাজটা হাসিল করা। সকলেই জানবে, প্রেসও জানবে টারজেনের বেল কনসিডার করা হয়েছে ওর বাড়ির কোনও সদস্যের ভীষণ অসুস্থতার কারণে।”

“আই সি।”

“ওরা এটা খুব ভাল করে জানবে, আপনি ওদের ফোন পাওয়ার আগে পুলিশে গেলেও ফোন পেয়ে, হুমকির কথা মাথায় রেখে ওদের গোপন ডিলটাতে অর্থাৎ কালকে টারজেনের জামিনে মুক্তিতে কনসেন্ট দেবেন। না হলে রুম্পার বিপদ। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রভূত মুক্তিপণের টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব হলেও একটি জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা আপনার পক্ষে সহজতর। কারণ এটি অর্থাৎ রুম্পার অপহরণ, র‍্যানসামের জন্য নয়। খুবই গোপনে আপনার সঙ্গে একটি ডিল করা। ডার্লিং ডটারের জীবন বিপন্ন। এই সরল সত্য আপনি মেনে নেবেন, ওরাও জানে।”

আরও কিছু বলতে চাইলেও কন্তুরীকে থামতে হল সমরজিতের প্রশ্নে, “তাহলে, ওরা ফোন করে দরাদরি শুরু করলে কী করব? এইরকম পরিস্থিতিতে আমার মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না।”

“স্যার, শুধু অভিনয় করে যেতে হবে। প্রথমেই ওদের শর্ত মানা চলবে না। আপনি যে অনড়, কর্তব্যই যে প্রধান বিবেচ্য, এসব গালভরা কথা বেশ কঠোরভাবে শোনাতে হবে।”

“বেশ। তাতে যদি ওরা রুম্পার উপর অত্যাচার শুরু করে? ওর গলার আর্তস্বরও যদি শোনায়?”

“তখন স্বর আপনিও কঠিন করে বলবেন, যদি রুম্পার কোনও ক্ষতি হয়, পুলিশের গুপ্তঘাতক দিয়ে টারজেনকে এজলাসে ঢোকার আগেই...”

কন্তুরীর কথাগুলো শেষ হয় না। বিপাশা রুদ্র ঢুকল। রাজ্য জয় করার তৃপ্তি চোখে-মুখে ছড়ানো। পিছনে দু’জন লেডি কনস্টেবল সুইটির দায়িত্বে। রুম্পার কোনও হদিশ পাওয়া গেলেও যেতে পারে এই আশায় কন্তুরী নড়েচড়ে বসে। নতস্বরে সমরজিৎকে জানায়, “স্যার এখন ছাড়ছি। পরে আবার করব। মনে জোর রাখুন।”

সুইটির অত মনমোহিনী চেহারা বিধ্বস্ত। বাহারি চুলের বিন্যাস এলোমেলো। দেবদাস-অর্ক আরও ডান দিক ঘেঁষে সরে দাঁড়ায় সকলকে জায়গা করে দিতে। বিপাশা গর্জে ওঠে, “বল সুইটি, আমাকে যা-যা বলেছিস, ম্যাডামকে বল। বলবি না ফের সেলে নিয়ে যেতে হবে!”

অবরুদ্ধ কান্নার বেগ সামলে সুইটি মুখ খোলে। সে জানাল ওই

কাগজের লেখা ওরই। 'লড়কি' হচ্ছে জজসাহেবের বেটি। ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। 'বিচ্ছু' হচ্ছে স্করপিও গাড়ি, ব্ল্যাক স্করপিও। ছক টারজেনেরই। মনিটর করছে সুনীল, সুনীল সিংহ।

সুনীল সিংহের নাম শুনেই শতরূপার শরীর টানটান। অ্যাব্‌সকন্ড করে রয়েছে প্রথম থেকেই। নেকড়ের মতো ধূর্ত। সে রুম্পার কিডন্যাপিং মনিটর করছে জেনে,কন্তুরীর কপালে চিন্তার ভাঁজ। এইসব হার্টলেস ক্রিমিনালরা একটু তাল কেটে গেলেই ভিকটিমকে রেহাই দেয় না। অতএব পা ফেলতে হবে খুব সাবধানে।

"সুইটি, গাড়ির নাম্বার বল।" কন্তুরীর কণ্ঠস্বরে অসন্তুব দৃঢ়তা। সুইটি নাম্বারটা বলতেই হেড মিস সুনন্দার দেওয়া নাম্বারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিল। ঠিকই আছে।

"লেকিন ম্যাডাম, উও নাম্বারপ্লেট ঝুটা হ্যায়। ঝাড়খণ্ড কা আসলি নাম্বার প্লেটকা উপর বেঙ্গলকা ঝুটা প্লেট সাঁটা দিয়া"।

"গাড়িতে ক'জন আছে?"

"দু'জন, ড্রাইভার শর্মা আর বিল্লু।"

বিপাশা হুঙ্কার ছাড়ে, "ডিটেলে বল। ওদের প্ল্যানটা কী, ম্যাডামকে সচ-সচ বল।"

কন্তুরী কলিং বেল বাজিয়ে সেন্ট্রিকে ডাকল।

"শোনো, এখন কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে। দরজা বন্ধ করে দাও। হ্যাঁ সুইটি, নাউ টেল মি দেয়ার ডেস্টিনেশন।"

"ধানবাদ। লেকিন আজ আসানসোলের আশপাশমে থাকবে।"

"কোথায়? ঠিক-ঠিক বলবে। একদম মিসগাইড করবে না।"

"সালানপুরমে।"

"কেন, কেন সালানপুরে কেন? আসানসোলে নয় কেন? ওখানে কি টারজেনের কোনও ডেরা আছে?"

কিছুটা হোঁচট খেতে-খেতে বলে, "জি! উধার, উধার।" বলেই সুইটি বিপাশার দিকে চোরা চোখে তাকায়। দেখল বিপাশার দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে কন্তুরীর চোখে চোখ রেখে বলে, "জি ম্যাডাম। উধার সুনীল কা ডেরা হ্যায়।"

সুইটি জানে কলকাতা পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে সুনীলকে। ও যেভাবে ফাঁদে পড়ে গিয়েছে হাজার চেষ্টা করলেও কোনও কথা গোপন করতে পারবে না। অনেক ভেবেচিন্তে পুলিশের সঙ্গে মোটা টাকার রফা করে সুনীল ঝাড়খণ্ড আর বাংলার এই বর্ডার শহর সালানপুরকে বেছে নিয়েছে। তা ছাড়া টারজেনের খাঁচাবন্দি হওয়ার পর থেকে সুনীলই সুইটির দাবিদার। বলবীর্যে সুনীল টারজেনের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। টারজেনকে যদি পাকাপাকিভাবে জেলে যেতে হয় এবং এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে ওর জামিনের আশাও নির্মূল, তা হলে সুনীলকে নিয়ে ঘর বাঁধতেই বা দোষ কী ছিল! কিন্তু সে আশাও বুঝি চুপসে গেল। এ যাত্রায় ওকে আর রক্ষে করা গেল না।

"ইয়েস ম্যাম। সুনীল সিং," সুইটির গলার স্বর হঠাৎই কেমন চোক্‌ড হয়ে যায়। কন্তুরীর চোখে তা এড়ায় না। বুঝতে পারে, সুনীলের উপর সুইটির একটা চোরাগোপ্তা ইমোশন্যাল অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে। ইন ফ্যাক্ট, এই সুইটির মতো মেয়েরা ভীষণ সুযোগসন্ধানী। গ্যাং লিডার টারজেনের যেহেতু জেল থেকে বেরিয়ে আসার চান্স প্রায় শূন্য, সুনীল পুরো সাম্রাজ্যটায় থাবা বসাতে শুরু করেছে। বিউটি কুইন সুইটিকে তো বেহাত হতে দেওয়া যায় না। অমন গনগনে আগুন সরুলে তো আর সামলাতে পারবে না! শরীরে তাকত আর টাকার গরম দুটোই যে চাই।

সুইটির এই 'ফ্রেইলটি'র সুযোগটি কন্তুরী হেলায় হারাতে চাইল না।

"সুইটি, তুম সুনীল কো বহত পেয়ার করতে হো। ডাঙ্ক হি লাভ ইউ টু?"

"জি," খুবই গাঢ়স্বরে সংক্ষিপ্ত উত্তরটি দিয়েই সুইটি মেঝের দিকে তাকায়। হয়তো সুনীলের মুখটা মনে পড়তেই চোখের জল বাঁধনহীন। হয়তো ভয়, ওরই মতো সুনীলও এবার মজবুত ফাঁসে আটকে যাবে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যাবে।

"শোনো সুইটি, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করো, রুম্পার যদি কোনও ক্ষতি না হয়, তোমার আর সুনীলের ব্যাপারটা আমরা..."

কোনও সেল ফোন সুরেলা ঝংকার তুলেছে। প্রাথমিক অস্থিরতা কাটিয়ে সকলেই দেখল ওদের কারও রিং টোন এটা নয়। 'তেরে মস্ত মস্ত দো নয়ন মেরে দিল কা লে গয়ে চ্যয়ন।'

কন্তুরী ঝুঁকে পড়ে দেখল সুইটির সেলফোনের স্ক্রিনে একটা নাম ভেসে উঠেছে। 'দবং' ছবির হিট গানটি বেজেই চলেছে। টেবিল থেকে সেলটি তুলে নিয়ে সুইটির হাতে দিয়ে বলল, "কার কল?" সেই ফাঁকে টেবিলের তিনটে ফোনেরই রিসিভার নামিয়ে রাখে সাবধানতার অঙ্গ হিসেবে। প্রত্যেকে মোবাইলের সুইচ অফও করে।

"বিল্লু," স্ক্রিনে চোখ বুলিয়ে সুইটি বলে।

শতরূপার চোয়াল শক্ত হয়, "কলটা রিসিভ করো, স্পিক নর্মাল। ওরা এখন কোথায় জেনে নাও। এর পর কোথায় যাবে? রুম্পা কেমন আছে? ওর যেন ক্ষতি না হয়। সব জানো। স্পিকার অন করো।"

বিপাশা সাবধান করে দেয়, "কথাবার্তার মধ্যে কোনও ইঙ্গিত দিবি না। তাহলে টারজেনের সঙ্গে-সঙ্গে তোকেও..."

বুদ্ধিমতী সুইটি বুঝে গিয়েছে, কিডন্যাপিংয়ের চালটা ভেস্তেই গেল। টারজেনের কোনও আশাই আর নেই। উল্টে মেয়েটার কোনও ক্ষতি হয়ে গেলে সুইটিকেও কমপক্ষে ১০-১০টা বছর ঘানি টানতে হবে। সুইচ অন করল। কন্তুরী ইশারায় সকলকে জানাল, 'চুপ।'

"হাঁ বিল্লু বোল," বলেই সুইটি স্পিকারের বোতাম পুশ করে।

"ইতনি দের কিউঁ?"

"ফোন পার্স মে থা। বোল, অভি কহাঁ পে হো?"

"ইধারসে বর্ধমান। শর্মা, কিতনি কিলোমিটার দেখা? ২৬? সুইটি, ২৬। আধে ঘন্টে মে বর্ধমান আ যায়েগা, সব ঠিকঠাক হ্যায় তো?"

"বিলকুল। অভি তক কুছ পতা নহি চলা। শুন, লড়কি কা হালত ক্যায়সি হ্যায়?"

"সহি সলামত। অভি শো রহা হ্যায়।"

এইসময় সুইটির ফোনে অন্য কোনও কল আসার সংকেত হতেই সে বিল্লুকে বলে, "শুন বিল্লু, লগতা হ্যায় সুনীল ট্রাই কর রহা হ্যায়। আজ তো উধারই, সালানপুরমে ঠ্যায়রনা হ্যায়।

"বস কা অর্ডার তো অ্যায়সি হ্যায়। দেখ, সুনীল প্রোগ্রাম পালট দেতে কি নহি। সুইটি, বাদ মে জরুর ফোন করনা।"

সুইটির ফোন কেটে গেল। বিপাশা ভাল করে দেখে নিল, ঠিকমতো অফ হয়েছে কি না। নইলে সবটাই ভেস্তে যাওয়ার ভয়।

কন্তুরী ফের ঘড়ি দেখল। প্রায় তিনটে বাজে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডা মাথায় বিষয়টি নিয়ে একান্তে ভাবার সুযোগ হচ্ছে না। আপাতত মেয়েটার একটা খবর যা হোক পাওয়া গেল। এ-ও জানা গেল যে, ওরা আজ সালানপুরে কোনও ঠেকে থাকছে। সেটা ঠিক কোথায়, সুইটি মিসলিড করবে না বলেই মনে হয়।

যদি সত্যি-সত্যি সুনীল সিংহ সুইটিকে ফোন করে, সেই আশায় সকলেই এখনও নীরব। ল্যান্ডলাইন এবং হট লাইনের রিসিভারগুলো কন্তুরী ইচ্ছে করেই ক্রেডেলে তোলেনি। এখন ওদের অবস্থা রোপ ওয়াকের মতো। একটু বেচাল হলেই ধপাস। রুম্পারও জীবন সংশয় প্রকট হবে।

কন্তুরী তা হলে কী করবে? কোনও দ্রুতগামী ট্রেন ধরে আসানসোল চলে যাবে? জায়গাটা ওর নখদর্পণে। আইপিএস হওয়ার পর থার্ড পোস্টিং ছিল আসানসোল, অ্যাক্ষ অ্যাডিশনাল এসপি। ফের ঘড়ি দেখছে। ইচ্ছে করলে এখনও হাওড়ার রাজধানী ধরতে পারে সে। ঘন্টাখানেক সময় আছে। ফার্স্ট স্টপেজ দুর্গাপুরে। আসানসোলে।... না। কোথাও ভুল হচ্ছে। হাওড়ার রাজধানী এক্কেবারে ধানবাদেই প্রথম থামে, যদ্দুর মনে হচ্ছে। ধানবাদ থেকে আবার সালানপুর ফেরা... অবাস্তব চিন্তা। শিয়ালদার রাজধানী অবশ্য দুর্গাপুর এবং

আসানসোলে থামে। চারটে পঁয়তিরিশে শিয়ালদা ছাড়ে। সময় আছে। কিন্তু ফোর্স নিয়ে তো ট্রেনে... জানাজানি হওয়ার ভয়। হাজারো কৈফিয়ত দাও। আবার যদি আসানসোলের অ্যাডিশনাল এসপির সাহায্য চাওয়া যায়, সালানপুরের ওসি নির্ঘাৎ খবরটা পেয়ে যাবে। সুইটি যা বলল, সুনীলের সঙ্গে পুলিশমহলের ভাল লেনদেনের বিনিময়েই রফা হয়েছে। অতএব কস্তুরীর একাই নিজস্ব ফোর্স নিয়ে, ওর সাদা স্বরপিওতে করেই যাওয়া উচিত। কিন্তু এখনও একটা বড় সমস্যা মাথার উপর ঝুলছে। বড়সাহেব। কমিশনার সাহেবকে এবার বোধ হয় সব জানানো উচিত। এত বড় একটা রেডে বেরলে, তাও আবার কলকাতা থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে, সিপিকে তো আর অন্ধকারে রাখা যাবে না!

সুইটির আর ফোন আসছে না দেখে কস্তুরী প্রথমেই হট লাইনের রিসিভার ক্রেডেলে রাখল। কারণ প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট সবক'টি ল্যান্ডলাইনকে ডেড করে রাখা হয়েছে। ডিসি-ডিডির ফোন এতক্ষণ স্তব্ধ থাকা মানে তোলপাড় পড়ে যাওয়ার কথা। হট লাইনের রিসিভারটি যেইমাত্র স্বস্থানে রেখেছে, সকলকে চমকে দিয়ে বড় ভীমরুলের মতো গম্ভীর আওয়াজ গোঁ-গোঁ করে চলল কস্তুরীর মোবাইল।

নিশ্চয়ই সিপি। ঝুঁকে স্ক্রিনে দেখল, যা ভেবেছে তাই! চ্যাটার্জিসাহেব। সিপি তপোব্রত চট্টোপাধ্যায়। কালবিলম্ব না করে রিসিভার তুলল। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিপাশার হাতে থাকা সুইটির সেল দবং স্পেশ্যাল পরিবেশন করে চলল, তেরে মস্ত মস্ত দো নয়ন, মেরে দিল কা লে গয়ে চ্যয়ন...

নির্ঘাৎ সুনীল সিংহ।

"স্যার, এক মিনিট হোল্ড করুন প্লিজ। নাকি, আমি একটু পরেই করব।"

"তাই করো। টপ আরজেন্ট।"

ফের হটলাইনের রিসিভার নামিয়ে সুইটিকে ইঙ্গিত করল, "কলটা ধরো, এই কি সুনীল?" কস্তুরী ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে।

সুইটি ঘাড় দুলিয়ে জানাল, "হ্যাঁ," সুইচ অন করতেই বেশ ভরাট কণ্ঠস্বর। স্পিকারে ছিলই।

"হ্যালো," সুইটির হাবেভাবে বেশ জড়তা। ঠিক যেন স্বাভাবিক হতে পারছে না। এমনটা হলে তো মুশকিল। ধূর্ত সুনীল কিছু ফাউল স্মেল আন্দাজ করে নেবে।

বিপাশা ওকে ইশারায় স্বাভাবিক হতে বলে। চোখ পাকিয়ে ভয়ও দেখায়।

"হ্যালো, সুনীল?"

"আরে লায়লি, ডার্লিং। অ্যায়সা পুকার কিউঁ? অভি তো টারজেন তুমহারা পাশ নহি। পেয়ার সে একবার পুকারো, কাম অন, আরে সুইটি শরমাতি কিউঁ? পহলে বোলো তো অভি তুম কিধর হো?"

"এক মল মে।"

"আশপাশ আদমি হ্যায়?"

"নহি, থোড়ি দূর মে।"

"তব শরমাতি কিউঁ? পাপ্পি দো। এক, দো, তিন..."

বিপাশার ভয়েই হোক আর নিজের শেষরক্ষার তাগিদেই হোক, সুইটি বেশ শব্দ করেই তার মজনুকে ইথার তরঙ্গ বাহিত চুম্বন পাঠিয়ে দিল। সুইটি যে ভালমতোই সহযোগিতা করছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না। ওদের কথোপকথন থেকে একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল যে, সুনীল সালানপুর থেকেই কলটা করেছে। দিশেরগড়ের কাছেই একটি বাংলো বাড়িতেই সে রয়েছে। বিল্লুও সেখানেই আসবে রুম্পাকে নিয়ে। যতক্ষণ না ওরা পৌঁছচ্ছে, জজসাহেবের কাছে ফোন করবে না। গাড়ি দিশেরগড় এসে গেলেই সুনীল ফের সুইটিকে ফোন করবে। এ-ও জানা গেল, ওরা কলকাতার রাস্তায় ইচ্ছে করেই অলিতে-গলিতে ঘুরপাক খেয়েছে পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে। যেখানে বর্ধমান এক-দেড় ঘন্টার বেশি লাগে না, সেখানে এত দেরির কারণ মেমারির কিছুটা আগে একটা লরি পালটি খেয়েছে। সেই জ্যাম জটের জন্য গাড়ির স্পিড স্লো।

সুইটিকে বিপাশার দায়িত্বে পাঠিয়ে, ওর সেল ফোনটিও তার হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল। এ-ও বলল, সুইটিকে ভাল করে সার্চ করে যেন দেখে নেয় দ্বিতীয় কোনও সেল ফোন ওর কাছে আছে কি না! অর্ক এবং দেবদাসকে বলল, তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিতে। লেডি কনস্টেবলদের পই-পই করে সাবধান করে দিল সুইটির ফোন বাজলেই বিপাশার হাতে দেবে। অন্যথা না হয়। একথা বলার কারণ বিপাশা কোনও কাজে কাছাকাছি গেলে এই নির্দেশ যেন সবসময় মনে থাকে।

"আর বিপাশা..."

"বলুন, ম্যাডাম।"

"সুইটির ফোন এলে কীভাবে হ্যান্ডল করবে তোমাকে আলাদা করে বোঝাতে হবে না, আশা করি। যাও, সুইটিকে সেলে নিয়ে যাও।"

লেডি কনস্টেবলরা সুইটিকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই কস্তুরী বিপাশাকে খুব সিরিয়াস হয়ে নতস্বরে বলে, "মনে রাখবে, এই মোবাইলে ও কথা বলার সময় তোমাদেরগুলো যেন অফ থাকে। কারও হাঁক-ডাক যেন শোনা না যায়! একটু বেচাল হলেই ওই বাচ্চা মেয়েটির বাঁচার আশা ক্ষীণ হয়ে পড়বে। দ্যাখো, প্রয়োজনে আজ রাত জাগতেও হতে পারে।"

বিপাশা আশ্বস্ত করে, "ম্যাডাম এটাই তো আমাদের চাকরির প্রধান শর্ত। সময়ের কোনও হিসেব করা চলবে না। বুঝতেই পারছি, আপনারও যা ধকল যাবে। কখন যে টেনশন মুক্ত হবেন, কে জানে? এখন কিছু মুখে দিন আর সময় পাবেন না।"

ঠিকই বলেছে। ওদিকে বড় সাহেব আবার কী বলেন দেখি।

হটলাইন তুলে সিপি তপোব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে কল থ্রো করে নিল সিপিই সুইচ পুশ করে। বার দুয়েক বুঁ-বুঁ শব্দ হতেই চ্যাটার্জিদা'র ব্যারিটোন ভয়েস, "কী ব্যাপার ফোনে পাচ্ছি না কেন? কিছুক্ষণ আগে দেখলাম কোনও রিং হচ্ছে না। সাড়া শব্দই নেই। সেন্ট্রিকে পাঠালাম তোমার চেম্বারে। এসে বলল, কী নাকি আরজেন্ট কনফিডেনশিয়াল মিটিং চলছে, তোমার পিএ বলল। পরের বার করে তো শুনলাম, 'মস্ত মস্ত দো নয়ন' বাজছে।"

ওঁর একটানা কথার ফাঁকে কস্তুরী ভাবছিল, মুডটা ঠিক কীরকম হতে পারে? বিদ্যাস? নাকি প্রিলিউড টু চ্যাসটাইসমেন্ট? আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তিরস্কার করার স্টাইলটা বড় অদ্ভুত। প্রথমটা বুঝতেই দেবেন না গুগলি না ফুলটস। তবে দ্বরয়ের গানটার কথা দু'বারই উল্লেখ করলেন। মনে তো হয়, নাথিং সিরিয়াস। কিন্তু, সেকশন ওয়াইয়ের, মানে কড়েয়া থানার সেনসেশনাল গ্যাং রেপ কেসটা নিয়ে নাকি উপর মহলে বেশ চাপানউতোর চলছে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, সি এমের খুবই ঘনিষ্ঠ কোনও তরুণ মন্ত্রীর এক ভাগ্নে এই রেপ কেসের আসামি। আরও বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার মন্ত্রীর আত্মীয়টি আবার এক ডাকসাইটে সুন্দরী, সিনেমার উঠতি নায়িকার বাগদত্তা। একমাসের মধ্যেই বিয়ের কথা ছিল। সেই গ্যাং রেপটির ব্যাপারে উনি কিছু পরামর্শ দেবেন নাকি? ভেরি, ভেরি টাইট কেস। যত চাপই আসুক, সে তার স্ট্যান্ড পয়েন্টে জাস্ট সলিড রক। নট নড়ন-চড়ন।

"স্যার কি একটু ফ্রি আছেন?"

"তোমার জন্য সবসময়ই ফ্রি। জানো তো শতরূপা, তোমার একটা কোড নেম লালবাজারে চালু হয়েছে।"

"জানি স্যার।"

"কী জানো?"

কস্তুরী প্রমাদ গোনে। এত সিনিয়র অফিসার যখন জুনিয়রের প্রশস্তি শুরু করে সম্পূর্ণ সূত্রহীনভাবে, তখন অবশ্যই চিন্তার কারণ থাকে।

MAFIA

মাংসের টুকরো কাকের ঠোঁট থেকে খসিয়ে নিতে শেয়ালকে ৺টুকারিতারই আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ক্ষমতাবানের মুখে দুর্বলের প্রতি প্রশংসাবাক্যতে শতরূপার বড় অনীহা। নিজের মুখেও ওর কোড নেমটি নিয়ে আর এগোতে চাইল না। তা ছাড়া এখন গোঁফখেজুরে গল্পের সময়ও নেই।

"ছাড়ুন তো স্যার ওসব ফালতু কথা।"

"আরে, শোনো, শোনো। নামকরণটি শুনে আমি তো ভেবে দেখেছি, ঠিকই তো। কন্তুরীর সঙ্গে জেনিফার লোপেজের কোথায় একটা মিল রয়েছে। তোমার হাঁটাচলা..."

"স্যার, উনি আমার খুবই ফেভারিট আর্টিস্ট, সেই অ্যানাকোন্ডার সময়ে থেকে। স্যার, ১০ মিনিটের মধ্যেই আসছি। জাস্ট কিছু মুখে দিয়েই।"

"ঠিক আছে আর হ্যাঁ শোনো। তোমার নেমপ্লেটে এখনও ডেপুটি কমিশনার লেখা রয়েছে, আমার পিএ বলল। কবে সার্কুলার পাঠিয়ে দিয়েছি ডিসি ডিডি ওয়ান পদটা অবলুপ্ত হল। ডিসি ডিডি স্পেশ্যাল যেমন ছিল, থাকছে। কেবল তোমার ক্ষেত্রে পদটির উন্নয়ন ঘটিয়ে জয়েন্ট সিপি ক্রাইম করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে নোটিফিকেশনও হয়ে গিয়েছে তো।"

কন্তুরী এবার সত্যি-সত্যি বিপদের গন্ধ পেল। ওর পদমর্যাদার আপলিফ্টমেন্ট এবং ডিসি-ডিডি ওয়ান পদের অবলুপ্তি সপ্তাহ খানেক আগের পুরনো ব্যাপার। তবে এটা ঠিক, ওর পিতলের নেমপ্লেটটিতে এই সংযোজন এবং পরিমার্জন এখনও ঘটেনি। কারণ অ্যাকাউন্টস সেকশন জয়েন্ট সিপি ক্রাইম পদের জন্য ব্র্যান্ড নিউ প্লেট স্যাংশন করেছে। আজ-কালের মধ্যেই বসে যাবে। কন্তুরীর চেম্বার থেকে করিডর দিয়ে ডাইনে হেঁটে গেলে কমিশনারসাহেবের চেম্বার। ডেকেছেন যখন, যেতেই হবে। রুপ্পার মরণ-বাঁচনের চিন্তায় সে এখন টালমাটাল। প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। গড়িয়ে যাচ্ছে সময়। এইরকম একটা জটিল সময়ে এখন তার কেরিয়ার নিয়ে ভাবার অবকাশ কোথায়? ষড়যন্ত্র তার নিজস্ব কুৎসিত অনুষঙ্গ নিয়ে যেমন দানা বাঁধছে, বাঁধুক। এসবই পার্ট অফ দ্য গেম। সে কখনও ঝাঁপা নোয়ায়নি, নোয়াবেও না। রাজরোষের ঝাপটা এই প্রথম নয়। ওসব সয়ে গিয়েছে। অকিঞ্চিৎকর আর দূরবর্তী, এইরকম পোস্টিং দু'-দুবার খাঁড়া হয়ে নেমে এসেছে। কুছ পরোয়া নহি। ঘাড় সোজা রেখে তল্পিতল্পা বেঁধে সটান জয়েন করেছে জয়েনিং টাইমের মধ্যেই। এই যে কড়েয়া থানার কেসটা। ওর কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। পৌলমীর মাস রেপিং-এর সঙ্গে জড়িত চারজন কানপ্রিটকেই লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে ঢোকাতে পেরেছে, ঘটনার ১৪ দিনের মাথায়। মিডিয়া ওকে মাথায় তুলে নাচছে। সে বরাবরই প্রচার বিমুখ। লো-প্রোফাইলেই থাকতে চায়। তার আসল লক্ষ্য, মূল অপরাধীকে খুঁজে বের করে তদন্তটিকে লিকপ্রুফ করা। 'চার্জশিট' বা 'চালানে' যেন ফাঁক-ফোকর না থাকে। দু'-একজন সাক্ষী ভেঙে গেলেও রিয়েল কালপ্রিটরা যাতে অ্যাকুইটেড না হয়। পুলিশ সিস্টেমের উপর মানুষের আস্থা যেন অটুট থাকে।

একটা ঘোঁট যে পাকছে তার বিরুদ্ধে, এটা ডিসি ডিডি টু ১০-১২দিন আগেই ইঙ্গিত দিয়েছে। মূল আসামি আলতাফ হোসেনকে ইনদওর থেকে গ্রেফতার করার পর থেকেই একটা পাওয়ারফুল চক্র সক্রিয়। তলে-তলে কন্তুরীকে এই পদ থেকে হটিয়ে দেওয়ার তুমুল তোড়জোড়ও শুরু হয়েছে। ডিসি ডিডি বা জয়েন্ট সিপি ক্রাইমই এই জঘন্য রেপ কেসটির ওভার অল দায়িত্বে। কন্তুরী যতক্ষণ এই দায়িত্বে থাকবে, তদন্তে ছিদ্র সৃষ্টি করা যাবে না। কারা-কারা সিএমের কানভারী করতে উঠে পড়ে লেগেছে, কোন ক্ষমতাবান মন্ত্রী এই কেসটাতে অত্যন্ত উৎসাহী, এসব খবর বিভিন্ন সূত্র মারফত ছুঁইয়ে ওর কাছে আসছে। লিডিং পত্রিকাগুলোর জার্নালিস্টরা ওকে খুবই পছন্দ করে। একেবারে হাঁড়ির খবর পৌঁছে যায় ঘোঁট পাকানোর প্রত্যেক পর্যায়ে। এখন সেটাই ভেরিফাই করতে হবে কৌশলে। সিপি এত ঘন-ঘন ওর খোঁজ করছেন কেন?

আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি যাচাই করা তার আশু কর্তব্য, তা হল পৌলমী শতপথীর উপর কি সত্যি-সত্যিই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এফ আই আর উইদড্র করার জন্য? এ-ও শোনা যাচ্ছে ওর ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টে যেহেতু রেপ কনফার্মড, ফের নাকি পৌলমীকে বোর্ড অব ডক্টরস দিয়ে এগজামিন করা হবে। অবশ্যই কেসটার মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিতে।

১৫-২০ দিন আগেও পরিস্থিতি খারাপ ছিল না। ওর কর্মপদ্ধতিতে কারও হস্তক্ষেপ ঘটেনি। নিজের মর্জিমতো টিম সাজিয়ে তদন্তে এগিয়েছে। খুব কম ক্ষেত্রেই এফ আর টি মানে তদন্তের রেজ্যাল্ট জিরো হয়েছে। কলকাতার ৬৫টি থানা এলাকায় রটেই গিয়েছে কোনও রংবাজিতেই আর পতাকার রং কাজ করবে না। জয়েন্ট সিপি ক্রাইম নাকি বড় ত্যাঁদড় মহিলা!

হাতঘড়ি দেখে আঁতকে ওঠে। ইস! ঘড়ির কাঁটা যেন ছুটছে। মেয়েটা কেমন আছে? ওরা কি বর্ধমান পেরিয়ে গেল? সিপি সাহেবকে ব্যাপারটি জানিয়ে তাড়াতাড়ি বিদেয় নিতে হবে। একটা বাচ্চার লাইফ অ্যান্ড ডেথের প্রশ্ন।

সেন্ট্রি দরজা খুলে দিতেই কন্তুরী ঢুকে যায়। প্রথা অনুযায়ী স্যালুট ঠুকতেই সিপি, চ্যাটার্জিসাহেব বেশ গাঢ় অভ্যর্থনা জানায়।

"আরে, বসো বসো।"

"কিছু বলবেন বলছিলেন..."

"এই তোমার এক রোগ, কন্তুরী। বড্ড ব্যস্ততা দেখাও।"

"বিশ্বাস করুন, একটি ক্লাস সেভেনের মেয়ে কিডন্যাপ্‌ড হয়েছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। তার নিরাপত্তার ব্যাপারটি নিয়েই... এখনই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। কিছু মুখে দেওয়ারও সময় পাইনি। স্যার, ব্যস্ততা দেখানো আমার অভিনয় নয়। কাজেই ব্যস্ত থাকি।"

"তাহলে তো তোমাকে একটি হালকা কাজের পোস্টিং-এই পাঠানো দরকার," তপোব্রত চট্টোপাধ্যায় বেশ চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাগুলো ছুড়ে দেয়।

কন্তুরীও কম টেটিয়া নয়। মুখে হাসির রেশ টেনে বলে, "ওটা আপনার এবং উপরমহলের একচেটিয়া ব্যাপার। বদলিকে ভয় পাই না, স্যার। এখন কী জন্য ডেকেছেন, বলুন।"

সিপি তপোব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ইগোতে জোর ধাক্কা লাগে। এমনিতে খুবই দাম্ভিক, আবার কাজ হাসিল করার সময় বেশ হিউমারও করেন। এই মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছে কন্তুরীর অহংকারটা ত্রিমুখী। ভেরি গ্রেসফুল, তাই রূপের দম্ভ, নিজের কাজটা ভীষণ ভাল বোঝে, সবজান্তার বড়াই আর সততা নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি। দম্ভের এই ত্রিফলা উপাদানে ও যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ও জানেই না ওর পায়ের তলার মাটি ঝুরঝুরে হয়ে যাচ্ছে। বিরক্তি যথাসাধ্য চেপে সিপি বলল, "সিএম সেক্রেটারিয়েট থেকে ফোন এসেছিল।"

কন্তুরী চুপচাপ শোনে। হয়তো পরের কথাগুলো তার বদলি সংক্রান্ত। তাই একটু খেলিয়ে-খেলিয়ে ছাড়ছেন। যেখানে পাঠাবে, সে চলে যাবে। তবে তার আগে সেকশন 'ওয়াই', মানে কড়েয়া থানার মাস রেপিং-এর কেসটার টুঁটি এমনভাবে টিপে দিয়ে যাবে যে, মন্ত্রী মহোদয় তার ভাগ্নেকে স্বখাত সলিল থেকে উদ্ধার করতে পারবে না, শত চেষ্টা করেও।

সিপি বাকি কথাটুকু শেষ করে, "ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"

"তা আমাকে সরাসরি করলেই তো পারতেন। যাক গে, কী ব্যাপারে কিছু বলেছেন?"

"সিএম স্যার আজ পাঁচটাতে একটা প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। উনি চান, তুমি এই প্রেসমিটে উপস্থিত থাকও। তোমাকে পাশে বসিয়েই মিডিয়াকে সাক্ষাৎকারটা দেবেন।"

কন্তুরী টের পেল চালটা বেশ জব্বর চালই চেলেছেন মহামান্যবর। রাজসূয় যজ্ঞটি হবে মিডিয়ার সামনে, বহুল প্রচারের আয়োজন।

কোনও খামতি নেই। বকমবাজি করবেন সিএম নিজে ওর অননুকরণীয় ভঙ্গিমায়। কস্তুরী সেখানে ঠুঁটো জগন্নাথ। সিএম স্যারের কোনও বাক্যের প্রতিবাদ করা যাবে না।

কস্তুরী, পৌলোমী শতপথীর কেসটি তদন্তের সময়েই জেনে গিয়েছে, এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ভাগ্নে ওই মূল আসামি আলতাফ হোসেন। সেই মন্ত্রী কড়েয়া থানায় দলবল নিয়ে গিয়ে আইওকে ধমকে ধামকে এসেছে। আই ও ওইদিনই কস্তুরীর কাছে দরবার করেছে, "ম্যাডাম এই কেসটি থেকে অব্যাহতি দিন। আমার লাইফ রিস্ক।"

যুদ্ধটা যদি রাজার সঙ্গেই করতে হয় প্রতিনিয়ত, একজন কর্মচারী আর কতক্ষণ পারে যুঝতে। এখন, বদলি করার অজুহাতে যদি ওকে পৌলমীর মামলাটির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো পুলিশ কমীদের মরালটাই ভেঙে যাবে। কস্তুরীর ছত্রছায়ায় সকলে নির্ভীকভাবে তদন্তে এগচ্ছে। ওর আচমকা বদলিতে ব্যাপারটি দাঁড়াবে, ছত্রভঙ্গ তুরঙ্গম।

আজই বিকেল পাঁচটায় প্রেস মিট। কস্তুরী বেশ ফাঁপড়ে পড়ে যায়। ওকে তো বেরিয়ে পড়তে হবে এখনই। নইলে মেয়েটিকে যে বাঁচানো যাবে না। বেশ শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলে, "স্যার, আজ তো কিছুতেই সম্ভব নয়। বিকেল পাঁচটা মানে তখন আমি হয়তো মাফিয়াদের ডেনে।"

"তার মানে?" তপোব্রত চট্টোপাধ্যায়কে বেশ বিরক্ত মনে হচ্ছে। "একটু আগেই তো বললাম স্যার। একটি ১০-১২ বছরের মেয়েকে

বদলি করার অজুহাতে যদি ওকে পৌলমীর মামলাটির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো পুলিশ কমীদের মরালটাই ভেঙে যাবে!

মাফিয়ারা কিডন্যাপ করেছে। ওদের ট্র্যাক করাও গিয়েছে। আমার দেরি মানে বাচ্চাটির প্রাণসংশয়।"

"তোমার টিমের অফিসারদের পাঠিয়ে দাও। ওরা যা ভাল বোঝে, করুক।"

"তা হয় না, স্যার। আমার থাকাটা ভীষণ জরুরি।"

"তুমি থাকলে বাচ্চাটা বাঁচবে! তুমি কি ভগবান? এদিকে সিএমকে কী বলব?"

"যা বললাম, তাই বুঝিয়ে বলুন। ওঁর আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য। কিন্তু তার আগে আমার কর্তব্য, একটি শিশুর প্রাণ।"

সিপির ফরসা মুখমণ্ডলে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ছে, বাড়ছে। একসময় একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ক্রোধে ফেটে পড়লেন।

"হোয়াট আ অডাসিটি! আমি এক্ষুনি সিএমও অফিসে তোমার ভিউ জানিয়ে দিচ্ছি। বাকিটা তুমি সামলাও! দেখি, কোনটা আগে, কর্তব্য, না কর্তার আদেশ!"

কস্তুরীর সেল সাড়া দিচ্ছে। স্ক্রিনে জজ সমরজিতের নাম্বার। সঙ্গে-সঙ্গে রিসিভ করে।

"নমস্কার স্যার। চিন্তা করবেন না। ট্র্যাক করা গিয়েছে। এখনই বেরিয়ে পড়ছি। যেমন, যেমনটি কথা হয়েছে, সেইভাবেই 'ফোন কল' ডিল করবেন। মিসেস ফিরে এসেছেন? আচ্ছা। স্যার ...এখন কমিশনার সাহেবের চেম্বারে। একটু জরুরি কাজ আছে। ওটা সেরেই বেরচ্ছি। মনের জোর রাখুন। দেব? দেব? কমিশনারসাহেব কাছেই রয়েছেন।"

বলেই কস্তুরী ফোনের মুখ চেপে কলারের পরিচয় দেয়। দু'চার কথায় ওঁর চরম বিপদের বার্তাটুকুও জানায়।

তপোব্রত চট্টোপাধ্যায় সসম্ভ্রমে আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়। কারণ সমরজিৎ লাহিড়িকে সে হাড়ে-হাড়ে চেনে। উত্তরবঙ্গে তপোব্রত তখন একটি জেলার এসপি। একটি থানার ধড়িবাজ ওসির বিরুদ্ধে জেলা জজের বেশ 'কস্টিক কমেন্ট' এস পি-র কাছে পাঠিয়ে তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। কারণ ওই ওসিটি ছিল আসলে এক লম্পট। ধূপগুড়ির এক হতভাগ্য তরুণী প্রভাবশালী পঞ্চায়েত প্রধানের হাতে ধর্ষিতা হয়ে সেই সঙ্কেতেই থানায় যায় এফআইআর করতে। স্বামী পরিত্যক্তা বধূটি ফের ওই ওসির লালসার শিকার হয়। তার এফআইআর তো নেওয়া হলই না, উল্টে তাকে শাসানো হয় গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। সেই হতভাগ্য মেয়েটির এক প্রতিবেশী জেলা জজের স্টেনো। তার সঙ্গে সে সোজা কোর্টে এসে জজ সমরজিতের সাক্ষাৎ পায়। সব কথা শুনে সমরজিৎ লাহিড়ি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তার অফিস থেকে লিখিত এজাহার ড্রাফ্‌ট করে মেয়েটিকে তার অফিসের গাড়িতে থানায় পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে সেই মহিলা ও স্টেনোও যায়।

তারপর শুরু হয় আসল খেলা। সেই দিনই পঞ্চায়েত প্রধান গ্রেফতার হল। বলা বাহুল্য, জেলা জজের নির্দেশেই ছিল যেন থানার সেকেন্ড অফিসার কেসটির তদন্ত করে।

জজ সমরজিতের নির্দেশে এসডিপিও শুরু করলেন দ্বিতীয় ধর্ষণের তদন্ত সেই কীর্তিমান ওসির বিরুদ্ধে। কিন্তু এসপি তপোব্রত চট্টোপাধ্যায়ের গোঁয়ার্তুমিতে তদন্ত আর এগয় না। এসপি যেন বুক দিয়ে আগলে রাখতে চায় গুণধর ওসিকে। শুরু হয়ে গেল 'জুডিশিয়ারি ভার্সাস পুলিশ' ঠান্ডা লড়াই। শেষমেশ সমরজিৎ কনটেম্পট প্রসিডিং স্টার্ট করে কপি পাঠিয়ে দিলেন উচ্চ পর্যায়ে। ব্যস! খবরটা কানে যেতেই এসপি সুড়সুড় করে হাজির জেলাজজের চেম্বারে। সমরজিতের সে কী রণং দেহি মূর্তি। নো, নট ইন মাই চেম্বার। মিট মি ইন মাই কোর্টরুম অ্যাট টেন থার্টি শার্প। সেই লম্পট ওসি ১০ বছরের ঘানি টানছে এখনও। কারণ তার আপিলও ডিসমিস্‌ড।

সেই সমরজিৎ লাহিড়ির কল কস্তুরীকে। কস্তুরী যেইমাত্র সেলটি সিপির হাতে দিল, তার মনে হল যেন একটা 'ফায়ার বল' ভুলক্রমে লুফে নিয়েছে। কিন্তু মজার কথা, সমরজিৎ লাহিড়ি অত্যন্ত মার্জিত এবং সংযত স্বরেই কথা বললেন। জানালেন তার চরম বিপদের বার্তা। বড়জোর মিনিটখানেক, তারপরেই কথা শেষ। এই মুহূর্তে বলার কী-ই বা থাকতে পারে? তপোব্রত চট্টোপাধ্যায়ও তাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিল। এ-ও বলল, "কস্তুরী যখন টেকআপ করেছেন নাথিং টু ওরি।"

কমিশনারের কাছ থেকে বিদায় নিয়েই কস্তুরী দ্রুতপায়ে নিজের চেম্বারে ঢোকে। অর্ক-দেবদাস ছাড়াও হেস্টিংস থানার ওসি মানস মজুমদার রয়েছে। সঙ্গে একজন কেউ।

কস্তুরীর মনে পড়ে গেল একটু আগেই মানস বলেছিল, 'স্কুলের খাতা, তপন দাস।'

মানসই আলাপ করিয়ে দিল। কস্তুরী বসতে বলে কফির অর্ডার দিল। তারপর রুপার খাতাটি হাতে নিয়ে দেখতে শুরু করে। মলাটের ব্রাউন পেপারের উপর লাল স্কেচপেন দিয়ে লেখা, 'কিডন্যাপ্‌ড'। লাল কালি বুলিয়ে বুলিয়ে অক্ষরগুলোকে বেশ স্বাস্থ্যবান করেছে। বাহ। মেয়েটা এই এতটুকু বয়সে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে পড়েও ভেবে-ভেবে একটা কার্যকরী বুদ্ধি তো বাতলেছে।

ভিতরের পাতাতেও একইভাবে লেখা 'কিডন্যাপ্‌ড'। সংস্কৃত বিষয়ের হোমওয়ার্কের খাতা, কস্তুরী খাতাটি রাখতে যাচ্ছিল। তা দেখেই তপন দাস বলল, "ম্যাডাম, আরও আছে। এই দেখুন।"

বলেই সে খাতাটির সাদা পাতায় গেল। দেখা গেল সেখানে বেশ গুছিয়ে লিখেছে 'রুম্পা কিডন্যাপ্‌ড', 'ব্ল্যাক স্করপিও'।
কস্তুরীর চোখ বিস্ফারিত, ইস! মেয়েটা কত সতর্ক হয়ে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে খাতাটি ফেলতে পেরেছে। জানালা নিশ্চয়ই সেন্ট্রালি লক করা। নইলে তো পুলিশ দেখেই সে চিৎকার করত।
"দ্যাখো অর্ক, এই ভদ্রলোক কিন্তু পুলিশের লোক নন, খাতাটি দেখে কুড়িয়ে নিয়ে উনি পড়েছেন। 'কিডন্যাপ্‌ড' লেখাটি দেখেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে, ছুটে গিয়েছেন ট্রাফিক ডিউটিরত পুলিশ এবং মোবাইল সার্জেন্টের কাছে। ওরা তপনবাবুকে স্রেফ হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছে, "ছাড়ুন তো মশাই। কেউ মশকরা করেছে। কী তপনবাবু, তাই তো?"
"হ্যাঁ, ম্যাডাম। এমনকী, ধমকও দিয়েছে ওদের বিরক্ত করার জন্য। আমি তবুও পীড়াপীড়ি করেছি, দেখুন। এই লেখাটা কিন্তু কোনও বয়স্ক মানুষের লেখা নয়। নিশ্চয়ই ওই রুম্পা মেয়েটি লিখেছে। প্লিজ, সেকেন্ড হুগলি ব্রিজের টোল প্লাজায় ফোন করে বলুন একটা ব্ল্যাক স্করপিও দেখলে যেন আটকায়। তখন বাইকে বসা সার্জেন্ট আমাকে ঠাট্টা করে বলল, 'এবার কলকাতা পুলিশের পরীক্ষায় বসে পড়ুন। খুব গোয়েন্দা গল্প পড়া হয় বুঝি।"
"ম্যাডাম, তবুও হাল ছাড়িনি। বলেছি, অন্ততপক্ষে ওই স্কুলে ফোন করুন। স্টিকারের নাম এবং ফোন নাম্বার রয়েছে। আপনারা পুলিশের লোক, কত ক্ষমতা। দেখুন না করে।"
"তারপর?" কস্তুরীর চোয়াল শক্ত হচ্ছে।
"তখন একজন লম্বা মতো সার্জেন, সানগ্লাস পরা, বেশ ফরসা আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বলল, ফুটুন তো মশাই। দেখছেন না, এটা খুব বিজি ক্রসিং। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে আপনি সামলাবেন?"
"কী বলব ম্যাডাম! শুধু মনে হচ্ছিল, মূল্যবান সময়টা বেরিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার কী হবে! তখন একজন পথচারী, কাছে দাঁড়িয়ে সবটাই শুনছিলেন, উনি বললেন থানায় গিয়ে জমা দিতে..."
টেবিলে একটা থাপ্পড় মেরে অসহ্য বিরক্তি প্রকাশ করে কস্তুরী বলল, "দেখলে তোমরা? তোমাদের কোলিগদের চেহারাটা? কত গপ্‌পো বাজারে... কলকাতা পুলিশ পারে না, এমন কাজ নেই...অথচ দ্যাখো, একটু তৎপরতা দেখালে, শুধু মোবাইলে একটা মেসেজ করে টোল প্লাজার ডিউটি সার্জেন্টদের বললেই ১০ মিনিটের মধ্যে ওই ব্ল্যাক স্করপিওকে আটকানো যেত! এখন সেই কাজটাই করতে আমাদের ৩০০ মাইল ছুটতে হবে!"
কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বেশ দৃঢ়স্বরে কস্তুরী বলে, "মানস, আজকের ট্রাফিক গার্ডের ডিউটি চার্টের কপি যেন সন্ধের মধ্যে আমার ডেস্কে পৌঁছে যায়। যারা ওই ক্রসিং পয়েন্টে দুপুরে ডিউটিতে ছিল, তাদের নামগুলো মার্ক করে দেবে... আর হ্যাঁ, তপনবাবু, আপনার কাছে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ, যা করেছেন, তা প্রকৃতই শিক্ষণীয়। আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যান... আর নিজের কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন, এখন যাবেন কোথায়?... মানস, তপনবাবুকে ওঁর গন্তব্যে ড্রপ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করো, দরকার হলে তুমি নিজে যাও।"
"ওকে ম্যাডাম।"
ওরা বেরিয়ে যেতেই কস্তুরী খেয়াল করল যে, ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘর পেরিয়ে গিয়েছে। ও সেলটা তুলে বর্ধমানের এসপি দীপ্যমান বসুকে ধরে। কস্তুরীর চেয়ে বছরদুয়েকের জুনিয়র।
"ইয়েস ম্যাডাম!"
"শোনো দীপ্য..." কস্তুরী ভাল করে ওর প্ল্যানটা বুঝিয়ে বলে।

{১৬}

বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল ওদের ২২ হাজার টাকার বিলটা এখনও কাউন্টার থেকে আসছে না। অথচ ক্যাশ কাউন্টারে তেমন ভিড়ও নেই। ওরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে লোকটা ফোনে গল্প করছে তো করেই চলেছে। এদিকে তিনটে বাজতে চলেছে। চারটে দশের লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালটা না পেলে বাড়ি যেতে রাত হয়ে যাবে। সন্ধে সাতটার সময়ই সব ভ্যানরিক্‌শা উধাও হয়ে যায়। অন্ধকার রাস্তায় তিন কিলোমিটার হাঁটাও নিরাপদ নয়। সঙ্গে এককাঁড়ি টাকা নিয়ে রাতবিরেতে মেঠো রাস্তা ধরে হাঁটা যেমন বিপজ্জনক, তেমনই মঞ্জুর মতো ভরন্ত যুবতীকে নিয়ে ওই জনশূন্য পথে দু'পা এগনো মানেই আগ বাড়িয়ে সর্বনাশকে ডেকে আনা, সে কথা রাখঢাক না করেই মঞ্জুকে জানিয়ে দিয়েছে তারাপদ। অতএব? মঞ্জু তখন নিজেই প্রস্তাবটা দিয়েছে। আজ আর বাড়ি যাবে না। "তা হলে এক কাজ করো... কোনও দিন হোটেলে থাকনি, আজ হোটেলেই থাকব। রাজি?" তারাপদ বেশ অবাক হয়, বলে, "কথাটা ভেবেচিন্তে বলছ তো?"
দুষ্টুমিভরা চোখে ভ্রুভঙ্গি করে মঞ্জু বলে, "হ্যাঁ, ভেবেই বলছি। টাকার তো অভাব নেই। একরাতের হোটেল চার্জ কত হতে পারে?"
"অনেক রকম হোটেল আছে। ৫০০ টাকার যেমন আছে, পাঁচ হাজারেরও আছে..."
"তা হলে পাঁচ হাজারেরটাতেই যাব, সেটা কোথায়?" অস্থির হয় মঞ্জু।
"এই মল থেকে বেশি দূরে নয়, পদ্মপুকুরে। তবে..."
"তবে? তবে কী?"
একটু কিন্তু-কিন্তু করে তারাপদ বলে, "চার্জ কমও হতে পারে... কিন্তু ওইসব দামি হোটেলে আমাদের থাকতে না-ও দিতে পারে।"
"কেন?" অবাক হয় মঞ্জু। "আমাদের পোশাকআসাক খুব দামি নয় বলে? ঠিক আছে, ফের দোতলায় চলো, দু'জনেই বেশ দামি-দামি ড্রেস কিনব।"
"দূর... ও কথা বলিনি।"
"তা হলে? কেন থাকতে দেবে না?" ডাগর চোখ মেলে জানতে চায় মঞ্জু।
মঞ্জুর কানের লতির কাছে মুখ এনে সে ফিসফিসিয়ে বলে, "আমরা যে স্বামী-স্ত্রী নই! স্বামী-স্ত্রী ছাড়া রুম দেবে না।"
"কিন্তু আমরা তো কিছু দিনের মধ্যেই বিয়ে করব। সে কথা বলে দেবে..."
"উঁহু, সিঁথিতে সিঁদুর না থাকলে ওরা দেবেই না।"
সমস্যাটার সহজ সমাধান মঞ্জুই করে দেয়, "তা হলে চলো, এক প্যাকেট সিঁদুরও কিনি। তুমি লাগিয়ে দেবে। কাল আবার মুছে নেব। আমি যে অনেক কিছু ভেবেছি।"
"কী?"
"আজ তোমাকে সব দেব। স-অ-ব। ওই উপর-উপর নয়। গোটা রাত ধরে... " বলেই কপট লজ্জায় ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকে মঞ্জু।
শুনেই তারাপদর মেরুদণ্ড বেয়ে এক অলীক সুখ নামতে থাকে শিরশির করে। তলপেটটাও কেমন যেন মুচড়ে ওঠে সেই সঙ্গে। মূল কাউন্টার ছেড়ে বাঁদিকের ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা। কিন্তু বিল মেটাতে এত দেরি হচ্ছে কেন।
ওদিকে মঞ্জুর মুখে "সব দেব। স-অ-ব" শুনে তারাপদর মাথাটাও বনবন করে ঘুরতে শুরু করে। সে ফের শুনতে চায়, "কী বললে?"
"ঠিকই শুনেছ।"
"তবুও বলো না।"
"সব, আমার কাছে যা আছে... এবার বুঝেছ?"
এসি মেকানিক তারাপদর নিজেকে বেশ ভারিক্কি মনে হয়। মঞ্জুর মুখ থেকে তার গোপন ইঙ্গিতটি শুনে সে দৃশ্যটাকে চোখের সামনে ভাসিয়ে তোলে। অমনি তার পৌরুষ জেগে ওঠার উপক্রম হয়। ভিতরে কেউ যেন ফুঁসে ওঠে। আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে তারাপদ মঞ্জুর শরীরে সেঁটে আসে, লেপটে যেতে চায়। ওর ঘাড়ের কাছে মুখ নামিয়ে এনে মঞ্জুর শরীরের ঘ্রাণ নেয়। টের পেয়ে মঞ্জুও ঘাড় ঘুরিয়ে চটুল চোখে তারাপদকে দ্যাখে।
ওরা খেয়ালই করেনি, কখন তিন-চারজন পুলিশ নিঃশব্দে এসে

ওদের থেকে মাত্র হাতপাঁচেক দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকাচ্ছেও। হঠাৎ খেয়াল হতেই মঞ্জু তারাপদর নিঃশ্বাসের দূরত্ব থেকে ছিটকে সরে যায়। এতটা বেহায়া সে নয় যে, লোকজনকে দেখিয়ে প্রেম করবে। এইসময় কাউন্টারের লোকটি ওদের ডেকে নেয়।

"একটু এদিকে আসুন..." বলেই কাউন্টারে ঢোকার দরজাটা ঠেলে ধরে। মঞ্জু একটু বিরক্ত হয়ে বলে, "ভিতরে যেতে বলছেন কেন? আমি তো ২৩টা হাজার টাকার নোটে ২৩ হাজার টাকা দিয়েছি! মোবাইল সেট ১৮৭০০ টাকা, আর বাকি ড্রেসগুলো মিলিয়ে মোট ২২৮৫০টা। ১৫০ টাকা ফেরত পাব... ভিতরে ঢোকার কী দরকার?" সঙ্গে-সঙ্গে ভিতর থেকে একজন বেশ গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, "ওর কোনও দরকার নেই, দরকারটা আমাদের।"

ততক্ষণে সেই চারজন পুলিশ ওদের ঠিক পিছনেই পজিশন নিয়েছে। মঞ্জু দেখল একজন নয়, ভিতরে তিনজন নতুন মুখ। বেশ রাগী-রাগী হাবভাব। এরাও কি তাহলে পুলিশের লোক? জজকাকু লাগিয়েছে? কী করে খবর পেল যে, ওরা এই মলে রয়েছে? তার আগেও তো চাইনিজ় রেস্তোরাঁয় ছিল! তা হলে কি সেখান থেকেই পুলিশ ওদের পিছু নিয়েছে?

"কী হল? ভিতরে আসুন! দু'জনেই আসুন।"

মঞ্জুর মনে হল এবারের ডাকটা বেশ রুক্ষ। একবার বাথরুম যেতে পারলে ভাল হত। তারাপদর মনে হল, প্যান্টেই না হয়ে যায়। ভিতরে ঢুকতেই সেই লোকটি করকরে নতুন ২৩টি এক হাজার টাকার নোট মঞ্জুর চোখের সামনে নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "এই টাকাগুলো কোথা থেকে পেলেন?"

ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। তবু ঢোক গিলে পালটা প্রশ্ন করল মঞ্জু, "কেন নোটগুলো কি খারাপ?"

উপস্থিত অন্যজন একটু মোলায়েম স্বরে বলে, "নোটগুলো আসল নয়, জাল।"

পা দুটো হঠাৎ টলে যায় যেন। ওর মনে হচ্ছে এই ক্যাশ কাউন্টারটা দুলছে। বনবন করে ঘুরছে মাথাটা। এসি-র এই ঠান্ডার মধ্যেও যেন ভিতরে-ভিতরে ঘাম হচ্ছে খুব।

আগের অফিসার বেশ ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "এইরকম নোট তোমাদের কাছে আর ক'টি আছে? শিগ্‌গির বের করে দাও।" সম্বোধন 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে যায়।

তারাপদর দিকে তাকিয়ে অন্য অফিসারটি খুব ভদ্রভাবে বুঝিয়ে বলে, "থাকলে বের করে দাও, না হলে কিন্তু এখনই সার্চ করা শুরু হবে।" সব স্বপ্ন ভাঙচুর হয়ে যাচ্ছে। সে পইপই করে মঞ্জুকে বলেছিল, "এটা ঠিক করছ না। যারা বিশ্বাস করে তোমার দায়িত্বে মেয়েটাকে দিয়েছে, তাদের এত বড় ক্ষতি করতে যেয়ো না। ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না।"

"কী হল! চুপ করে আছ কেন?"

"স্যার বিশ্বাস করুন, আমি সঠিক জানি না। তবে ও বলছিল নাকি তিনলক্ষ আছে।"

"কোত্থেকে পাচারটা করলে? মালদা বর্ডার, না ধুলাবাড়ি? বাংলাদেশ না নেপাল? কোথাকার টাকা? মানে ছাপা হল কোথায়?"

কিছুই বুঝতে না পেরে তারাপদ মঞ্জুর দিকে তাকায়। তার মুখের সব রক্ত যেন শুষে নিয়েছে কেউ। বারবার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরচ্ছে না। তবুও গভীর ক্লান্তি-মেশানো গলায় মরিয়া হয়ে মঞ্জু বলে, "একটু বসব? মাথাটা খুব ঘুরছে।"

ক্যাশ কাউন্টারের লোকটি একটি চেয়ার এগিয়ে দেয়, জলের বোতলটাও বাড়িয়ে ধরে।

এক নিঃশ্বাসে প্রায় অর্ধেক বোতল শেষ করে মঞ্জু হাঁপ-ধরা গলায় বলে, "সব বলছি..."

{১৮}

"খোঁকি, কুছু খাবে?" ড্রাইভার আগেও দু'বার জিজ্ঞেস করেছে। রুম্পা আগের মতোই মাথা নেড়ে 'না' জানাল। কারণ ড্রাইভারআঙ্কল ঘাড় ঘুরিয়েই জিজ্ঞেস করেছে। বহুক্ষণ হল ওরা আটকে রয়েছে জ্যামে। যতদূর চোখ যায় শুধু গাড়ি আর গাড়ি। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে জেনেছে কারণটা। দু'জন বাইক-আরোহী জানাল, একটা লরি রাস্তার মাঝে আড়াআড়ি উ গিয়েছে ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে। ক্রেন এসেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

শোকের বেসামাল ভাবটা অনেক কেটে গিয়েছে। টিফিনবক্স খুলে কিছু ফল-সন্দেশও খেয়েছে ও। এখন একটা ফন্দি ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। ওর সংস্কৃত খাতাটা কি কেউ কুড়িয়ে পেয়েছে? হেডমিসের কাছে নিশ্চয়ই কেউ ফোন করে জানিয়েছে। আর হেডমিসও তখনই বাবাকেও খবরটা দেবেন। এইসব ভাবতে-ভাবতে রুম্পা খুব সাবধানে একটা খাতার সাদা পাতা খুলল। কিছুটা ভাঁজ করে কেটে ফের দুটো ছোট্ট সাইজ় করল।

সেই বদমাইস লোকটা দরজা খুলে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। দেখছে রাস্তা কখন খুলবে। ড্রাইভারআঙ্কলকে জিজ্ঞেস করছিল, তেল ফুল ট্যাঙ্ক ছিল কি না, এসি চললে ফুয়েল শেষ হয়ে যাবে কি না। ড্রাইভার আঙ্কল বলেছিল, "নেহি, দো-তিনঘন্টা চলেগা।"

খুব দ্রুত দুটো কাগজেই লিখল, 'ফিডন্যাপ্‌ড- হেল্প!' তারপরই বাবার সেল নাম্বার লিখে স্কুলব্যাগের ছোট খুপরি থেকে একটা ছোট কুইক ফিক্সের টিউব বের করল। বন্ধ গাড়ির মধ্যে গন্ধ বেরবে বলে ডেনড্রাইটটা নিল না।

এবার সেই জোরালো আঠা কাগজের পিঠে লাগিয়ে লেখাটা সোজা রেখে বাঁ হাতের বাহুতে চেপে দিল টুকরো কাগজটি। জামার হাতা ঠিকঠাক করে নিয়ে দেখল বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে কি না। একইভাবে অন্য টুকরো কাগজটিও ডান হাতে সেঁটে নিল বাঁ হাতের সাহায্যে। এই কর্মকাণ্ডটি

সে সেরে নিল ড্রাইভারআঙ্কলের চোখে ধুলো দিয়েই। এখন সে একমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে, মিরর দিয়ে দেখার কোনও সুযোগই নেই।

সেই পাজি লোকটা ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে ঢুকল। কারণ গাড়ি সব এগচ্ছে শম্বুক গতিতে। বোধ হয় লরিটাকে সরানো গিয়েছে।

যন্ত্রণাকাতর শব্দটা প্রথমে বিল্লুরই কানে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, মেয়েটা সিটের উপর শুয়ে পড়ে পা দুটো আছড়াচ্ছে বেশ শব্দ করে। আর দু'হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরেছে। ওর মুখ দিয়ে গোঙানির মতো শব্দ বেরচ্ছে। বিল্লু ভয় পেয়ে যায়। শর্মার সঙ্গে কথা বলে। সে-ও শুনেছে রুম্পার কান্না। গাড়ি তেমন স্পিডে চালানোও যাচ্ছে না। ওরা ঠিক করল গাড়ি সাইড করবে কিছুটা এগিয়ে। সেই ফাঁকে শর্মা বারবার রুম্পার খোঁজ নেয়। যন্ত্রণাটা বোধ হয় বাড়ছে। না হলে ও এত চিৎকার করবে কেন? এতক্ষণ তো কোনও ঝামেলা করেনি। নিশ্চয়ই খুব তকলিফ হচ্ছে। গাড়ি সাইড করে দাঁড় করিয়ে শর্মা তাকে জিজ্ঞেস করল, "কুছু কষ্ট হচ্ছে?"

প্রবল চিৎকারের ফাঁকে সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

বিল্লু দেখল একটা সবুজ বোর্ডে লেখা রয়েছে 'মেমারি'। গাড়ি থেকে নেমে খোঁজ নিয়ে জানল, তিন কিলোমিটার ভিতরে গেলে মেমারি স্টেশন। ওইখানে স্টেশন বাজারে ডাক্তার কুণ্ডু বসেন।

বিল্লু ফ্যাসাদে পড়ে যায়। কী করা উচিত? সুনীল সিংহকে ফোনে ধরার চেষ্টা করে। আধঘন্টা আগেও সুনীল ফোন করেছিল, ওরা কোথায় আছে জানতে। লেড়কি কেমন আছে, খুব বজ্জাতি করছে কি না, সব খবরই সে জানিয়েছে সুনীলকে। সুনীল বারবার সাবধান করেছে, "উসকি হালত সহি সলামত রহনা চাহিয়ে... ডরাও মৎ!" কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না ওকে। তা হলে সুইটি? ওর ফোনও

অনেকক্ষণ পায়নি। হয়তো এতক্ষণে সব জেনে গিয়েছে, 'জজসাব কা বিটি কিডন্যাপ্‌ড!' সেই কারণেই হয়তো সুইটি হুঁশিয়ার। কলকাত্তা কা পুলিশ বহুত খতরনাক!

সে কী! সুইটির ফোন সুইচ্‌ড অফ। তা হলে? দু'জন জরুরি আলোচনা সেরে নিয়ে ঠিক করল স্টেশনবাজারেই যাবে। গাড়ি ফাঁকা রাস্তায় এমনভাবে রাখা হবে, যাতে বিপদ বুঝলেই অনায়াসে উধাও হওয়া যায়। কারণ মেয়েটা যন্ত্রণায় বলতে গেলে কাতরাচ্ছে। ড্রাইভার শর্মা বিল্লুর চেয়ে বয়সে বড়। সে বেশ চিন্তিত হয়ে বলল, "খোঁকি কি জো বিমারি, হর মাহিনা কা প্রবলেম লগতা হ্যায়... দেখতা নহি কিস তরহা পেট দাবা রহি হ্যায়! দাওয়াই দেনা হোগা, ডাক্তারকে পাস হি জানা হ্যায়।"

ট্রেনলাইন পার হয়ে অবশ্য ওপারে যেতে হল না। এপারেই বড় রাস্তার ধারে একটু ফাঁকা দেখে গাড়ি রেখে ড্রাইভার শর্মা গেল ডাক্তারের খোঁজে। বিল্লু রইল পাহারায়। সে নিজেও ভাল ড্রাইভ করতে জানে আর যন্ত্রটা তারই ট্যাকে গোঁজা। বিপদ বুঝলে ওটারও দরকার হতে পারে। আর মেয়েটা শর্মাকে তেমন ভয়ও পায় না। হল্লাও জুড়ে দিতে পারে। তা ছাড়া শর্মা বাংলায় কথাও বলতে পারে ভেঙে-ভেঙে।

একটা বাইকে চেপে ডাক্তারবাবু এলেন। পিছনে শর্মা বসে। বাইক থেকে নেমে ডাক্তারবাবু বললেন, "গাড়ি যখন ছিল, চেম্বারেই তো চলে গেলে পারতেন!"

শর্মা ম্যানেজ দেয়, "আসলে উলটি হবে বলছিল, ইসি লিয়ে ডর গ্যয়া!"

ডাক্তারবাবু কেরিয়ার থেকে ব্যাগটা নেওয়ার ফাঁকে বিল্লু দরজা খুলে রুম্পাকে শাসিয়ে যায়, "ম্যায় ইধারই হুঁ! বিমারি কি ইলাওয়া কুছ মত বোল... দোনো কো গুড়ুম কর দুঙ্গা!"

ভয়ে রুম্পার গলা শুকিয়ে কাঠ।

ডাক্তারবাবু কাছে এসে যেতেই বিল্লু চট করে নেমে আসে।

"যাইয়ে ডাক্তারসাব, দেখিয়ে..."

"যাবেন কদ্দুর?"

"আসানসোল।"

"আপনি মেয়েটির কে?"

"আঙ্কল।"

এসি বন্ধ করে শর্মা আগেই সেন্ট্রাল লক খুলে দিয়েছে। ভিতরে ঢুকে সিটে বসে ডাক্তার কুণ্ডু রুম্পার হাতটা তুলে নেন।

"কী কষ্ট হচ্ছে, বলো তো মামনি..."

রুম্পা যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে তলপেটের দিকে আঙুল দেখায়।

রুম্পার স্কুলের ড্রেস দেখেই ডাক্তারবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করেন, "এ কোন স্কুলে পড়ে?"

ওরা শুনতে না পাওয়ার ভান করে চুপ করে থাকে।

দু'জনেই দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবু সিটে বসে আছেন বলে, ওরা রুম্পাকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না। সে শুয়ে আছে আর ঝাপসা কাচের জন্য ভিতরটা বাইরে থেকে অন্ধকার দেখাচ্ছে, একটা দরজা খুলে রাখা সত্ত্বেও।

ব্যাগ খুলে ডাক্তারবাবু প্রেশার মাপার যন্ত্রটা বের করে শর্মার হাতে ব্যাগটা ধরতে দিলেন। বিল্লু কান খাড়া করে রেখেছে, যাতে কোনও কথা এড়িয়ে না যায়। কিন্তু মেয়েটা তো কোনও কথাই বলছে না! তা হলে হালত বহোত খারাপ! বিল্লু আরও ভয় পেয়ে যায়। প্রেশার মাপার যন্ত্রের চওড়া ফিতেটা হাতের উপরদিকে বাঁধার জন্য ফ্রকের হাতা একটু গোটাতে চাইলেন। রুম্পা হাতাটা নিজেই টেনে ধরল আর তখনই ওঁর চোখে পড়ে যায় লেখাটা, 'কিডন্যাপ্‌ড। হেল্প।'

ডাক্তারবাবুর মনে এরকমই একটা সন্দেহ দানা বাঁধছিল এদের হাবভাব দেখেই। ফিতে বাঁধার ছলে আরও ঝুঁকে ওদের দিকে পিঠের আড়ালটা নিশ্ছিদ্র করে অসীম তৎপরতায় আঠা লাগানো কাগজটা খুলে খুব সন্তর্পণে বুকপকেটে চালান করেন। আর জানেন, নিশ্চয়ই এদের কাছে আর্মস আছেই। সুতরাং একটু বেচাল হলে দু'জনেরই প্রাণসংশয়।

যন্ত্রে হাওয়া পাম্প করতে করতে ডাক্তারবাবু ভাবলেন, যদি বাঁ হাতটা ডান হাতে না বেঁধে বাঁ হাতে বাঁধতাম তা হলে তো জানাই যেত না ওর এই বিরাট বিপদের কথা।

"দেখো মামনি, জিবটা দেখাও তো... হুঁ ঠিক আছে, এবার পাশ ফিরে শোও, পিঠে স্টেথো দেব..." বলেই ম্যাজিশিয়ানের মতো অদ্ভুত আঙুলের কৌশলে রুম্পার বাঁ বাহু স্পর্শ করেই টের পেলেন, ওখানেও আছে। একই দ্রুততায় সেটিকেও খুলে নিয়ে চালান করলেন যথাস্থানে। আর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তাঁর আশু কর্তব্য কী।

ব্যাগ গুছিয়ে ডাক্তার কুণ্ডু গাড়ি থেকে নামতেই বিল্লু সঙ্গে-সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দেয়। সে লক্ষ করে ডাক্তারবাবুর কপালে ভাঁজ।

"গুড়িয়া ক্যায়সি হ্যায়, ডাক্তারসাব?" শর্মার প্রশ্নটি যে বিল্লুরও মনের কথা, তা বোঝা যাচ্ছে ওর অস্থিরতায়। সেটা আন্দাজ করেই ডাক্তার কুণ্ডু কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "বেশ কমপ্লিকেটেড, খুব চিন্তার ব্যাপার!"

"কিউ?" ওদের কোরাস।

"মেয়েটি কি হস্টেলে থাকে?"

ডাক্তার কুণ্ডুর বেমক্কা প্রশ্নে আমতা-আমতা করে শর্মা। বিল্লু খুব স্মার্টলি বলে, "জি, লেকিন হুয়া ক্যা?"

"দেখুন মেয়েটি তো মুখে কিছু বলছে না।

বারবার জিজ্ঞেস করলাম, আগে এরকম যন্ত্রণা হয়েছে কি না, ও তো কিছুই বলছে না। আসলে ওর অ্যাপেনডিক্সটা এনলার্জড। বেশ বড় হয়ে গিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে বার্স্ট করতে পারে আর বার্স্ট করলে কিছুই করার থাকবে

না। পারলে এখানকার কোনও নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিন। এখানকার 'আরোগ্য' নার্সিংহোমটা ভাল। ওখানে ডাক্তার দত্ত আছেন, ভাল সার্জেন।"

রুম্পা এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তার যন্ত্রণাকাতর চিৎকার বন্ধ গাড়ির ভিতর থেকেও শোনা যাচ্ছে। বিল্লুরা বেশ ঘাবড়ে যায়। ডাক্তারবাবু বাংলায় বললেও সমস্যাটা ওদের বোধগম্য হয়েছে। যদি অ্যাপেনডিক্স সত্যি-সত্যি বার্স্ট করে, তা হলে তো মারাত্মক ব্যাপার।

"লেকিন ডাক্তারসাব, কোঈ ইমার্জেন্সি মেডিসিন তো জরুর হোগা... ও হি লিখ দিজিয়ে, রাস্তে মে দুকান মিলেগা..."

ওদের প্রস্তাব যে তাঁর মনে ধরেছে, সেটা দেখানোর জন্যই মুখে বললেন, "হ্যাঁ, ভাল বলেছেন, তাই লিখে দিচ্ছি। খাইয়ে দিলে পেন কমে যাবে বলেই মনে হয়, দু'-তিন ঘণ্টা বেশ ঘুমোবে। তবে রাত্রিবেলার মধ্যেই নার্সিংহোমে ভর্তি করে দেবেন," বলেই আড়চোখে কবজির ঘড়ি দেখলেন। প্রায় চারটে বাজে।

তারপর খুব ব্যস্ততার ভান করে ব্যাগ খুলে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন বেশ খানিকক্ষণ। তারপর "এই যা!" বলে ব্যাগ বন্ধ করলেন।

"ক্যা হুয়া?"

"আরে তাড়াহুড়োতে প্রেসক্রিপশন লেখার প্যাডটাই নিতে ভুলে গিয়েছি!"

তা আন্দাজ করে বিল্লু আগেভাগে পকেট হাতড়ে একটুকরো কাগজ বের করে রেখেছে। এবার সেটা বাড়িয়ে ধরে বলে, "তব ইস মে লিখ দিজিয়ে..."

চোরাচোখে ডাক্তার কুণ্ডু লক্ষ করেছিলেন লোকটি পকেট হাতড়ে কাগজ খুঁজছে। এরকম একটি প্রস্তাব যে আসবে, তা আন্দাজ করেইছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বিল্লুকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, "উঁহু! কড়া মেডিসিন, ডাক্তারের প্যাড এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া দোকান দেবে না।"

হাবভাবে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে বিল্লু বলে, "ইয়ে বাত! আপ ফিক্‌র মত কিজিয়ে, হম সামহাল লেঙ্গে।"

"আর আমার হাতে হাতকড়া পড়লে কি আপনি বাঁচাতে আসবেন? এক কাজ করুন, যে কেউ আমার সঙ্গে আসুন, আমার চেম্বারেই হয়তো ওষুধটা পেয়ে যাব।"

সময় নষ্ট না করে ডাক্তার কুণ্ডু বাইকের দিকে পা বাড়ান। সব দিক ভেবেচিন্তে বিল্লু শর্মাকেই পাঠায়। গাড়ির চাবি চেয়ে নেয় শর্মার কাছ থেকে।

রুম্পার চিৎকার শুনে দু'-একজন সাইকেল-আরোহী ঘাড় ঘুরিয়ে গাড়ির জানালার দিকে তাকায়। ডাক্তার কুণ্ডু বাইকে স্টার্ট দেওয়ার আগে ঘাড় চুলকোবার অছিলায় গাড়ির নাম্বারটি বারবার ঝালিয়ে মুখস্থ করে নেন। পিলিয়নে শর্মা বসতেই তিনি স্টার্ট দিলেন।

বাইকের চলে যাওয়ার শব্দ টের পায় রুম্পা। এতক্ষণ তার মনে বড় ভরসা ছিল ডাক্তারআঙ্কল তো কাছেই রয়েছেন, ভয় কী! বড় আপন মনে হচ্ছিল ওঁকে। এখন বাইকের শব্দ দূরবর্তী হতেই রাজ্যের ভয়, একাকিত্ব যেন একসঙ্গে এসে ওর অনুভূতিগুলোকে নির্জীব করে দিচ্ছে। ডাক্তার আঙ্কল ভুলে যাবেন না তো! বাবাকে উনি ফোন করে সত্যি-সত্যিই ওর দুর্দশা জানাবেন তো!

স্করপিওটার থেকে দূরত্ব কিছুটা বাড়তেই ডাক্তার কুণ্ডু হঠাৎই বাইক থামিয়ে মোবাইল বের করলেন। মুখস্থ করা নাম্বারটা দ্রুতহাতে সেভ করে নিয়ে ফের চালু করলেন বাইক। মনে-মনে ভাবতে লাগলেন, 'মেয়েটিকে কিডন্যাপ করা হল কেন? বোঝাই যাচ্ছে, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওকে তুলে নেওয়া হয়েছে। ওর বাবা কি প্রভূত বিত্তশালী? র‍্যানসমের ফিরিস্তি কি প্লেস করে দেওয়া হয়েছে? গ্যাংটায় আর ক'জন আছে? অবশ্য একটা বাচ্চা মেয়েকে তুলে নেওয়ার জন্য বেশি রাওডির দরকার পড়ে না। বরং লোকের চোখে ধুলো দিতে কম সংখ্যক দুষ্কৃতী বেশি এফেকটিভ। পিছনে বসা লোকটিকে ততটা বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না। শয়তান হচ্ছে ওই লিডারটা। চোখে-মুখে হিংস্রতার ছাপ। কথাবার্তায় খুব হুঁশিয়ার। পাকা খেলুড়ের মতো গাড়িটাকে হাইওয়ের দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে যাতে বিপদ বুঝলে হুঁশ করে কেটে পড়া যায়। হাতে সময় খুব কম। যা করার করতে হবে এখনি। পলাশ নন্দীকে এখন থানায় পাওয়া যাবে তো? যদি না পাওয়া যায়, তাহলে? সব জেনেও কিছু করা যাবে না? মেয়েটা এত বিপদের মধ্যেও কী দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে তার বিপদের কথা জানাতে পেরেছে! আর তার উদ্ধারকাজে হাত গুটিয়ে বসে থাকব! ওর বাড়িতে বা বাবাকে ফোন পরে করলেও চলবে। আগে জানা দরকার পলাশ নন্দী কোথায়।'

হঠাৎই ব্রেক কষে বাইক থামিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, "একটু নামুন তো... অনেকক্ষণ থেকে চেপে আছি।"

শর্মা বুঝতে পারে ডাক্তারবাবুর পিসাব পেয়েছে।

বাইক স্ট্যান্ড করে ব্যস্ত পায়ে বেশ কিছুটা দূরে দৌড়ে যান ডাক্তারবাবু। একটা বড় অর্জুনগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্রহাতে সেল সার্চ করে পুশ করেন পলাশ নন্দীর নম্বর। রিং হচ্ছে... হচ্ছে... হয়েই চলেছে। ফুল টার্ম রিং হয়ে শেষ হল। এই হচ্ছে ওসিদের মুশকিল, একচালে পাওয়াই যায় না।

ফের বাটন প্রেস করতে যাবেন, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে পলাশ নন্দীর নাম। কল রিসিভ করতেই ভেসে এল ওসির ভরাট কণ্ঠস্বর, "কী ব্যাপার? কল করছিলেন?"

হাতে চাঁদ পাওয়ার উত্তেজনায় আসল বক্তব্য গুলিয়ে যাচ্ছে, তবুও খুব নিচু গলায় ধীরে-ধীরে জানতে চাইলেন, "এখন কোথায়, থানায়?"

"না, না, কিছুটা দূরে, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে।"

"ফোনও অ্যাকসিডেন্ট?"

"না, না, রাস্তা ব্যারিকেড করা হয়েছে। এসপি সাহেবও আছেন। গাড়ি চেকিং চলছে।"

"কিছুক্ষণের জন্য একবার চেম্বারে আসা যাবে?"

"কেন? কী হল আবার?"

"খুব বিপদ।"

"বিপদ! কার আপনার?"

"না, আমার নয়।"

"তবে?"

"একটি বাচ্চা মেয়ের, আপনাকে খুবই দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন প্লিজ।"

"দেখছি, এসপি সাহেব নিজে রয়েছেন তো! দেখি ওর পারমিশন পাই কি না... যদি না ছাড়েন, ফোন করে জানাচ্ছি। তেমন হলে সেকেন্ড অফিসার কার্তিককে যেতে বলব।"

সেলটি যথাস্থানে রেখে প্যান্টের চেন টানার ভান করে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তারবাবু ছুটে এলেন বাইকের কাছে। এখন জেনে নেওয়া দরকার লোকটির কাছে কোনও সেল আছে কি না।

বাইক চালু করে লোকটির উদ্দেশে বললেন, "আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই খুব অস্থির হচ্ছে দেরি দেখে, ওকে ফোন করে বলে দিন, এখনই হয়ে যাবে।"

"নেহি ডাক্তারসাব, মেরা ফোন গাড়িমে রহে গ্যয়া..."

নিশ্চিন্ত হয়ে চেম্বারে ঢুকে দেখলেন যেসব পেশেন্ট ছিল, তারা সবাই অপেক্ষা করে আছে। আরও দু'-একজন এসেছে, শর্মাকে বসতে বলে রোগী দেখায় মন দিলেন। এখন যে-কোনও অজুহাতে কিছুটা সময় কাটাতে হবে। চোরা চোখে লক্ষ করলেন, দেরি দেখে লোকটি খুব উসখুস করছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন

প্রেসক্রিপশন লিখতে। যেন তাড়াহুড়োয় ওষুধ দেওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছেন।
আর ধৈর্য ধরতে না পেরে উঠে দাঁড়ায় শর্মা, "ডাক্তারসাব, গুড়িয়াকে লিয়ে দাবা...?"
"ও হো! হ্যাঁ, হ্যাঁ... বসুন, বসুন। দিচ্ছি..."
বিল্লু চাতকপাখির মতো তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। শর্মার দেখা নেই। প্রায় ১৫ মিনিট হয়ে গেল। ওর হঠাৎই খেয়াল হয়, 'তাই তো! শর্মাকো তো পয়দলহি লওটনা হোগা... পহলে কিঁউ নেহি সোচা! কোঈ মুসিবতমে ফাঁস গয়া তো!'
দুর্ভাবনাটা মাথায় টোকা দিতেই বিল্লু বেশ ঘাবড়ে যায়। বেশ অস্থির লাগে। আবার মেয়েটার যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে টারজেনের বিপদের শেষ থাকবে না। বারবার ঘাম মোছে সে। আরও দুশ্চিন্তা, কারণ গাড়ির এসি চলছে নাগাড়ে। ফুয়েল খতম হয়ে গেলে খতরা বেড়ে যাবে। এখানে গাছের ছায়াও নেই, বিকেলেও রোদ্দুরের প্রবল তেজ।
শর্মার এত দেরি হওয়ার কারণ কী? তবে কি দাবা পাওয়া যায়নি? ও কি কোনও মেডিসিনের দোকানে খোঁজ করছে? একটা ফোনও তো করতে পারে।
ফোনের কথা মনে হতেই বিল্লু সেল সার্চ করে শর্মার নাম্বারে কল করে। রিং হচ্ছে। তারপরই তার ভুল ভাঙল। রিংটা হচ্ছে গাড়ির ভিতরেই। অর্থাৎ শর্মা ওটা নিতে ভুল করেছে তাড়াহুড়োতে। প্রবল

এত দেরি হওয়ার কারণ কী? তবে কি দাবা পাওয়া যায়নি? ও কি কোনও মেডিসিনের দোকানে খোঁজ করছে?

আক্রোশে ড্যাশবোর্ডে এক থাপ্পড় কষায় বিল্লু।
তাই তো! অনেকক্ষণ মেয়েটার কোনও সাড়াশব্দ নেই। অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি! নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডাকে, "গুড়িয়া ... আরে ও খোঁকী, ক্যায়সি হো?"
রুম্পা অনেকক্ষণ থেকেই ঘুমের ভান করে মটকা মেরে আছে। এই লোকটা বড্ড পাজি। লোকটার কাছে আর্মস আছে। এখন ড্রাইভারআঙ্কল নেই। যদি ওকে গুলি করে মেরে দেয়। ভয়ে গুটিসুটি মেরে সে সিঁটিয়ে থাকে। আরও বার-দুই ডেকে রুম্পার সাড়াশব্দ না পেয়ে বিল্লু আন্দাজ করে, ও হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে।
সিদ্ধান্তহীনতায় অস্থির হয়ে সে ফের রাস্তায় নামে। সুনীলকে ফোনে বহুক্ষণ ধরা যাচ্ছে না। আর আশ্চর্য! না সুনীল, না সুইটি... কেউ তো ফোনও করছে না। এখন কার কী করণীয়, সে কার কাছ থেকে পরামর্শ নেবে?

{১৯}

মসৃণ গতিতেই এগচ্ছে ওদের সাদা স্করপিও। মনের টালমাটাল অবস্থা কাটাতে বারবার ঘড়ি দেখছে সে। যার ফোনের অপেক্ষায় সে প্রহর গুনছে, সেই এসপি বর্ধমান দীপ্যমানের কোনও কল এল না। অথচ দীপ্যমান ভীষণ দায়িত্ববান। অফুরন্ত এনার্জি। যত কাজের চাপই থাক, দায়িত্ব ভুলে যাওয়ার মানুষ সে নয়। রুম্পার নিরাপত্তার চিন্তাটাই ওকে কুরে-কুরে খাচ্ছে।
শেষ মুহূর্তে প্ল্যান বদলে সুইটিকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়েছে। অর্ক বসেছে সামনে ড্রাইভারের পাশে। দেবদাস আর দু'জন আর্মড গার্ড পিছনে। সুইটি রয়েছে মাঝের সিটে কন্তুরীর ডানপাশে।
বিপাশা বারবার আশ্বস্ত করলেও সুইটিকে সেন্ট্রাল জেনানা সেল-এ রেখে কন্তুরী নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না। হাজার হোক রাওডি গ্যাংয়ের মক্ষিরানি। কতরকমের পাটোয়ারি বুদ্ধি মাথায়। তা ছাড়া দিশেরগড়ে সুনীলের ঠেকটা চিনিয়ে দেওয়ার জন্য সুইটিকে খুবই দরকার। আর সর্বোপরি রুম্পার হালহকিকত জানার জন্য সুইটির থাকা দরকার।
দ্বিতীয় সেলটা হঠাৎ জেগে উঠল। এসপি বর্ধমানের ফোন ভেবে খুবই তৎপরতার সঙ্গে স্ক্রিনে চোখ বোলায়। না, দীপ্যমানের নয়। দুলাল বৈদ্যের নাম জ্বলজ্বল করছে। ইন্সপেক্টর এসটিএফ, মানে স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। এই বিভাগটি অর্থনৈতিক অপরাধ বিষয়ে তদন্ত করে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের প্রধান হিসেবে এই বিভাগের কর্মকাণ্ডও কন্তুরীকেই মনিটর করতে হয়।
দুলাল বৈদ্যর কলটা ধরবে কি না ভাবছে। এই মুহূর্তে ওর যা মানসিক অবস্থা, তাতে অন্য উটকো ঝামেলা মাথায় নিতে মন চাইছে না। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তো প্রাথমিক ঝক্কি সামলানোর জন্য রয়েইছে। হুট করে ওকে কল করার দরকারটাই বা কী! একে তো রুম্পার মরণ-বাঁচন সমস্যা। তার উপর সিএমের প্রেস কনফারেন্স নামের একটা ডিফেসিং গেম। ওদিকে কড়েয়া থানার সেনসেশনাল মাস রেপিংয়ের কেস। পৌলোমী শতপথীর বিধ্বস্ত মুখটা মনে পড়ছে বারবার। কন্তুরী কি তবে ঠুঁটো জগন্নাথ! অমন জলজ্যান্ত নারী-লাঞ্ছনার অপরাধ ধামা চাপা পড়ে যাবে? আর এসবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কোনও অকিঞ্চিৎকর পদে ওর বদলি।
কিছুটা বিরক্ত হয়ে কলটা রিসিভ করতে যাবে, কেটে গেল।
সুইটির ফোন সুইচ অফ করে রাখা। সে বসেছে কন্তুরীর ডানপাশে জানালার ধারে। খুবই আড়ষ্ট। চিন্তিত তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। তার ছোট্ট একটা ভুলের মাশুল শুধু তাকেই নয়, টারজেন, সুনীল, সবাইকেই দিতে হবে। কেন সে মরতে খতটা লিখতে গেল! খুব বেপরোয়া আর অতি-উৎসাহী হয়েই সে কাণ্ডটা ঘটিয়ে ফেলেছে। না হলে কাজটা কিন্তু তুখোড়ভাবেই এগচ্ছিল। সে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না যে, ওরা জানল কী করে! এত গোপনে চিরকুটটা চালান করলেও সিকিওরিটিদের চোখে পড়ল কী করে? আর যদি চোখে পড়েও থাকে, টারজেনের পকেট থেকে ওটা পাওয়া গেল কোন মন্ত্রবলে? তা হলে কি ওটায় চোখ বুলিয়ে টারজেন ওটা কোর্ট চত্বরেই কোথাও ফেলে দিয়েছিল?
কন্তুরীর ফোনে ফের সুরেলা ঝঙ্কার। দুলাল বৈদ্যই ট্রাই করছে। কিছু জরুরি কথা?
"হ্যাঁ দুলাল, বলো..."
"খুব ব্যস্ত কি ম্যাডাম? একটু কথা বলা যাবে?"
"খুব আরজেন্ট?"
"হ্যাঁ ম্যাডাম।"
"বেশ বলো কী বলছিলে..."
"প্রচুর জাল নোটসহ দু'জন ধরা পড়েছে, প্রায় তিনলক্ষ।"
"এসি এসটিএফকে রিপোর্ট করো।"
"উনিও এখানেই আছেন।"
"মানে? তোমরা এখন কোথায়?"
"ভবানীপুরের একটা মলে। ওঁর নির্দেশমতোই আপনাকে রিপোর্ট করছি... এই যে ম্যাডাম, উনি কথা বলবেন।"
"হ্যাঁ সুজিতবাবু, আপনি তো রয়েছেন। সব ফর্মালিটিজ় মেনে যাতে সিজার হয়..."
"সিজার নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।"

"তা হলে?"
"আসলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়েছে।"
"কেউটে?" কস্তুরী নড়েচড়ে বসে, "তার মানে?"
"ইনফ্যাক্ট ম্যাডাম, এরা কেউই ফেক কারেন্সির পাচারকারী নয়, কোনও বর্ডারও ট্রিকল করেনি।"
"দেন?"
"যার ব্যাগ থেকে করকরে জাল নোটগুলো পাওয়া গিয়েছে, সেই মেয়েটি বলছে, একটি স্কুলের ছাত্রীকে কিডন্যাপিংয়ে সাহায্য করে, বিনিময়ে এই পুরস্কার পেয়েছে।"
চাক থেকে উৎখাত হওয়া কোনও ভিমরুল যেন কস্তুরীর গ্রীবায় হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। ড্রাইভারকে সে বলল, "গাড়ি সাইড করো তো।"
গ্রিন সাইনবোর্ডে লেখা 'মেমারি'। সেই বোর্ডের কাছ ঘেঁষেই গাড়ি দাঁড় করায় ড্রাইভার।
"আচ্ছা, মেয়েটির নাম কি মঞ্জু? মঞ্জু সাঁতরা?"
এসি সুজিত মৈত্র স্বরে প্রত্যয় এনে বলে, "হ্যাঁ ম্যাডাম। মঞ্জু সাঁতরা। যাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে সে হল..."
সুজিত মৈত্রকে মাঝপথে থামিয়ে কস্তুরী বলে, 'শুনুন সুজিতবাবু, আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রেস ব্রিফিং নয়। সিজার উইটনেসরাও যেন কোথাও মুখ না খোলে। আসামিদের সেন্ট্রাল লক আপে রাখবেন।"
সুইটি জানালার কাচে চোখ রেখে বাইরের দৃশ্য দেখলেও ভাবছিল, ম্যাডাম কি ওকে রেহাই দেবে? বলছিল রাজসাক্ষী হতে হবে। তার মানে অ্যাপ্রুভার? কিন্তু তা করলেও তো কাস্টডি থেকে মুক্তি নেই। কেবল মামলা শেষ হলে জজসাহেব সাজা কম করে দেবে, এই যা! এখনই ফোনে কথা বলার ফাঁকে ম্যাডাম মঞ্জু সাঁতরার কথা বলছিল। তার মানে মঞ্জু ধরা পড়ে গিয়েছে। তা হলে তো জাল টাকার রহস্যও ফাঁস হবে। মঞ্জু তো সবই বলে দেবে। দু'-দু'টো টাইট কেসে সে, বিল্লু, শর্মাজি সবাই ফাঁসবে। না! আপাতত কোনও পরিত্রাণ নেই। একটি প্রবল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নড়েচড়ে বসে সুইটি।
ঠিক এই সময় কস্তুরীর অন্য ফোনটা সজাগ হয়। স্ক্রিনে বহু প্রতীক্ষিত এসপি দীপ্যমানের ফোন।
"হ্যাঁ, দীপ্য, বলো... তোমার ফোন না পেয়ে খুব চিন্তায় ছিলাম।"
প্রায় দু'মিনিট কথা হয় দু'জনে। কথা শেষ হলে কস্তুরীকে বেশ নির্ভার মনে হয়। সে ড্রাইভারকে সেখানেই আরও কিছুক্ষণ থাকতে বলে। তবে কি... তবে কি বিল্লু ধরা পড়েছে? ভাবতেই যেন সুইটির শরীরে ছ্যাঁকা লেগে গেল। এত নিখুঁত প্ল্যানটা মাঠে মারা গেল! স্রেফ ওই খত! কেন যে মরতে ওটা লিখতে গেল!

{২০}

প্রেশার যন্ত্রটি প্যাক করতে-করতে ডাক্তার চন্দ্র থমথমে মুখে জানালেন, "দেখুন, এরকম অসুস্থতার ক্ষেত্রে বড়জোর একটা ইনজেকশন পুশ করতে পারি। অন্য কোনও ওষুধে কিছু কাজ হবে না। প্রচণ্ড শক থেকে সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে যায়, আবার কিছুক্ষণ পরে তা ফিরেও আসে। প্রেশার ঠিকই আছে, যদিও একটু লো। পাল্‌স কিছুটা র‍্যাপিড।"
মানসিকভাবে বিধ্বস্ত সমরজিৎ ডাক্তারবাবুকে বলে, "যা ভাল বোঝেন তাই করুন, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।"
"আসলে কী জানেন, এইরকম মানসিক অবস্থায় পেশেন্টের দরকার বিশ্রাম। লক্ষ রাখতে হবে, একই টেনশন যেন বারবার ফিরে না আসে। ইনজেকশনটা দিয়ে দিচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ ঘুমোবে। চিন্তার কিছু নেই।"
সিরিঞ্জে সিরাম টেনে নেওয়ার ফাঁকে ডাক্তার চন্দ্র জানতে চাইলেন, "কিছু খবর পাওয়া গেল?"
অবরুদ্ধ শোক গলার কাছে দলা পাকিয়ে আছে। কিছুটা সামলে নিয়ে বিষাদ-ভাঙা স্বরে বলেন, "ওরা তো বলল রাইট ট্র্যাক ধরেই এগচ্ছে। কোনও পজিটিভ খবর পেলেই জানাবে... এর বেশি কিছুই জানি না।"
কান্নার বেগ আর চাপা গেল না। ডুকরে কাঁদতে-কাঁদতে প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলে যায়, 'কী করছে মেয়েটা, কিছু মুখে দিতে পারল কি না, সুস্থ আছে তো...নাকি...'
কাজ সেরে ডিসপোজেব্‌ল সিরিঞ্জটি দ্রুত হাতে বাস্কেটে ফেলে ডাক্তার চন্দ্র সমরজিৎকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।
"আপনি এভাবে ভেঙে পড়লে মিসেসকে কে সামলাবে? প্লিজ ধৈর্য ধরুন... কমপোজ ইয়োরসেল্‌ফ!"
"ইটস ওকে... আসলে রুম্পা তো খুবই ছোট... আচ্ছা ওরা কি ওকে মারধোর করবে? নাকি মেরে ফেলবে? দে আর ভেরি হার্টলেস..."
এই কথার উত্তরে যে কী বলা উচিত, ডাক্তার চন্দ্র তা ভেবে পান না। তবুও সান্ত্বনাবাণী হাতড়ে-হাতড়ে বলেন, "এতটা এক্সট্রিম ভেবে নিচ্ছেন কেন? যে উদ্দেশ্যেই ওরা এতবড় কাণ্ডটা ঘটিয়ে থাকুক না কেন, ওরা জানে মেয়েটি কোনও সাধারণ বাড়ির মেয়ে নয়। গায়ে হাত তুলতে গেলে ১০বার ভাববে... তবে খুব কান্নাকাটি করলে ভয়-টয় দেখাতে পারে... ওদের তরফে কোনও ফোন-টোন?"
বুক উজাড় করা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমরজিৎ জানান, "না ডাক্তারবাবু, কোনও ফোন আসেনি। বারগেনটা যে কী বিষয়ে তা এখনও স্পষ্ট করে জানি না। ওদের এই নীরবতাটাই বড্ড ভাবাচ্ছে। রুম্পাকে কি কলকাতার আশপাশেই রেখেছে, নাকি দূরে কোথাও নিয়ে চলে গিয়েছে..."
কথাগুলো শেষ করতে পারল না, ফের কান্নার প্রবল ঢেউ আছড়ে পড়ল। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে তা চাপতে গিয়েও কিছুতেই সংবরণ করতে পারেন না। ডাক্তার চন্দ্র ওর হাতটি ধরে সোফায় বসালেন।
"প্লিজ মনে জোর রাখুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রুম্পার কোনও ক্ষতি হয়নি, ও ঠিকই আছে।"
প্রবল অসহায়তার মুহূর্তে সান্ত্বনার এই দু'চারটি শব্দও যে কতটা নির্ভরযোগ্য তা মর্মে-মর্মে টের পায় সমরজিৎ।
"বলছেন! আপনি বলছেন... রুম্পার কিছু হয়নি!"
ডাক্তার চন্দ্র বিদায় নিতেই ফের চরম নিঃসঙ্গতা তার দুর্মর অনুষঙ্গসহ সমরজিৎকে ফের গ্রাস করে। রুম্পার মুখ ভেসে ওঠে মানসপটে। কী করছে ও এখন? কতটা আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে প্রহর কাটছে ওর? ওকে উদ্ধার করা যাবে তো? কস্তুরী পারবে ওকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে?... মঞ্জু! কী করে পারল? কী সাংঘাতিক খেলাটাই না খেলেছে। সরল বিশ্বাসে রুম্পা মঞ্জুদির পিছু-পিছু স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে এসেছে। সে জানেই না যে, কী মর্মান্তিক ফাঁদ অপেক্ষা করছিল। তা হলে কি মঞ্জুও ওই গ্যাংয়ে নাম লিখিয়েছে! ও নিশ্চয়ই বাড়ি যাবে না এখন। কোথাও ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করবে কিছু দিন... তা হলে কি... তা হলে কি...?
ডিফেন্স লইয়ার জটাধারী চৌবের মুখটা মনে পড়ে যায়। যেখানে টারজেন সিংহের মামলা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে, ক'দিন বাদেই রায় ঘোষণাপর্ব, সেখানে হঠাৎ ওর জামিনের আবেদন! কী স্মার্ট প্ল্যান! রুম্পাকে কিডন্যাপ করে প্রেশার ট্যাকটিক্স!
জয়ন্তী পাশ ফেরে। তাঁর ক্ষীণ অনুচ্চারিত গোঙানির স্বর। সমরজিৎ কাছে গিয়ে বসে। কপালে হাত রাখে। সমরজিৎ না বললেও জয়ন্তী বাড়ি ফিরেই রুম্পার খবরটা আন্দাজ করতে পেরে যায়। ঘটনার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে যায় সে। সে চায় না জয়ন্তী এখনি উঠে বসুক। জেগে উঠেলেই তো সেই অস্থিরতা, চিৎকার, কান্না।তারপরেই মাথা ঘুরেতার চেয়ে যতক্ষণ পারে ঘুমিয়ে থাকুক। প্রতীক্ষার ক্ষণ কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে কে জানে!
জয়ন্তীর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে সমরজিৎ ভাবেন, মায়ের মন কি আগে থেকে সন্তানের অনাগত বিপদের আঁচ পায়? হয়তো কেন, অবশ্যই পায়, না হলে..কস্তুরীর পরামর্শমতো সে ঠিক করল লেক গার্ডেন্সে গিয়ে জয়ন্তীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

AMARBOI.COM

পরক্ষণেই মত বদল করল দুটো কারণে। ওখানে আত্মীয়-সমাগম হবে। রাতে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার। এই ছন্নছাড়া মানসিক অবস্থায় রুম্পার ব্যাপারটা কিছুতেই চেপে রাখা সম্ভব নয়। জয়ন্তীকে সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে। আর দ্বিতীয় কারণ, জনে-জনে সব্বাইকে ব্যাখ্যা করে বলা, কী ব্যাপার! কেন এমন হল! কী করে হল! সর্বোপরি কন্তুরী যখন বলেছে ঘটনাটা যথাসম্ভব গোপন রাখতে, যেন মিডিয়ার কানেও কিছু না যায়, সেদিকেও সতর্ক থাকতে, তখন নিজে না গিয়ে বিনোদকেই ফোন করে বলে স্কুলের গেটে রুম্পার জন্য ওয়েট করার দরকার নেই, সে যেন এখনিই লেক গার্ডেন্সে গিয়ে বউদিকে নিয়ে বালিগঞ্জে ফিরে আসে। ওর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। রুম্পাকে অফিসফেরত তুলে নেবে সে।

এই কথাগুলো সরাসরি জয়ন্তীকে বলতে গিয়েও পারেনি। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে। তবে যা ভেবেছিল যে, জয়ন্তীর ফোন আসবেই, এল আধঘণ্টা পর। একঝাঁক প্রশ্নের বাণ।

"কী হল হঠাৎ? ডাক্তার দেখিয়েছ? তুমি এখন কোথায়? আর রুম্পা? ওর তো আজ তিনটেয় ছুটি! ওকে নিয়ে এসেছ?"

"শোনো, আমি ফিরে এসেছি, তুমি বেরোওনি এখনও?"

"বেরব বললেই কি বেরনো যায়! পাকা দেখার ব্যাপার! কত কৈফিয়ত দিতে হবে তা জানো? এখন কেমন বোধ হচ্ছে?"

"কিছুটা ভাল।"

"তা হলে চলে এসো। কতক্ষণ আর লাগবে... রুম্পাকে একবার দাও তো।"

এবার সে প্রমাদ গোনে। কথাটা ফোনে জানানো কি ঠিক হবে? ওর অনুপস্থিতির অজুহাতটাই বা কী!

"কী গো! রুম্পা কোথায়? ওকে একবার দাও না..." রুম্পার নাম করতে গিয়ে হোঁচট খায়।

"রুম্পা? ও তো আসেনি।"

এবার তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল জয়ন্তীর দিক থেকে।

"তার মানে? রুম্পা আসেনি মানে! কী বলছ তুমি?"

স্বর যথাসাধ্য স্বাভাবিক রেখে সমরজিৎ বলেছে, "ওদের স্কুলে কী একটা রিহার্সাল চলছে, দেরি হবে, তুমি আগে বেরোও তো।"

"কী যা তা বলছ, কীসের রিহার্সাল! ও তো কিছু বলেনি!"

প্রায় চিৎকার করে জানতে চেয়েছে, "সত্যি করে বলো, রুম্পা কোথায়? এতক্ষণে তো ওর ছুটি হয়ে যাবার কথা।"

"শোনো, শোনো এভাবে চেঁচিয়ো না। চিন্তার কিচ্ছু নেই, যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো, একদম দেরি কোরো না।"

ফোনের প্রথম লহরী কানে যেতেই সমরজিৎ শশব্যস্ত হয়ে টেবিলের উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সেলটা হস্তগত করেন। স্ক্রিনে চোখ বুলিয়ে কার্যত হতাশই হন তিনি। না, কন্তুরীর ফোন নয়। র‍্যানসম বা বারগেন কলারও নয়... লেক গার্ডেন্স থেকে জয়ন্তীর দিদি।

"তোমার শরীর এখন কেমন? প্রেশার বাড়ল নাকি?"

"এখন কিছুটা ভাল।"

"শোনো, জয়ন্তীকে একবার দাও তো..."

"ও একটু..."

"তা হলে ওকে বলবে, রাতে যেন রান্না-বান্না না করে, তোমার দাদা গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

সমরজিৎ সতর্ক হয়, এই বাউন্সারটা কী করে সামলাবে।

"না, না, দিদি, ওসবের কোনও দরকার নেই... কেন দাদাকে খামোখা..."

"কী বলছ কী! এত সব আয়োজন, কতরকমের পদ, তোমাদের না খাইয়ে আমাদের মুখে রুচবে!"

"দিদি শুনুন... জয়ন্তী কিছুক্ষণ পরে ফোন করবে...এখন রাখি।"

সবে রেখেছে, ঝনঝনিয়ে তরঙ্গ তুলল ফোন। ঝুঁকে পড়ে দেখল, কন্তুরীর কল।

"হ্যাঁ, কন্তুরী বলুন, রুম্পার কোনও খবর?"

"স্যার আমরা এখনও রাস্তায়, কিছুটা সময় লাগবে, তবে মনে হয় আর কিছুক্ষণের মধ্যে ভাল খবর দিতে পারব।"

"ও কেমন আছে, কিছু জানা গেল?"

"সুস্থই রয়েছে এটুকু বলতে পারি।"

"এত নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?"

"এই মুহূর্তে সেসব ফোনে বলা ঠিক হবে না, আর শুনুন স্যার..."

"শুনছি..."

"কোনও মিডিয়া পারসন যদি খুব বেশি কিউরিয়োসিটি দেখায়, এড়িয়ে যাবেন... প্রয়োজনে ধমকধামকও দেবেন। ঘটনাটা ফ্ল্যাশ হয়ে গেলে কিন্তু রুম্পার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাব...আর..."

বাকি কথাগুলে বলতে গিয়ে সংযত হয় কন্তুরী, কথার ঝোঁকে খেয়াল ছিল না যে সুইটি পাশেই রয়েছে। ওর উপস্থিতিতে কোনও কনফিডেনশিয়াল কথা বলা ঠিক হবে না।

"আর কি কিছু বলতে চান?"

"এখন থাক, পরে দেখা করে সব বলব। মিসেসকে নিয়ে এসেছেন?"

সমরজিৎ সবটাই জানায়। জয়ন্তীর শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে ফোন রাখতে যাবে, কন্তুরী ব্যস্ত হয়ে বলে, "স্যার যে জন্য ফোন করলাম সেই কথাটাই তো জানানো হল না..."

"হ্যাঁ শুনছি..."

"মঞ্জু, মানে মঞ্জু সাঁতরা ধরা পড়েছে।"

"হোয়াট! মঞ্জু ধরা পড়েছে! কোথায়? কখন?"

কন্তুরীর কাছে সবটা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাবেন, সমরজিৎ দেখলেন জয়ন্তী চোখ মেলে তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন।

{২১}

গুলু ওস্তাগর লেনের মুখে একটি বিএম ডব্লিউ কনভার্টিব্‌ল এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে। গলিটি অপ্রশস্ত। এত বড় গাড়ি ঢোকার কোনও প্রশ্নও নেই। মেহের আলি বসেছিল সামনের সিটের ড্রাইভারের পাশে। নেমে গাড়ির পিছনের দরজা খুলে ধরতেই প্রকাশ এবং প্রিয়াঙ্কা নেমে আসে। ঘড়িতে তখন প্রায় একটা। এত সুন্দর রাজহাঁসের মতো গাড়ি বোধ হয় এ তল্লাটে প্রথম ঢুকল। ছেলেছোকরারা ভিড় করে দূর থেকে দেখছে কমলা রংয়ের গাড়িটাকে। কয়েকটি হতদরিদ্র বাচ্চা মেয়ে খুব কাছ ঘেঁষে ভয়ে-ভয়ে গাড়িটিকে ছোঁয়, যদি ড্রাইভারকাকু বকে দেয়।

মেহের আলি আগে দু'বার গুলু ওস্তাগর লেনে এসেছে। বাড়িটা চেনে। এই মে মাসের চাঁদি ফাটা রোদ্দুরে ভরদুপুরে ওরা পায়ে-পায়ে এগোয় মানুষজনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি গায়ে মেখে মেহেরের পিছু-পিছু। একটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত হয়েই মেহের হাঁক পাড়ে, "রহিমভাই! রহিমভাই! বাড়ি আছেন তো?"

সিড়িঙ্গে চেহারার একটি মানুষ বেরিয়ে আসে। তার পরনে ফতুয়া আর চেকলুঙ্গি।

"মেহের ভাই... এসে গিয়েছেন? আসুন... আসুন বহিন... নমস্তে।"

রহিম শশব্যস্তে ওদের আপ্যায়ন করে ওর ছোট্ট ঘরটায়। ইতিমধ্যে ঘরে উঁকি দিয়েছে ওর বিবিজান আর ছেলেমেয়ে।

"বসুন বাবু... মেহেরভাই সকালেই ফোন করেছিলেন, ভাবলাম ফের সাক্ষী দিতে হবে কি! একবার তো হয়ে গিয়েছে চার মাহিনা হল।"

প্রকাশ-প্রিয়াঙ্কা থিতু হলে মেহের বলে, "না রহিমভাই, ওসব কিছু না। ইনি হলেন জৈনসাহাব, মানে রতন জৈনের দামাদ প্রকাশজি আর এ হল বিটিয়া প্রিয়াঙ্কামাঈ। প্রিয়াঙ্কা বেটি, ইনি রহিম বক্স। যার সঙ্গে দেখা করার জন্য তোমরা পাগল।"

প্রিয়াঙ্কা হঠাৎই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, কোনওক্রমে চোখের জল সংবরণ করে বলে, "রহিমভাই..."

"হ্যাঁ জি..."

"বাদশা কেমন আছে? সুস্থ আছে তো?"

আসলে সেই ৬ নভেম্বরের ভোরে বাদশা আর রহিম বক্স যেভাবে

নিজেদের প্রাণ বাজি রেখে দুষ্কৃতীদের গাড়িটা ধাওয়া করেছিল তার পিতাজির জীবন রক্ষা করতে, সে গল্প সে শুনেছে মেহেরচাচার মুখে। শুনেও বারবার শুনতে ইচ্ছে হয়েছে। কবে থেকে ভেবেছে রহিমভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে, বাদশাকে আদর করবে। এরা যেন ওর সত্যিকারের আপনজন। জীবন তুচ্ছ করে ওদের হাতের থাকা ফায়ার আর্মসের ভয় উপেক্ষা করে যেভাবে চেজ় করেছে, সেই রহিমভাইরা সাহসিকতার পুরস্কার পাবে না! এত দিন কিছুতেই সময় করে উঠতে পারেনি, খালি ভেরাবল, দিল্লি, কলকাতা আর মুম্বই ছুটতে হয়েছে পালা করে। একে বাবার বিশাল সাম্রাজ্য, তার উপর গুজরাতের ভেরাবলে নতুন কডলিভার অয়েল প্রডাক্টসের ফ্যাক্টরি। কালই দুপুরের ফ্লাইটে ফিরে শুনল, আজ অর্থাৎ ২৮ মে থেকে ওর বাবার মার্ডার কেসের আরগুমেন্ট শুরু হচ্ছে। প্রিয়াঙ্কা শুনেছে, এই জজসাহেব খুব কড়া ধাতের মানুষ। সাক্ষীরা নাকি নির্ভয়েই সাক্ষ্য দিয়েছে। ওরা ঠিক করেছে রহিমের সঙ্গে দেখা করে আজ একবার সেশন কোর্টে যাবে চিফ প্রসিকিউটরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে।

প্রায় ৪০ মিনিট পরে ওদের গাড়ি রেস কোর্স রোড ধরে এগতে থাকে। বাঁ হাতে ব্যাটেলিয়ন কোয়ার্টার, পুলিশ ট্রেনিং স্কুল ছেড়ে সোজা কিছুটা গিয়ে ক্রশিংয়ে আটকে যায়। এই ক্রশিংটা বড্ড ভোগায়। বাঁয়ে গেলে চিড়িয়াখানা, আর সোজা রাস্তায় খিদিরপুর এবং দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ফ্লাইওভার।

ফোনে মা-কে সবটা জানাচ্ছিল প্রিয়াঙ্কা। কারণ মা-ও আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন যে, ওরা যেন রহিম বক্সের সঙ্গে দেখা করে। সিগন্যাল গ্রিন হতে কথাবার্তার ফাঁকেই প্রিয়াঙ্কা লক্ষ করল যে, সামনের কালো স্করপিও থেকে কিছু একটা যেন বাতাসে গোঁত্তা খেতে-খেতে সামনে ফুটপাথে পড়ল। ঘাড় বাঁকিয়ে কাচে চোখ সেঁটে সে দেখল, একটা বই বা খাতা। তারপর গাড়ি স্পিড তুলে এগতে থাকে। বেশ কয়েক সেকেন্ড কালো স্করপিওটা প্রিয়াঙ্কার চোখের আওতায় থাকলেও যেই ওদের গাড়ি ফোর্ট উইলিয়াম যাওয়ার ঢালু রাস্তায় নামল, সেটি আর চোখে পড়ল না। সে তখন উন্মত্ত গতিতে টোল প্লাজ়ার দিকে এগচ্ছে। মায়ের সঙ্গে কথা হয়ে গেলে প্রিয়াঙ্কা সেল-এর ফোটো গ্যালারিতে ঢোকে। বেশ ক'টি ছবি তুলেছে বাদশার, সঙ্গে রহিমভাইয়ের ফ্যামিলিরও। ফোটোগুলো দেখতে-দেখতে প্রিয়াঙ্কা বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল। বাবা যদি জীবিত ফিরে আসতেন, নিশ্চয়ই রহিমভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। মানুষের বিপদে-আপদে রাস্তাঘাটে যেখানে সহযাত্রীরাই ঘুরে তাকায় না, উটকো ঝামেলায় জড়াতে চায় না, রহিমবক্স সেখানে কী প্রবল জেদের বশে বাদশাকে ছুটিয়ে ওদের চেজ় করেছে। ওরা সব শার্প শুটার। যদি শুট করত! ভাবতেই শিউরে ওঠে প্রিয়াঙ্কা। রহিমভাই নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে বাবার কেউ ছিল।

প্রকাশ, মা-জির সঙ্গে সমস্ত আলোচনা সেরেই এসেছিল। রহিমবক্সের ফ্যামিলির সব দায়িত্ব ওরা নিতে চায়। প্রস্তাবটা পাড়তেই রহিম কয়েক মুহূর্ত চুপ। ওর স্ত্রী মর্জিনা চোখ বড়-বড় করে অবিশ্বাসী দৃষ্টি মেলে শুনেছে। রহিম হঠাৎ বলে ওঠে, "তোবা! তোবা! বাবুসাব! আল্লাতালা এই হাতদুটো দিয়েছেন খেটে খেতে। পরের পয়সায় বসে-বসে খেলে গুনাহ হবে। মাফ করবেন জনাব, টাকাপয়সার লোভ দেখাবেন না... আমাকে আর বাদশাকে যে মনে রেখেছেন, এতেই আমরা খুশি।"

তখন প্রকাশ বলেছে, "তা হলে আমরা যে খুবই দুঃখ পাব!"

প্রিয়াঙ্কাও সঙ্গে-সঙ্গে বলেছে, "রহিমভাই, আমার মা আপনাকে তাঁর সন্তানের জায়গায় বসিয়েছেন, আপনারা বিমুখ করলে ওঁকে কী বলব?"

রহিম এবার ধর্মসংকটে পড়ে যায়। তখনই মেহেরচাচা প্রস্তাবটা পাড়ল। সবাই মিলে এটা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল। মেহেরচাচা রহিমভাইয়ের হাতদু'টি ধরে বলেছে, "ঠিক আছে দোস্ত! টাকাপয়সা-দানসামগ্রী নিতে হবে না। কিন্তু ওদের নতুন প্রতিষ্ঠানে কর্মী হিসেবে যোগ দিতে তো পারো। সেখানে তো খেটেই খেতে হবে তোমায়!"

তারপরেই প্রকাশ দিয়েছে ভেরাবলের প্রস্তাব। রহিমবক্সের মতো বিশ্বস্ত মানুষজন তার খুব প্রয়োজন। প্রিয়াঙ্কা বুঝিয়েছে মর্জিনাকে। ছেলে-মেয়ে সবাইকে নিয়ে গুজরাতে চলুক, ওদের শিক্ষার সব দায়িত্ব কোম্পানির। থাকার ব্যবস্থাও সুন্দর ছিমছাম। মর্জিনার চোখে তখন এক সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। নিশ্চিন্ত সুরক্ষা, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যেন ওকে সুখের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

শেষ-মেশ ঠিক হয়েছে ওদের জুড়িগাড়ি আর সুলতান-বাদশা রহিমের ভাইপোর দায়িত্বে থাকবে। প্রিয়াঙ্কা একটি কড়া শর্ত দেয়। বাদশার দেখভালের যেন কোনও ত্রুটি না হয়। কারণ প্রকাশ আর প্রিয়াঙ্কা বাদশাকে অ্যাডপ্ট করছে। ওদের জন্য যা মাসোহারা পাঠানো হবে, তাতে সুলতান আর বাদশার ভালভাবেই সেবা-শুশ্রূষা করা যাবে। এও ঠিক হল, রহিম প্রকাশের সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যেই উড়ে যাবে ভেরাবল, সব কিছু সরেজমিনে দেখে আসতে।

একসময় প্রিয়াঙ্কা মেহেরচাচাকে ইশারা করে গিফ্‌টগুলো এবং খাবারের সামগ্রী রহিমভাইয়ের হাতে তুলে দিতে। প্রিয়াঙ্কা মর্জিনার থুতনি ধরে ঘনিষ্ঠ হয়ে আন্তরিকতার গলায় বলে, "বহিন, এই সামান্য কিছু..."

গাড়ি বিচারভবনের কম্পাউন্ডে ঢুকতেই মেহের আলি বলে, "প্রিয়াঙ্কা বেটি, তুমি বোসো, আমরা এখনিই আসছি, চিফ প্রসিকিউটরের সঙ্গে দেখা করেই..."

প্রিয়াঙ্কা জানাল সে-ও যাবে। শিবনাথ আঙ্কলকে প্রণাম করতে।

{২২}

একটু পরেই এসপি দীপ্যমানের গাড়ি কন্তুরীর সাদা স্করপিওর সামনে এসে দাঁড়ায়। ওর সিকিওরিটি দরজা খুলে ধরতেই দীপ্যমান লম্বা-লম্বা পা ফেলে কন্তুরীর দরজার সামনে এসে হাজির। অর্ক-দেবদাস ততক্ষণে নেমে এসেছে। প্রথামাফিক স্যালুটপর্ব সারা হতেই দীপ্যমান বলে, "সব কথা পরে হবে। এখন শুধু জেনে রাখুন আপনার রুম্পা রেসকিউড। সি ইজ় হেল অ্যান্ড হার্টি। দ্যাট রাওডি ইজ় ইন আওয়ার কাস্টডি। ড্রাইভারও। এখন আমার গাড়িকে ফলো করুন।"

দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নেমে বাঁ-দিকে ঢালু রাস্তা বেয়ে এগয় ওদের গাড়ি। এবার সুড়ঙ্গ পথে উপরের হাইওয়ের তলা দিয়ে আড়াআড়ি মেমারি স্টেশন যাবার রাস্তা ধরে এগতে থাকে। একটা বাঁক পেরোতেই দূর থেকে জটলা চোখে পড়ে। আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখল, একটা ডাবওর্ডি রিক্‌শাভ্যান আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো স্করপিওকে ব্লক করে। পাশেই ষন্ডামার্কা চেহারার ভ্যানওয়ালা হাফ প্যান্ট আর তেলচিটে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে, গামছাটা ফেট্টির মতো করে মাথায় জড়ানো। বেশ বড়সড় একটা হেঁসুয়া ডাবের গায়ে আলতো করে গাঁথা।

সুইটিকে আর্মডগার্ডদের দায়িত্বে রেখে কন্তুরী ঝটিতি নেমে আসে, সঙ্গে অর্ক, দেবদাসও।

এসপি দীপ্যমান মেমারি থানার ওসি পলাশ নন্দীর নাম ধরে ডাকতেই যে লোকটি চট করে এসে হিল-স্যালুট করল, সে আর কেউ নয়, সেই ভ্যানওয়ালা।

কন্তুরী এবং সেই সঙ্গে অর্ক-রাও বিস্ময়ে হতবাক।

"আপনি।"

"হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি পলাশ নন্দী, ওসি মেমারি। আগে সবাই ডাব খান একটা করে, গরমে নিশ্চয়ই সকলের গলা শুকিয়ে কাঠ," বলেই খুব অভ্যস্ত হাতে ডাব কেটে স্ট্র লাগিয়ে কন্তুরীর হাতে ধরিয়ে দেয়। তারপর এসপি সাহেব এবং অন্য সবাইকে।

বহুক্ষণ বাদে প্রাণখুলে হাসল কন্তুরী। সারাটা দিন যা যাচ্ছে। দ্রুত গলা ভিজিয়ে সে রুম্পার কাছে আসে। দেখল সে ব্ল্যাক স্করপিওর ভিতরে শুয়ে আছে আর মিটিমিটি দেখছে সবাইকে। একজন

ডাক্তারবাবু রুম্পার শুশ্রূষায় ব্যস্ত। ডাক্তারের পরামর্শে এবার তাকে ডাবের জলে গ্লুকোজ় মিশিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। তাই সে উঠে বসেছে।

কস্তুরী রুম্পার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় হাত রেখে অভয় দেয়, "এখন কেমন বোধ করছ মামণি? আর কোনও ভয় নেই," বলতে-বলতে চোখ ছলছল করে ওঠে কস্তুরীরই।

ভিতু-ভিতু চোখে রুম্পা তাকায় কস্তুরীর দিকে।

"ভয় নেই। দাঁড়াও, তোমার বাবাকে আগে ফোনটা করি।"

এতক্ষণে কথা ফোটে রুম্পার মুখে, "তুমি বাবার ফোন নম্বর জানো?"

"জানি বইকী! এই দ্যাখো..." বলেই সমরজিতের নাম্বারে বাটন পুশ করে। রিং হচ্ছে... হচ্ছে... সমরজিতের স্বর শোনা যেতেই বলে, "স্যার, কস্তুরী বলছি... ভেরি গুড নিউজ়। রুম্পাকে উদ্ধার করা গিয়েছে, সে এখন আমাদের কাছে। ওর মাকে বলুন রুম্পা সুস্থ আছে। এই নিন, রুম্পার সঙ্গে কথা বলুন।"

ফোনে বাবার গলা পেয়েই কান্নায় ভেঙে পড়ে রুম্পা, "হ্যাঁ বাবা, ওই পাজি লোকটা আমাকে আর্মস নিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল। মা-কে একটু দাও না বাবা।"

জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর শুনেই রুম্পার প্রথম প্রশ্ন, "মা, আমার বদরি-মুনিয়াগুলো কেমন আছে? জানো মা, মঞ্জুদি খুব বাজে।"

কস্তুরী কিছুটা সরে দীপ্যমানের কাছে আসে, "সত্যিই দীপ্য, তুমি আজ যা করলে, কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই... ভাগ্যিস ব্যস্ততম

দ্রুত গলা ভিজিয়ে সে রুম্পার কাছে আসে। দেখল সে ব্ল্যাক স্করপিওর ভিতরে শুয়ে আছে আর মিটিমিটি দেখছে সবাইকে।

এসপি সাহেবকে ফোনে পেয়েছিলাম, না হলে এতক্ষণে আসানসোল ছাড়িয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে যেত।"

দীপ্যমান এই প্রশস্তিবাক্যে কুঁকড়ে যায়, "কী বলছেন ম্যাডাম! এটা তো আমাদের ডিউটির মধ্যেই পড়ে। কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন উঠছেই বা কেন..."

"বা রে! তোমার অ্যাকটিভ পার্টিসিপেশন কতটা ভরসা জুগিয়েছে জানো! কোনও ভিভিআইপি ডিউটিতেও তো ফেঁসে যেতে পারতে। তখন রুম্পার লাইফ রিস্ক এক্সট্রিম পয়েন্টে চলে যেত। তাই না?"

বিন্দুমাত্র না দমে দীপ্যমান বলে, "তা যদি বলেন, এই 'অপারেশন-রুম্পা'-র পুরো কৃতিত্ব কিন্তু ওসি পলাশ নন্দীর। ওর মাথা থেকেই এসব 'গো অ্যাহেড ইউ লাইক' প্ল্যান বেরিয়েছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে পলাশ নন্দীর দিকে ফিরে কস্তুরী ওকে অভিনন্দন জানায়। ওসি পলাশ নন্দীও এই কৃতিত্বটা ঝেড়ে ফেলতে চেয়ে, ডাক্তার কুণ্ডুকে সামনে নিয়ে আসে।

ডাক্তার কুণ্ডু নমস্কার জানিয়ে খুবই সংকোচের সঙ্গে পরিচয় দেন, "আমি ডাক্তার পার্থসারথি কুণ্ডু। মেমারি স্টেশনবাজারেই আমার চেম্বার।"

কিছুক্ষণ আগে যা-যা ঘটেছে, সংক্ষেপে তার উল্লেখ করে বুকপকেটে রাখা দু'টি কাগজের স্লিপ কস্তুরীর হাতে তুলে দেয়।

"এই নিন ম্যাডাম! এই মহামূল্যবান কাগজের টুকরো দু'টি ওর প্রেশার মাপার সময় আমার চোখে না পড়লে কিছুই করতে পারতাম না। বরং বলব, রুম্পা নিজেই নিজেকে রক্ষা করেছে, স্রেফ ওর বুদ্ধি খাটিয়ে।"

চোখ বুলিয়ে কাগজের স্লিপদুটো দেবদাসের হাতে দিতে গিয়েই কস্তুরীর মনে পড়ে যায় একটি কথা। ঘনিষ্ঠ হয়ে রুম্পাকে একপ্রস্ত আদর করে সে জানিয়ে দেয়, "সংস্কৃতের যে খাতাটা রাস্তায় ফেলেছিলে, সেটি এক ভদ্রলোক কুড়িয়ে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছেন। দারুণ মাথা খাটিয়ে বের করেছ তো!"

এক ফাঁকে একজন সসম্ভ্রমে পলাশ নন্দীর কাছে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, "বড়বাবু, এবার ভ্যানটা নিয়ে যাব?"

সম্মতি জানাতে গিয়েও ওসি এসপি সাহেবের মতামতটা জেনে নিতে চায়। দীপ্যমান রসিকতার সুরে বলে, "ও, তা হলে আপনিই সত্যিকারের ডাবওয়ালা?"

চওড়া হাসি হেসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ, স্যার।"

"ভেরি গুড! তা কত কী পাওনা হল আমাদের কাছে...পলাশবাবু, কত দেব ওকে?"

"ছাড়ুন তো স্যার, ১১টা ডাবের দাম আর কত? ভানু কত হল?"

ডাবওয়ালা ভানু দামটা বলতেই দীপ্যমান ২০০ টাকা বের করে ওর হাতে দেয়। ভানু শশব্যস্তে ১০০ টাকা বের করে ফেরত দিতে চাইলে এসপি বলেন, "ওটা রেখে দিন, আপনার ভ্যানের ভাড়া।"

অর্ক এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল সব। পলাশ নন্দীকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবে বলে উসখুস করছিল, ফাঁক পেতেই জিজ্ঞেস করে বসে, "আপনার ডাবওয়ালা সাজার আইডিয়াটি সত্যিই অভিনব, কিন্তু ওভার পাওয়ার করলেন কী করে? লোডেড অটোমেটিক তো রাওডিদের কোমরে গোঁজাই থাকে।"

প্রশ্নটা শুনে দীপ্যমান ও কস্তুরীও পলাশ নন্দীর দিকে তাকায়। সত্যিই! আসল ঘটনাটাই তো শোনা হয়নি! এলোপাথাড়ি এনকাউন্টার শুরু হলে তো রুম্পারও গুরুতর ক্ষতি হতে পারত।

হঠাৎ কী মনে করে কস্তুরী ঘড়ি দেখল। তাই তো! ওঁকে এখনই রুম্পার খবর জানানো দরকার। কিন্তু ওর ফোন নাম্বার...

সবার কাছে একটু সময় চেয়ে কস্তুরী রুম্পার কাছে আসে, "আচ্ছা রুম্পা তোমার স্কুলের ফোন নাম্বারটা বলতে পারবে?"

নাম্বার রুম্পার মুখস্থ। সে বলে দেয়। ক্লাসের খাতাও বের করে দেয়। তাতেও স্কুলের ল্যান্ডলাইন নম্বরটা জ্বলজ্বল করছে।

ফোনে কস্তুরীর সংক্ষিপ্ত বার্তাটুকু পেয়েই সুনন্দা বসাক কেঁদে উঠলেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, "বিশ্বাস করুন, নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না, এরকম মারাত্মক একটা ভুল! এই নাক-কান মলছি... নো আর্লি ডিপারচার, বাবা-মা সশরীরে না এলে নৈব-নৈব চ। সবাই চলে গিয়েছে। তবু আপনার বা রুম্পার বাড়ির লোকের ফোনের আশায় ফোনের পাশে বসে আছি। উফ কী যে নিশ্চিন্ত করলেন। আশঙ্কার কাঁটা কুরে-কুরে খাচ্ছিল... যাক রাতে তা হলে একটু ঘুমোতে পারব। আর একটা কথা... রুম্পার উপর দিয়ে যা ধকল গেল, ক'টা দিন রেস্ট নিক।"

সেল অফ করে জটলার কাছে ফিরে এসে কস্তুরী বলেন, "হ্যাঁ, বলুন মিস্টার নন্দী... "

"তেমন কিছু নয় ম্যাডাম, ডাক্তার কুণ্ডুর আর্জেন্ট কলটা পেয়েই বড়সাহেবকে বলি। সবাই তখন হাইওয়েতে, মেমারি পয়েন্ট থেকে দু'কিমি আগে ব্যারিকেড করে গাড়ি চেকিংয়ে ব্যস্ত। আপনার নির্দেশমতো কালো স্করপিও ছাড়া অন্য গাড়িরও চেকিং চলছে। বড়সাহেব পারমিশন দিতেই নিজে গাড়ি ছুটিয়ে চলে আসি। কারণ যত শিগ্‌গির পারি ব্যারিকেড পয়েন্টে ফিরতে হবে আবার।

"মজার কথা ম্যাডাম, এই পথ দিয়েই গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় এই স্করপিওটিকেই দেখেছি হাইওয়ের দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার একপাশে কিন্তু তখন তো অন্য কথা ভাবার স্কোপ নেই। মাথায় তখন ডাক্তার কুণ্ডুর এক্সট্রা অর্ডিনারি রিকোয়েস্ট, 'এখনই চলে আসুন!' এখন ভেবে হাসি পাচ্ছে। যে গাড়িটাকে ধরার জন্য হাইওয়েতে জাল পাতা হয়েছে, সেই ব্ল্যাক স্করপিও সশরীরে হাজির।"

দীপ্যমান এই ফাঁকে যে কথাটা বলল, কস্তুরীও তার সঙ্গে একমত হলেন। কারণ পুলিশের গাড়ি দেখলে অপরাধী সতর্ক হয়ে আর্মস বাগিয়ে প্রস্তুত থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

"হ্যাঁ স্যার। কথাটা একেবারে সত্যি... এই ধরনের ক্রিমিনালরা খুবই ওস্তাদ খেলুড়ে। তা যা বলছিলাম। ডাক্তার কুণ্ডু আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কিছু খুলে বলতেই সঙ্গে-সঙ্গে থানায় ফোন করে দ্রুত ফোর্স চেয়ে পাঠালাম আর এসপি সাহেবকে জানিয়ে দিলাম ব্যারিকেড সরিয়ে গাড়ির চেকিং বন্ধ করতে। আরও বললাম কিছুটা এগিয়ে এসে অয়েলমিলের বাঁকের আড়ালে এমনভাবে রোড ব্লক করবেন, যাতে গাড়িটা পালাতে না পারে। ফোর্স যেন অ্যাম্বুশ করেই থাকে। খুব দ্রুত ডাবভর্তি ভ্যান চালিয়ে নিয়ে গাড়ির কাছাকাছি এসেই হাঁক ছাড়লাম, 'বাবু, ডাব দেব? কচি ডাব ১০ আর মালাই ডাব ১৫।' ফাঁদে পা দিয়েই শয়তানটা দরজা খুলে নেমে এল।

হয়তো, সত্যি তেষ্টাও পেয়েছিল, কিন্তু গাড়ির ভিতরে কেউ আছে কি না বুঝতে পারছিলাম না ডার্ক গ্লাসের জন্য। লক্ষ করলাম, সে গাড়ির পাল্লা অল্প ফাঁক করে জিজ্ঞেস করছে, 'গুড়িয়া, ডাব খাবে?'

"বুঝলাম মেয়েটা শুয়ে রয়েছে। যেন দেরি হয়ে যাচ্ছে, এরকম ব্যস্ততা দেখিয়ে ফের জিজ্ঞেস করি, 'কি বাবু ডাব খাবেন? না যাব?' চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে সে ভ্যানের কাছে এসে বলল, 'মালাইওয়ালা নারিয়েল দো।' আমি বললাম, 'একটা না দুটো?' মুখে কিছু না বলে বাঁ হাতের তর্জনী তুলে ও ইঙ্গিত করল একটা দিতে। আড়চোখে দেখলাম ডান হাত কোমরের পিছনে সেঁটে রেখেছে আর বারবার তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক, বিশেষ করে স্টেশনের দিকে। আমরা তো জানি এই ধরনের ক্রিমিনালরা খুব শার্প শুটার হয়। আমার স্টেপিংয়ে একটু গড়বড় হলেই চোখের পলকে ওর হাতে উঠে আসবে কোমরে গোঁজা যন্ত্রটা। হাতের ধারালো দা-টাকে কাজে লাগাব কি না ভাবছিলাম, তারপর ভাবলাম, না রক্তারক্তি হয়ে যেতে পারে।"

দেবদাস অধৈর্য হয়ে বলে, "কী করলেন তা হলে?"

"একটি হৃষ্টপুষ্ট ডাবকে ডান হাতের দাবনায় বেশ জব্দ করে ধরে যেন পরীক্ষা করে দেখছি, ভাল শাঁস হয়েছে কি না। তারপর যে মুহূর্তে দেখলাম, ও ফের ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে ওর ড্রাইভার আসছে কিনা, চোখের পলকে ভ্যানের এপার থেকে মারলাম ছুঁড়ে, যেন স্পোর্টসের শটপাটের মতো। অব্যর্থ নিশানা, লাগল ঠিক পেটে। পড়ে গেল চিৎপাত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমি একলাফে ওর বুকের উপর, আমার ৮০ কেজি ওজনের ভারে ও একেবারে বেদম!

"হাতসাফাইয়ের কায়দায় তুরন্ত ওর ট্যাক হাল্‌কা করে যন্ত্রটা হাতিয়ে নিলাম। আর ভ্যানে ব্যাগের আড়ালে লুকোনো হ্যান্ডকাফ বাঁ হাত দিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে... তখন যেন এক দানবীয় শক্তি ভর করেছে আমার উপর, ডান হাতে প্রবল এক ঘুসি বাগিয়ে ওকে বলেছি, 'বেগড়বাই করলে চোয়াল ভেঙে দেব...' বলতে-বলতেই রাস্তার উপর ওকে চেপে ধরে উপুড় করে শুইয়ে পিঠের উপর বসে পড়ি আর ওর হাতদুটো হ্যান্ডকাফে লক করি... সঙ্গে-সঙ্গে ওর সেলটাও তুলে নিই।

"তখন আমার হাঁফ ধরে গিয়েছে। হঠাৎ দেখি দরজা খোলা পেয়ে মামণি নেমে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। তবে স্যার পুলিশ হতে পারি, নির্দয় নই। ওকে তেষ্টায় রাখিনি। কচি ডাব কেটে স্ট্র ভরে ওর মুখের সামনে ধরে রেখে পুরোটা খাইয়েছি। আমার হুইসেল পেয়েই ফোর্স চলে আসে।"

{২৩}

লম্বা বরবটির এক দিক সে ধরে আছে, অন্য প্রান্তটি খাঁচার ভিতর। কিচিরমিচির থামিয়ে ওরা সবাই বরবটির সদ্ব্যবহার করছে। সাইজ ছোট হয়ে আসতেই রুম্পা সেটিকে সযত্নে ওদের খাবারের পাত্রে ফেলে দেয়। বাঁ হাতের মুঠোয় ধরা গুচ্ছ থেকে আবার একটা প্রমাণ সাইজের বরবটি নিয়ে বাড়িয়ে ধরে সস্নেহে। ওরা যতটা না খায়, তার চেয়ে ছড়ায় বেশি। মেঝেময় কাঁকরি দানা সর্ষের মতো ছড়ানো। আর নোংরার তো কথাই নেই। মেঝে ধুতে-ধুতে মা তিতিবিরক্ত। তাই প্লাস্টিকের ব্যবস্থা করা হয়েছে, দরকার মতো বদলে বাথরুমে ধুয়ে নেওয়া হয়। দেওয়াল জুড়ে বিশাল খাঁচা। তার মধ্যে পার্টিশান করে এক পাশে বদরি অন্য পাশে পাহাড়ি মুনিয়াদের সহাবস্থানের ব্যবস্থা। সমুদ্রের জমাট সাদা নোনতা ফেনা বদরিদের খাঁচায় রাখতেই হয়, ওরা মাঝে-মাঝে এসে সেই জমাট নোনতার স্বাদ নেয়। রুম্পা দেখল, ফেনার সাইজটা বেশ ছোট হয়ে এসেছে।

বরবটি খাওয়ানোর ফাঁকে ওর চোখ খুঁজে বেড়ায় তিনটে নতুন ছানাকে। একটু পরেই আবিষ্কার করল হাঁড়ির ভিতরই রয়েছে, ওদের মা উগরে-উগরে সবক'টাকে খাওয়াচ্ছে পরপর। কালারগুলো যা হয়েছে না, একটা টার-ব্লু, একটা গ্রিন আর ইয়েলোর মিশ্রণ, অন্যটা সাদা। নতুন সদস্যদের নিয়ে এখন রুম্পার সংগ্রহে মোট ১৪টা বদরি আর ২১টা মুনিয়া। জয়ন্তীও দাঁড়িয়ে ছিলেন রুম্পার পাশেই। একটা গাড়ির শব্দে নীচের দিকে তাকিয়ে একজন মহিলাকে নামতে দেখলেন, সঙ্গে সিকিওরিটির ইউনিফর্মে কেউ। চেনা-চেনা মনে হলেও ঠিক স্মরণে আসছে না। রুম্পাকে ডেকে বললেন, "দ্যাখ তো, এঁকে চিনিস কি না! অনন্যার মা কি?"

একঝলক দেখেই রুম্পা চিৎকার করে ওঠে, "চঞ্চলকাকু, তুমি? ম্যাম! সিঁড়ি এদিকে, মা হেডমিস!"

বেসিনের আয়নায় দাঁড়িয়ে সমরজিৎ শেভ করছিলেন। রুম্পার 'হেডমিস' কানে যেতেই নিজেকে দ্রুত পরিষ্কার করে এসে দাঁড়ায় সুনন্দা বসাককে অভ্যর্থনা জানাতে।

ঘরে ঢুকেই ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সুনন্দা। রুম্পাকে কাছে টেনে বলতে শুরু করেন, "মাই ডার্লিং ডটার, তুমি কী চিন্তায় যে আমাকে ফেলেছিলে..." তারপর কোনও মতে চোখের জল সামলে বলতে পারলেন, "দোষটা আমারই... তোমার কোনও ক্ষতি হয়ে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না, তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

একসময়ে চায়ে চুমুক দিয়ে জানালেন, কেন সকাল-সকালই ছুটে এসেছেন, "আসলে কাল ঘুমোতেই পারিনি। নিজেকে রুম্পার জায়গায় বন্দিদশায় ভাবছিলাম বারবার। কী ধকলটাই না গেল ওর উপর দিয়ে। কাল কস্তুরী ম্যাডাম যখন বিকেলে ফোনে আমাকে সব জানিয়ে আমার উৎকণ্ঠার অবসান ঘটালেন, তখনই ওঁকে বলেছি, রুম্পা ক'টা দিন বিশ্রাম নিক। স্কুলে আসার দরকার নেই। কিন্তু রাতে চিন্তা করে দেখলাম, ও স্কুলে আসুক, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাক। ওর ট্রমাটা তাড়াতাড়ি কেটে যাওয়া দরকার, বিশ্রী চ্যাপ্টারটা ভুলে যাওয়াই ভাল... কী রে স্কুলে যাবি আজকে?"

রুম্পা তো উল্লসিত। হেডমিস তার বাড়িতে এসেছেন, সে যেন পা বাড়িয়েই রয়েছে।

কাল সন্ধে সাতটার কিছু পরেই কস্তুরী নিজে এসে রুম্পাকে তার বাবা-মার কাছে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। ফিরে যাওয়ার সময় কস্তুরী বলেছে, কালই ও সেই সংস্কৃত ক্লাসের খাতাটা ফেরত পেয়ে যাবে। কস্তুরীর হাতদুটো নিজের হাতে নিয়ে বিপর্যস্ত জয়ন্তী কোনওক্রমে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছে, "এ ঋণ কখনও ভুলব না! যা করলেন..." আর সামলাতে না পেরে ডুকরে কেঁদেই ফেলেছিল। সমরজিৎ ঠিক সময়ে এসে না ধরলে হয়তো পড়েই যেত টাল সামলাতে না পেরে। সেই অবস্থাতেই শক্তি সঞ্চয় করে কস্তুরীকে জিজ্ঞেস করে, "মঞ্জু নাকি ধরা পড়েছে?" ওর মনে একটাই প্রশ্ন, "আমাদের এত বড় সর্বনাশ করতে ওর মন সায় দিল? যদি ওর বাবা আসে, কাইভলি বলে দেবেন, ও দু'মাসের মাইনে নিয়ে যায়নি।"

"অবশ্যই বলে দেব। তবে আপাতত ওর ছাড়া পাওয়ার আশা নেই। কারণ দু'-দু'টো সেপারেট মারাত্মক কেসে জড়িয়ে গেল কি না..." সারাদিনের ধকলে বলতে গেলে সে-ও বিধ্বস্ত। বাড়ি ফিরে যে বিশ্রাম নেবে, তারও জো নেই। গুচ্ছের কাজ বাকি পড়ে আছে

টেবিলে। দেবদাস-অর্কদের দায়িত্বে শর্মা, বিল্লু ও সুইটিকে সেন্ট্রাল লক আপে পাঠিয়ে দেওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট থানার ওসিকে ডেকে পাঠানো হয়েছে হেডমিস সুনন্দা বসাকের এফআইআর সমেত। সঙ্গে সেই ডিউটি অফিসারকেও ডাকা হয়েছে, যে সুনন্দা বসাকের ওরকম মারাত্মক কলটাই রিসিভ করেনি। লালবাজার কন্ট্রোলের যে অফিসার হেড মিসকে সঠিক পরামর্শ না দিয়ে সস্তা জ্ঞান বিতরণ করেছিল তাকেও। আর সেই রেসকোর্সে ক্রসিংয়ের ডিউটিরত দু'জন মোবাইল সার্জেন্টদেরও রিপোর্ট করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। যদিও একটু আগেই ও যে খবর পেল, তাতে ওর ব্যাপারেই ওপরমহলে ভীষণ তোড়জোড় শুরু হয়েছে, একটা এসপারওসপার করার, হয়তো তল্পিতল্পা বাঁধতেই হচ্ছে।

তবু মুখে প্রাণবন্ত হাসি ধরে রেখে রুম্পাকে আদর করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। গাড়িতে ওঠার মুখে ওর সেল সাড়া দিল। কলারের নামটা ভেসে উঠতেই কস্তুরী চমকে ওঠে। চন্দ্রনাথদা, চন্দ্রনাথ শ্রীমানি। সিএমও অফিসে পুলিশ বা স্বরাষ্ট্রদপ্তর প্রায় একা হাতেই সামলান। কস্তুরীকে স্নেহও করেন বিস্তর।

দু'-তিনবার রিং হতেই কস্তুরী খুব আগ্রহভরে কলটা রিসিভ করে। তখন অন্য ফোনের স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে পুলিশ কমিশনার তপোব্রত চট্টোপাধ্যায়ের নাম। কস্তুরী বাজতে দিল, ইচ্ছে করেই ধরল না। কারণ কস্তুরী জানে ওঁর কীসের এত তাড়া!

{২৪}

গারদের ভিতর টুলে বসে টারজেন সিংহ অনেক কিছুরই হিসেব মেলাতে পারছিল না। জেলের যে ওয়ার্ডেন ওকে মোবাইল সাপ্লাই করে তার পাত্তা নেই কেন? সে ধরা পড়ে গিয়েছে, নাকি ছুটিতে? সুইটি কাল ভিজিটিং আওয়ার্সে এল না, এখনও তো তার পাত্তাই নেই! জজসাহেব তো বেশ খোশমেজাজেই রয়েছে দেখছি। তা হলে কি কাল সুইটির খতটা পেয়ে গিয়ে পুলিশ লড়কিকে রেসকিউ করে ফেলেছে? শালা চৌবেজি তো ঘাড় কেতরে চেয়ারে বসে আছে তো আছেই! বেল পিটিশনটা মুভ করছে না কেন? একটা বাজতে চলল! পিপি শিবনাথ ঘোষাল জোর কদমে আরগুমেন্ট করেই চলেছেন। কিছু-কিছু কথা কানে ঢুকলেও টারজেন অন্যদিনের মতো মন বসাতে পারছে না। সাক্ষীদের সাক্ষ্য ধরে-ধরে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। মনে-মনে শিবনাথ ঘোষালের উদ্দেশে কয়েকটা কটু স্ল্যাং উগরে দিয়ে একটু নড়ে-চড়ে বসে টারজেন।

টারজেন বুঝতে পারছে না জটাধারী এরকম ম্যাদা মেরে গেল কেন? কোনও ফিডব্যাক কি আসেনি? ...আচ্ছা, যদি লড়কি সুনীল-বিল্লুর কব্জাতেই থাকবে, তা হলে জজসাহেব এত নিশ্চিন্তে এজলাসে বসে আছেন কী করে? নাকি খুব হুঁশিয়ারে সওদা হয়ে গিয়েছে, হাবভাবে বুঝতে দিতে চান না। একবার জামিনটা হয়ে যাক, সোজা মালয়েশিয়া।

কথাটা অর্কদেরও কানে এসেছে। ক'দিন ধরেই লালবাজারে ফিসফাস চলছে ম্যাডামকে নিয়ে। অন্য কোথাও বাজে পোস্টিংয়ে শাস্টিং করে দেওয়া হবে। কিন্তু কেন? এমন কাজের অফিসার লালবাজারে ক'জনই বা এসেছে? ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ভোলটাই যেন বদলে গিয়েছে। কী প্রম্পট চার্জশিট হচ্ছে তাবড়-তাবড় সব কেসে।

"খুচলিটা কে দিচ্ছে বলো তো?"

দেবদাসের প্রশ্ন শুনে অর্ক নিচুস্বরে বলে, "খোদ সিএম।"

"আমিও সেটাই শুনেছি। কিন্তু কেন?"

"সে অনেক কথা। তবে এটা জেনে রাখ, ৯৭ পার্সেন্ট অফিসারের যা নেই, সেটা ওঁর ভীষণ পাকাপোক্ত এবং মজবুতভাবে রয়েছে।"

"বুঝলাম না।"

"বুঝলি না! শিরদাঁড়া। এতটাই সোজা যে ওটাই কাল হচ্ছে। অন্যসব 'য়য়ের খাঁ' অফিসারদের মতো উনি সবেতে 'ইয়েস বস' বলতে পারেন না।"

"হুঁ! ন্যায্য কথাই বলেছিস!" আবেগঘন স্বরে দেবদাস জানায়।

"তার উপর আমাদের বড়সাহেব তো ওঁকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। কারণ ম্যাডাম ওঁকে অফিশিয়ালি সমীহ করলেও আসলে পাত্তাই দেন না। পাকাপাকিভাবে কী করে ম্যাডামকে লালবাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাই নিয়ে ঘোঁটও পাকাচ্ছেন।"

"সে না হয় হল, কিন্তু সি এমএর রাগের কারণটা? উনি তো তাঁর পাকা ধানে কোনও মই দেননি।"

চোখমুখ লাল করে বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই অর্ক বলে, "আলবাত দিয়েছেন!"

"বলিস কী!"

"আরে গর্দভ! ওই কড়েয়া থানার কেসটা!"

"কোনটা বল তো? বাড়ি ভেঙে পড়ার?"

চোরাচোখে আশপাশ দেখে নিয়ে অর্ক বোমাটা ফাটায়, "আরে ওই মাস-রেপিংয়ের কেসটা। সিনেমা না টিভি আর্টিস্ট। শতপথী না কী যেন... হ্যাঁ, হ্যাঁ... পৌলোমী শতপথী।"

দেবদাস খবর-টবর কম রাখে। সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, "গণধর্ষণের মামলার সঙ্গে সিএম-এর কী সম্পর্ক?"

বেশ বিজ্ঞের মতো অর্ক বলে, "কান টানলে মাথা আসে, অ্যাডিশনাল ওসি কড়েয়া মনোজ পাখিরার কাছে শোনা। চারজন আসামির মধ্যে পালের গোদা হচ্ছে আলতাফ হোসেন। সে কে জানিস?"

"না তো! কে সে? আ...ল...তাফ হোসেন?"

"দুটো জব্বর পরিচয়। এক হচ্ছে সিনেমার উঠতি নায়িকা পরভিন সুলতানা আলতাফের ভাবী বিবিজান। আর দুই হল সবচেয়ে মারাত্মক, একজন কেউকেটা মন্ত্রীর ভাগ্নে। সেই মন্ত্রী আবার সিএম-এর ভীষণ বশংবদ, বলতে গেলে ডান হাত। বুঝতেই পারছিস, আইও এবং ওসির উপর কী ট্রিমেন্ডাস চাপ। 'আলতাফকে বাদ দিয়েই যেন তদন্ত হয়।'... আরে বাবা, চারজনই এফআইআর নেম্‌ড। তায় আবার এক নম্বরেই আলতাফের নাম। এখন বোঝ আবদারটা।"

বলতে-বলতে অর্ক বেশ চার্জড! দেবদাসের মতো নীরব শ্রোতা পেয়ে সে তার চাপা ভাষণ চালিয়েই যায়, "জানিস তো রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্টের পর সেকশন থ্রি ৭৬ একেবারে অগ্নিগোলক। মাসরেপিংয়ের পানিশমেন্ট, কেসের গুরুত্ব অনুসারে হয় যাবজ্জীবন, নয় ফাঁসি। ঠ্যালা বোঝ! চার্জশিটে ঠিকমতো গাঁথা হলে আর রক্ষে আছে?"

দৃষ্টি টারজেনের সিংহের উপর সজাগ থাকলেও দেবদাস বেশ মনোযোগের সঙ্গেই অর্কর কথাগুলো শুনছে, "শেষমেশ কী হল? আলতাফ ধরা পড়েছে?"

"পড়বে না মানে? শালা পড়েছে কস্তুরী মুখোপাধ্যায়েরই খপ্পরে। পার পাবি ভেবেছিস? আই ও এবং ওসির মুখে শোনা মন্ত্রিমহোদয়ের শিরঃপীড়ার কারণ আর তদন্তের কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর, মানে এফআইআর-এ কারচুপি করার জন্য প্রেশার দেওয়া হচ্ছে। শুনেই ম্যাডাম আরও তেড়িয়া হয়ে যাবতীয় সোর্স কাজে লাগান আলতাফের হদিশ করতে। বাড়ির ফোন মোবাইল ট্যাপ করেও কোনও সূত্র না পেয়ে বুদ্ধি করে, কস্তুরী মুখোপাধ্যায় বলেই সম্ভব, পরভিন সুলতানার মোবাইল ট্যাপ করা শুরু করলেন। মারাত্মক খবর পেলেন। আলতাফ মরিয়া হয়ে বলেছে, 'ডার্লিং টাকা পাঠাও, সব টাকা শেষ, না খেয়ে মরতে বসেছি।'

"টাওয়ার লোকেশন বলছে কলটা ইনদওর থেকে। ব্যস! নেক্সট ফ্লাইট ধরে বাঘা-বাঘা অফিসারদের টিম নিয়ে দিল্লি। ওখান থেকে ভোপাল ভায়া ইনদওরের ফ্লাইট। মনোজদার কাছ থেকে আরও শোনা, ডিসি ইনদওর দারুণ হেল্প করেছে। ওখানে কসেরা বাজারের এক হোটেল থেকে ঘটনার ১৫ দিনের মাথায় মূল পাণ্ডা আলতাফ গ্রেপ্তার হল।"

দেবদাস লক্ষ করল টারজেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে। গারদের রেলিং ধরে খুব উৎসুক হয়ে কিছু শুনতে চাইছে। কয়েক কদম এগিয়ে ওরাও এজলাসের আরও গভীরে এল। দেখল বেঞ্চ ক্লার্ক অরুণবাবু

জজসাহেবের কাছে কিছু কাগজপত্র এগিয়ে দিচ্ছে, "স্যার, আসামি টারজেন সিংহ গতকাল এই জামিনের দরখাস্ত করেছে। সঙ্গে কিছু মেডিক্যাল পেপার্সও রয়েছে।"

দেড়টা বাজতেই শিবনাথ ঘোষাল আজকের মতো আরগুমেন্ট স্থগিত রেখেছেন। সেই ফাঁকেই টারজেনের দরখাস্ত জমা পড়েছে। দ্রুত পিটিশনটিতে চোখ বুলিয়ে সমরজিৎ লাহিড়ি তাকালেন জটাধারী চৌবের দিকে। চৌবেজির ভাবগতিক খুবই ঢিলেঢালা। পানসে মুখ করে বললেন, "ইয়োর অনার, এই বেল পিটিশনটা এখন আর মুভ করছি না।"

চিফ পিপি শিবনাথ ঘোষাল এতক্ষণ মুখিয়েই ছিলেন ভেহেমেন্ট অবজেকশন দেবেন বলে। কিন্তু যুদ্ধটা মাঠেই মারা গেল। সমরজিৎ যা বোঝার বুঝলেন, ভিতরে-ভিতরে আঁতকে উঠলেন এই ভেবে যে, রুম্পাকে কিডন্যাপ করার তথ্যটি তা হলে কালই চৌবে জানতেন? তা হলে ষড়যন্ত্রের শিকড় এত দূর অবধি ছড়িয়েছে? এসব তো আর শিবনাথবাবু জানতেন না। যা হোক, খুবই নিরাসক্তভাবে তিনি, চৌবেজিকে নির্দেশ দিলেন, "মিস্টার চৌবে, তা হলে আপনার পিটিশনের উপর লিখে দিন 'নট প্রেস্‌ড', তারপর সই করুন।"

জটাধারী চৌবে সবে জজসাহেবের কথামতো দরখাস্তের উপর 'নট প্রেস্‌ড' লিখে সই করতে যাবেন, টারজেন সিংহ এক কাণ্ড করে বসল। গলা ফাটিয়ে প্রবল চিৎকার করে বলতে শুরু করল, "জজসাব, উয়োলোগ বহোত পিটা, মুঝে বেহোঁশ কর দিয়া!"

এরকম বাজখাঁই চিৎকারে উপস্থিত জনতা ঘাড় ঘুরিয়ে টারজেনকে দেখে। চিফ প্রসিকিউটর শিবনাথবাবু প্রায় চমকে উঠলেন টারজেনের অভিযোগ শুনে। বলে কী লোকটা! পাগল হয়ে গেল নাকি! ব্যাটা রয়েছে জেল কাস্টডিতে... পুলিশ কাস্টডি হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু জেলের ভিতর! তা হলে কি ওয়ার্ডেনরা নাকি অন্য কয়েদিরা! এত বড় অভিযোগ তো মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল।

শিবনাথ উঠে দাঁড়ালেন। জটাধারীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, "চৌবে, তোমার মক্কেল কাদের কথা বলছে বলো তো?"

জটাধারীও আকাশ থেকে পড়ল। টারজেনের বক্তব্য ওরও বোধগম্য হয়নি।

জজ সমরজিৎ প্রথমে টারজেনের চিৎকারে হতচকিত হয়ে পড়লেও পরক্ষণেই যা বোঝার তা বুঝে গেলেন। কাল কস্তুরী বলেছিল দু'জন এসআই-এর কথা, অর্কপ্রভ এবং দেবদাস। ওদের নাম এবং মুখগুলোও রোজ দেখার ফলে বেশ চেনা হয়ে গিয়েছে। কস্তুরী আরও বলেছিল, ওরা সক্রিয় না হলে রুম্পার অপহরণের প্ল্যানটা তৎক্ষণাৎ জানা যেত না। জীবনসংশয় দেখা দিত। যদিও কস্তুরী ডিটেলে সব কিছু বলেনি, তবু আন্দাজ করা যেতে পারে, কোনও এক ফাঁকে টারজেনের সঙ্গে ওদের একটা এনকাউন্টার হয়েছে এবং তা-ও কোনও সন্দেহজনক বিষয়কে ঘিরে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার পরিচয় সে আইনের রক্ষক। টারজেনের উপর উত্তমমধ্যম পড়ায় সে মনে-মনে খুশি হলেও মুখে তার প্রকাশ করার কোনও উপায় নেই। টারজেনকে তাই সরাসরি জিজ্ঞেস করতে হল, "কাদের কথা বলছেন? "

অর্ক-দেবদাস আদালত কক্ষের বেশ কিছুটা গভীরে এসে দাঁড়িয়েছে টারজেনের ভাবগতিক লক্ষ করে, সে যখনই বলেছে 'উয়োলোগ বহোত পিটা...' তা শুনে তখনই ওদের মনে হয়েছে, মেঝেটা যেন দুলছে। এবার বোধ হয় আর রক্ষে নেই। চাকরিটা তো যাবেই, সেইসঙ্গে শুরু হবে প্রসিডিংস।

জজসাহেবের প্রশ্নে টারজেন রেলিংয়ের বাইরে হাত বের করে অর্ক-দেবদাসকে নির্দেশ করে, "স্যার উয়োলোগ, উধার... দো পুলিশ... বহোত পিটা, পিট-পিটকে বেহোঁশ কর দিয়া!"

ওরা এবার সত্যি-সত্যিই প্রমাদ গোনে। যদি জজসাহেব ওদের কিছু জিজ্ঞেস করে, তা হলে ওরা কী বলবে! দেবদাস ফিসফিস করে অর্ককে পাখিপড়ার সুরে বলে যায়, "স্রেফ ডিনাই। মিনমিন করে নয়,

Royal Indian Hotel Pvt. Ltd
147, Rabindra Sarani, Kol-73, Ph: 9903369147
RIH Reputed Since 1905 ROYAL
স্পেশাল পুজোর খাবার
চিকেন চাঁপ, মটন চাঁপ, রুমালি রুটি, পসিন্দা কাবাব, নার্গিস কোপ্তা, মুর্গ মুসল্লম, চিকেন বিরিয়ানী, মটন বিরিয়ানী, তন্দুরী আইটেম, ফিরনি, শাহি টুকরো
Credit Card Accepted in AC | Parking available

ASHOKA RESTAURANT
For Delicious INDIAN TANDOORI & CHINESE FOOD
3B,Chowringhee Road, Kol-13, Phone-22282248
▼ Heart Of Calcutta ▼ Exclusive Dining Hall For Private Parties& Conferences ▼ Fully Air-Conditioned ▼ Cool & Comfortable family ambiance ▼ Wallet Friendly Prices

MD YAQUB GORA
MYG
CATERERS FOR YEARS
9903582261, 8981075889
Approved Caterers of:
Calcutta Port Officers' Club
93, Chowringhee Road,
Kolkata - 700020
Freemasons' Hall
19, Park Street,
Kolkata - 700016
advtmacsys@gmail.com 9331038281

খোলতাই স্বরে বলবি, 'মিথ্যে বলছে হুজুর, ডাহা মিথ্যে...' "
তবে ব্যাপারটা ততদূর গড়াল না। শিবনাথ ঘোষাল বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে বললেন, "এসব কী যা-তা বলছ? ওরা তোমার গায়ে হাত দিলে কেউ দেখতে পেত না এই কোর্ট চত্বরে? যন্তসব বোগাস!"
"নহি সাব! ইধার নহি... লকআপ ভ্যানকে অন্দর..."
শুনে তো আরও খাপ্পা শিবনাথবাবু, "কী বলছ কী! ওদের কী দায় পড়েছে খামোকা তোমাকে পিটাই করার?"
জটাধারীর মুড এমনিতেই ভাল ছিল না। বেশ বিরক্তির সঙ্গেই সে জানায়, "না স্যার, আমি কোনও অভিযোগ দাখিল করছি না।"
ঠিক সেই সময় আলিপুর সিজেএম কোর্টের ছবি অন্যরকম।
লেডি কনস্টেবল পরিবৃত হয়ে সুইটি আর মঞ্জু সাঁতরা আদালত কক্ষের একপাশে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে গরাদের ওপাশে তারাপদ, বিল্লু আর ড্রাইভার শর্মা। আই-ও সবাইয়ের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা দায়ের করেছে। একটি হল একজন স্কুলছাত্রীকে অপহরণ ও পাচারের চেষ্টা। আর তারাপদ ও মঞ্জুর বিরুদ্ধে মামলা জালনোটের পাচার সংক্রান্ত। বলা বাহুল্য, অপহরণের মামলাটিতে মঞ্জুকেও অন্যতম আসামি হিসেবে ট্যাগ করা হয়েছে। তারাপদ বাদে অন্য সবাইকার পুলিশ কাস্টডির প্রেয়ার হাকিম অ্যালাও করলেন, আর তারাপদর হল জেসি।
খুবই কৌশল করে রুম্পার পরিচয় এফআইআরে বিশদে বলা হয়নি প্রেসক্রিফিং এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ টারজেন সিংহ মামলায়

সমরজিৎ যা বোঝার বুঝলেন, ভিতরে-ভিতরে আঁতকে উঠলেন এই ভেবে যে, রুম্পাকে কিডন্যাপ করার তথ্যটি তা হলে কালই চৌবে জানতেন?

কোনও বিঘ্ন ঘটুক, তা কন্তুরী চায়নি। মামলাটি বেঞ্চ চেঞ্জ হয়ে অন্য আদালতে চলে যাক, এটা কন্তুরীর কাছে কোনও ভাবেই কাম্য নয়। রুম্পা-অপহরণ মামলায় টারজেনকেও ষড়যন্ত্রকারী আসামি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ধারায় গেঁথে ফেলা হয়েছে। জেলের ভিতরে বসেই এই জঘন্য কন্সপিরেসি করেছে প্রেশার ট্যাকটিক্স হিসেবে। সব দেখে-শুনে ম্যাজিস্ট্রেটও টারজেনকে প্রডিউস করার নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে রুম্পার স্টেটমেন্ট নথিভুক্ত করার তারিখও ধার্য হয়েছে।

{২৫}

ইনদওর আদালতের ট্রানক্বিট রিম্যান্ড অর্ডারটিও খুঁটিয়ে পড়ে নিয়ে শশিকান্তর হাতে ধরিয়ে দিল। অমনিই সে ওটিকে স্ক্যানারে ফেলে স্ক্যান করে ল্যাপটপে সেভ করে নেয় 'প্রাণভোমরা' নামের একটি স্পেশ্যাল ফোল্ডারে। আজ খুব সকাল-সকাল তার দফতরে চলে এসেছে কন্তুরী। লালবাজার চত্বর তখন বেশ শুনশান। মনোজ পাখিরাও ম্যাডামের নির্দেশে পৌলোমী শতপথীর গণধর্ষণ মামলার কেস ডায়েরি বগলদাবা করে হাজির। আর এসেছে কন্তুরীর টিমের অত্যন্ত দায়িত্বশীল একজন অফিসার বৈদ্যনাথ, বৈদ্যনাথ সাহা। পিএ শশিকান্ত দাঁ-ও কন্তুরীর কনফিড্যান্ট ম্যান, ম্যাডাম বলতে অজ্ঞান। কম্পিউটারের প্যাঁচপয়জারও ওর নখদর্পণে।
এবার আইও মনোজ পাখিরা কন্তুরীর কথামতো আলতাফ হোসেনের অ্যারেস্ট মেমো এবং ইনদওরের সেই হোটেল প্যানোরামার স্টাফদের বিবৃতি এগিয়ে দেয়। দ্রুত চোখ বুলিয়ে সেগুলোও শশিকান্তর হাতে চালান হয়ে যায়। একটু আগেই আসামিদের পোটেন্সি টেস্ট রিপোর্ট এবং পৌলোমী শতপথীর মেডিক্যাল এগজামিনেশন রিপোর্ট সহ তার স্টেটমেন্ট সেভ করা হয়েছে। যেসব তথ্যে ট্যাম্পারিংয়ের চেষ্টা করা হতে পারে এবং মন্ত্রীর ভায়েকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া চেষ্টা চালানো হতে পারে, সেসব ডকুমেন্টারি এভিডেন্স কন্তুরী আগেই নিজের কবজায় নিয়ে নেওয়ার কথা ক'দিন আগেই ভেবে রেখেছে। কেসটার প্রাণভোমরা থাকবে ওর কবজায়। ওর জায়গায় যে পেটোয়া অফিসারকে বসানো হবে, সম্ভবত তার প্রথম কাজই হবে 'পারফার্টেরি ইনভেস্টিগেশন', এই অজুহাতে অপদার্থতার লেবেল সেঁটে মনোজ পাখিরাকে তদন্তের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। যেখানে আর ক'দিনের মধ্যে কেসটার চার্জশিট দাখিল হয়ে যাবার কথা, সেখানে ঢিলেমি দেখিয়ে স্ট্যাটুটরি পিরিয়ড ৯০ দিনের সীমা পার করে দেওয়া হবে। ব্যস। আসামিদের পোয়াবারো। এই যদি আইনরক্ষকদের মানসিকতা হয়, তা হলে ধরে নিতে হবে শুধু তার কর্মজীবনই নয়, সারা সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন, কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে।
না, আর তিন-চারদিনও যদি ট্রান্সফার ঠেকানো যায়, তা হলে চার্জশিট দাখিল করেই যাবে। পরবর্তী কালে সাপ্লিমেন্টারি চালান জমা পড়লেও মূল কেসের ভিত টলানো যাবে না।
কাল টেলিফোনে চন্দ্রনাথ শ্রীমানিদা যা বললেন, তা রীতিমত চিন্তার ব্যাপার। সি এম-এর মিটিং কাল পোস্টপন হয়ে গিয়েছে। অ্যাকাডেমিতে ওঁর ছবির প্রদর্শনী ছিল। সে মিটিং কবে হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু এই ওয়ান পারসন শো মিটিং নিয়ে কন্তুরীর কোনও মাথাব্যথা নেই। শ্রীমানিদা যা বললেন, আসলে মিটিংটা ডাকা হয়েছিল কন্তুরীকে চিবিয়ে খেতে। সিপি চ্যাটার্জিসাহেবের ইন্ধন ছিল। সবশেষে উনি যা বললেন, "নর্থবেঙ্গলের জন্য রেডি থেকো। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। তোমার জায়গায় বশংবদ খোঁজা হচ্ছে। মন্ত্রীর আত্মীয়দের কেসে তুমি কারও কথা শুনছ না। বলো তো পোস্টিং অর্ডার ১০দিন পিছিয়ে দিতে পারি। যদিও উনি চাইছেন উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট।"
না, কন্তুরী কোনও দয়াভিক্ষা করেননি। কর্তৃপক্ষ তাকে টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার করলেও, সে তখনই চার্জ বুঝিয়ে দেবে। সেশন জজ সমরজিৎ লাহিড়ি একবার ডেকেছেন। চারটের সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সেইমতো প্রস্তুত হচ্ছিল। সেলটি ঝঙ্কার তুলতেই স্ক্রিনে চোখ যায়, আরে! রাহুল তানেজা! হঠাৎ রাহুল কেন? কন্তুরীরই ব্যাচমেট, পঞ্জাব ক্যাডারের। এখন ও তো ডেপুটেশনে সিবিআই-তে। কন্তুরীও দরখাস্ত করেছিল। সেটাও পিএমও অফিসেই চেপে রাখা হয়েছে বিশেষ একজনেরই অঙ্গুলিহেলনে। কন্তুরী এখন যে অনেকেরই চক্ষুশূল।
"আরে রাহুল... হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইজ! আরে কবে এলে? সঙ্গীতা ক্যায়সি হ্যায়? ম্যায় তো বিলকুল ঠিক হুঁ..."
"জাস্ট অ্যারাইভ্‌ড, টপ আরজেন্ট... নিড ইয়োর হেল্প কন্তুরী..."
"এনি কনফিডেনশিয়াল রেইড?"
"ইয়েস... উই আর চেঞ্জিং আ লেভিয়াথান, আ ম্যামথ মনস্টার... বঙ্গাল কা খুন চুস রহা থা। কব মিলোগি, ইঁসস ভেরি, ভেরি আরজেন্ট।"
রাহুলের সঙ্গে কথা শেষ করেই কন্তুরী সেশন কোর্টে যাবার তোড়জোড় শুরু করে। রাহুলের কথাগুলো তো মারাত্মক।
এত দিন গুঞ্জন আকারে কথাগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু তা যে ভিতরে-ভিতরে এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল, তা টের পায়নি। লালবাজারেও রাহুলকে ডাকা যেত, কিন্তু এখানে দেওয়ালেরও কান আছে। গাড়িতে উঠতে-উঠতে সে ভাবে, তা হলে কি সত্যি-সত্যি কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে?

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য